শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীত

গুরুসদয় দত্ত আই. সি. এস.

এবং

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক

ডক্টর নির্মলেন্দু ভৌমিক এম. এ., ডি. ফিল.

সম্পাদিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৬৬

শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীত : ভূমিকা

সূচীপত্র

॥ প্রথম খণ্ড ॥

॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥

॥ পরিশিষ্ট ॥

নিবেদন

আগষ্ট ১৯৫৭ খ্রীষ্টসন হইতে আগষ্ট ১৯৬০ খ্রীষ্টসন পর্যন্ত আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রামতনু লাহিড়ী গবেষণা-সহায়ক' ছিলাম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগের তদানীন্তন 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক' ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের অনুপ্রেরণা ও নির্দেশনায় এই কাজ আরম্ভ করি। তিনিই বাঙলা পুঁথিশালায় রক্ষিত স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্ত মহাশয়-সংগৃহীত শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীতের জীর্ণ ফাইল আমার হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন। আজ সেই ফাইল ছাপাইয়া যখন শেষ করা হইল, তখন তিনি পরলোকে। এই গ্রন্থের প্রকাশক্ষণে সর্বাগ্রে আমি স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্ত এবং স্বর্গীয় শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহোদয়গণকে প্রণাম নিবেদন করিতেছি। একজন এই গ্রন্থের উপদেশ জোগাইয়াছেন, অপরজন আমাকে এই গ্রন্থ সম্পাদনার দায়িত্ব ও অনুপ্রেরণা দিয়াছেন।

ডাঃ দাশগুপ্ত এই গ্রন্থের মুদ্রণকার্য সমাপ্ত দেখিয়া যাইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু ইহার সংগ্রহ-অংশের সম্পূর্ণটাই এবং ভূমিকা-অংশের কিয়দংশ মুদ্রিত দেখিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থের মূল পরিকল্পনায় এবং আলোচনা-রীতিতে তাঁহারই নির্দেশ অনুসরণ করিয়াছি। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, সাধারণ পাঠকবর্গও যেন এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীত সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা লাভ করিতে পারেন। এইজন্যই সহজ প্রাপ্য পুস্তকাদি হইতেও যেমন উদ্ধৃতি দিয়াছি, তেমনি পূর্বে আলোচিত বিষয়ের জেরও অনেক ক্ষেত্রে টানিয়াছি,—বিশেষতঃ বাউল গান ও সূফীগানের প্রসঙ্গে। প্রসঙ্গতঃ একটি কথা বলা দরকার। বইখানিতে শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীতের সকল দিক আলোচিত বা উদাহৃত হয় নাই। ভবিষ্যতের সংগ্রাহক ও সম্পাদকের উপর সে কাজের ভার রহিল।

গ্রন্থ-সম্পাদনার মূল পরিকল্পনাটি গ্রন্থের মুখবন্ধে আমার পূজ্যপাদ শিক্ষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী মহাশয় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ডাঃ দাশগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহারই

নির্দেশনায় এ গ্রন্থ সমাপ্ত হইল। তিনি এই গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখিয়া ইহার মর্যাদা বাড়াইয়া দিয়াছেন।

এইবার ঋণ স্বীকারের পালা। গ্রন্থটির ভূমিকা-অংশ রচনা করিতে আমি বিভিন্ন লেখক-লেখিকার গ্রন্থের সাহায্য লইয়াছি। তাঁহাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। স্বর্গীয় অচ্যুতচরণ চৌধুরীর 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত'; ডাঃ শ্রীরমা চৌধুরীর 'বেদান্ত ও সুফীদর্শন'; অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'বাঙলার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি'; এবং ডাঃ শ্রীউপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্যের 'বাঙলার বাউল ও বাউল গান' প্রভৃতি বই হইতে আমি বিশেষরূপে সাহায্য পাইয়াছি।

প্রখ্যাত সঙ্গীত-রসিক স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ এবং শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের সহিত অলোচনা করিয়া অনেক উপকৃত হইয়াছি। ভাটিয়াল, রাগ, সারি ও ধামাইল গান সম্পর্কে শ্রীচক্রবর্তী আমাকে অনেক নির্দেশ দিয়াছেন। লোকসঙ্গীত শিল্পী শ্রীহেমাঙ্গ বিশ্বাস শ্রীহট্টেরই অধিবাসী। তিনি শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীতের সুর সম্পর্কে একটি সুন্দর নিবন্ধ লিখিয়া দিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক, বিশিষ্ট কথাশিল্পী, আমার পূজনীয় শিক্ষক শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিতও আলোচনা করিয়া উপকৃত হইয়াছি এবং গ্রন্থে তাঁহার মতামত সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। জীবনে ইঁহার নিকট নানাভাবে স্নেহ পাইয়াছি, প্রণাম নিবেদন করিয়া সে ঋণ শোধ হইবে না। সঙ্কলিত গানগুলিতে ব্যবহৃত আরবী-ফারসী শব্দের অর্থ ও টীকা করিয়া দিয়াছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগের অধ্যাপক পরভেজ সাহিদী, এম. এ। লোক-সাহিত্য রসিক অধ্যাপক ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় ভূমিকা-অংশটি পড়িয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন খয়রা রিসার্চ স্কলার শ্রীসত্যেন্দ্র নারায়ণ গোস্বামী শ্রীহট্টের তিনটি গানকে আন্তর্জাতিক বর্ণমালায় রূপান্তরিত করিয়া দিয়াছেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের সহকারী অধ্যাপক, আমার শ্রদ্ধেয় সহকর্মী, ডাঃ শ্রীভূদেব চৌধুরী শ্রীহট্টের 'ভাষা-পরিচয়' শীর্ষক অধ্যায়টি রচনা করিয়ে সহায়তা

করিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন কলেজের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক, আমার অগ্রজ-প্রতিম শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট সর্বপ্রকার সাহায্য ও উপদেশ পাইয়াছি। তিনিই এ গ্রন্থের প্রথম পাঠক। তাঁহার মত ও মন্তব্যকে এ গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে গ্রহণ করিয়াছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা পুঁথি-বিভাগের শ্রীসুকুমার মিত্র মহাশয় আমার অনেক উপদ্রব সহ্য করিয়াছেন। এই স্নেহশীল মানুষটির সংস্পর্শে যিনি আসিয়াছেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীনীরদপ্রসাদ নাথ, এম. এ. কয়েকটি তথ্য সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। কলিকাতা সুরেন্দ্রনাথ কলেজের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক, বন্ধুবর ডাঃ শ্রীমুনীন্দ্রকুমার ঘোষের অপ্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থ "কবি সঞ্জয়ের মহাভারত" হইতে আমি কয়েকটি উদ্ধৃতি লইয়াছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা প্রকাশনা বিভাগের সম্পাদক, বন্ধুবর ডাঃ পীযূষকান্তি মহাপাত্র এই গ্রন্থের মুদ্রণকার্যের সূত্রপাত হইতে সর্বদা সচেতন দৃষ্টি রাখিয়াছেন এবং উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন। 'ইণ্ডিয়ান ফোক-লোর' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্ত মহাশয় পুস্তকাদি দিয়া সাহায্য করিয়াছেন।

আমি ভালো প্রুফ সংশোধন করিতে পারি না। অনেক স্থলেই হয়তো ছাপার ভুল থাকিয়া গেল। সেজন্য পাঠকদের সস্নেহ প্রশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। ইতি—

নির্মলেন্দু ভৌমিক

প্রেসিডেন্সী কলেজ,
কলিকাতা-১২,
রথযাত্রা, ১৩৭২

মুখবন্ধ

স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্ত, আই, সি, এস, মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের নিকট ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ সনে শ্রীহট্ট হইতে সংগৃহীত এই গানগুলির পাণ্ডুলিপি জমা দিয়াছিলেন। সেই ফাইল দীর্ঘদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক, স্বর্গীয় ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় ১৯৫৭ সনে তদানীন্তন রামতনু লাহিড়ী গবেষক, বর্তমান গ্রন্থের সম্পাদক শ্রীমান নির্মলেন্দু ভৌমিককে রক্ষিত গানগুলি সম্পাদনার ভার দেন। আজ এই গ্রন্থের প্রকাশ-লগ্নে দুইজন মানুষকে আন্তরিকভাবে স্মরণ করিতেছি। একজন এই গানগুলির সংগ্রাহক স্বর্গীয় দত্ত মহাশয়; অপর জন স্বর্গীয় শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়, যাঁহার উৎসাহ ও উপদেশে এই গ্রন্থের সম্পাদনা এবং প্রকাশনা আরম্ভ হয়। আজ সেই দুইজন মানুষের স্মৃতিকে জড়াইয়া এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের নিকট পাণ্ডুলিপি জমা দিবার সঙ্গে স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্ত মহাশয় একটি দীর্ঘ চিঠিও দিয়াছিলেন। উহাতে যে পদ্ধতিতে শ্রীহট্ট হইতে এই গানগুলি সংগৃহীত হইয়াছিল, এবং লোকসঙ্গীত কিভাবে সংগ্রহ করা উচিত, সে বিষয়ে তিনি তাঁহার মতামত জানাইয়াছিলেন। লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করা খুবই কঠিন কাজ। কোনোরূপ বিকৃত না করিয়া যথাযথরূপে উহা গ্রহণ করা দরকার। স্বর্গীয় দত্ত মহাশয় সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন। তিনি সেই চিঠিতে লিখিতেছেন,

...I have now had them [গানগুলি] recorded in exactly the same dialect in which they are sung, which I need hardly say, is the most important consideration in the genuineness of folk songs.

পরিশেষে তিনি লিখিয়াছিলেন,

...I shall undertake to...contribute a suitable introduction explaining the nature and scope of the collection.

দুঃখের বিষয়, সেই প্রস্তাবিত 'introduction' তিনি লিখিয়া যাইতে পারেন নাই। শ্রীমান নির্মলেন্দু সেই কাজ করিয়াছে।

দত্ত মহাশয়ের পাণ্ডুলিপিতে গান ছিল মোট ৪২৩টি। বইয়ের নাম ছিল, "শ্রীহট্টের গণগীত"। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা বিভাগের অনুমোদনক্রমে বর্তমানে তাহা "শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীত" নামে প্রকাশিত হইল। পাণ্ডুলিপিতে রক্ষিত ৪২৩টি গানের মধ্যে অনাবশ্যক মনে হওয়ায় ৪৩টি পরিত্যক্ত হইল। গানের সংখ্যা তাই দাঁড়াইয়াছে ৩৮০।

কোনো বিশেষ একটি রীতি বা আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া দত্ত মহাশয় গানগুলি সাজাইয়া যান নাই। কিংবা, বাউল-ভাটিয়াল গানগুলির পারিভাষিক শব্দের ও সংখ্যার অর্থ যোজনা করিয়া রাখেন নাই। খুব সম্ভব, 'ভূমিকা' অংশে তাহা করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছিলেন।

বর্তমান সম্পাদক, শ্রীমান নির্মলেন্দু, সমস্ত গানগুলিকে নতুন করিয়া সাজাইয়াছে। এখন প্রতিটি বিষয়ের গানগুলিকে ধারাবাহিকভাবে পড়িলেই একটি বিশেষ ভাবের ক্রমবিকাশকে লক্ষ্য করা যাইবে। বুঝিবার সুবিধার জন্য বিষয়গুলিকে গুচ্ছে-গুচ্ছে উপ-বিভক্ত করা হইয়াছে এবং তাহার একটি করিয়া শীর্ষনাম দেওয়া হইয়াছে। পঙক্তিকে ভাঙিয়া বর্তমান স্তবকে রূপ দেওয়া হইয়াছে। আঞ্চলিক শব্দগুলির অর্থ অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবিকৃত-রূপে পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু পারিভাষিক শব্দের টীকা-টিপ্পনী শ্রীমান নির্মলেন্দু-কৃত। আরবী-পারশী-উর্দু শব্দের অর্থের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক পরভেজ সাহিদী, এম, এ, মহাশয়ের সাহায্য লওয়া হইয়াছে।

গ্রন্থটি ভূমিকা, সংগ্রহ এবং পরিশিষ্ট—এই তিনটি অংশে বিভক্ত। ভূমিকা অংশের প্রথমে শ্রীহট্টের লোকসাহিত্য বিচার করিবার জন্য উহার ইতিহাস ও পরিবেশটিকে তুলিয়া ধরা হইয়াছে। তারপর যে সব কবিদের জীবন-পরিচয় জানা গিয়াছে, তাঁহাদের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ভাটিয়াল, রাগ, সারি, ধামাইল, প্রভৃতি গানের সংজ্ঞা ও স্বরূপ লইয়া ইহার আগে তেমন আলোচনা হয় নাই। বর্তমান গ্রন্থে এ সকল বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। এই ব্যাপারে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, অল ইণ্ডিয়া রেডিও-র ডাঃ সুরেশ-চন্দ্র চক্রবর্তী এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কথাশিল্পী শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির নিকট আমরা অনেক সাহায্য পাইয়াছি।

সঙ্কলিত ৩৮০টি গান অবলম্বন করিয়া নির্বিশেষভাবে বাঙলার

লোকসঙ্গীত এবং বিশেষভাবে শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীতের রচনাভঙ্গীটিকে শ্রীমান নির্মলেন্দু নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছে; এবং এই গানগুলিকে অবলম্বন করিয়াই শ্রীহট্টের উপভাষার পরিচয়ও যতটা পায়া যায়, দিয়াছে।

পরিশিষ্ট অংশটিরও বিশেষত্ব আছে। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীতগুলি সংগ্রহ করিয়া শ্রীমান নির্মলেন্দু সঙ্কলিত করিয়াছে। এই গানগুলি দত্ত মহাশয়ের সংগ্রহে ছিল না। দ্বিতীয়ত, শ্রীহট্টের লোকসাহিত্যের অন্যান্য দিক এবং সে সম্পর্কে যে সব আলোচনা বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও এখানে সঙ্কলিত হইল। এ বিষয়ে 'শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা' হইতে সর্বাধিক সাহায্য পাইয়াছি।

এই সংগ্রহ গ্রন্থের অপর বিশেষত্ব হইল,—স্বরলিপিসহ শ্রীহট্টের লোক-সঙ্গীতের সুরের পরিচয়। শ্রীহেমাঙ্গ বিশ্বাস মহাশয় "শ্রীহট্টের লোক-সঙ্গীতের সুর-বিচার" নামক দীর্ঘ প্রবন্ধটি লিখিয়া দিয়াছেন। স্বরলিপিসহ লোকসঙ্গীতের সুরের পরিচায়ন এই প্রথম।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
বাঙলা বিভাগ
৩.২.৬৫

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

॥ শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীত ॥

•

প্রথম খণ্ড : ভূমিকা ॥ দ্বিতীয় খণ্ড : সংগ্রহ

প্রথম অধ্যায়

॥ শ্রীহট্ট ও উহার পরিবেশ ॥

শ্রীহট্ট জেলা প্রাচীনকালে বঙ্গদেশেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল,—১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে উহা আসাম প্রদেশ-ভুক্ত হয়; ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গ ও আসাম মিলিয়া যে নতুন প্রদেশ গঠিত হয়—শ্রীহট্ট তাহাতে পূর্ববঙ্গের অধীন হয়। পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ তখন পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত ছিল : ঢাকা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিভাগ, রাজশাহী বিভাগ, সুরমা উপত্যকা বিভাগ এবং আসাম উপত্যকা বিভাগ। সুরমা উপত্যকা বিভাগ—শ্রীহট্ট, কাছাড়, খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পাহাড় এবং নাগা ও লুশাই পাহাড়কে লইয়া গঠিত ছিল।

বর্তমান সময়ে গণভোট হইবার ফলে শ্রীহট্টের বেশীর ভাগ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে[১]। পূর্বপাকিস্তানের সতেরোটি জেলা, তিনটি ডিভিশন (ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম)। শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম ডিভিশনের পাঁচটি জেলার (চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট) অন্যতম। পাকিস্তানী শ্রীহট্ট ৪,৮৮২ বর্গমাইল, উহার চারটি সাব-ডিভিশন, বত্রিশটি থানা এবং ৯,৪৯২টি গ্রাম[২]। শ্রীহট্টের সাব-ডিভিশন চারিটি : সদর, হবিগঞ্জ, দক্ষিণ শ্রীহট্ট (মৌলভী বাজার), সুনামগঞ্জ[৩]। পূর্বের করিমগঞ্জ মহকুমার রাতাবাড়ী, পাথারকান্দি, বদরপুর এবং কিছু অংশ বাদে করিমগঞ্জ থানা ভারতবর্ষের মধ্যেই আছে; বড়লেখা, বিয়ানী বাজার এবং করিমগঞ্জ থানার কিছু অংশ (কুশিয়ারা নদীর উত্তর দিক) পাকিস্তানে।

সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে অবশ্য এই ভৌগোলিক সীমা-নির্দেশ নিতান্তই অবান্তর। রাজনৈতিক ব্যবধান আজিকার দিনেও সেই সংস্কৃতির ধারাকে ব্যাহত করিতে পারিয়াছে কিনা সন্দেহ। উপরে শ্রীহট্টের

১ "The Sylhet district of Assam voted in a referendum for Pakistan"—Census of Pakistan, 1951, Vol. 3, By *H. H. Nomani, M. A., P.* 25

২ *Ibid, P.* 4.

৩ *Ibid, P.* 41.

ভৌগোলিক সংস্থান সম্পর্কে যে তথ্যাদি পরিবেশিত হইল,—তাহা শ্রীহট্টের পরিবেশকে বুঝিয়া লইবার জন্যেই। আমরা শ্রীহট্ট বলিতে অখণ্ড শ্রীহট্টকেই বুঝাইব, উহাই উহার সাংস্কৃতিক জগতের পূর্ণ পরিচয়কে উজ্জ্বল করিবে।

উত্তরে খাসিয়া-জয়ন্তীয়া পাহাড়, পূর্বে কাছাড়, দক্ষিণে পার্বত্য ত্রিপুরা এবং পশ্চিমে ত্রিপুরা ও মৈমনসিংহ জেলা—এই ছিল শ্রীহট্টের চৌহদ্দি। বহু নদী, প্রান্তর, টিলা এবং 'হাওর' (জলমগ্ন প্রান্তর, 'সাগর' হইতে) দ্বারা পরিপূর্ণ এই জেলা। পাহাড়-পর্বত, অরণ্য-প্রান্তর এবং নদী-হাওরে শ্রীহট্টের নিসর্গ শোভা বাড়িয়াছে, গীতিসাহিত্যের প্রেরণা আনিয়াছে। এই সমস্ত পাহাড়-টিলা-নদী-হাওর শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীতে অসকৃৎ উল্লিখিত হইয়াছে।

পলডহরের (সরসপুরের) পাহাড়, দু আলিয়া (প্রতাপ গড়ের) পাহাড়, ষাঁড়ের গজ (লঙলার) পাহাড়, আদমপুরের পাহাড়, বড়শী ঘোড়া (বালিশিরার) পাহাড়, সাতগাঁও ও বিষ গাঁয়ের পাহাড়—প্রভৃতি পাহাড়; কুশিয়ারা (বরাক), সুরমা, ধলেশ্বরী (ভেড়ামোহনা), গোয়াইন, পিয়াইন, বৌলাই, কংস,—প্রভৃতি নদী এবং উহাদের অসংখ্য উপনদী, খাল, হাওর এই জেলায় রহিয়াছে। চা, কমলালেবু শ্রীহট্টের দুই বিশেষ বস্তু হইলেও উহাদের কথা ও প্রভাব গানে নাই।

প্রসঙ্গতঃ শ্রীহট্টের নৌকা-শিল্পের কথা উল্লেখ করা যায়। এককালে সমুদ্রগামী নৌকাও এখানে প্রস্তুত হইত। হবিগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলের দীর্ঘ 'পলওয়ার' নৌকা, অল্প জলে চলিবার জন্য পাণ্ডুয়া ইত্যাদি স্থানের 'বারকী' নৌকা—প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমদানী-রপ্তানী-ব্যবসা-বাণিজ্য শ্রীহট্টে যথেষ্টই ছিল—গানে তাহার প্রভাবও পাইয়াছি।

এখানকার পশু-পাখী ও ইতর প্রাণীর ছাপ প্রাপ্ত গানগুলিতে নাই বলিলেই চলে।

শ্রীহট্ট জেলার বিভিন্ন রকমের অধিবাসীদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানদের কথাই বর্তমান প্রসঙ্গে আমাদের আলোচ্য ও বিবেচ্য। হিন্দুদের মধ্যে লৌহদ্রব্য প্রস্তুতকারক নবশায়ক জাতির অন্তর্গত কামার, লিপিবিদ্ ক্ষত্রিয় কায়স্থ, পালকি বাহক কাহার, ইক্ষু ব্যবসায়ী কুশিয়ারী, বস্ত্রবয়নকারী ব্রাহ্মণ-শূদ্রের সংকর সন্তান কেওয়ালী বা কপালী, জালিক কৈবর্ত ও 'হালিক,' নৌকা সংরক্ষণ ও চালনায় পটু গণ্ডপাল বা গাড়ওয়াল, গন্ধবণিক, চুন

ব্যবসায়ী চুনার, চুলী, তাঁতী, তেলী, দাস-হালুয়াদাস-শূদ্রদাস, ডোম-পাটনী-নদীয়াল, নমঃশূদ্র, পালকি-বাহক কুঁইয়ালী ও মাহারা, মৎস্যজীবী মালো, লোহাইত, কুমী, নাথ উপাধিধারী যুগী, পান ব্যবসায়ী বারুই, শাঙ্খিক শাঁখারি, শৌণ্ডিক শুঁড়ি। ভাট বা ভট্টকবি—কবিতা রচনা ও গান করা ইহাদের ব্যবসায়। মুসলমানদের মধ্যে : মক্কার সন্নিহিত স্থান হইতে আগত কুরেষি, নিম্নশ্রেণীর গায়ক-সম্প্রদায় গাইন, নিম্নশ্রেণীর বস্ত্রব্যবসায়ী জোলা, বাদ্যকর নাগরাছি, পাঠান (শেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান—এই চারিটি প্রধান সম্প্রদায়ের অন্যতম), মৎস্যজীবী মাহিমাল, পাখী প্রভৃতি শিকারী নিম্নশ্রেণীর মীর শিকারী, মোগল, পশু-শিকারী ও সর্প-ব্যবসায়ী বেজ, শেখ ("আরবের সাধারণ মুসলমানদের উপাধি শেখ") "হজরত মোহাম্মদের জামাতা আলীর বংশজাত" মোসলমান সমাজে সম্মানিত 'সৈয়দ'—প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য[১] ॥

আসাম এমন একটি স্থান, যাহার সহিত বাঙলা ও আসামের দুই বৈষ্ণব মহাপুরুষের নাম ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত : শঙ্করদেব ও শ্রীচৈতন্যদেব। ইঁহাদের প্রবর্তিত ও প্রণোদিত বৈষ্ণবতার ধারার মধ্যে পার্থক্য আছে সন্দেহ নাই,—কিন্তু সেই পার্থক্যের মধ্যেও সাধারণ ভাবে কয়েকটি বিশেষত্ব এমন ভাবে কাজ করিয়াছিল,—যাহাতে সমগ্র আসাম-বাসী শ্রীরাধাকৃষ্ণের নামগানের এক সুরে সাড়া দিয়াছে। শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীতে অবশ্য শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত ধারাটিই যে বলবতী হইয়াছে, তাহা বলিয়া বুঝাইবার আবশ্যক নাই।

শ্রীহট্টের বৈষ্ণব-প্রতিবেশ সম্পর্কে গভীরতর আলোচনায় নিবিষ্ট হইবার পূর্বে শঙ্করদেব ও শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণবতার পার্থক্যটি স্পষ্ট করিয়া মনে রাখা দরকার।

"আসামের মহাপুরুষ শঙ্করদেব শ্রীচৈতন্যের প্রায় সমসাময়িক। শঙ্করদেবের ধর্মমতের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয় সম্প্রদায়েই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ও নবধা ভক্তির সাধন

১ এই পরিচ্ছেদটি অচ্যুতচরণ চৌধুরী-লিখিত 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' (১৩১৭) এবং *B. C. Allen, C. S.* সম্পাদিত Assam District gazetteers (Vol. II : Sylhet, 1905)—এই বই দুইটি অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে।

দেখা যায়। শঙ্করদেব ও শ্রীচৈতন্য উভয়েই কীর্তনের দ্বারা ধর্মপ্রচার করেন, উভয়েই শ্রীকৃষ্ণকে একমাত্র উপাস্যরূপে স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণকে মধুররসে উপাসনা করিয়াছেন, আর শঙ্করদেব দাস্যভক্তির মহিমা প্রচার করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি ষোড়শ নাম ও শঙ্করদেব চারনাম গ্রহণের উপদেশ দিয়াছেন[১]।"

ডাক্তার সত্যেন্দ্র নাথ শর্মা শঙ্করদেবের 'চারিতত্ত্ব' ও 'নবধা' ভক্তির কথা সংক্ষেপে সুন্দর করিয়া জানাইয়াছেন: "নাম, দেউ (উপাস্য), গুরু আরু ভকত (সৎসঙ্গ)—এই চাৰিটা তত্ত্বক ভক্তিসাধনাৰ অপৰিহাৰ্য অঙ্গস্বরূপে "এক শৰণ নামধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি জনসমাজকে উদ্বুদ্ধ কৰি তোলে।" "মহাপুরুষ দ্বারা (অর্থাৎ শঙ্কর দেবদ্বারা) প্রবর্তিত নববৈষ্ণব ভক্তি মাৰ্গৰ প্ৰধান লক্ষণসমূহ চমুকৈ এই:—

(১) এই ধৰ্ম কৃষ্ণ-ভক্তি প্ৰধান আৰু ভাগবত পুৰাণ প্ৰধান আৰু আদৰ্শ ধৰ্মগ্ৰন্থ.

(২) শ্ৰৱণ আৰু কীৰ্তনৰ যোগে ভগবানৰ উপাসনা.

(৩) নানা দেব দেবীৰ ঠাইত অব্যভিচাৰী ভক্তিৰ দ্বাৰা বিষ্ণুত আশ্ৰয়

(৪) যাগযজ্ঞ, তপস্যাব্ৰত আদি কষ্ট সাপেক্ষ, ক্ৰিয়াবহুল সাধন বা উপাসনাৰ অনুপযোগিতা দৰ্শন

(৫) অহিংসা, প্ৰেম, দয়া আদি সৎ প্ৰবৃত্তিৰ কৰ্ষণৰ ওপৰত গুৰুত্ব

(৬) ভক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ব্ৰাহ্মণ চণ্ডাল সকলোৰে সম অধিকাৰ[২]।"

"৯ বিধ ভক্তিৰ ভিতৰত শঙ্কৰী ধৰ্মত শ্ৰৱণ আৰু কীৰ্তনকে প্ৰধান স্থান দিছে,...[৩]।"

আসামে বৈষ্ণবতার প্রচার-প্রসঙ্গে শঙ্করদেবের অবদান দুই দিক হইতে—জীবন দিয়া ওই ধর্মের মর্মগ্রাহী উপলব্ধিতে এবং তাঁহার রচনার মধ্যে। শঙ্করদেব কাব্য রচনা করিয়াছেন (হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান, রুক্মিণী হরণ কাব্য, বলিছলন, অমৃত মথন, গজেন্দ্র উপাখ্যান, অজামিল উপাখ্যান, কুরুক্ষেত্র); ভক্তিতত্ত্ব-প্রকাশক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন (ভক্তি-প্রদীপ, ভক্তিরত্নাকর,

---

১ ডাক্তার বিমান বিহারী মজুমদার: শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান (দ্বি. সং) পৃ ৫০৭
২ অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বি. প্র. ১৯৬১), পৃ ৬২
৩ ঐ, পৃ ৮৭

নিমিনবসিদ্ধ সংবাদ); অনুবাদ করিয়াছেন (ভাগবতের ১ম, ২য়, ১০ম, ১১শ, ১২শ স্কন্ধ, রামায়ণের উত্তরাকাণ্ড); নাটগীতি লিখিয়াছেন (পত্নীপ্রসঙ্গ, কালিদমন, কেলি গোপাল, পারিজাত হরণ, রামবিজয়); গীত রচনা করিয়াছেন (বরগীত, ভটিমা); এবং নাম-প্রসঙ্গে নামগীতি রচনা করিয়াছেন (কীর্ত্তন, গুণমালা)[১]।

বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্য হইতে সহজেই বুঝা যায়—ইহার সব গুলিই বৈষ্ণববিষয়ক নহে। বরগীত, কীর্ত্তন, গুণমালা এবং ভাগবতের অনুবাদই অসমীয়া বৈষ্ণব-জগৎকে অপেক্ষাকৃত বেশী দোলা দিয়াছে। "বরগীতর ভাষা ব্রজবুলি বা ব্রজাবলী।...প্রকাশ সংযম, শাস্ত্রীয় রাগর প্রয়োগ, আধ্যাত্মিক ভাবর প্রাধান্য আরু ভক্তি অনুভূতির আন্তরিকতা বরগীতর আন আন বৈশিষ্ট্য। বরগীত বোরত বাৎসল্য শান্ত আরু দাস্য ভাবর প্রাধান্য দেখা যায়। বৈষ্ণব সকলর মতে বরগীতর ৬টা বিষয় পোৱা যায়,—(১) পরম পুরুষ ভগবানর অবতারী লীলা, (২) যশোদা আরু গোপ-গোপীর কৃষ্ণবিদায়ত বিরহ দুখ, (৩) পরমার্থ, (৪) সংসারর প্রতি বিরক্তি, (৫) কৃষ্ণর চৌর্য ক্রিয়া আরু (৬) কৃষ্ণর চাতুরি। লীলাবিষয়ক গীতত আকৌ জাগরণ, চলন, খেলন, নৃত্য আরু নানা অবতারী কার্য বর্ণনা করা হয়[২]।"

শঙ্করদেব প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবতার ধারার প্রতি একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, উহার সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবতার পার্থক্য রহিয়াছে। এইবারে শ্রীহট্টের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের যোগাযোগের কথা বলি।

"বৈষ্ণবসাহিত্যে দেখা যায় যে শ্রীহট্ট, নবদ্বীপ এবং মিথিলা, রামকেলি, খেতরী এবং নীলাচল যেন পরস্পরের বড় নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। এ নৈকট্য দেশ ও কালের ব্যবধান উপেক্ষা করিতে পারিয়াছিল যে কারণে সে কারণ আধ্যাত্মিক। প্রত্যেকটি দেশের যে নিজস্ব সংস্কৃতি ছিল, তাহা অপর দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে মিশিয়া বাঙ্গালার প্রাণধারাকে বড় উদার ও শ্লাঘ্য করিয়া তুলিয়াছিল। বাঙ্গালার ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত তাই শ্রীহট্ট, নানুর, মিথিলা, শ্রীখণ্ড, খেতরী, শান্তিপুরকে একই নগরীর বিভিন্ন পল্লীতে পরিণত করিয়াছে।...শ্রীহট্টের ধর্মপ্রাণ বিপ্রেরা যখন শান্তিপুর-নদীয়া

১ ঐ, পৃ ৮০
২ ঐ, পৃ ৮২

উদ্ধন করিলেন, তখন তাঁহারা শুধু তাঁহাদের শয্যা দ্রব্য ও তৈজসপত্র লইয়া আসেন নাই। তাঁহারা সেখান থেকে যে বীজ আনিয়া সুরধুনীর তীরে ছড়াইয়া দিলেন, তাহাই ক্রমে এক অপূর্ব প্রেমতরুতে পরিণত হইল যাহার তুলনা জগতে নাই।…শ্রীহট্টে সে সময়ে এমন কি আধ্যাত্মিক ও মানসিক সম্পদ ছিল, যাহার ফলে অদ্বৈত, জগন্নাথ, মুকুন্দ, শ্রীবাস প্রভৃতির আবির্ভাব হইতে পারিল[১]?"

"দীর্ঘকাল হিন্দু রাজত্ব থাকার ফলে শ্রীহট্ট একটি প্রধান সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। এমন কি বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের বিদ্যার আলো শ্রীহট্টের দীপশিখা হইতে বিস্তার পাইয়াছিল। নবদ্বীপের দুইটি প্রধান গৌরব নব্যন্যায় ও ভক্তিধর্মের বিকাশ। এই নব্যন্যায়ের অন্যতম মহাগুরু, এমন কি এদেশে সেই বিদ্যার প্রধান প্রবর্তক, রঘুনাথ শিরোমণি শ্রীহট্টের ক্রোড়ের সন্তান। অপরাপর বহু নৈয়ায়িক যাঁহাদের প্রতিষ্ঠা বঙ্গদেশময় তাঁহারাও শ্রীহট্টের অধিবাসী। এই ন্যায় ও তর্কশাস্ত্রের কঠোর ও শুষ্ক মরুভূমিতে যে ভগবৎকল্প ব্যক্তি ভক্তিরসের অমৃতধারা বহাইয়া দিয়াছিলেন তিনি শ্রীহট্টের লোক। শুধু চৈতন্যদেব নহেন ভক্তব্যূহের মধ্যে বহু প্রাতঃস্মরণীয় মহাজন শ্রীহট্টের অধিবাসী। শ্রীচৈতন্যদেবের পিতা জগন্নাথ মিশ্র, মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী, প্রিয়সখা গদাধর ও মুরারিগুপ্ত প্রভৃতি অনেক ভক্তিধর্মের অবতার শ্রীহট্টে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আর এই যুগে যিনি উপনিষদ ও বেদান্ত শাস্ত্রের গুরু, বিদ্যাবুদ্ধিতে যাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি তৎসময়ে বঙ্গদেশে দুর্লভ ছিল, সেই শান্তিপুর-নাথ, সীতার স্বামী "উপকারিকা" নামক প্রাসাদবাসী, লাউড়ের রাজগুরু অদ্বৈতাচার্যও শ্রীহট্টের অধিবাসী ছিলেন। সুতরাং ষোড়শ শতাব্দীতে জ্ঞান, বিজ্ঞান, ভক্তি ও শাস্ত্র-চর্চার যে কয়েকটি জগৎপূজ্য লোক নবদ্বীপ ও শান্তিপুর তাঁহাদের কর্মকেন্দ্র করিয়া, বঙ্গীয় সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, এবং যাঁহারা সমস্ত বাঙ্গালী জাতিকে চির গৌরবান্বিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের সর্বপ্রধান ব্যক্তিগণ—তাঁহাদের কিরীটকুণ্ডল শ্রীহট্টের রত্নখনিতে উদ্ভূত হইয়াছিল[২]।"

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় বা শ্রীচৈতন্যের সহিত শ্রীহট্টবাসী অনেকেই

১ যোগেন্দ্রনাথ মিত্র: শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, বৈশাখ, ১৩৪৩, পৃ ৬-৭

২ ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন: শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, বৈশাখ, ১৩৪৩, পৃ ৪

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যুক্ত ছিলেন। বৈষ্ণবসাধক হরিদাস দাস তাঁহার "শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবজীবন" গ্রন্থে এ সম্পর্কে তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করিয়াছেন। আমরা সেই গ্রন্থ হইতে প্রাসঙ্গিক অংশ সঙ্কলন করিতেছি।

অদ্বৈত আচার্য : "পঞ্চতত্ত্বের একতম। মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। পূর্বলীলায় মহাদেব। শ্রীহট্ট, লাউড় গ্রামে ১৩৫৫ শকে মাঘ মাসের শুক্লাসপ্তমীতে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণবংশে অবতীর্ণ হন[১]।" অদ্বৈতের জীবনী যে কয়জন লিখেন, তন্মধ্যে একজন নবগ্রামের রাজা দিব্যসিংহ, অদ্বৈত তাঁহাদের কুলগুরু। নবগ্রামেই প্রসিদ্ধ তপন মিশ্রের জন্ম,—যিনি পরে মহাপ্রভুর আজ্ঞায় কাশীবাসী হইয়াছিলেন। এই তপন মিশ্রই বৃন্দাবনবাসী ছয় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর পিতা।

ঈশান নাগর : "অদ্বৈত প্রভুর শাখা। ব্রাহ্মণবংশে ১৪১৪ শকে জন্ম। আদি নিবাস—শ্রীহট্ট জেলায় লাউড় পরগণান্তর্গত নবগ্রাম।…ইনি ১৪৯০ শকে "অদ্বৈতপ্রকাশ" নামক গ্রন্থ রচনা করেন"[২]। ঈশান নাগর অদ্বৈতের প্রিয়শিষ্য ও পালিত পুত্র। প্রভুর অন্তর্ধানের পর তাঁহার পত্নী সীতাদেবীর আদেশানুসারে ৭০ বৎসর বয়সে বিবাহ করিয়া নবগ্রামে ধর্মপ্রচারে ব্রত হন।

কৃষ্ণদাস লাউড়িয়া (দিব্য সিংহ রাজা) : "শ্রীহট্ট জেলার লাউড় গ্রাম বা নবগ্রামে ইঁহার রাজধানী ছিল। শেষ জীবনে বৈরাগ্য ধর্ম গ্রহণ করতঃ বৃন্দাবনে বাস করেন। অদ্বৈত প্রভুর পিতা রাজা দিব্য সিংহের রাজসভায় থাকিতেন।…শ্রীবৃন্দাবনে 'লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস' ও 'কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী' নামে খ্যাত ছিলেন[৩]।"…ইনি 'বিষ্ণুভক্তি রত্নাবলী' নামক বিষ্ণুপুরী রচিত গ্রন্থের পয়ারে অনুবাদ করেন। পূর্বকালে ইঁহার মন্ত্রী কুবের পণ্ডিত 'ভক্তকচন্দ্রিকা' প্রণয়ণ করেন[৪]।" ইনি অদ্বৈতের 'বাল্যলীলা সূত্র' রচনা করিয়াছিলেন,—বলা হয়।

বৃন্দাবন দাস : "পিতা বৈকুণ্ঠনাথ মিশ্র, মাতা নারায়ণী। নারায়ণী শ্রীবাস পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নলিন পণ্ডিতের কন্যা। বৃন্দাবনের জন্মভূমি কুমারহট্টে

---

১ শ্রীহরিদাস দাস : শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-জীবন (১ম সং), পৃ ১-২
২ ঐ, পৃ ৭-৮
৩ ঐ, পৃ ৮৯
৪ ঐ, পৃ ৩০

বা হালিশহরে।…তাঁহার পূর্বপুরুষগণের নিবাস ছিল শ্রীহট্টে[১]।" চৈতন্য ভাগবত ইঁহারই রচিত।

মুরারি গুপ্ত : "শ্রীচৈতন্য শাখা। পূর্বলীলায় হনুমান।…আদি নিবাস শ্রীহট্ট। তথা হইতে শ্রীধাম নবদ্বীপে মহাপ্রভুর বাটির নিকটে নিবাস হয়। মহাপ্রভুর সমবয়স্ক বাল্যবন্ধু। একসঙ্গে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে অধ্যয়ন করিতেন। ইনি মহাপ্রভুর বাল্যলীলা স্বচক্ষে যাহা দর্শন করিয়াছিলেন তাহা সংস্কৃত ভাষায় 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' নাম দিয়া লিপিবদ্ধ করেন। এতদ্ব্যতীত ইনি পদাবলী সাহিত্যেও দান করিয়াছেন[২]।"

যদুনাথ কবিচন্দ্র : "নিত্যানন্দ শাখা।…শ্রীহট্ট জেলার বুরুঙ্গ গ্রামে, কেহ বলেন, ঢাকা দক্ষিণ গ্রামে পূর্ববাস ছিল, তথা হইতে কুলীন গ্রামে বাস করেন।…যদুনাথ প্রভুর সমসাময়িক[৩]।"

শ্রীবাস পণ্ডিত : "পঞ্চতত্ত্বের অন্যতম। পূর্বাবতারে নারদ।…প্রেম-বিলাস মতে শ্রীহট্ট-নিবাসী বৈদিক জলধর পণ্ডিত সস্ত্রীক নবদ্বীপে বাস করিতেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র—নলিন, শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি (শ্রীকান্ত)। কুমারহট্ট ও নবদ্বীপে ইঁহার বসতি ছিল[৪]।"

হরিচরণ দাস : "অদ্বৈতপ্রভুর শাখা। অচ্যুতানন্দের শিষ্য। 'অদ্বৈতমঙ্গল' নামক গ্রন্থ ইনি রচনা করেন। গ্রাম সম্পর্কে ইনি নাভাদেবীর (অদ্বৈত প্রভুর জননী) ভ্রাতা। শ্রীহট্টের নবগ্রামে বাস করিতেন[৫]।"

উপরের এই বিবরণ হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সহিত শ্রীহট্টের যোগাযোগ কী ও কতোখানি তাহা সম্যক বুঝিতে পারা যাইবে। ইহারই ফলে শ্রীহট্টের সর্বত্র বৈষ্ণবদের তীর্থ ও আখড়া গড়িয়া উঠিয়াছে,[৬]—এবং সমগ্র শ্রীহট্টবাসীর—হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে—ধর্মজীবনে এক উল্লেখযোগ্য ছাপ ফেলিয়াছে॥

১ ঐ, পৃ ১৩৮
২ ঐ, পৃ ১৫৯
৩ ঐ, পৃ ১৬২
৪ ঐ, পৃ ২০৭
৫ ঐ, পৃ ২১৯
৬ শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তাঁহার 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' (১৩১৭) গ্রন্থের পরিশিষ্টে (পৃ ৩৩-৩৫) বৈষ্ণব দেবালয় সমূহের তালিকা রচনা করিয়াছেন।

বৈষ্ণবতার এই সুর শ্রীহট্টবাসীর ধর্মজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। বৈষ্ণবতার প্রসঙ্গেই তাহাদের গীতিসাহিত্য-ভাণ্ডার গড়িয়া উঠিয়াছে। "শ্রীহট্টের ধামালী চৌ-পাড়া কীর্তন, গোপাল ও গোবিন্দ ভোগের গীতি-নৃত্য শ্রীহট্টেরই প্রাচীন নৃত্য-সঙ্গীতের এক অমূল্য সম্পদ[১]।" এই প্রসঙ্গে বর্তমান সঙ্কলনে ধৃত 'প্রার্থনা ও মনঃশিক্ষা' পর্যায়ের গানগুলি বিশেষভাবে মনে করিবার মতো।

"...বৈষ্ণবদের ঝুলনযাত্রা ও রথযাত্রায় বিশেষ বিশেষ স্থলে বহু জনতার সমাবেশ হয়।...

"নৌকাপূজা ও গোবিন্দকীর্তন শ্রীহট্টের দুইটি বিশেষ ধর্মোৎসব।...

"গোবিন্দকীর্তন সন্ধ্যা হইতে প্রভাত পর্যন্ত গাইতে হয়। ন্যূনাধিক দুইশত, দেড়শত লোক দলে দলে বিভক্ত হইয়া আসরে উপস্থিত হয়। লতা-পুষ্পমণ্ডিত একটি কুঞ্জগৃহ নির্মাণ করিয়া তাহাতে ৺রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ রাখা হয় ও তৎসম্মুখে দলে দলে পর্যায়ক্রমে অবিরাম ভাবে গীত গায়। গীত শেষ হইলে প্রভাতে মঙ্গল আরতি গাইয়া উৎসব শেষ করা হয় ও প্রসাদ বিতরণ হয়। গোবিন্দ কীর্তনের সঙ্গীত, গৌরচন্দ্রিকা, জল-সংবাদ, রূপ, খেদ, দূতীসংবাদ, অভিসার বা চলন এবং মিলন, এই পর্যায়ক্রমে গীত হয়[২]।"

শ্রীচৈতন্যদেব ও অদ্বৈতপ্রভুর পিতৃভূমি বৈষ্ণবদের নিকট তীর্থস্বরূপ। "ঢাকা দক্ষিণ পরগণায় দত্তরালি গ্রামে জগন্নাথ মিশ্রের জন্ম হয়। তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র প্রদ্যুম্ন মিশ্রের প্রণীত "কৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী" গ্রন্থে লিখিত আছে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর, তদীয় পিতামহীর আগ্রহে ঢাকাদক্ষিণে আগমন করতঃ তাঁহার বাসনা পূর্ণ করেন। আগমন কালে বরুঙ্গায় তিনি একরাত্র ছিলেন, তথায় যে বকুলতলে তিনি প্রথম উপবেশন করিয়াছিলেন, সে স্থান এখনও লোকের নিকট বন্দনীয়[৩]।" "ঢাকা-দক্ষিণ শ্রীহট্টের মধ্যে প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত ও গুপ্তবৃন্দাবন নামে খ্যাত[৪]।"

---

১ শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৩৪৮, পৃ ৫১
২ শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী : শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত (১৩১৭), প্রথম ভাগ, পৃ ২২-২৪
৩ ঐ, পৃ ১১৭
৪ বিশ্বকোষ, সপ্তম ভাগ, পৃ ৪৪৪

অদ্বৈত প্রভুর জন্মস্থানের নিকটবর্তী একটি স্থান 'পণাতীর্থ' নামে বৈষ্ণবদের নিকট শ্রদ্ধা পাইয়া থাকে। অদ্বৈতপ্রভু তাঁহার জননী নাভাদেবীকে সকল তীর্থের সলিলে স্নান করাইবেন বলিয়া 'পণ' করেন; লাউড়ের নিকটবর্তী এক ক্ষুদ্র শৈলের উপর যোগবলে তিনি সেই ফোয়ারা তৈয়ারী করাইয়া জননীকে স্নান করান। ফলে ইহার নাম হয় 'পণাতীর্থ' এবং তাহা বৈষ্ণবদের তীর্থস্থানে পরিণত হয়।

শ্রীহট্টের বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে বিবর্ত্তনের ফলে দুইটি উপ-সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে: কিশোরী-ভজন সম্প্রদায় ও জগমোহনী সম্প্রদায়। এই দুই উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবরা খাঁটি বৈষ্ণব নহেন, তবে শ্রীহট্টের সাহিত্যধারার সহিত ইঁহাদেরও একটা পরোক্ষ ও ক্ষীণ যোগসূত্র আছে বলিয়া মনে হয়।

"...অনেক উপধর্মাক্রান্ত ব্যক্তি আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া থাকে; .. এই উপধর্মাক্রান্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কিশোরী-ভজন মত অবলম্বিগণের সংখ্যাই অধিক। শুদ্ধ বৈষ্ণব মতের সহিত সহজ বা কিশোরী-ভজন মতের সম্পূর্ণ ঐক্য নাই। ইহারা পঞ্চরসিকের মতে চলে বলিয়া কথিত আছে। প্রত্যেকেই উপাসনার জন্য এক এক জন সঙ্গিনীর সাহায্য গ্রহণ করে এবং তাহাকেই প্রেম শিক্ষার গুরুরূপে কল্পনা করা হয়। এই ধর্মের প্রধান অবলম্বনই প্রেম। ইহারা উপাসনাকালে জাতি বিচার করে না; নিম্ন শ্রেণীর সহিত উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরাও অবাধে আহারাদি করে[১]। তাহাদের উপাসনা কার্য ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর অসাক্ষাতে গভীর রাত্রে সম্পাদিত হয়। তৎকালে দলপতি ও দলে যিনি প্রধানা রমণী, তাহাদের বিশেষ সম্বর্ধনা করা হয়। যে ভোজ্য দ্রব্য উপস্থিত করা হয়, প্রথমে তিনি তাহা আস্বাদ করত: ভক্তবর্গকে প্রসাদ বিতরণ করেন। তৎপর রাধাকৃষ্ণ লীলাত্মক সঙ্গীতাদি সহকারে উপাসনার অন্যান্য অঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়[২]। কিশোরী-ভজন উচ্চশ্রেণীর লোকেরা

১ "Each worshipper devotes himself to a woman whom he considers as his spiritual guide and with whose help he expects to secure salvation of his soul. His religion is a religion of love, and is not confined to any dogmas, the caste prejudice with him is much shaken, and in his festivals he mixes with all the low caste Hindus freely."—Report on the census of Assam—1901, chap. iv. P. 41.

২ "The members of his sect are said to have assembled secretly at night and to worship the mistress of their priest, who is supposed to represent Radha. The food is offerd to her, and after she has taken a little, the prasad are distributed amongst the congregation"—Assam District Gazetteers, vol. II, chap. III, P. 84.

আদর করেন না। বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে জগন্মোহনী বৈষ্ণবগণও ভুক্ত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ নূতন একটি ধর্মসম্প্রদায়। ওই ধর্মের উৎপত্তিস্থান শ্রীহট্ট জিলা। সুতরাং ইহা শ্রীহট্টের বিশেষত্ব জ্ঞাপক ঘটনার অন্যতম। প্রায় তিনশত বৎসর হইল, এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। গোপীনাথের শিষ্য বাঘাসুরাবাসী জগন্মোহন গোসাঞি এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" গ্রন্থে ৺অক্ষয়কুমার দত্ত, ইহাকে বৈষ্ণব ধর্মের এক উপ-সম্প্রদায় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ইহারা ব্রহ্মবাদী, প্রতিমা পূজায় তাহাদের স্পৃহা নাই। "গুরু সত্য এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া, গুরুকেই ইহারা প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া স্বীকার ও বিশ্বাস করে[১]।" ইহারা স্ত্রী-ত্যাগী, ব্রহ্মচর্য পালন করাই তাহাদের ধর্মসঙ্গত বিধি। তাহারা তুলসী ও গোময়ের ব্যবহার করেন না; এবং স্ব-সম্প্রদায়ের গোসাঞির "নির্বাণ সঙ্গীত" গান করাই উপাসনার অঙ্গ মনে করেন। জগন্মোহন শিষ্যের প্রশিষ্য রামকৃষ্ণ গোসাঞি হইতে এই ধর্ম বহুল প্রচারিত হয়। বিথঙ্গলের আখড়াই ইহাদের প্রধান তীর্থস্থান। তদ্ব্যতীত মাছুলিয়া ও ঢাকার ফরিদাবাদে আরও দুই আখড়া আছে[২]।"

এই আখড়াগুলি শ্রীহট্ট ও সন্নিহিত অঞ্চল সমূহে বাউল-ভাটিয়ালী গানের উৎস ও প্রেরণা রূপে কাজ করিয়াছে। স্বর্গীয় ক্ষিতি মোহন সেন-শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, "শ্রীহট্টের বিথঙ্গলের জগমোহনী সাধনার প্রভাবে ও বন্যার প্রভাবে মেঘনার তীরে বহু বাউল আখড়া জমিয়া উঠে। তাহাদের মধ্যে অষ্টগ্রাম, ডিগ্রী, ভররা প্রভৃতি মঠকে অষ্টগ্রামী সমাজ বলে। এই সমাজেরই এক শাখা পরে স্থান লইল ঢাকা জেলায় পাঁচদোনার নিকটে নরসিংদী গ্রামে। বিশাল মেঘনা নদীর তীরে এই নরসিংদী আখড়ায় প্রায় একশত বৎসর পূর্বে নদেরচাঁদ নামে এক বাউল আসেন। তিনি খুব সমর্থ সাধক ছিলেন। ...অষ্টগ্রামী বাউল সমাজের প্রভাবে মেঘনার তীরে ত্রিপুরা জেলার ওয়াইল আখড়ায় কাছে রাণীদিয়া গ্রামে আবর আলি প্রভৃতি সমর্থ বাউল সাধকদের অভ্যুদয় ঘটে[৩]।"

---

১ অক্ষয়কুমার দত্ত : ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (প্রথম ভাগ), পৃ ২১০
২ অচ্যুতচরণ চৌধুরী : শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত (১৩১৭) প্রথম ভাগ, পৃ ৮৮-৯০
৩ ক্ষিতিমোহন সেন-শাস্ত্রী : বাংলার বাউল (১৯৫৪), পৃ ৫৯

....৪

শ্রীহট্ট জেলার বিশিষ্ট ভক্তি-সাহিত্য এবং লোক-সাহিত্য ধারার সহিত "সিলেট নাগরী" নামক এক প্রকার হরফের ইতিহাস জড়াইয়া আছে। শ্রীহট্টের মুসলমানগণই এই বিশেষ ধরনের হরফে বই ছাপাইতেন। এই জন্যে "সিলেট নাগরী"-র পরিচয় নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"পূর্ববঙ্গ মোসলমান প্রধান স্থান; তন্মধ্যে পূর্ববঙ্গের প্রায় পূর্বতম অংশ শ্রীহট্ট-অঞ্চলে মোসলমানের সবিশেষ প্রাধান্য। সুতরাং মোসলমানী বাঙ্গালারও শ্রীহট্ট একটা প্রধান আড্ডা।

"খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে শাহ জলাল নামক এক অতি শক্তিশালী মহাপুরুষ আরব দেশের এমেন প্রদেশ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন; ঘটনাক্রমে তাঁহাকে দিগ্বিজয়ীর বেশে সৈন্য-সামন্ত সহ শ্রীহট্টের তদানীন্তন হিন্দু ভূপতি গৌর গোবিন্দের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে হইয়াছিল; একপ্রকার বিনা রক্তপাতেই শ্রীহট্ট মোসলমানের অধিকারভুক্ত হইল। শাহ জলালের সঙ্গে ৩৬০ জন মোসলমান আউলিয়া আইসেন; উঁহারা এবং সৈন্য সামন্তেরাও অনেকে শ্রীহট্টের নানা স্থানে উপনিবিষ্ট হইয়া বস-বাস করিতে লাগিলেন।

"ইঁহাদের অধিকাংশই উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। তখনও বোধ হয় আরব্য অক্ষরে হিন্দী ভাষা লিখিত হইয়া উর্দুর সৃষ্টি হয় নাই। তাই এই সকল মোসলমান প্রধানতঃ হিন্দী ভাষারই চর্চা করিয়া দেবনাগরাক্ষরে লেখা-পড়া করিতেন। তাঁহাদের অনুকরণে শ্রীহট্টের সাধারণ মোসলমানের মধ্যেও নাগরাক্ষর লব্ধ-প্রসর হইল। কালক্রমে যদিও পশ্চিমাঞ্চলে মোসলমান সমাজে হিন্দী আরব্য অক্ষরে লিখিত হইয়া আরব্য-পারস্য শব্দ বহুল হইয়া উর্দুতে পরিণত হইল, এবং সেই উর্দু ক্রমশঃ সমগ্র মুসলমানাধিকৃত ভারতবর্ষে প্রসৃত হইয়া শ্রীহট্টেও পৌছিল, তথাপি এই অঞ্চলের মোসলমানেরা নাগরাক্ষর একবারে পরিত্যাগ করিল না। তবে এই নাগরাক্ষরের প্রসার অনেকটা খর্ব হইল; একদিকে স্থানীয় বঙ্গভাষা অন্যদিকে মোসলমানের আলোচ্য আরব্য, পারস্য ও উর্দু এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া নাগরাক্ষর হীনপ্রভ এবং শীর্ণ ও বিকৃত হইতে লাগিল। খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহার অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছিল যে নিম্নস্তরের

মোসলমানদের মধ্যে যাহারা বঙ্গাক্ষর জানিত না তাহারা পরস্পরের মধ্যে চিঠিপত্রে মাত্র এই অক্ষরের ব্যবহার করিত।...

"আজ প্রায় চল্লিশ বৎসর হইল, মোনশী আবদুল করিম[১] নামক জনৈক শ্রীহট্টবাসী শিক্ষিত ব্যক্তি-কর্তৃক এই বিকৃত নাগরাক্ষর "সিলেট নাগরী" সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া মুদ্রাযন্ত্রারূঢ় হইয়াছে। ইতিপূর্বেই আরব্য-পারস্য পুস্তকের ন্যায়, এই অক্ষরে দুই একখানি পুথি নাকি লিথো প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছিল, কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রে ছাপা হওয়ার পর হইতেই যে এই অক্ষরের পুথির বহুল প্রচলন হইতেছে, সেই বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। পূর্বে এই অক্ষর শ্রীহট্ট সহরের আশে পাশে মাত্র প্রচলিত ছিল। ছাপার পর এইক্ষণে শ্রীহট্ট জেলার সমগ্র, কাছাড়, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও ঢাকা, অর্থাৎ পদ্মার পূর্বদিকে বঙ্গভূমির সর্বত্র এই অক্ষর মোসলমান জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

"সিলেট নাগরীতে ৩২টি মাত্র অক্ষর, পাঁচটি স্বর এবং ২৭টি ব্যঞ্জন। অনুস্বার এবং ৫টি মাত্র স্বর চিহ্ন আছে : আকার, একটি ঈকার (ী), একটি উকার (ু), একার ও ঐকার।...

"অক্ষরগুলির প্রতি অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে আ, ও, খ, ছ, ঝ, ল, এবং হ এই গুলির আকৃতি নাগরাক্ষর হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। স্বর-চিহ্নগুলি ঠিক দেবনাগরের মতই। সমস্ত অনুনাসিক বর্ণ-মধ্যে ন এবং ম ই আছে। ন ও স এ এক-একটি এবং অন্তঃস্থ 'য' টি লোপ পাইয়াছে। অথচ এত কাট-ছাটের মধ্যে অতিরিক্ত 'ড়' একটি নিতান্ত আবশ্যক ভাবে রাখা হইয়াছে; ইহার কাজ 'ড' কিংবা 'র' দ্বারা অনায়াসে চলিতে পারিত। স্বরবর্ণেই সংক্ষেপটা কিছু বেশী; অ, ঈ, উ, ঋ, ঐ, ঔ, এই অত্যাবশ্যক স্বরগুলি বর্জিত হইয়াছে।

"মাত্র ১৬টি সংযুক্ত বর্ণ রাখা হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রথমটি বঙ্গ বা সংস্কৃত ভাষার কোথাও পাওয়া যাইবে না; ইহা আলেফ্-লাম্-আল্, কেবল 'আল্লা' শব্দটি লিখিতেই ইহার প্রয়োজন দেখা যায়। বাকী ১৫টি বিশেষ ভাবে

১ ইনি আরব, মিসর ও ইউরোপের নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া বহু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন এবং স্বদেশে আসিয়া নিজ সমাজের হিতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় দৈবাৎ নদী-গর্ভে জাহাজ হইতে নিপতিত হইয়া অকালে এই কর্মঠ জীবনের অবসান হইয়াছে।

পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে সাধারণতঃ আরবী বা পারসী শব্দে সচরাচর যে সকল সংযুক্ত বর্ণের প্রয়োগ আছে, তাহাই মাত্র রাখা হইয়াছে। এই স্থলেই সিলেট নাগরীর সংস্কারকের[১] কৃতিত্ব কৌশলের সমধিক পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙ্গালার সংযুক্ত বর্ণের সংখ্যা প্রায় ত্রিশত হইবে; এইগুলি শিক্ষা করাই বঙ্গভাষা-ব্যায়ীর পক্ষে বড় সুকঠিন কাজ। ইহার সংখ্যা মাত্র ১৫-তে পরিণত হওয়ায় এই নাগরী সাধারণ মোসলমানের পক্ষে সুগম হইয়াছে, তাই ইহার আদর দিন-দিন বাড়িতেছে। 'ঞ্জ'-তে 'ঞ'-এর কাজ 'ন' দ্বারা করা হইয়াছে এবং 'স্চ' স্থলে 'শ'-এর কাজ 'স' দ্বারাই সম্পন্ন হইয়াছে।...

"...স্বরের প্রধান অ-কারের কার্য 'ও' দ্বারা সাধিত হইতেছে। ও-কারের স্বর চিহ্ন (ে া) না থাকিলেও উহার কার্য উকার দ্বারা (যথা লোকের পরিবর্তে লুক) নিষ্পন্ন হয়। ঐ-কার থাকিলেও সচরাচর ইহার স্থানে 'অই' এবং ঔ-কারের স্থানে 'অউ' ব্যবহৃত হয়। ফলকথা আরব্য-পারস্য যদি জের-জবর-পেশ এই তিনটি মাত্র স্বরচিহ্ন দ্বারা কাজ চলিতে পারে, যদি ঐ তিনটিরই মাত্র সহায়তায় হিন্দীকে উর্দুতে পরিণত করা যাইতে পারে, তবে এই স্থলেও কাজ না চলিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। ব্যঞ্জনবর্ণ সম্বন্ধেও ঐ কথা। আরব্য বর্ণমালাকে মূলাধার করিয়া দুই চারিটি মাত্র অতিরিক্ত (যথা পারস্য—চ, গ, প এবং উর্দু ট, ড) বর্ণ নাক্তা যুড়িয়া তৈয়ার করিয়া যদি তৎসাহায্যে হিন্দীভাষাটা লিখিতে পারা যায়, তবে এই স্বল্প ব্যঞ্জনের সহায়তায় বাঙ্গালাভাষা লিখিতে বিশেষ অসুবিধা হইবার কোনও কারণ নাই। বিশেষতঃ ইহাতে মাত্র মোসলমানী বাঙ্গালা লিখিবারই প্রয়াস হইতেছে; এই বাঙ্গালায় সচরাচর আরব-পারস্য শব্দেরই বহুল ব্যবহার দেখা যায়, সংস্কৃত শব্দ অতি কমই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সংস্কৃত শব্দের বিরলতায় দুটি বিষয়ে সুবিধা হইতেছে: এক বর্ণাশুদ্ধি হইলেও তেমন বাধে না, অপর সংযুক্ত বর্ণের অল্পতায়ও কোনরূপ অসুবিধা হয় না।

"একটা অভাব কিন্তু বড়ই অনুভূত হয়; যদি হসন্ত চিহ্নটি পরিগৃহীত

১ প্রাগুক্ত মোনশী আবদুল করিম যখন এই অক্ষরগুলির টাইপ করেন, তখন তিনি বর্ণমালার এবং সংযুক্ত বর্ণের অনেকটা সংস্কার সাধন করেন। ফলতঃ তাঁহার হস্তক্ষেপের পূর্বে এই নাগরীর যে কি অবস্থা ছিল তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন।

হইত, তাহা হইলে "সম্পদ" যে 'সম্পদ' তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যাইত। এই নাগরীতে পুস্তক মুদ্রাঙ্কন ইতিপূর্বে কেবল শ্রীযুক্ত বেণীমাধব ভট্টাচার্যের চিৎপুর রোডস্থিত জেনারেল প্রিন্টিং প্রেসেই হইত। সম্প্রতি আরও দুইটি প্রেস স্থাপিত হইয়াছে; এক হামিদী প্রেস শিয়ালদহ (কলিকাতা); অপর ইসলামিয়া প্রেস শ্রীহট্ট। ইতিপূর্বে দুই-চারিখানি মাত্র মোসলমানী কেতাব এই অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছিল; সম্প্রতি বহু পুস্তক এই হরফে মুদ্রিত হইয়াছে এবং প্রকাশকদের সংকল্প এই যে যত মোসলমানী পুথি বঙ্গাক্ষরে আছে, তাহা এই অক্ষরে পুনর্মুদ্রিত করিতে হইবে, নূতন পুস্তকের ত কথাই নাই।

"সম্প্রতি এই হরফের কেতাব যাহারা পড়ে উহারা প্রায়শঃ বঙ্গ-ভাষাভিজ্ঞ নিম্নশ্রেণীর মোসলমান। যথা—কৃষক, মৎস্যজীবী, নৌকার মাঝি-মাল্লা প্রভৃতি।···পূর্বেই বলিয়াছি চট্টগ্রাম ও ঢাকা পর্যন্ত ইতিমধ্যেই ইহার প্রসার হইয়াছে। শুনিতেছি এই অক্ষরে শ্রীহট্ট সহর হইতে নাকি একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রচারেরও প্রস্তাব চলিতেছে[১]।"

সিলেট নাগরী এবং নাগরী সাহিত্য সম্পর্কে 'শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'রও বিভিন্ন সংখ্যায় বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে আলোচনা করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে। একাধিক সংখ্যায় এই সাহিত্যধারার সাহিত্যিকদের এবং তাঁহাদের গ্রন্থ সম্পর্কে পরিচয় দান করা হইয়াছে। সেই সমস্ত আলোচনা ও পরিচয়াদি পাঠ করিলে সিলেট নাগরী সাহিত্যের একটি স্পষ্ট পরিচয় মিলে। ইঁহাদের মধ্যে মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন, সাহিত্যরত্ন-কাব্যবিনোদ-পুরাতত্ত্ববিদ-এর আলোচনা ও মন্তব্যকে এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে।

"শ্রীহট্টের নাগরী সাহিত্যের চর্চা মুসলমান সমাজেই সীমাবদ্ধ, আজ পর্যন্তও উহা হিন্দু সমাজে বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। হিন্দু সমাজের উদাসীনতাই ইহার কারণ কিনা, তাহা সুধি-মণ্ডলীই বিবেচনা করিবেন। শ্রীহট্টের নাগরী সাহিত্য শুধু ধর্মের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। বরং গল্প উপন্যাস, জীবনী ও সমাজ-চিত্রও তাহাতে প্রবেশ করিয়াছে। মোট-কথা মুসলমানের দ্বারা সৃষ্ট ও আলোচিত হইয়া আসিলেও তাহাতে যে

১ পদ্মনাথ দেবশর্মা: সিলেট নাগরী, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৫, চতুর্থসংখ্যা

অন্যজাতির স্থান নাই, তাহা মোটেই বলা যাইতে পারে না। তবে বর্তমানে নাগরী সাহিত্য দুই চারিজন বিশিষ্ট হিন্দু মনীষীর কাছেও আদর লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়।...

"আমরা এখানে যে সময়ের কথা বলিতেছি, সিলেটের তৎকালীন ভাষা ছিল সংস্কৃত বহুল। সুতরাং পশ্চিমাগত মুসলমানগণ এদেশের ভাষাকে নিজের ভাষারূপে বরণ করিয়া লইলেও প্রথমাবস্থায় তাঁহারা তাহা সম্যক রূপে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। পক্ষান্তরে মুসলমান প্রাধান্য ও রাজভাষা মুসলমানী হওয়ায়, বিদেশাগত মুসলমানদের তাহাতে অসুবিধা না ঘটিলেও নবদীক্ষিত মুসলমান ও হিন্দু ভ্রাতৃবৃন্দের পক্ষে নূতন আমদানী বিদেশীয় আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষা বুঝিয়া উঠা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। আবার শাসন ও ধর্মপ্রচার কার্য পরিচালনে হিন্দু ও নবদীক্ষিত মুসলমানদের সহিত কথা বলিতে শাসকগণ ও ধর্মপ্রচারকামী আলেমগণকেও বিষম অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। ইহাও অনুমান করা অবাস্তর নহে যে, নানা ভাষার সংমিশ্রণে সিলেটের তৎকালীনভাষা এক অপূর্বভাব ধারণ করিয়াছিল।

"অতঃপর ভবিষ্যৎ বিবেচনায় মুসলমান শাসকগণের গবেষণার ফলে এতদ্দেশীয় হিন্দুগণের রাজকার্য ও নবদীক্ষিত মুসলমানদের ধর্মকার্য ও রাজকার্য পরিচালনা হেতু প্রথমতঃ নাগরিকদের সুবিধার্থে এক সহজ সুন্দর মিশ্রিত ভাষার প্রচলন করা হয় ও তাহা লিখিয়া প্রকাশ করার জন্য 'দেব-নাগরী' ও বাঙ্গালা অক্ষরের সৃষ্টি ঘটে। সরল, সহজ ও সুন্দর বলিয়া জনসাধারণ ইহার নাম দিয়াছিলেন "ফুল নাগরী"। এই নাগরী অক্ষরের দ্বারা জনসাধারণের প্রচলিত কথ্যভাষা লিখিয়াই নানা বিষয় কর্ম নিষ্পন্ন হইত—তবে তৎকালে নাগরী টাইপ তৈয়ার হয় নাই, হাতে লিখিয়াই সর্বকার্য সম্পাদিত হইত। আজ প্রায় ৮০ বৎসর হয়—সিলেট জননীর সুসন্তান, সিলেটবাসীর গৌরবরত্ন বিখ্যাত পুরুষ সিলেট সদর (টাউন) নিবাসী জোনাব মুন্সী মোহাম্মদ আবদুল করিম মরহুম সাহেব "সিলেটী নাগরীর" টাইপ কাটাইয়া, প্রথমে নাগরীতে নানা প্রকার পুস্তক ছাপাইতে আরম্ভ করেন।...

"...আজ পর্যন্ত নাগরীতে যতগুলি পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে কতকগুলি মুসলমান ধর্মের নিত্য অনুষ্ঠেয় বিধি, নিষেধ ও ক্রিয়াকলাপের

ব্যবস্থাপূর্ণ, কতকগুলি মারিফত বা আধ্যাত্মিকতত্ত্ব বিষয়ক ; কয়েকখানি মহাপুরুষগণের জীবনী ও কতকগুলি পুস্তক গল্প, উপন্যাস শ্রেণীর।

"যাহারা সমাজের পনর আনা অংশ, উল্লিখিত পুস্তকগুলি সেই সকল অল্প শিক্ষিত পুথি পড়ুয়া লোকের শোক, দুঃখে সান্ত্বনা ও বিশ্রামে আমোদ দানে তাঁহাদের দুঃখ দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে ও রাখিতেছে। এবং গৃহ পঞ্জিকার ন্যায় আজ নাগরী পুস্তক পল্লিবাসীর গৃহে-গৃহে আসন লাভ করিয়াছে। আজ সাধু বাঙ্গালা ভাষায় মুদ্রিত নানা রকমের পুস্তকের কোন অভাব নাই বটে কিন্তু জনসাধারণের এক আনা লোকও উহার আদর করিবার সুযোগ ও যোগ্যতা লাভ করে নাই। কিন্তু নাগরী পুস্তক সমাজের সকল স্তরেই আদর লাভ করিয়াছে[১]।"

"উপসংহারে বক্তব্য এই যে নাগরী পুস্তকের মধ্যে কতকগুলি পুস্তক বাঙ্গালা অক্ষরেও মুদ্রিত হইয়াছে। আবার দুই চারিখানা পুস্তক শুধু বাঙ্গালা অক্ষরেই ছাপা হইয়াছে বটে ; তবে তাহার বর্ণনা ও ভাব ভাষা প্রভৃতি একই শ্রেণীর।…

"উল্লেখ প্রয়োজন যে, এই শ্রেণীর সমুদয় পুস্তকই ডিমাই ৮ পেজি আকারের[২]।"

অবশ্য, প্রথমে এই হরফ শ্রীহট্ট জেলাতেও সর্বত্র ব্যাপ্ত হইতে পারে নাই; নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানগণ কেবল বিশেষ এক প্রয়োজন সাধনের জন্যেই ইহা গ্রহণ করিয়াছিল। এ বিষয়ে উপরিউক্ত মন্তব্যের বহুপূর্বে জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ারসনের মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য :

"Among the low class Muhammadans of the east of the district the use of the Dēva-nāgarī alphabet occurs. It is extremely common for Muhammadans to sign their names in this character, and the only explanation they offer for its use is that it is so much easier to learn than Bengali. *Puthis* in Bengali are printed in this character, but except for this purpose and for the writing of signatures by otherwise illiterate men, the script is hardly used,—never, at least in formal documents.[৩]"

১ শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৩৫০, পৃ ১৫-১৮
২ শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, কার্তিক, ১৩৫০ পৃ ৪৪
৩ Linguistic survey of India, vol. v, part I, p. 224.

....ও

শ্রীহট্টে ইসলাম ও সুফীপ্রভাব এবং তাহার ফল হিসাবে এক বিশিষ্ট সাহিত্য-ধারার সূত্রপাতের সঙ্গে শাহ্ জলালের নাম ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত। এইবার শাহ্ জলালের পরিচয় প্রদান করি।

"বাঙ্গালার সুহ্‌রবর্দীয়হ্ সাধকদের মধ্যে শ্রীহট্টের বঙ্গ-বিখ্যাত সাধক শাহ্ জলাল্ মুজর্‌রদ্-ই-য়মনী একটি অতি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। এদেশে ইসলাম বিস্তৃতির জন্য বাঙ্গালার মুসলমান এই স্বনাম-খ্যাত দর্‌বীশের নিকট প্রভূত পরিমাণে ঋণী। তিনি যে শুধু নিষ্ক্রিয় ও স্থাণুর ন্যায় সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন তাহা নহে, তিনি একাধারে ধর্ম-প্রচারক ও যোদ্ধা ছিলেন। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর দ্বিতীয়পাদে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম আসাম একদিকে যেমন তাঁহার রণ-দুন্দুভি-নিনাদে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল, ঠিক তেমনই অপরদিকে তাঁহার প্রচার-তৎপরতায় মাতিয়া উঠিয়াছিল। এই বিশাল ভূভাগে তিনি সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্যরূপে সনাতন ইস্‌লামের বীজ বপন করিয়াছিলেন; তাই এখনও পূর্ববঙ্গের মুসলমানগণ শত-শত পল্লী গাথায় তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করিয়া আসিতেছে। এই পল্লিগাথার দুইটি পঙ্‌ক্তি এইরূপ—

"হিন্দু আছে লাখে লাখে নাই রে মুসলমান।
সিলটর মোকামে আসি' কে দিল আজান॥"

"সে যাহা হউক, এ-যাবৎ এ-সাধকের সঠিক ইতিহাস উদ্ধারের জন্য অনেক পণ্ডিত চেষ্টা করিয়াছেন[১]।... তাঁহার জীবনী সম্বলিত ফারসী "সুহৈল্-ই-য়মন্" গ্রন্থ কোন কোন বিষয়ে ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ হইলেও এই গ্রন্থ[২] হইতে এই দর্‌বীশের সাধারণ জীবন আখ্যায়িকা জানিতে পারা যায়। শাহ্‌জলাল্ ৭০৩ হিজরী অর্থাৎ ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে সিকন্দর খান ঘাযী নামক কোনো গৌড় সেনাপতির সহিত একযোগে শ্রীহট্ট জয় করেন। সুতরাং তিনি ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। মিসরদেশীয়

১ (ক) Journals of the Asiatic society of Bengal, 1873, P. 278. (খ) *E. A. Gait* History of Assam (2nd edi) PP. 275-76. (গ) Contributions to the Geography and History of Bengal, pp. 70-73

২ নসীর-দ্-দীন হায়দার নামক জনৈক মুন্সফ ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে "সুহৈল্-ই-য়মন্" গ্রন্থ লিখেন। এই গ্রন্থে শাহ্ জলালের জীবনী লিপিবদ্ধ আছে।

বিশ্ববিশ্রুত পর্যটক ইব্‌ন্ বতুতহ্ যখন ১৩৪৫ খ্রীষ্টাব্দে (৭৪৬ হিঃ) বঙ্গদেশে আগমন করেন[১] তখন তিনি স্বয়ংরূপে শাহ্ জলাল্‌কে দেখিতে গিয়াছিলেন। ইহার পর বৎসর অর্থাৎ ১৩৪৬ খ্রীষ্টাব্দে শাহ্ জলাল্ দেহত্যাগ করেন[২]।"

"শাহ্ জলাল্ য়মন্ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া শৈশবেই পিতৃ-মাতৃহীন হন এবং তদীয় মাতুল সয়্যদ্ আহ্‌মদ্ কবীর্ সুহ্‌রবর্দীর আশ্রয়ে প্রতিপালিত ও সিদ্ধত্ব লাভ করিয়া বঙ্গদেশে আসিয়া পৌছেন। তখন শ্রীহট্টের হিন্দু রাজা গৌর গোবিন্দের অমানুষিক অত্যাচারে বুর্‌হানু-দ্-দীন্ নামক কোনো মুসলমান অত্যাচারিত হইয়া গৌড়ের সুল্‌তানের শরণাগত হইলে সুল্‌তান্ ফীরূয শাহ্ দিহ্‌লবী (১৩০২-১৩২২ খ্রীঃ) রাজা গৌর গোবিন্দের শাস্তিদান মানসে সিকন্দর্ ঘাযীকে বিরাট বাহিনীসহ শ্রীহট্টে প্রেরণ করেন। এই বাহিনীর সঙ্গে শাহ্ জলাল্‌ও যুদ্ধ করেন বলিয়া প্রকাশ। এই যুদ্ধে শ্রীহট্টের রাজা গৌর গোবিন্দ পরাজিত ও পলায়িত হয়েনএবং শ্রীহট্ট সর্বপ্রথম মুসলমান কর্তৃক বিজিত হয়। শ্রীহট্ট বিজয়ের পর শাহ্ জলাল্ আর বঙ্গে প্রত্যাবর্তন করেন নাই। ধর্মপ্রচারে তাঁহার শেষ জীবন অতিবাহিত হয়। ইব্‌ন্ বতুতহ্ তাঁহার ধর্ম প্রচার সম্বন্ধে বলেন : "এই পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা তাঁহার (শাহ্ জলালের) নিকট হইতে ইস্‌লাম ধর্মে দীক্ষালাভ করেন এবং এই জন্যই তিনি তাঁহাদের মধ্যে বাস করিয়াছিলেন[৩]।"[৪]

শাহ্ জলাল সম্পর্কে উপরে যাহা বিবৃত হইল, পরবর্তী গবেষকগণের মতে তাহার কিছু অংশ ভুল। 'সুহল্-ই-য়মন্' এবং উক্ত গ্রন্থের বাঙলা অনুবাদ 'তোয়ারিখে জলালি'-তে প্রাপ্ত সব তথ্যাদিকে অনেকেই নির্ভুল মনে করেন না। অধ্যাপক পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় একটি প্রবন্ধে[৫] এবং অচ্যুতচরণ চৌধুরী-তত্ত্বনিধি তাঁহার গ্রন্থে[৬] এ বিষয়ে তথ্যনির্ভর আলোচনা করিয়াছেন। সেই আলোচনার সার-সংক্ষেপ নীচে সঙ্কলিত হইল।

১ *N. Kanta Bhattasali* : Travels of IbnBatutah (*An Extract*)—Coins and Chronology of the Early, Independent Sultans of Bengal, pp. 143-44.

২ প্রাগুক্ত, পৃ, ১৫০

৩ "The inhabitants of those mountains received Islam from his hands and it was for this reason that he stayed among them"—Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal, P. 139.

৪ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক : বঙ্গে সূফী প্রভাব (১৯৩৫), পৃ, ৯৮-১০০

৫ প্রদীপ, কার্তিক, ১৩১২

৬ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত (১৩১৭), দ্বিতীয় ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ১০-৫১

প্রথমে শাহ্‌ জলালের জীবনী সম্পর্কে জ্ঞাতব্য অতিরিক্ত তথ্যগুলি জানাই : "হজরত মোহাম্মদ যে বংশে জন্মিয়াছিলেন, সেই কুরেষিবংশীয় এব্রাহিমের পুত্র মাহমুদই শাহ্‌জলালের জনক ছিলেন। জননী সৈয়দ বংশীয়া ও সাতিশয় ধর্ম পরায়ণা ছিলেন।...গুরু পরম্পরায় শাহ্‌ জলাল, মোসলমান-ধর্ম প্রবর্তক হজরত মোহাম্মদ হইতে অষ্টাদশ স্থানীয় ছিলেন।" শাহ্‌জলালের মাতুল এবং গুরুই তাঁহাকে হিন্দুস্থান হইতে এক মুষ্টি মৃত্তিকা আনিয়া শাহ্‌ জলালের হস্তে দিয়া বলিলেন, 'তোমার হাতে যে মৃত্তিকা দিলাম...ঈদৃশ মৃত্তিকা যে স্থানে পাইবে, সেখানেই সতত অবস্থান করিবে। এই মৃত্তিকা যে স্থানে পরিত্যাগ করিবে, সেই স্থানের মাহাত্ম্যের আর তুলনা থাকিবে না'।" বলা বাহুল্য, শ্রীহট্টের মাটির স্বাদ, বর্ণ ও গন্ধের সহিত উহার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গিয়াছিল বলিয়াই শ্রীহট্ট শাহ্‌ জলালের কর্মভূমি হয়। শ্রীহট্টের পথে আসিতে-আসিতে শাহ্‌ জলালের শিষ্য ও অনুচর-সংখ্যা বাড়িয়া ৩৬০ হয়। "প্রধানত: হজরত শাহ্‌ জলালের অনুসঙ্গী ৩৬০ জন আউলিয়া বা ধর্মবীর কর্তৃক শ্রীহট্ট বিজিত হইয়াছিল বলিয়া বিদেশীয় মোসলমানগণ শ্রীহট্টকে "তিন শ' ষাট আউলিয়ার মুলুক" বলে[১]।"

শ্রীহট্ট কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত ছিল, 'গৌড়' তাহার মধ্যে একটি। গৌড় খণ্ডের রাজার নাম ছিল গোবিন্দ। অনেকে তাঁহাকে 'গৌর গোবিন্দ' বলেন, কিন্তু হওয়া উচিত 'গৌড়-গোবিন্দ'। ইনি চতুর্দশ শতকের বাঙলার ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্বাধীন সুলতান শামসুউদ্দীন ইলিয়াস্‌ খাজের সমসাময়িক ছিলেন। শামসুউদ্দিন্‌ শ্রীহট্টে আসেন নাই,—তাঁহার মৃত্যুর পর দরবেশ শাহ্‌জলালের পরিচালনায় শ্রীহট্টে মুসলমান রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়,—শেষ হিন্দু নরপতি গোবিন্দকে পরাভূত করিয়া।

শাহ্‌জলালের নাম ও সময় লইয়া সন্দেহ আছে। অন্তত: চারজন 'শাহ্‌জলাল' নামধেয় ব্যক্তির উল্লেখ 'তোয়ারিখে-জলালি'-তে পাওয়া যায়। তাঁহাদের একজনের জন্মস্থান বোখারা, একজনের তাব্রিজ, একজনের এমন এবং চতুর্থ জনের গজেরয়া। 'তোয়ারিখে-জলালি'-তে শাহ্‌জলালের সময় নির্দেশক তারিখ হইল ৫৬১ হিজরী অর্থাৎ ১১৬৫ খৃষ্টাব্দ। তখন তো

১ বর্তমান সঙ্কলনের ৪৯-সংখ্যক গানটি এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য

দিল্লীই মুসলমান-অধিকৃত হয় নাই,—ইহা থানেশ্বরের যুদ্ধেরও প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ববর্তী। ভূপর্যটক ইবন্ বাতোতা (আবু আব্দুল্লা ইবনে) কামরূপের পার্বত্য প্রদেশে ১৩৫১ খৃষ্টাব্দে যে শাহ্‌জলালকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহার জন্মভূমি তাব্রিজ এবং তিনি ১৫০ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। কিন্তু, শ্রীহট্টাগত শাহ্‌জলালের জন্মভূমি এমন এবং তাঁহার আয়ুষ্কাল ৬২ বৎসর।

মুসলমানগণ-কর্তৃক শ্রীহট্টবিজয়ের ইতিহাসে হিন্দু নৃপতি গোবিন্দের সহিত আরো দুইজন মুসলমানের নাম যুক্ত হইয়া আছে : বুরহান্‌উদ্দীন ও নুরউদ্দীন্। শ্রীহট্ট তখন তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল, ওই তিন ভাগের অতিরিক্ত আর একটিঅংশ ছিল—তাহাকে 'তরফ' বলা হইত। ইহা পৃথক ভাবে শাসিত হইত, বেশীর ভাগ সময় ত্রিপুরার অধীনতা স্বীকার করিলেও ইহা গৌড় রাজ্যের অংশ বিশেষ বলিয়া পরিগণিত হইত। এই তরফে তখন নুরউদ্দীন্ নামীয় জনৈক মুসলমান সপরিবারে বাস করিতেন। আর টুলটিকর নামক স্থানে বাস করিতেন বুরহান্‌উদ্দীন। বুরহান্‌উদ্দীন একদা গোবিন্দ কর্তৃক নির্যাতীত হইয়া সুবর্ণগ্রামের শামস্‌উদ্দীন ইলিয়াস খাজের সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং ইলিয়াস্ খাজে তাঁহার পুত্র সুলতান সিকান্দরশাহ্‌কে গোবিন্দের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলে গোবিন্দ পরাভূত হন। ইলিয়াস্ খাজের মৃত্যুর পর ১৩৫৮ খৃঃ সিকান্দর শাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করেন, রাজা গোবিন্দ ওই সময় তাঁহার সহিত সন্ধি করিয়া শ্রীহট্টকে রক্ষা করেন। ইতিমধ্যে নুরউদ্দীন্‌কেও রাজা গোবিন্দ নির্যাতিত করায় তিনিও গোবিন্দের প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন হইলেন। নুরউদ্দীন ও বুরহান্‌উদ্দীন উভয়েই দিল্লীতে রাজা গোবিন্দের অত্যাচারের প্রতিকার প্রার্থনা করিলে তোঘলক বংশীয় সম্রাট আলাউদ্দীন্ ফেরোজ শাহ্ তাঁহার ভাগিনেয় সিকান্দর শাহ্ গাজীর অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন—গোবিন্দকে পরাভূত করিয়া শ্রীহট্টে মুসলমান প্রভাব বিস্তার করিতে।

সম্রাটের ভাগিনেয় সিকান্দর শাহ্ গাজী দুইবার গৌড়-গোবিন্দের নিকট পরাভূত হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদীতীরে শিবির স্থাপন করিলেন। মনের খেদে বুরহান্‌উদ্দীন মদিনায় চলিয়া গেলেন। শাহ্‌জলাল তখন দিল্লীতে অবস্থান করিতেছেন। ঘটনাক্রমে শাহ্‌জলালের সহিত বুরহান্‌উদ্দীনের আলাপ-পরিচয় হয়,—এবং শাহ্ জলাল গোবিন্দের অত্যাচার দমন করিবেন বলিয়া

প্রতিশ্রুত হন। এইবার গৌড়-গোবিন্দ পরাভূত হন, শ্রীহট্ট মুসলমানগণ কর্ত্তৃক বিজিত হয়। সিকান্দর শাহ্‌র দুইবার পরাজয়ের কথা শুনিয়া সম্রাটও নাসিরউদ্দীন্ নামীয় এক সেনাপতির অধীনে আরো সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। ডব্লু. ডব্লু. হান্টারের মতে ১৩৮৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্ট মুসলমান কর্ত্তৃক বিজিত হয়,[১] মতান্তরে ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দে।

"শ্রীহট্ট বিজিত হইলে, শাহ্ জলাল্ স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করেন নাই।...তখন সম্রাট ভাগিনেয় সিকান্দর গাজীর উপর...শ্রীহট্টের শাসনভার অর্পিত হইল।...এইস্থানই তাঁহার কর্মক্ষেত্র বুঝিতে পারিয়া তিনি একটি মনোরম স্থানের উপর নিজ উপাসনালয় প্রতিষ্ঠিত করেন।...ফলতঃ তিনি কোন হিন্দু দেবতাদের উপর অত্যাচার করিতে পারেন নাই,—করেনও নাই; এই জন্যেই বুঝি হিন্দুগণও তাঁহার সম্মাননা করিয়া থাকেন।...শাহ্ জলাল শাহ্ সিকন্দর গাজীর উপর রাজ্যশাসনের ভার অর্পণ পূর্বক নির্জনে ঈশ্বর চিন্তা করিতে লাগিলেন।...হজরত শাহ্ জলাল শ্রীহট্ট দেশের নানা অংশে অনুসঙ্গী সাধুগণকে প্রেরণ পূর্বক মোসলমান ধর্ম প্রচার করিতে চেষ্টা করেন। কেবল শ্রীহট্ট নহে, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ, ঢাকা, রঙপুর প্রভৃতি স্থানেও তিনি প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন।...হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরের অনেক ব্যক্তিই তাঁহাদের আহ্বানে আকৃষ্ট হয়।...এইরূপ ধর্মকর্ম ও দেশহিতকর কার্যে হজরত দেশের মধ্যে যথার্থই দেবতার মতো পূজিত হইতে লাগিলেন। তিনি শ্রীহট্টে আগমনের পর ত্রিশ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন, তৎপর দ্বিষষ্টি বর্ষ বয়সে শুক্রবারে তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁহার নিজকৃত উপাসনা গৃহের পার্শ্বে তদীয় দেহের সমাধি দেওয়া হয়। এই পবিত্র সমাধিস্থল এখনও তথায় বিরাজিত আছে, এবং ইহার বিদ্যমানতা জন্যেই শ্রীহট্ট শহর এক প্রধান মোসলমান তীর্থে পরিণত হইয়াছে। শাহ্ জলালের দরগা হিন্দু মোসলমান, সকলেরই মান্য[২]।"

"হজরত শাহ্ জলালের সঙ্গীয় ৩৬০ জন অনুচর ইত্যাদির শ্রীহট্ট, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা প্রভৃতি জিলার নানাস্থানে মজার বা সমাধি বর্তমান আছে,

১ Statistical Accounts of Assam, vol. II (sylhet).
২ অচ্যুতচরণ চৌধুরী : শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত (১৩১৭), দ্বিতীয় ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৩০-৩৫

কিন্তু শ্রীহট্ট জিলায়ই বেশীর ভাগ, এই জিলা আউলিয়াদের মজারে প্রায় পরিপূর্ণ বলা যাইতে পারে[১] ॥"

৬

বাঙলাদেশ ও ভারতবর্ষে মুসলমানগণ নবাগত, কিন্তু যুগ-যুগ ধরিয়া একত্র বসবাস ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিবার জন্য মুসলমানগণ আর বিদেশী নহেন। বাঙালী মুসলমানগণ আগে বাঙালী, পরে মুসলমান ; বহু মুসলমানের পূর্ব পুরুষ হিন্দু। উত্তর ভারত হইতে আগত অসংখ্য স্ফী সাধকের প্রেরণাতে স্ফী ধর্ম ও ইসলাম ধর্ম জনপ্রিয় হইয়াছিল। স্ফীদের অনুভূতি ও মরমিয়াবাদ বহু মানুষের মনে ভক্তির সুর চালিয়াছিল। হিন্দু-মুসলমানের এই সাংস্কৃতিক মিলন কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে ততোটা হয় নাই, যতোটা হইয়াছিল নিম্নশ্রেণীর ও অশিক্ষিতদের মধ্যে।

"বাঙলায় যখন চিশ্‌তী-সুরবর্দী-কাদিরী-নকস্‌বন্দী প্রভৃতি স্ফী সাধনা এল তখন হিন্দু-মুসলমান এই দুই দলের পণ্ডিতদের কাছে মিলনের আশা ছিল না। ইঁটে ইঁটে মেলে না, মেলে কাদায় কাদায়। প্রাকৃতদের মধ্যে যোগ হলেও সংস্কৃতদের মধ্যে যোগ অসম্ভব। তাই বাউলদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান ভেদ নেই। হিন্দুর শিষ্য মুসলমান, মুসলমানের শিষ্য হিন্দু—এমন ক'রে পরম্পরা নেমে এসেছে[২]।"

এই জন্যেই বাঙলা সাহিত্যে 'মুসলমানের অবদান' বলিতে, যাহার মধ্যে বাঙালীর বৈশিষ্ট্য এবং মুসলমানের স্বাতন্ত্রিকতা ফুটিয়াছে, তাহা বলিতে অনেকেই লোক-সাহিত্যের একটি বিশেষ দিককেই বোঝাইয়া থাকেন[৩]। রোমান্টিক প্রণয়গাথা এবং বাউল-ভাটিয়াল সাহিত্যের কথা প্রসঙ্গতঃ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মুসলমান কবি-কর্তৃক মধ্যযুগীয় বঙ্গ-সাহিত্য ধারার বিভিন্ন স্তর যতো না সমৃদ্ধ হইয়াছে, তাহার চেয়ে অনেক বেশী হইয়াছে নিরক্ষর ও অশিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত মুসলমান গায়ক, শ্রোতা ও কবিরা— যাঁহারা লোক-সাহিত্যের ধারক ও বাহক। বাঙলার সংস্কৃতি পরিপূর্ণ রূপে

১ শ্রীহট্টে শাহজলাল : পৃ (অতিরিক্ত) ২২

২ ক্ষিতিমোহন সেন : বাঙলার সাধনা (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, ফাল্গুন, ১৩৬০) পৃ ৫০

৩ দীনেশচন্দ্র সেন : প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান (অক্টোবর, ১৯৪০),

প্রতিফলিত হইয়াছে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনায়,—লোক-সংস্কৃতি ও সাহিত্যের মধ্যে। সূফী সাধকদের অবদানের কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

বাঙলাদেশে মুসলমানদের সাহিত্য-সাধনার কয়েকটি কেন্দ্র ছিল, শ্রীহট্ট তন্মধ্যে একটি। মঙ্গলকাব্য, অনুবাদকাব্য, বৈষ্ণবপদ-সাহিত্য ও চরিত সাহিত্য ছাড়া শ্রীহট্টের অন্য সাহিত্য ধারার মধ্যে রহিয়াছে ইসলাম-পুরাণ কাব্য ও রোমান্টিক প্রণয়গাথা। ইসলাম-পুরাণ কাব্যগুলি হিন্দুদের পুরাণ-পাঁচালীর দেখাদেখি রচিত হইয়াছিল। এই কাব্যগুলির মধ্যেও দুই ভাগ রহিয়াছে : একভাগে ইসলাম-ধর্ম প্রচারকদের জীবনী-মঙ্গলকাব্য, অপর ভাগে "হজরত নবীর পরবর্তী খলিফাদের বিজয় অভিযান ও গৃহবিবাদের বর্ণাঢ্য কাহিনী। এগুলির সাধারণ নাম 'জঙ্গনামা' (অর্থাৎ যুদ্ধকথা)[১]।"

"এই ইসলামি পুরাণ-পাঁচালীর ধারা নিঃসৃত হয়েছিল সপ্তদশ শতাব্দীতে চাটিগাঁয়ে ও সিলেটে।···সিলেটের মুসলমান উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে হোসেন শাহার আমল থেকে। সিলেটের মুসলমানেরা উত্তর-পশ্চিমের হিন্দীভাষী মুসলমানদের সঙ্গে বরাবর যোগ রেখে চলেছিল বলে এরা পুরাপুরি বাঙালী হয়ে উঠতে পারে নি অনেকদিন অবধি।···সিলেটে এবং পশ্চিম রাঢ়ে উত্তরপশ্চিম-ভারতীয় হিন্দী ইসলামি প্রভাব প্রকটতর হয়েছিল।···ভাষাতেও আরবী-ফারসী শব্দের ভিড় জমেছিল[২]।"

"সিলেট-চাটিগাঁর মুসলমানদের মধ্যে হিন্দীমূলক আখ্যায়িকার প্রচলন খুবই ছিল। রোমান্টিক এডভেঞ্চার-বিহীন বিশুদ্ধপ্রণয়গাথাও এঁরা অনেকদিন অবধি চালু রেখেছিলেন। এই রকম একটি পুরানো এবং ভালো গাথা, নাম 'চন্দ্রমুখী,' ছাপা হয়েছিল বহুদিন পূর্বে সিলেটী নাগরী হরফে। রচয়িতা খলিল সম্ভবত সিলেটের লোক ছিলেন[৩]।"

ইসলামি জীবনচরিত ও যুদ্ধোপাখ্যান এবং রোমান্টিক প্রণয়গাথা ছাড়া শ্রীহট্টের লোক-সঙ্গীত ও সাহিত্য ধারাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই লোক-সাহিত্য ধারার মধ্যে বাউল, ভাটিয়াল, রাগ, সারি, ধামাইল প্রভৃতি

---

১ ডাক্তার সুকুমার সেন : ইসলামি বাঙলা সাহিত্য (১৩৫৮), পৃ ৪৪
২ ঐ, পৃ, ৪৪-৪৫
৩ ঐ পৃ ৫৩

বিভিন্ন প্রকারের গান রহিয়াছে। এই সকল গানের পটভূমিকা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। প্রসঙ্গতঃ ইহা মনে রাখা দরকার, বাংলা দেশের অন্যত্রও এই সকল গান প্রচলিত আছে—শ্রীহট্টের বিশেষ পটভূমিটি কেবল ওই অঞ্চলে ব্যাপকতর ভাবে রচিত হইতে প্রেরণা জোগাইয়াছে মাত্র॥

....৭

বৈষ্ণবধর্ম ও ইসলাম-সুফীধর্মের প্রভাবে শ্রীহট্ট একদা বাউল-ভাটিয়াল-মারফতী গান রচনার একটি বিশেষ কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়। মুসলমান সাধক ও ফকিরেরাই সেই সাংস্কৃতিক মিশ্রণের সুর-বাণী-রূপকে তাঁহাদের রচিত গীতি-গুচ্ছের মধ্যে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। যে সমস্ত সাধক-ফকির এই বৈষ্ণব-ইসলাম-সুফী ধর্মকে তাঁহাদের গানে রূপ দিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই মরমী সাধক,—অনুভূতিই তাঁহাদের প্রধান সম্বল। অনুভূতির এই নিবিড়তা এবং সুরের আন্তরিকতার জন্যই তাঁহাদের গীতাবলী জনপ্রিয় হইয়াছে।

বৈষ্ণবতত্ত্ব ও ইসলাম ধর্মের দার্শনিক দিকটি সর্বদা এবং সর্বত্রই যে ইঁহাদের গানে সার্থক ও তথ্য-সম্মত রূপে পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা নহে। পরন্তু, নিজেদের ব্যক্তিগত ও অঞ্চলগত কয়েকটি বিশেষত্বের মধ্য দিয়া কি বৈষ্ণবতত্ত্ব, কি ইসলাম-সুফীতত্ত্ব—সব তত্ত্বকেই খানিকটা পরিমাণে পরিবর্তিত বা পরিবর্জিত করিয়া আপনাদের মতো করিয়া লইয়াছেন। যেখানে অনুভূতি এবং উপলব্ধিই সাধক জীবনের চরম এবং পরম কথা, সেখানে সেই অনুভূতির ব্যক্তিগত সুরটিকে গানের মধ্যে যথাযথ পরিমাণে ও রূপে তুলিয়া ধরিবার জন্য যদি গোষ্ঠীগত তথ্যের একটু ব্যতিক্রম হইয়াই থাকে, তবে তাহার ফল এমন কিছু মারাত্মক নহে এবং এক হিসাবে ইহা স্বাভাবিক।

বৈষ্ণবের প্রেমধর্ম এবং রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা দ্বারা প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হইয়া অনেক মুসলমান কবিই বৈষ্ণব-পদাবলী রচনা করিয়াছেন। কিন্তু, কয়েকটি বিশেষ কারণে নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবের রচিত পদাবলী-সাহিত্যধারার সহিত মুসলমান বৈষ্ণব-কবির রচিত পদাবলীর মধ্যে পার্থক্যও আসিয়া গিয়াছে। ডাক্তার শ্রী শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় মুসলমান বৈষ্ণব কবির এই

বিশেষত্বগুলি কারণসহ সুন্দর ভাবে আলোচনা করিয়াছেন[১]। ডাক্তার দাশগুপ্তের অনুসরণে মুসলমান বৈষ্ণব-কবির বিশেষত্বগুলিকে এইভাবে লক্ষ্য করা যাইতে পারে :

(ক) আধ্যাত্মিকতা বা সাহিত্যিক উৎকর্ষের দিক হইতে মুসলমান কবি কর্তৃক রচিত বৈষ্ণব বা বৈষ্ণবভাবাপন্ন পদাবলীর মূল্য তেমন একটা নাই ; "কিন্তু আমাদের বাঙালী জাতীয় মনের ক্রম-বিকাশের ধারাটি লক্ষ্য করিতে এই গানগুলির একটি বিশেষ মূল্য রহিয়াছে।"

(খ) এই সকল মুসলমান কবিরা নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব নহেন। শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত প্রেমধর্মের মধ্যে এমন একটা সার্বজনিক আবেদন ছিল—যাহা বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ গণ্ডীকে কাটিয়া জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে মানব-মনকে নাড়া দিয়াছে। এই প্রেমধর্ম হিন্দু-মুসলমান-নাথ-বৌদ্ধ-নির্বিশেষে বাঙালীর সাংস্কৃতিক মানস ও জীবনের একটা বিশিষ্ট দিক।

(গ) শ্রীরাধা-কৃষ্ণের তত্ত্ব ও প্রতিবেশকে ভিত্তি করিয়া বাঙলাদেশে যে সাহিত্যধারার পত্তন হয়, তাহার দুইটি দিক আছে। একটি—আনুষ্ঠানিক গৌড়ীয় বৈষ্ণবতার ধারা, অর্থাৎ রাগানুগামার্গে সাধন ধারা; অপরটি—বৈষ্ণব তত্ত্বকে অঙ্গীকার না করিয়া, রাধা-কৃষ্ণকে সাধারণ মানব-মানবীর প্রতিরূপ হিসাবে গ্রহণ করিয়া নিছক লৌকিক ও জনপ্রিয় সাহিত্যধারা। খাঁটি বৈষ্ণব শাস্ত্রানুযায়ী সাধক কখনই শ্রীকৃষ্ণের সহিত রমণ করিবার বাসনা পোষণ করিতে পারেন না। সে অধিকার কেবল শ্রীরাধা এবং গোপীদেরই আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রে সাধক অপ্রাকৃত বৃন্দাবনস্থ শ্রীরাধা-কৃষ্ণলীলাকে সখীর সখীদের 'অনুগা' ভাবে দর্শন করিয়া দূর হইতে উহারই লীলাকীর্তন করেন মাত্র। কিন্তু মুসলমান কবিদের রচিত বৈষ্ণব পদাবলীতে দেখা যায়—তাঁহারা শ্রীরাধার সহিত নিজেদের একাত্ম করিয়া কৃষ্ণ-সঙ্গ কামনা করিয়াছেন—যাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন-সম্মত নহে। সুতরাং, ইহা একদিকে খাঁটি বৈষ্ণবতার সুর নহে, অপরদিকে নিছক লৌকিক প্রেমকে ফোটাইবার জন্য যুগ-প্রাচীন প্রথানুসৃতিও নহে ;—কিন্তু, এই দুইয়ের মাঝামাঝি তৃতীয় একটি স্তর।

(ঘ) এইরূপ হইবার কারণ কি ? ইহার কারণ মোটামুটি ভাবে দুইটি :

১ বাঙলার মুসলমান বৈষ্ণব-কবি : বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র, ১৩৮৩

প্রথমত: বৈষ্ণব ভাব, ভাষা ও ভঙ্গীকে পাইলেও তত্ত্বকে মুসলমান কবিগণ আয়ত্ত করিতে চান নাই, বা পারেন নাই, কিংবা সে সুযোগই তাঁহাদের আসে নাই। দ্বিতীয়ত: তাঁহাদের উপর স্ফীধর্মের প্রভাব। স্ফীধর্মের মূল কথা হইল, প্রেমের দ্বারাই জীব পরম একের সহিত একাত্ম হইয়া যাইতে পারেন, প্রেমের সেই অবস্থাকে বলা হয় 'ফানা'। যেহেতু স্ফীমতে পরম একের সহিত মিলিত হওয়া সম্ভব প্রেমের মাধ্যমে, সেইহেতু সেই ধারণার বশবর্তী হইয়া মুসলমান বৈষ্ণব কবিরাও প্রেমের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের সহিত একাত্ম হইতে চাহিয়াছেন,—যাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-শাস্ত্রানুমোদিত নহে। প্রসঙ্গত: ইহাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, খাঁটি স্ফীধর্মের সহিত ভারতের স্ফীধর্মের খানিকটা পার্থক্য আছেই; বাঙলা তথা ভারতের স্ফীমতবাদ অনেকটা এদেশীয় প্রেমধর্ম ও প্রেম-আখ্যান দ্বারা প্রভাবিত।

(ঙ) গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বকে পুরাপুরি না পাইবার জন্য এবং স্ফীমতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হইবার জন্য মুসলমান মরমী কবিকুল যখন যুগ-প্রাচীন রাধা-কৃষ্ণের ভাব-প্রতিবেশকে অঙ্গীকার করিয়া পদ রচনায় মনোনিবেশ করিলেন, তখন স্বাভাবিক ভাবেই 'রাধা' ও 'কৃষ্ণ'-ও আর গৌড়ীয় বৈষ্ণবের শাস্ত্র-সম্মত রহিলেন না,—তাঁহারাও পরিবর্তিত হইলেন এই সকল কবির ধারণাতে। তাই শ্রীরাধাও আর কেবল শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিন্যাত্মক স্বরূপ-শক্তির আধার নন, কিংবা শ্রীকৃষ্ণও কেবল স্বরূপধামের পরম রসিক, সেই শক্তির উৎস নহেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন এই কবিদের নিকট বৈষ্ণবতার সঙ্কীর্ণতাকে মুছিয়া ফেলিয়া শ্রীহরি-আল্লা-গড-এর মিশ্রিত স্বরূপে এক সার্বজনিক 'ভগবান' এবং দেশ-কাল-সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ এক সাধারণ 'প্রেমিক পুরুষ' রূপে আবির্ভূত হইলেন। শ্রীরাধাও নিখিল বিশ্বের প্রেমিকার প্রতীক হইয়া উঠিলেন। শ্রীরাধা যেখানে চিরকালের প্রেমের প্রতীক মাত্র,—শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিন্যাত্মক স্বরূপশক্তি নহেন,—সেখানে শ্রীরাধার সহিত কবির একাত্ম হইতে বাধা কোথায় এবং শ্রীরাধার সহিত একাত্ম হইলে শ্রীকৃষ্ণেরই সঙ্গ-সুখ চাহিতে বা পাইতে দোষ কী। শ্রীরাধা-কৃষ্ণের লীলাও আর 'অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে' সংঘটিত হইতেছে না, উহা সাধারণ প্রেমিক বা মানুষের মনে ও ঘরে অনুষ্ঠিত হইয়া চলিয়াছে।

(চ) ইহার পর বৌদ্ধ-নাথ-যোগতন্ত্র এবং উহাদের মিশ্রণজাত বাউল

ধর্মের প্রভাবে ও প্রতিবেশে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের আর এক প্রস্থ পরিবর্তন ঘটিল। বৌদ্ধ-নাথ-তন্ত্রাচার-বাউলধর্মে দেহই পরমসত্যের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র এবং সদ্‌গুরু সেই সত্যকে লাভ করিবার উপায় বলিয়া কল্পিত। ইহারই ফলে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের ভূমিকাও পরিবর্তিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ এখন অপ্রাকৃত বৃন্দাবনস্থ লীলারসিক নহেন, তিনিই গুরু বা মুরশিদ,—অথবা গুরু বা মুরশিদকে ভজিলেই দেহের মধ্যে কৃষ্ণকে পাওয়া যাইবে। দেহ এখানে রাধা, মন এখানে কৃষ্ণ। কৃষ্ণ এখানে ঘর, রাধা এখানে ঘরিণী: আবার কখনওবা রাধা ঘর, কৃষ্ণ সে ঘরের গৃহী। কৃষ্ণ তখন বাউলের 'মনের মানুষ' বা 'পরম-তত্ত্ব,'—তিনি এই দেহেই আছেন, আবার নাইও বটেন; ক্ষণে ধরা দেন, ক্ষণেই আবার অধরার রাজ্যে মিলাইয়া যান। শ্রীরাধা ও কৃষ্ণের এই তত্ত্বগত বিবর্তনের পশ্চাতে রহিয়াছে প্রেমধর্ম ও প্রেমসাধনার সঙ্গে যোগধর্ম ও যোগসাধনার মিলন,—সূফী ও সহজিয়া বৈষ্ণব সাধকগণ যাহার সংঘটক।

রাধা-কৃষ্ণ লীলা-তত্ত্ব কিভাবে মুসলমান বৈষ্ণব কবি এবং বাউলের হাতে বিবর্তিত হইয়াছে, উপরে তাহাই তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করা হইল। সাধারণ ভাবে বাঙলার মুসলমান বৈষ্ণব কবি সম্পর্কে এই সকল মন্তব্য করা হইলেও শ্রীহট্টের কবিদের সম্পর্কেও উহা খাটে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্বের পরিবর্তন যেমন মুসলমান বৈষ্ণব ও বাউল কবিদের পদাবলীতে লক্ষিত হয়, তেমনি খাঁটি ইস্‌লাম ধর্ম ও তত্ত্বও এই সকল কবিদের পদাবলীতে বিকার প্রাপ্ত হইয়া অভিনব একটি দিককে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। ইহার কারণ—সূফীধর্ম ও ইস্‌লাম ধর্মের মূলগত বিভেদ। যাহা হউক, কি গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্ব, কি শরীয়ত-বাদী খাঁটী ইস্‌লাম ধর্ম—দুইই শ্রীহট্টের মুসলমান বৈষ্ণবকবি ও সূফীকবির হাতে পরিবর্তিত হইয়া বাউলতত্ত্বকে পরিস্ফুট করিয়াছে॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

॥ কবি ও ভণিতা ॥

প্রস্তুত গ্রন্থে শ্রীহট্ট জেলার অনেক কবির গান সঙ্কলিত হইয়াছে। নীচে তাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইল।

১. আকবর আলী, ছাবাল। ছাবাল আলী : সং ৪৮, ৪৯, ৬০, ৬২, ৯৩, ১৪৭, ২১১।

২. আখতর সায়েব, ফকির : সং ১৫৯।

৩. আচন, ফকির : সং ২৭৭, ২৮৩।

৪. আবজল, অধম। অনাথ আবজল। অধীন আবজল। ফকির আবজল : সং ৩৪, ৬৪, ৬৬, ১৫৫, ১৮০, ১৯৪, ২৬৭, ২৮৬, ২৯০।

৫. আব্দুল। ফকির আব্দুল, হুছন। হীন আব্দুল আলী : সং ৩৩, ৩৬, ১৮২।

৬. আব্দুল্লা : সং ২০৪।

৭. আম্বর আলী : সং ৩১৯।

৮. আয়নুল্লাহ : সং ৫৬।

৯. আরকুম, পাগল : সং ৮৯, ১৭১, ১৭২, ১৭৫, ১৮৩, ১৮৪, ১৯৩, ১৯৯, ২১২, ২২৯. ২৩০, ২৩১, ২৪০, ২৪৮, ৩৫৩, ৩৫৪।

১০. ইছাক, পাগল : সং ১৬৭, ১৮৮, ২৩৩।

১১. ইদং শা', মস্তান : সং ১৯।

১২. ইরপান, অধীন, নাকিছ। ফকির ইরপান আলী : সং ২১, ২৪, ২৭, ৪০, ৬৫, ২১৪।

১৩. ইয়াকুল আবদুল ওয়াহিদ। শেখ আব্দুল ওয়াহিদ। ওয়াহিদ : সং ১৭, ১২৩, ১৪২, ১৭০, ১৭৩, ২৫০।

১৪. ইয়াছিন : সং ৩৫, ৫০, ১৭৪, ২৭১, ২৯৭।

১৫. ঈশ্বর : সং ১৫৪।

৬৮. মাইজ ভাণ্ডার[১] : সং ৪২।

৬৯. মিলন শা', ফকির : সং ২৮৮।

৭০. মুজমিল নাগর : সং ৯৯, ১২১।

৭১. রইছ, অধম : সং ৮৭, ২৯৬।

৭২. রতনদাস, কাঙাল : সং ৭১।

৭৩. রতনমণি : ৯৬।

৭৪. রমজান শা', ফকির : সং ২৬৫।

৭৫. রমণ। রমণচান্দ, গোঁসাই : সং ১২৭, ১৩৭, ২১৫।

৭৬. রহিমুদ্দীন, ফকির। রহিমুদ্দীন ফকির : সং ২২০, ২৩৬।

৭৭. রাধারমণ, বাউল : সং ২২, ৪৪, ৭৫, ৭৬, ৭৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৫, ৯৭, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৫, (দীন মদন), ১১৬, ১১৯, ১২২, ১২৬, ১২৯, ১৩২, ১৩৩, ১৩৯, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৬ (জয়মণি), ১৬৪, ১৬৬, ১৯৬, ২৩৭, ২৫২, ২৫৬, ২৫৭, ৩১৫, ৩১৬, ৩১৭, ৩২২, ৩২৪, ৩২৬, ৩২৮ (বৈকুণ্ঠ), ৩৩০, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৪, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫০।

৭৮. শরৎ : সং ২৩।

৭৯. শীতালং ফকির : সং ১৪০, ১৬৮, ২৩৫, ২৪৩, ২৪৪, ২৬৩, ২৭২, ২৭৮, ২৮০।

৮০. শেখ বানু, অধীন : সং ১৪৯।

৮১. শ্রীনাথ : সং ২৯।

৮২. সদাই শা' : সং ২১৭।

৮৩. সদানন্দ : সং ৭৩।

৮৪. স্বরূপানন্দ : সং ৯।

৮৫. শাহা নূর সৈয়দ। সৈয়দ শা' নূর : সং ২২২, ৩৫৫।

৮৬. সুরেশ : সং ৩৩৯।

৮৭. সুয়াগ দাস। সোয়াগ, হীন : সং ৩২১, ৩৩৩।

---

১ চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ী থানার অন্তর্গত মাইজ ভাণ্ডার নামে একটি গ্রাম আছে। মনে হয়, সেই মাইজ ভাণ্ডার গ্রামের কথাই এখানে বলা হইতেছে। মাইজ ভাণ্ডার উক্ত জেলার সুফীদের একটি কেন্দ্র।

৮৮. সৈয়দ আকিল : সং ১৮১, ২২১।

৮৯. সৈয়দ শা', বাউল : সং ১৬৫।

৯০. সৈয়দ সৈদ আলী ছাব : সং ২৬১।

৯১. হক আলী, অধীন। অপরাধী হক আলী : ৬৮, ১০৪।

৯২. হরিদাস : সং ২০২।

৯৩. হাছন রাজা। ছৈয়দ হাছন। অধম হাছন : সং ৩, ২৫, ৪৬, ৪৭, ৫১, ৫২, ৫৫, ১৪৬, ১৫৭, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৯, ২০৭, ২১০, ২২৩, ২২৮, ২৯১।

৯৪. হীরাচান্দ, বাউল : সং ১৪৮।

৯৫. হুছন আলম, শা'। শাহ্ হুছন আলী : সং ২৫৮, ২৬২।

৯৬. হেম : সং ৭৪।

মোট এই ছিয়ানব্বই জন কবির নাম পাওয়া গিয়াছে। কয়েকটি গানের ভণিতায় কবির নামের বদলে বিশেষণ পাইয়াছি : ১. 'অধম পাগল'—সং ৪৫। ২. 'অধীন পাগল'—সং ২৩৪। ৩. 'অধীন প্রেমিক'—সং ১৬৯। ৪. 'ছাবাল' —সং ২২৪। ৫. 'জঙ্গলিয়া মস্তান'—সং ২৭৬। ৬. 'দীনহীন'—সং ১৩১।

কয়েকজন কবির ভণিতাতে অন্য কবির নাম মিলিয়াছে। ৪৫-সংখ্যক গানের ভণিতায় আছে 'অধম পাগল', কিন্তু গানের মধ্যে 'শীতালঙ্গ' নামটি আছে। ইনি কি শীতালং ফকির? ১১৫, ১৫৬ ও ৩২৮-সংখ্যক গানে কবি রাধারমণের সহিত যথাক্রমে 'দীন মদন,' 'জয়মণি' ও 'বৈকুণ্ঠে'র নাম উল্লিখিত হইয়াছে। রাধারমণ কি ইঁহাদের গুরু ছিলেন? এইরূপ, ১৮৩-সংখ্যক গানটিতে কবি আরকুমের নামের সহিত 'হজরত শাহা আব্দুল লতিফ' নামটি পাওয়া যাইতেছে।

দুইটি ভণিতা গানের প্রথমেই দেওয়া হইয়াছে : সং ২৫ ও সং ২৬৪।

নিম্নলিখিত গানগুলির কোনোপ্রকার ভণিতা নাই : সং ২, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৫, ২০, ২৬, ২৮, ৩০, ৩৭, ৩৮, ৪১, ৪৩, ৫৩, ৫৯, ৬১, ৬৭, ৭০, ৭২, ৭৭, ৭৮, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৮, ৯৪, ১০২, ১১৭, ১২৪, ১৩০, ১৪৪, ১৭৮, ১৮৫, ১৮৯, ১৯০, ২০১, ২০৫, ২০৮, ২০৯, ২১৩, ২১৬, ২১৮, ২১৯, ২২৬, ২৩৯, ২৪২, ২৫১, ২৫৩, ২৮৫, ৩০৩, ৩১৮, ৩২০, ৩২৩, ৩২৫, ৩২৯, ৩৫২, ৩৫৬—৩৮০॥

....২

এইবার ভণিতাগুলি লইয়া আলোচনা করিতেছি।

প্রাপ্ত ভণিতাগুলির প্রথম বিশেষত্ব হইল—কবিদের বিনয়। বিনয় প্রদর্শন করিবার জন্য অধিকাংশ কবিই কতকগুলি বিশিষ্ট বিশেষণ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে 'অধীন' ও 'অধম' বিশেষণ দুইটিই সর্বাধিক ব্যবহৃত হইয়াছে। 'অধম' এবং 'বুদ্ধিহীন'—এই দুইটি বিশেষণের প্রতিশব্দ হিসাবে 'নাকিছ' ও 'নাদান'-ও দুই-একজন কবি ব্যবহার করিয়াছেন। অন্যান্য বিশেষণ সমূহ: 'অনাথ,' 'অপরাধী,' 'কাঙাল,' 'দীন', 'হীন', 'দীন-হীন'।

কয়েকটি ভণিতার মধ্য দিয়া কবিদের সাধকমনের পরিচয় যথার্থরূপে বিকশিত হইয়াছে। তাঁহারা যে ইষ্টের জন্য 'পাগল' বা 'লক্ষ্যহারা' হইয়াছেন—তাঁহাদের প্রযুক্ত বিশেষণগুলি হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। যেমন, 'বেলক্ষ্যি' (ইষ্টের জন্য লক্ষ্য-হারা যিনি), 'পাগল', 'মস্তান' (অর্থাৎ পাগল), 'ছাবাল' (ভক্তি-সাধনার পথে যিনি শিশুতুল্য)। এই প্রসঙ্গে 'অধম পাগল', 'অধীন পাগল,' 'জঙ্গলিয়া মস্তান' (ইষ্টের জন্য পাগল হইয়া যিনি জঙ্গলবাসী হইয়াছেন) ইত্যাদি ভণিতাগুলির নাম করা যায়।

কবিদের বৃত্তি বা বংশগত পরিচয় ধরা পড়িয়াছে কয়েকটি ভণিতায়। এই ধরণের ভণিতাগুলি কবিদের নামের আগে ও পরে—দুই দিকেই ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন, 'গোঁসাই', 'বাউল', 'ঠাকুর', 'ফকির', 'হকির' (ফকির), 'মুরশিদ', 'শেখ'।

ভণিতাগুলি পড়িলে উহাদের মধ্যে বেশ কয়েক ধরনের ভণিতা পাওয়া যায়। নীচে কিছু-কিছু ভণিতার শ্রেণীভাগ করিয়া দেখানো হইল:

(ক) কবিদের পরপারের চিন্তা, আত্মগ্লানি, ক্ষোভ, খেদ, নৈরাশ্য ও অতৃপ্তি। পরিমাণে এই ধরণের ভণিতাই বেশী—সং ১৬, ১৮, ১৯, ২১, ২৩, ২৪, ২৫, ৩১, ৩২, ৩৩, ৪০, ৪২, ৪৫, ৪৮, ৪৯, ৫৮, ৬০, ৬৯, ৭৪, ৯৮, ১১৪, ১৩১, ১৪৮, ১৪৯, ১৫৪, ১৫৭, ১৭২, ১৭৬, ১৭৭, ১৮০, ১৮৭, ১৮৮, ১৯৭, ১৯৮, ২০৩, ২০৪, ২৬৫, ২৬৭, ২৭২, ২৭৫, ২৭৯, ২৮২, ২৮৪, ২৮৮, ২৯০, ২৯২, ২৯৩, ২৯৬, ২৯৮, ৩১৪, ৩৫৩, ৩৫৫।

(খ) আত্ম নিবেদন, ইষ্টের প্রতি বিশ্বাস—সং ১, ৩, ১৪, ২৯, ৩৯, ৪৬, ৪৭, ৫১, ৫৪, ৬৪, ৬৫, ৭৩, ৭৬, ৮৯, ৯০, ৯২, ১০৮, ১৪২, ১৫৫, ১৭৩, ১৭৯,

১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৬, ১৯৬, ২০২, ২৩০, ২৪০, ২৬৬, ২৯৪, ২৯৫, ৩১৬, ৩২৪, ৩৫৪।

(গ) ব্যক্তিগত কথা—সং ১৭, ৩৪, ৬৬, ১৩৪, ১৬৫, ৩১৪।

(ঘ) সাধন-পথে সঙ্কোচ, দিশেহারা হইয়া প্রশ্ন—সং ৫০, ৫৫, ৬২, ৬৩, ৭১, ৭৫, ৭৯, ৮৬, ৮৭, ৯৬, ১০৬, ১২৩, ১৩৮, ১৫০, ১৫৩, ১৬২, ১৮৪, ২০৭, ২১৭, ২২০, ২২১, ২৩২, ২৩৬, ২৪১, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৫০, ২৫৫, ২৫৭, ২৬০, ২৮৬, ২৮৭, ২৯১, ৩০০, ৩০৮, ৩০৯, ৩৪৮।

(ঙ) সাধন-পন্থা নির্দ্দেশ—সং ৯, ২২, ২৭, ৩৫, ৩৬, ৪৪, ৫২, ৫৬, ৫৭, ৬৮, ১৪৫, ১৫৮, ১৫৯, ১৭০, ১৭৪, ১৯১, ১৯২, ১৯৫, ১৯৯, ২০০, ২০৬, ২২৭, ২২৮, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৪৫, ২৬৯, ২৭৩, ২৭৬, ২৭৭, ২৮৩।

(চ) প্রেম—সং ১০৩, ১০৪, ১২৫, ১৩৩, ১৩৯, ১৪০, ১৫৬, ১৬৯, ১৭১, ১৭৫, ১৯৩, ২১১, ২২৯, ২৫২, ২৫৬, ২৫৯, ২৯৭, ৩১৫, ৩১৭, ৩৩৩, ৩৪৯।

(ছ) অভিমান—সং ১৬৩, ১৬৬, ২৭৮, ৩৫০।

(জ) কয়েকটি গানের ভণিতায় কবিরা বিভিন্ন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়াছেন—সং ৯৩, ৯৫, ১৬৭, ১৬৮।

(ঝ) বর্ণনামূলক ভণিতা—সং ৯৭, ৯৯, ১২১, ১২২, ১৫২, ১৬৩, ২১০, ২২২, ২৩১, ২৬১, ২৬২, ২৬৮, ২৭০, ২৮০, ২৮১, ২৮৯, ৩২১, ৩৩৭, ৩৩৯, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৫১।

(ঞ) শ্রীরাধার প্রতি সান্ত্বনা, নির্দ্দেশ, সমবেদনা। অনেক ক্ষেত্রে রাধার ব্যথা কবিদেরই ব্যথা হইয়াছে। সান্ত্বনা, নির্দ্দেশ ও সমবেদনার মধ্যে কবিদের কৌতুক, নিষ্ঠা ও দৃষ্টির পরিচয় মিলে—সং ৯১, ১০০, ১০১, ১০৫, ১০৭, ১০৯, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৫, ১১৬, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩২, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৪১, ১৪৩, ১৪৬, ১৪৭, ১৫১, ১৬০, ১৬১, ১৬৪, ১৬৮, ১৯৪, ২১৫, ২৫৮, ২৬৩, ২৭১, ২৯৯, ৩০১, ৩০৪, ৩০৫, ৩০৬, ৩০৭, ৩১২, ৩১৩, ৩১৯, ৩২২, ৩২৬, ৩২৭, ৩২৮, ৩৩০, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৮, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৬, ৩৪৭।

....৩

ভণিতাগুলির মধ্যে কবিদের পরিচয় যেমন মিলে, তেমনি কোথায় কখন কেমন করিয়া তাঁহারা গানগুলি রচনা করিয়াছেন—তাহাও দুই-একটি গানে মিলে। অবশ্য, এই সকল তথ্যাদিকে আক্ষরিক অর্থে কতোখানি গ্রহণ করা চলিবে—তাহা একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন বটে। মনে হয়,—ইহার মধ্যে লৌকিক সত্য ততোখানি নাই, যতোখানি রহিয়াছে কাব্যিক একটি বিশেষত্ব। যাহাই হউক, এ বিষয়ে নিম্নলিখিত ভণিতাগুলি পঠিতব্য :

১. আর কইন তো ফকির ফয়জুল্লা শা'য়
দরিয়ার পার বইয়া :
হায়রে, পারইতাম-পারইতাম করি'
দিন তো যায় মোর গইয়া রে ॥—সং ১৬

২. আর শেখ আব্দুল ওয়াহিদ বলে—
লাঞ্ছিত সংসারে ;—সং ১৭

৩. আর ভাইবে রাধারমণ বলে—
নদীর কূলে বইয়া।—সং ২২

৪. নাকিছ হৈরপানে বলে—নদীয়ার কূলে বইয়া :
বেরথা জীবন গাওয়াইলাম—
চোরের ছলা বইয়া ॥—সং ২৪

৫. আর কইন নি ফকির আব্দুল হুছন
দিলেতে ভাবিয়া—সং ৩৩

৬. আর প্রেম-হারা কথা সয় না—
কান্দে ইয়াছিনে :—সং ৩৫

৭. আর অধম পাগলে বলইন—
মন রে, হইয়া নৈরাশ—সং ৪৫

৮. কান্দিয়া মিনতি করে
হাছন রাজা দাসা।—সং ৪৬

৯. ইয়াছিনে বলে—লজ্জা ভাবি' মনে—সং ৫০

১০. আর মুরশিদ মজাইদ চান্দে বলইন
কদমরছুল বইয়া—সং ৬৯

১১. আর কইন তো ফকির কাহ্নু শা'য়
সনদের পার বইয়া—সং ৯৮

১২. রাধারমণ বাউলে বলে
ঝুরি' দুই নয়ানে—সং ১২৯

১৩. আর সৈয়দ শা' বাউল কইনি
ভুটাঙ্গী টিলায় বইয়া—
ওয়রে, এই গীত রুচিলাম আমি
আন্ধইর ঘরে বইয়া ॥—সং ১৬৫

১৪. অধম আবজলে বলে, মুরশিদের চরণতলে—সং ১৮০

১৫. আর কইন তো ফকির পিয়ারা শা'য়
রফি নগর বইয়া—সং ১৮৬

১৬. আর কইন তো অধম জংলা শা'য়
বসিয়া জৈন্তাপুর—সং ১৮৭

১৭. অধীন চৈতন্যে কইন
ঘাটের কূলে বইয়া :—সং ২০৩

১৮. সৈয়দ আকিলে কইন—
ফুলের তলে বইয়া—সং ২২১

১৯. শীতালং ফকিরে কইনি রে মনা
গাছের ডালে বইয়া—সং ২৪৪

২০. কয় তো সাধু মদন শা'য়
লঙ্গাইর পার বইয়া :—সং ২৫৯

২১. আর কইন তো ফকির রমজান শা'য়ে—
আবাতির টিলায় বইয়া :—সং ২৬৫

২২. আর কইন তো মুরশিদ চান্দ আলী শা'য়
বড়োবন্দে বইয়া ।—সং ২৯৪

....৪

ছিয়ানব্বই জন কবির মধ্যে আমরা সামান্য কয়েকজন কবির ব্যক্তিগত পরিচয় জানিতে পারিয়াছি। নিম্নে তাঁহাদের সেই পরিচয় দেওয়া যাইতেছে :

আকবর : ইঁহার পূরা নাম আকবর আলী ছাবাল শাহ্ জলালবাদী। ইনি শ্রীহট্ট জেলার গুপরাইল পরগণার মহম্মদপুর (মামদপুর) নিবাসী ছিলেন। "তাঁহার অপর নাম শামসুল আরেকিন শাহ্ শরফউদ্দিন চিস্তিয়া। তাঁহার পিতার নাম সৈয়দ আবদুল আজিম। তাঁহাদের পূর্বপুরুষ হবিগঞ্জের তরফ হইতে আসিয়াছিলেন[১]।" কবির পিতামহের নাম মেন্দিকামাল, প্রপিতামহ—জাফর আলী। কবি তাঁহার 'এস্কে দেওয়ানা' গ্রন্থে লিখিয়াছেন,

সাহা সরপউদ্দিন নাম রাখিলা আমার।
আকবর আলী ছাবাল সাহ নাম করিলা প্রচার॥
ছৈয়দ সাহনূরের বেটা সাহা জহর আলী নাম।
তান খেদমতে আমি অধম গুলাম॥—পৃ ২২

ইহা হইতে জানিতেছি, কবি শ্রীহট্ট জেলার বিখ্যাত ফকির সৈয়দ শাহনুরের পুত্র শাহ্ জহর আলীর মুরিদ ছিলেন। আকবর সর্বদাই ভণিতায় 'ছাবাল' এই বিশেষণ ব্যবহার করিয়াছেন; ইহার অর্থ—শিশু, বালক। ভক্তি-মার্গে কবির সাধনা শিশু বা বালক-সুলভ—ইহাই বোধ হয় তিনি জানাইতে চাহেন।

আকবর অনেক গান লিখিয়াছেন। তাঁহার তিনখানি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে : 'এস্কে দেওয়ানা', 'ফানায়ে জান' এবং 'যৌবন বাহার'। 'এস্কে দেওয়ানা' বা 'প্রেম পাগল' বইটি "আধ্যাত্মিক তত্ত্বপূর্ণ গানের পুস্তক।" অন্যান্য গ্রন্থে কবির অন্যান্য পদের সহিত রাধাকৃষ্ণ লীলা-বিষয়ক পদ আছে।

আবজল : 'আবঝল' নামে জনৈক শ্রীহট্টবাসী মুসলমান কবির নাম পাওয়া যায়। মনে হয়, 'আবজল' এবং 'আবঝল' অভিন্ন ব্যক্তি। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য মহাশয় 'আবঝল' প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,

১ শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৩৫০ : মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন

"পরিচয় অজ্ঞাত। ইঁহার রচিত দুইটি পদ ব্রজসুন্দর সান্যাল-সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' চতুর্থ খণ্ডে ও একটি পদ 'ভারতবর্ষ', ১৩২৫ বাং পৌষ-সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে[১]।"

আরকুম : শাহ্ আরকুম উল্লা শ্রীহট্ট জেলার 'খিত্তা' পরগনার ধরাধরপুর নিবাসী ছিলেন। "ইনি সিলেট জেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক ফকির। হাজার হাজার লোক তাঁহার মুরিদ (শিষ্য)[২]।" তাঁহার মুরশিদের নাম সাহা আবদুল লতিফ, 'হকিকতে সিতারা' গ্রন্থে তিনি তাহা জানাইয়াছেন,

হজরত সাহা আবদুল লতিফ নিজের বেসাত দিয়া
পাগল আরকুমের নৌকা দিয়াছইন ভাসাইয়া॥—পৃ ৩১

আরকুম সাধক-জীবনে অনুভূতি-প্রধান কবি ছিলেন; ভণিতায় তিনি নামের পূর্বে 'পাগল' এই বিশেষণ ব্যবহার করিতেন। তাঁহার 'হকিকতে সিতারা' "আধ্যাত্মিক তত্ত্ববহুল গানের পুস্তক।...পুস্তকে বহুসংখ্যক চিন্তাকর্ষক মারেফত বিষয়ক গান আছে[৩]।" এই বইতেই একটি জায়গায় (পৃ ৬৬) তিনি লিখিয়াছেন, "ভিক্ষার ফকিরী হইয়া ফিরি ঠাঁই ঠাঁই।" তিনি যে শেষ জীবনে ফকিরী গ্রহণ করিয়াছিলেন, গানেও তাহা উল্লেখ করিয়াছেন।

'হকিকতে সিতারা' গ্রন্থে ৯৪টি গান আছে; ইহা শ্রীহট্টের ইসলামিয়া প্রেস হইতে মুদ্রিত হইয়াছে (বাং ১৩৪৭)। কবি সুফী ও বৈষ্ণব—উভয় পরিবেশকেই স্বীকৃতি জানাইয়াছেন। তাঁহার অপর একখানি গ্রন্থ "কবিনামা"; ইহা "১৩০৪ বাঙলার ভূমিকম্পের বর্ণনামূলক ভাট কবিতা পুস্তক।...কবি ভাট কবিতার ছলে এই পুস্তকে ভূমিকম্পের বিবরণের সহিত তৎকালীন সিলেটের বহুতথ্যের বর্ণনা করিয়াছেন। শেষের দিকে একটি দুর্ভিক্ষ কবিতাও স্থান পাইয়াছে[৪]।"

আব্দুল্লা : শাহ্ মোহাম্মদ আব্দুল্লা কোথাকার অধিবাসী ছিলেন, তাহা ঠিক জানিতে পারা যায় নাই। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'হজনামা'। ইহা

১ বাঙ্গালার বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন মুসলমান কবি (দ্বি সং ১৯৬২), পৃ ১০৭-৮
২ শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৩৫০
৩ শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৩৫০
৪ ঐ

"হজযাত্রিগণের অবশ্য জ্ঞাতব্য পুস্তক।...রাস্তায় ও তথায় করণীয় কার্যের প্রয়োজনীয় উপদেশের সমাবেশ করিয়াছেন[১]।"

আব্দুল : এই নামের একাধিক কবি মিলিয়াছে শ্রীহট্ট জেলা হইতে। অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য মহাশয় আবদুল মালীক (হেকিম) নামীয় জনৈক শ্রীহট্ট শহরবাসী কবির নাম উল্লেখ করিয়াছেন[২]। উক্ত কবির "প্রেমের দেওয়ানা' (প্রথম খণ্ড) আটটি গান-সম্বলিত পুস্তক, উহা ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে শ্রীহট্টের ইসলামিয়া প্রেস হইতে মুদ্রিত হয়।

শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা-র বিভিন্ন সংখ্যায় আব্দুল ('আবদুল') নামীয় একাধিক কবির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে :

(ক) ফকির মোহাম্মদ আবদুল আজিজ সাহেব : জৈন্তা চুপীর ঘাট, আগফৌদ নিবাসী ছিলেন। গ্রন্থ : 'রাগ বাউলা দিল দেওয়ানা'; ইহা "আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বিষয়ক গানের পুস্তক।...শ্রীহট্ট সারদা প্রেসে ১৩৪০ বাং সনে মুদ্রিত[৩]।"

'মুন্সী আবদুল আজিজ' নামেও জৈন্তার ছোটোদেশ গ্রাম নিবাসী একজন কবির উল্লেখ মিলে। ইঁহার গ্রন্থের নাম 'মফিদুল আওয়াম' : "জনসাধারণকে ধর্মের পথে প্রদর্শনমূলক পুস্তক।...কবি এই পুস্তকে জাতিকে ধর্ম বিষয়ক বহু উপদেশ প্রদান করিয়াছেন[৪]।"

(খ) মুন্সী আবদুল করিম : ইনি জৈন্তার কোনো গ্রাম নিবাসী। "ওজুনামের কবিতা' তাঁহার একটি মুদ্রিত গ্রন্থ। ইহা "পবিত্রতা ও নামাজ বিষয়ক কবিতা।...কবি তাঁহার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় ব্যবস্থা শাস্ত্র বিষয়ে ভাট কবিতা ছন্দে বহুকথা আলোচনা করিয়াছেন এবং তৎসংক্রান্ত বিষয়ে শ্লেষপূর্ণ বহু উপদেশও দিয়াছেন[৫]।"

'মৌলবী আবদুল করিম' নামও পাওয়া যাইতেছে, যিনি "জৈন্তার চতুল পরগনার হালাতইল প্রকাশিত রাঙ্গারাই মৌজার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম মুন্সী মোহাম্মদ জকি।" রচিত গ্রন্থের নাম 'ওয়াজিবুল

১ ঐ
২ বাঙ্গালার বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন মুসলমান কবি (দ্বি সং ১৯৬২), পৃ ১০৮
৩ শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৩৫০
৪ ঐ
৫ ঐ

আমল বা জরুরী অভ্যাস' : "কবি এই পুস্তকে ইহকাল, পরকাল, বেহেস্ত, দোজখের বর্ণনাসহ মুসলমানের নিত্য অনুষ্ঠেয় ধর্মকর্মের ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। ইহা অতি জরুরী পুস্তক, এই পুস্তকখানা আয়ত্ত করিতে পারিলে দৈনন্দিন ধর্মকার্য ও অন্যান্য আকস্মিক কার্যাবলী সম্পাদনে কোনও অসুবিধায় পড়িতে হয় না।" 'চরকার চক্কর' ইঁহার অপর এক গ্রন্থ। ইহা "চরকার মাহাত্ম্য বিষয়ক পুস্তিকা।...খেলাফত আন্দোলনের সময়ে মহাত্মা গান্ধীর চরকা আন্দোলনের উপলক্ষে লিখিত পুস্তক। ইহাতে চরকার গুণ ও প্রসার বিষয়ক কয়েকটি গান আছে[১]।"

মুন্সী ও মৌলবী আবদুল করিম কি অভিন্ন ব্যক্তি?

(গ) মৌলবী আবদুল করিম মরহুম : ইনি সিলেট শহরবাসী। রচিত গ্রন্থের নাম 'কড়িনামা' : "ইহাতে কড়ি অর্থাৎ ধন সম্পদশালী হইলে লোক চরিত্রের কিরূপ পরিবর্তন এবং অর্থহীন লোকের কিরূপ দুর্দশা ঘটে, নিপুণ চিত্রকরের মত কবি তাহার চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন।" 'হদ্‌ছিমছলা' "ধর্ম বিষয়ক পুস্তক।...ইহাতে মুসলমান সমাজের নিতান্ত জ্ঞাতব্য একশত ত্রিশ 'ফরজ'-এর বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।" 'সোনাভানের পুঁথি' গল্প পুস্তক, সিলেটি নাগরীতে লিপ্যন্তরিত। "ইহাতে আরবের আম্বাজ প্রদেশবাসী মোহাম্মদ হানিফা ও সোনাভান সুন্দরীর যুদ্ধ, সোনাভানবিবির পরাজয় ও বিবাহ কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে[২]।"

'আবদুল ওয়াহেদ মরহুম' নামেও একজন কবি পাই। ইনি শ্রীহট্ট নিবাসী, সিলেটী নাগরীতে ছাপা বইয়ের ব্যবসায়ী। রচিত গ্রন্থ 'বসন্ত ভ্রমরা': 'বাহার দানেশ' হইতে রাজপুত্র বাহরাম ও মন্ত্রিকন্যা জোহরার প্রেম-কাহিনী অবলম্বনে লিখিত[৩]।

(ঘ) মৌলবী শাহ আবদুল ওহাব চৌধুরী মরহুম : শ্রীহট্টের বরায়া পরগনার ফুলবাড়ী নিবাসী, আলেম ও সাধক ছিলেন। 'হাসর তারণ' "ধর্মবিষয়ক বর্ণনা ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বপূর্ণ গানযুক্ত পুস্তক। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শাহস মাহতাবউদ্দিন আহমদ, ওরফে জহুরুল হক চৌধুরীও একজন সাধক পুরুষ।"

১ শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৩৫০
২ ঐ
৩ ঐ

'ভবতারণ'—একখানা "ধর্ম ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ববহুল পুস্তক। নামেই উহার পরিচয়; তবে উহা মুদ্রিত হয় নাই[১]।"

(৬) মৌলবী সৈয়দ শাহ আবদুল কদির : শ্রীহট্টবাসী। গ্রন্থ : 'আহকামখরা': "মুসলমান সম্প্রদায়ের দৈনিক অনুষ্ঠেয় ধর্ম-ব্যবস্থা বিষয়ক সরল ও বৃহৎ পুস্তক। ...ব্যবস্থা শাস্ত্র ছাড়া ইহাতে ধর্মবিষয়ক অনেক কথা আছে। এই পুস্তকখানা আয়ত্ত করিলে দৈনন্দিন ধর্মকার্য সম্পর্কে কোন অভাব ঘটে না[২]।"

বর্তমান সঙ্কলনে যে 'আব্দুল' নামধেয় কবির তিনটি গান ধৃত হইয়াছে, স্বভাবতঃই তাঁহার পরিচয় উদ্ধার করা সহজ নহে। তিনটি গানের মধ্যে 'ফকির আব্দুল হুছন', 'দীন আব্দুল আলী'-ও পাইয়াছি।

ইরপান : 'ইরপান'-কে বিভিন্ন জন বিভিন্ন ভাবে উচ্চারণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁহার 'বাঙ্গালার বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন মুসলমান কবি' (দ্বি সং ১৯৬২) গ্রন্থের সংগ্রহ অংশে লিখিয়াছেন 'ইরফান' (পৃ ৪৮), কিন্তু কবি-পরিচয় অংশে লিখিয়াছেন 'ইরপান' (পৃ ১১০)। 'ইরপান সা'-র পরিচয় প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন, "ইনি কাছাড় জেলার 'উধারবন্ধ' পোষ্ট অফিসের অধীনস্থ 'লাঠি' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইঁহার রচিত ৩১টি গান-সম্বলিত 'মারীফতি উদাস বাউল' গ্রন্থ শিলচর প্রেসে মুদ্রিত হয়।" (পৃ ১১০-১১১)।

শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় 'ইরফান' নামীয় এক কবির উল্লেখ মিলিতেছে। তাঁহার পূরা নাম মুন্সী 'ইরফান আলী'। উক্ত পত্রিকায় প্রচারিত 'ইরফান আলী'র জীবনী ও রচিত গ্রন্থের নামের সহিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য মহাশয় প্রদত্ত কবি-পরিচয়ের স্বাভাবিক কারণেই কোনো প্রকার মিল নাই।

আমাদের মনে হয়,—'ইরফান'-ই কবির আসল নাম, বর্গের দ্বিতীয়বর্ণ প্রথম বর্ণে পরিণত হইয়া পরে উহা হইয়া যায় 'ইরপান'। আমাদের এই-প্রকার অনুমানের পশ্চাতে যুক্তি এই : মুহাম্মদ আব্দুল বারী তাঁহার লিখিত একটি প্রবন্ধে[৩] কবি ইরফানের চারিটি গান সঙ্কলিত করিয়াছেন। উহার

১ ঐ

২ ঐ

৩ পল্লীকবি মুন্সী ইরফান আলী : শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, মাঘ, ১৩৩৩

মধ্যে দ্বিতীয় গানটির প্রথম ছত্র এই : "দেখ মন পড়িল বাকী জায়—মনের খিরাজ বাকী রইল উশল নাই তৌজি চিঠায়।" এই গানটি আমাদের বর্ত্তমান সঙ্কলনেও আছে, সামান্য পরিবর্তিত আকারে (সং ২১)। ভণিতা কিন্তু আবদুল বারীর সঙ্কলনে 'অধীন ইরফান', আর আমাদের সঙ্কলনে 'অধীন ইরপান'। ইহা হইতেই বুঝিতেছি, 'ইরফান'ই 'ইরপান'। তাহা ছাড়া, আমাদের বর্ত্তমান সঙ্কলনে ইরপানের ভণিতায় বিশেষণ হিসাবে যেমন 'অধীন', 'নাকিছ' ইত্যাদি পাইয়াছি, মুহাম্মদ আব্দুল বারীর সংগৃহীত গানেও তাহা মিলিতেছে। যতীন্দ্র মোহন বাবুর সংগ্রহে কিন্তু 'ছাবাল সা ইরফান' এই ভণিতা মিলিতেছে। কাজেই যতীন্দ্র মোহন বাবুর ইরফান (বা ইরপান সা') এবং বর্ত্তমান সঙ্কলনের কবি 'ইরপান' হয়তো বা ভিন্ন ব্যক্তি।

মুন্সী ইরফান আলীর পরিচয় এই : "১২৫৩ সালে শ্রীহট্ট জেলার করিমগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত কসবা গ্রামে মুন্সী ইরফান আলী সাহেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মৌলবী রিফাত আলী সাহেব আরবী-ফারসী ও উর্দ্দু ভাষায় বেশ বুৎপন্ন ছিলেন। একমাত্র পুত্রকে মৌলবী সাহেব বিদ্যা-শিক্ষার্থ গ্রাম্য পাঠশালায় ভর্তি করিয়া দেন। সহপাঠীদের মধ্যে ইরফান আলী সর্বদাই শীর্ষস্থান অধিকার করিতেন। পাঠশালার পাঠ শেষ করিয়া বালক ইরফান আলী ৪।৫ বৎসর কাল উদাসীনের ন্যায় নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ান। গানের প্রতি তাঁহার একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। এই সময়ে তিনি "সিলেটী নাগরী" শিক্ষা করিয়া বহুসংখ্যক পল্লী গান অভ্যাস করেন।"

"যাহা হউক, কিশোর ইরফান আলী সঙ্গীত রসে আপনাকে ডুবাইয়া দিলেন। তাঁহার সুললিত কণ্ঠের রাগ ও বাউল গান যে শুনিত সেই মুগ্ধ হইয়া যাইত।... ১৪।১৫ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের বৎসরই তিনি আবার আরবী-ফারসী শিখিতে আরম্ভ করেন।..."

"মুন্সী সাহেব একজন কোমল হৃদয় ব্যক্তি ছিলেন।...মুন্সী ইরফান আলী সাহেব অত্যন্ত মিশুক ও সামাজিক লোক ছিলেন।..."

"...১৩৩৩ সালের মাঘ মাসে বুধবার দিবস মুন্সী সাহেব ইহলোক ত্যাগ করেন। বর্ত্তমানে তাঁহার দুইপুত্র জীবিত আছেন।"

"মুন্সী সাহেব অনেকগুলি গান ও কবিতা পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন।

তন্মধ্যে "মুফিদুল মু:মিনিন" (নাগরী অক্ষরে মুদ্রিত) পুস্তকখানাই প্রধান। উহা সবিশেষ প্রচলিত ও সমাদৃত হইয়াছে। উহাতে নামাজ রোজা প্রভৃতি ধর্ম সম্বন্ধীয় এবং আধ্যাত্মিক বহু সংখ্যক "রাগ" ও "বাউল" গান স্থান পাইয়াছে। এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলিও কম আদৃত হয় নাই। "রাহাত নামা" (বাঙলা অক্ষরে মুদ্রিত), "আখবারুল ঈমান" (নাগরী অক্ষরে মুদ্রিত), "ফয়জুল বেদাত" (নাগরী), "জঙ্গে রোম" (বাঙলা), "শাহজালালের তয়ারিখ" (বাঙলা)।"

"...ইহা ছাড়া ভট্ট কবিতার ন্যায় মুন্সী সাহেবের "মৌলভী মোহাম্মদ আলী", "১৩২৬ বাঙালার তুফানের কবিতা" (আপাই নামা) এবং "জারমনী প্যানা" (কচুরি পানা) নামক তিনখানা কবিতা পুস্তকও প্রচলিত আছে। শেষ বয়সে মুন্সী সাহেব উল্লিখিত পুস্তক বিক্রয়-লব্ধ অর্থ দ্বারাই সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ করিতেন[১]।..."

উম্মর (আলী): "ইনি শ্রীহট্ট জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত পরগনা 'বাদে কুমড়ি শাইলের' (চুড়খাই) 'খারাভরা' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইঁহার রচিত 'এস্কের বাগান' গ্রন্থ ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে শ্রীহট্ট ইস্‌লামিয়া প্রেসে মুদ্রিত হয়[২]।"

ইয়াকুব আব্দুল ওয়াহিদ: "ইনি শ্রীহট্ট জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত ঢাকাদক্ষিণ পরগনার অধিবাসী ছিলেন। ইঁহার রচিত ৪৬টি গান সম্বলিত 'তওকুলিয়া প্রেমের মিঠাই' ১৩৪২ বঙ্গাব্দে শ্রীহট্ট ইসলামিয়া প্রেসে মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থের একাধিক সঙ্গীতে রাধাকৃষ্ণ লীলার উল্লেখ আছে[৩]।"

ওহাব (ফকির): "ইনি চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত 'হাওলা' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত গ্রামের জনৈক ছাত্র মৌলবী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয়কে ওহাবের পদ সংগ্রহ করিয়া দেন। ব্রজসুন্দর সান্যাল-সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি,' চতুর্থ খণ্ডে ওহাবের দুইটি পদ মুদ্রিত হইয়াছে[৪]।"

নাছির : ইঁহার পরিচয় পাওয়া যায় নাই,—তবে ব্রজসুন্দর সান্যাল-

---

১ শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, মাঘ, ১৩৪৩ ; ঐ, শ্রাবণ, ১৩৫০

২ বাঙ্গালার বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন মুসলমান কবি (দ্বি সং ১৯৬২), পৃ ১১১

৩ ঐ, পৃ ১১১

৪ ঐ, পৃ ১১২

সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি,' তৃতীয় খণ্ডে ইঁহার দুইটি পদ ধৃত হইয়াছে। 'নাছির' ছাড়াও 'নাছির মহম্মদ' ও 'নশির মামুদ' নাম পাওয়া গিয়াছে এবং ব্রজসুন্দর সান্যাল মহাশয় তিন জনকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য মহাশয় তাহা স্বীকার করেন নাই[১]।

পাঞ্জশাহ : ডাক্তার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় ফকির পাঞ্জশাহের জীবনী ও গান সঙ্কলিত করিয়াছেন। বাঙলার বাউলগানের মধ্যে লালন ফকিরের পরই ফকির পাঞ্জশাহের নাম উল্লেখ্য। বাঙলা দেশের সর্বত্রই তাঁহার গান গীত হয়,—সর্বত্রই তাঁহার শিষ্য আছে। যশোহর জেলার শৈলকূপা গ্রামে ১২৫৮ সালের শ্রাবণ মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩২১ সালে ২৮শে শ্রাবণ ৬৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। ইঁহার পিতার নাম খাদেমালী খোন্দকার। বাল্যকাল হইতেই তিনি ইসলাম, সূফী ও বৈষ্ণব তত্ত্বাদি লইয়া আলোচনা করিতেন। যশোহর জেলার হরিশপুর গ্রামের হেরাজতুল্ল্যা খোন্দকার নামীয় একজন সূফী সাধুর নিকট ইনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। আজীবন ইনি সাধক জীবন যাপন করিয়াছেন[২]। 'ইস্কি ছাদেকী গহর' ইঁহার রচিত ও মুদ্রিত একটি গ্রন্থের নাম।

ভবানন্দ : কবি ভবানন্দকে লইয়া একদা শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় বিস্তৃত আলোচনা চলিয়াছিল বিভিন্ন সংখ্যায়[৩]। এই আলোচনায় যাঁহারা প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা হইলেন—অধ্যাপক পদ্মনাথ দেবশর্মা এবং মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন। ভবানন্দ নামের পূর্বে বিশেষণ হিসাবে 'দীন' শব্দটি ব্যবহার করিতেন। এই 'দীন'-কে 'দিন' ধরিয়া মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন ভবানন্দকে ইসলাম-সেবক বলিতে চাহিয়াছেন; অপর পক্ষে, অধ্যাপক পদ্মনাথ দেবশর্মা ভবানন্দকে আমরণ ব্রাহ্মণ বলিতে চাহেন। মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন্ ভবানন্দের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা এই : "ত্রিপুরা ষ্টেইটের ধর্মনগর মহকুমার কাছিমনগর মৌজায় তাঁহার সমাধি

১ ঐ, পৃ ১১৭

২ বাঙলার বাউল ও বাউলগান (১৩৬৪), পৃ ১৮৩-১৮৫

৩ শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, মাঘ, ১৩৪৩, পৃ ১২১; ঐ বৈশাখ, ১৩৪৪, পৃ ২১; ঐ কার্তিক, ১৩৪৪, পৃ ৭৮; ঐ মাঘ, ১৩৪৪, পৃ ১১৩; ঐ শ্রাবণ, ১৩৪৫, পৃ ২৩; ঐ কার্তিক, ১৩৪৫, পৃ ১৭; ঐ মাঘ, ১৩৪৫, পৃ ১; ঐ শ্রাবণ, ১৩৫০, পৃ ২৫

বর্ত্তমান আছে। দুই শতাধিক বৎসর পূর্বে ভবানন্দ দক্ষিণ শ্রীহট্টের লংলা পরগনার নর্তন মৌজায় এক কুলীন ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া হিন্দুশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন।...ভবানন্দ ৪০ বৎসর বয়সে ব্রহ্মচাল পরগনার কোনোও মৌজায় বিবাহ করিয়াছিলেন। ভবানন্দ ঠাকুর স্বৈণ লোক ছিলেন,...দীর্ঘ ৪০।৫০ বৎসর পর তিনি হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করিয়া গোলাপগঞ্জ বাজারে আসিয়া এক আশ্রম করিয়া বাস করিতে থাকেন। বৈষ্ণবমতে তাঁহার গুরু-দত্ত নাম ছিল 'রাজীবংশদাস'।...দলে দলে মুসলমান জনসাধারণ তাঁহার কাছে মুরিদ (শিষ্য) হইতে থাকেন। ঐ সময় হইতে তিনি "দিন্ ভবানন্দ শাহ" নামে পরিচিত হন ও নানা স্থানে বেড়াইতে থাকেন।" "তিনি যে সমস্ত আধ্যাত্মিক তত্ত্বপূর্ণ গান রচনা করিয়াছিলেন, তাহার সংগ্রহ পুস্তকের নাম "হরিবংশ"। শ্রীহট্ট সদর নিবাসী মুন্সী মাং আফজল সাহেব উহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানেও পুস্তকখানা প্রচলিত আছে।... সংগ্রাহকের নিবেদনে জানা যায় যে বাঙ্গালা ১১৫৬ সালে দীন ভবানন্দ এই গানগুলি রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে দেখা যায় যে অনুমান ১৮৭ বৎসর পূর্বে বা তৎপরেও ভবানন্দ জীবিত ছিলেন, পুস্তকখানা রাধাকৃষ্ণপ্রেমের রূপক আদর্শে রচিত।" শ্রীহট্ট হইতে ভবানন্দের গীতাবলীর যে সঙ্কলন মুন্সী আফজল সাহেব বাহির করেন, তাহা 'সিলেট নাগরী' হরফে ছাপা হয়, নাম "রাগ হরিবংশ"। ইহা দুই খণ্ডে বিভক্ত, মোট ২২২টি গান বা পদ তাহাতে মুদ্রিত হয়। শ্রীহট্টের মুসলমানগণই সেই সমস্ত গানের রক্ষক, শ্রোতা ও গায়ক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও পণ্ডিত সতীশচন্দ্র রায়, এম. এ-কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া ভবানন্দের 'হরিবংশ' একদা মুদ্রিত হয়। সতীশ বাবু ভবানন্দের জীবনী ও আবির্ভাব কাল সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন। তিনি 'হরিবংশে'র ভাষা আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে—ভবানন্দ ত্রিপুরা, পূর্বময়মনসিংহ অথবা পশ্চিম শ্রীহট্টের লোক হইবেন,—শ্রীহট্টের হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী[১]। 'শিবানন্দসুত'—ইহা হইতে জানা যায়—কবির পিতা 'শিবানন্দ'। 'হরিবংশে' কবির জন্মভূমি বা আবির্ভাব কাল সম্পর্কে কোনো

১ ১৩৩২ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় সতীশবাবুই লিখিয়াছিলেন যে, যেহেতু ভবানন্দের পদে পূর্বময়মনসিংহ ও কুমিল্লার আঞ্চলিক শব্দ আছে, সেই হেতু কবি ওই অঞ্চলেরই লোক হইবেন। খুবসম্ভব, তখনও তিনি শ্রীহট্ট হইতে কোনো পুথি পান নাই। পরে মত পাল্টাইয়াছিলেন।

উল্লেখ নাই। ব্রাহ্মণ বলিয়া অনুমিত হইলেও ভণিতা 'দীন' শব্দই আছে, দ্বিজ শব্দ পাওয়া যায় নাই বলিলেও চলে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-সঙ্কলিত 'হরিবংশে'র পঙ্‌ক্তি সংখ্যা ৮৭৫৩। ইহার মধ্যে মাত্র ৩টি দশেক আরবী-ফারসী শব্দ মিলিয়াছে। ভবানন্দ ইসলাম ধর্ম কবুল করিলে আরবী-ফারসী শব্দের সংখ্যা অধিকতর হইত বলিয়া তিনি অনুমান করেন। যে কয়খানি পুথি মিলাইয়া সতীশবাবু 'হরিবংশে'র পাঠ প্রস্তুত করেন, তাহার মধ্যে একটি পুথি শ্রীহট্ট জেলার বেতকান্দি হইতে পাওয়া। এই পুথির লিপিকাল ১০৯৬ সাল অর্থাৎ ১৬৮৯ খৃঃ। সতীশবাবু অনুমান করেন—মূল পুথি অন্ততঃ ইহার একশত বৎসর আগে লেখা, পদ্মনাথ দেবশর্মা মনে করেন, আরো একশত বৎসর আগে লেখা। সতীশবাবু এবং পদ্মনাথ বাবু দুই জনেই ভবানন্দকে হয় চৈতন্যদেবের সমসাময়িক নতুবা তাঁহার কিছু পূর্ববর্তী কালে ফেলিয়াছেন,—যেহেতু গ্রন্থমধ্যে ভবানন্দ শ্রীচৈতন্যদেবের বন্দনা করেন নাই।

'সিলেট নাগরী'তে ছাপা 'রাগ হরিবংশে' 'পয়ার' অর্থাৎ কবিতাংশ বাদ দিয়া কেবল গানগুলি গ্রথিত হইয়াছিল। 'রাগ হরিবংশে'র প্রথম খণ্ডে দীন ভবানন্দের ভণিতাযুক্ত ১৫০টি গানের মধ্যে মাত্র ৬৭টি সতীশবাবুর সঙ্কলনে পাওয়া যায়, অবশ্য একই গানের দুই গ্রন্থে ভিন্ন পাঠ রহিয়াছে। সতীশবাবুর 'হরিবংশে' গানের সংখ্যা ১৫০,— তাহার মধ্যে ২৬টি তিনি খাঁটি ভবানন্দের বলিয়া মনে করেন না। এই ২৬টির একটিও 'রাগ হরিবংশে' নাই।

ভেলা শা': ইঁহার পূরা নাম—হজরত শাহ্ ভেলা শাহ্ মরহুম। "ইনি বালাগঞ্জের নিকটবর্তী কোনও স্থানের অধিবাসী ছিলেন।" "শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের[১] উত্তরাংশে ভেলা শাহ নামক জনৈক সাধকের সামান্য বিবরণ আছে। ইনি সেই ব্যক্তি কিনা তাহা অনুসন্ধান যোগ্য। ইঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'খবর নিশান'— "ধর্ম ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ববিষয়ক বড়ো আকারের পুস্তক,...ইহাতে পয়ার ছন্দে ধর্মতত্ত্বমূলক বহু তথ্যের বর্ণনা ও অধ্যাত্মবাদ-মূলক বহু সংখ্যক গান আছে[২]।"

---

১ অচ্যুতচরণ চৌধুরী-তত্ত্বনিধি লিখিত

২ শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৩৫০। 'আল ইসলাহ,' সপ্তম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যার ৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শীতালং ফকির : শীতালং শাহ্ প্রৌঢ় বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া ফকিরী গ্রহণ করেন। করিমগঞ্জ মহকুমার অন্তঃপাতী 'ভাঙ্গার' নিকটবর্তী এক গ্রামের অধিবাসী ইনি। "ইঁহার রচিত আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ বহু সঙ্গীত শ্রীহট্ট অঞ্চলে বিশেষ প্রচলিত। ইঁহার রচিত প্রায় তিন শতাধিক গানের এক পাণ্ডুলিপি বর্তমানে 'শ্রীহট্ট মুসলিম সাহিত্যসংসদ গ্রন্থাগারে' রক্ষিত আছে" বলিয়া অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য মহাশয় জানাইতেছেন। শীতালং ফকির সম্পর্কে অন্যত্রও আলোচনা হইয়াছে[১]।

সদাই শা' (ফকির): "ইনি শ্রীহট্ট জেলার উত্তর শ্রীহট্ট মহকুমার অন্তর্গত 'বালাগঞ্জ' থানার লোক ছিলেন। ইঁহার একটি গান মোহাম্মদ আশরাফ্ হোসেন-সঙ্কলিত 'রাগ-মারিফত,' প্রথম ভাগ গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে[২]।"

সৈয়দ শা' নূর (শাহা নূর সৈয়দ) : ইঁহার পূরা নাম—হজরত সৈয়দ শাহ নূর মরহুম। "শাহ্ নূর হবিগঞ্জ মহকুমার জলালহাক নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পরিণত বয়সে ইসলাম প্রচার বা পীরি-মুরীদি ব্যপদেশে নানা স্থান ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে তিনি দক্ষিণ শ্রীহট্টের ইটা পরগনার "লামু" মৌজায় আসেন ও তথাকার অধিবাসী 'হাজির ঠাকুর' নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের এক কন্যা বিবাহক্রমে তথায় বাস করিতে থাকেন। মধ্যে একবার সুনামগঞ্জের সৈয়দ পাড়ায় কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন; তথায়ও তাঁহার একখানা বাড়ী আছে[৩]।"···

"শাহা নূর মৌলবী বাজারে সহরের সন্নিকটে কদমহাটা গ্রামে বহুদিন বাস করিয়াছিলেন। জালালহাকে এখনও তাঁহার কবর আছে[৪]।···

"যে যে ফকীরের কণ্ঠ-বীণার সুরতরঙ্গে শ্রীহট্টের নিজস্ব কথায় অধ্যাত্মবাদ ফুটিয়াছে, যাঁদের কথায় শ্রীহট্টের পল্লী ভাব-সাগরে সাঁতার দেয়, যাঁদের কাছে শ্রীহট্টের হিন্দু-মুসলমান সমভাবে মাথা নোয়ায়, তাঁদের মাঝে সৈয়দ শাহানূর শীর্ষ স্থানীয়।···শাহানূরের কাছে হিন্দু-মুসলমান বিভেদ ছিল না।··· তাঁহার পিতার নাম সৈয়দ নবু, মাতার নাম কলসী বিবি।···শাহানূরের

১ মুহম্মদ আব্দুল বারী লিখিত: মাসিক মোহাম্মদী, শ্রাবণ, ১৩৪২
২ বাঙ্গালার বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন মুসলমান কবি (দ্বি সং ১৯৬২) পৃ ১২৬
৩ শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, কার্তিক, ১৩৪৪, পৃ ৯৭
৪ ঐ, মাঘ, ১৩৪৪, পৃ ১২৭

দীক্ষাগুরু শাহা মঞ্জুর আলী এবং উপদেষ্টা চান্দ মিয়া।…শফী উল্লার ছেলে মাছু নামক শিষ্যকে শাহানুর পোষ্যপুত্র করিয়াছিলেন। ছয় বৎসর পর সে চলিয়া যাওয়ায় শাহানূর ব্যথিত হইয়াছিলেন।”…

“পীর সৈয়দ শাহানূর জন্মকবি ছিলেন। ইনি যে সকল গীত ও সারিগান (হাইড়) রচনা করিয়াছিলেন এখনও শ্রীহট্ট জেলার একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সেগুলি প্রাচীন গীতিরূপে লোক সমাজে প্রচলিত হইয়া রহিয়াছে

“…খোদা-প্রেমে বিভোর হইয়া তিনি যে সকল গান, সারিগান ও পয়ার রচনা করিয়াছিলেন তাহার সংগ্রহ গ্রন্থের নাম “নূর নছিয়ত”। হস্তলিখিত দেব নাগরী অক্ষরে লিখিত, প্রকাশিত হয় নাই। প্রকাশকের উপর পীরের অভিশাপ পড়িবে বলিয়া লোকের বিশ্বাস।”…

“বিষয়ের দিক দিয়া নূর নছিয়তকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম পরমাত্মার স্বরূপ ও সন্ধান, দ্বিতীয় দেহ এবং আত্মা, তৃতীয় লোকশিক্ষা।”…

“উত্তাল তরঙ্গময় দুই সমুদ্র আবেগ ভরে একে অন্যের মাঝে আছাড়িয়া পড়ে। কিন্তু, উভয়ের মধ্যস্থিত বরজখ (বিভেদ পরদা) অন্তর্হিত হয় না। ইসলামিক Mystic Theory-র মূল সূত্র বরজখ।

পাঁচজন বরজখ আছেন আপনার তন,
তনের মাঝে বরজখ আছৈন শুন দিয়া মন।
বরজখের মাঝে শুন এ তিন ভুবন।

* * *

বরজখের মাঝে শুন পাঁচ আইনির বিচার,
আল্লা নবীর খেলা-লীলা বরজখের মাঝার।

* * *

মুরশীদ বাতাইলে পাইবায় ছায়ার (বরজখের) মাঝে ফুল
এক জনের কল্লি হয় আর একজনের ফুল।

“গঙ্গা যমুনার মিলন হয়।…কিন্তু মূলতঃ এক হইয়া যায় না।…সিদ্ধি যত বড়ই হউক না কেন খোদা আর মানুষ এক হইয়া যায় না।[১]।”

১ শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, মাঘ, ১৩৪৪, পৃ ১২৩-১৩৬ ; ঐ বৈশাখ, ১৩৪৫, পৃ ৯-১৯

'সাত কন্যার বাখান' সৈয়দ শাহ্ নূরের অপর এক গ্রন্থ। ইহা ইসলামিয়া লাইব্রেরী (বন্দর বাজার, শ্রীহট্ট) কর্তৃক মুদ্রিত হইয়াছিল, মূল্য দেড় আনা মাত্র। নারী-চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া কবি এখানে নারীজাতিকে সাতটি স্তরে বিন্যস্ত করিয়াছেন এবং প্রতিটি স্তরের নাম দিয়াছেন। নামগুলি এইরূপ : পহেলা বয়ান হস্তনী কন্যার ; দুছুরা বয়ান শঙ্কুনী কন্যার ; তিছ্‌রা বয়ান নাগুনী কন্যার ; চউথা বয়ান কাঙ্কুনী কন্যার ; পাঁচওয়া বয়ান কিঙ্কুনী কন্যার ; ছটওয়া বয়ান চিন্তনী কন্যার ; সাতওয়া বয়ান পদ্মিনী কন্যার। এই শ্রেণীভাগ কিছুই নতুন নয়।

হাছন রাজা : 'হাছন রাজা' রূপে গানের ভণিতা পাইলেও আসলে কবির পদবী 'রজা' এবং পূরা পদবী 'রজা চৌধুরী'।—ইঁহাদের পূর্বপুরুষ দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ ছিলেন। "সুনাম গঞ্জের জমিদার সাধক-কবি দেওয়ান হাছন রজা চৌধুরী মহাশয় খুব সঙ্গীত প্রিয় লোক ছিলেন। তিনি শুধু গান-দ্বারা "হাছন উদাস" নামক বৃহৎ পুথি রচনা করিয়া ছাপাইয়াছিলেন। এখন উহা দুষ্প্রাপ্য[1]।" হাছন রজা যে শ্রীহট্ট জেলার সদর মহকুমার অন্তঃপাতী 'রামপাশা' গ্রামের অধিবাসী এবং সুনাম গঞ্জের অন্তর্গত 'লক্ষ্মণশ্রী' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, বর্তমান সঙ্কলন-গ্রন্থে ধৃত একটি গানে তাহার পরোক্ষ পরিচয় আছে,

হাছন রাজা মরিয়া গেলে
মাটির তলে বাসা—
কোথায় রইবা লখণ-ছিরি
রঙ্গের রামপাশা ॥—সং ১৫৭

হছন (মুন্সী হছন আলী) : "ইনি শ্রীহট্ট জেলার সদর মহকুমার 'জৈন্তা-পুরের' অন্তর্গত 'বিড়াখাই' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইঁহার রচিত ১৩টি গান-সম্বলিত 'প্রেমসতী ; ২য় খণ্ড' গ্রন্থ ১৩৪২ বঙ্গাব্দে শ্রীহট্ট ইসলামিয়া প্রেসে মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থের একাধিক সঙ্গীতে রাধাকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ আছে[2] ॥"

---

১ শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, কার্তিক, ১৩৪৫, পৃ ২৯

২ বাঙ্গালার বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন মুসলমান কবি (দ্বি সং : ১৯৬২), পৃ ১৩২

তৃতীয় অধ্যায়

॥ বিবিধ ভক্তিগীতি ॥

....১

আজিকার দিনে লোকসঙ্গীত অনেকখানিই ধর্ম-নিরপেক্ষ (Secular) হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু, চিরদিন এমন ছিল না। লোকসঙ্গীতের প্রাচীন-স্তরে এবং আজিকার দিনেও পৃথিবীর বহু অঞ্চলে ধর্মীয় লোকসঙ্গীত (Religious Folk Music)-ই লোকসঙ্গীতের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে প্রধানতম দিক ছিল এবং আছে।

আমাদের মনে হয়, 'ভক্তিগীতি' (Devotional Song) এবং 'ধর্মীয়গীতি' (Religious Folk Music)-র মধ্যে একটি মাত্রাগত প্রভেদ আছে। ধর্মীয় লোকসঙ্গীত একদিকে লোকসঙ্গীতের প্রাচীন দিক, অপর দিকে প্রাচীন ও অর্বাচীন, মার্জিত ও অমার্জিত মানুষের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলিকে (Rituals) বর্ণনা করিয়া গান[১]। ভক্তিগীতিগুলি ভক্ত ও সাধকের হৃদয়-নিঃসৃত বাণীধারা। ইহা কি মার্জিত কি অমার্জিত, উভয় সমাজেই অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের—অনুভূতিই ইহার সার কথা।

ভক্তিগীতিকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়: মার্জিত সমাজের ও অমার্জিত সমাজের। এই পার্থক্য ভাব-ভাষা-রচনারীতি ও সুরের। অমার্জিত লোকসমাজের ভক্তিগীতি আগে 'লোকসঙ্গীত,' পরে ভক্তিগীতি; উল্টা দিকে, মার্জিত সমাজের ভক্তিগীতি আগে মার্জিত মানুষের গান, পরে ভক্তি-গীতি। দৃষ্টান্ত দিয়া বলা যায়, বৈষ্ণব ও শাক্তপদাবলী, ঊনবিংশশতাব্দীর ব্রহ্মসঙ্গীত বা 'গীত বিতানে' রবীন্দ্রনাথের পূজার গানগুলি একদিকে থাকিলে বর্তমান সঙ্কলনের আলোচ্য গানগুলি তবে অপরদিকে থাকিবে।

ধর্মীয় লোকসঙ্গীত সাম্প্রদায়িক ও আনুষ্ঠানিক; একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের বিশেষ দেবতা বা দেবতাগণের উদ্দেশে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে তাহা গেয়। ভক্তিগীতিগুলি সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ এবং তাহা অনানুষ্ঠানিক। কিন্তু, উভয়ের

১ বর্তমান গ্রন্থের পরিশিষ্ট খ-তে 'শ্রীহট্টের মাঘব্রত' নিবন্ধে যে ছড়া-গানটি আছে, তাহাকে 'ধর্মীয় লোকসঙ্গীত' বলা যায়।

মধ্যে মিশ্রণ যে লক্ষ্য করা যায় না, তাহা নহে। 'বাউল' ও শ্রীহট্টের 'গোবিন্দ কীর্তনে'র গানগুলিই তাহার প্রমাণ।

'বাউল' গান একদিকে ধর্মীয়—যখন তাহাতে বাউলের Ritual-গুলি বর্ণিত হয়; আবার, উহাই ভক্তিগীতি হইয়া উঠে যখন তাহাতে নিবিড় রহস্যানুভূতি ও মিষ্টিকতার সুর প্রবাহিত হয়। রবীন্দ্রনাথও তো বাউল সুরে অনেক গান রচনা করিয়াছেন,—তবু তাহা Ritual গান নয়, ভক্তিরই গান (বলা দরকার, সেগুলি শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রসঙ্গীতই হইয়াছে)। বর্তমান সঙ্কলনের বাউল-ভাটিয়াল গানগুলিকেও ধর্মীয় ও ভক্তি—এই দুই দিক হইতে দেখা চলে। অনেকটা বৈষ্ণবপদাবলীর মতো: উহার যতোদূর গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসতত্ত্বের বিকাশ ততোদূর ধর্মীয়, বাকীটা ভক্তি। শ্রীহট্টের গোবিন্দকীর্তন গান যেখানে আনুষ্ঠানিক ভাবে গাওয়া হয়, সেখানে তাহা ধর্মীয়। কিন্তু উহার যে অংশে সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ আত্মনিবেদনের সুর, তাহাই খাঁটি ভক্তিগীতি। ইস্‌লামী ও সুফী ভক্তিসঙ্গীতগুলি সম্পর্কেও এই এক মন্তব্য করিতে পারা যায়। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মর্তব্য এই, ধর্মীয়সঙ্গীতের সহিত ভক্তিসঙ্গীতের এই প্রকার মিশ্রণের সম্ভাবনা অমার্জিত সমাজেই অধিক।

ধর্মীয় লোক-সঙ্গীতের উৎস হইল—প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রোগ-মহামারী এবং বিবিধ আধিদৈবিক ও বিচিত্র আধিভৌতিক বিপদ হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য মানুষের স্বার্থময় প্রবৃত্তি। ভয় ও বিস্ময়বোধই তখন ছিল ইহার একমাত্র প্রেরণা। এই স্তরের গানগুলিতে তাই দেবতা, উপদেবতা ও অপ-দেবতার অলৌকিক শক্তির প্রতি ভয়মিশ্রিত সম্ভ্রম, তাঁহাদের প্রতি স্বার্থময় প্রশংসা এবং জীবনে বিপদ ও মৃত্যু হইতে মুক্ত হইবার বাসনা ব্যক্ত হইয়াছে। অনন্তর সেই দেবতার সৃষ্টি-রহস্যকে বুঝিবার জন্য আসিল কিছু কৌতূহল ও রহস্য বোধ। তখন বিশ্বসৃষ্টি-তত্ত্ব ও পৌরাণিক ব্যাপারের পত্তন হইল এবং তাহাই তখন গানের বিষয় হইল।

পাশ্চাত্ত্য গবেষকদের মতে, ধর্ম-নিরপেক্ষ সঙ্গীত অপেক্ষা ধর্ম-ঘটিত সঙ্গীতই আদিম মানুষের আদিম গান। ইহার কারণ, দেবতাকে সেখানে শুধুই অধ্যাত্ম ও অদৃশ্য লোকের শক্তিময় কর্তা হিসাবে স্বীকার করা হয় নাই; তিনি কৃষি, শিকার, ভ্রমণ, যুদ্ধ এবং জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের দেবতা হিসাবেও

কল্পিত হইয়াছেন। পশু-পাখী প্রভৃতি ইতর প্রাণীর উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, নদী-বৃক্ষ-পর্বত-প্রস্তর হইতে বিবিধ সাহায্য আদায় করিবার জন্য, গ্রহ-উপগ্রহ-তারকার কুফল এড়াইবার জন্য—ধর্মীয় লোকসঙ্গীত রচিত, গীত ও শ্রুত হইয়া থাকে।

এই প্রসঙ্গে সুরের কথাটিও স্মরণ করিবার মতো। মার্জিত সমাজের ভক্তিগীতি শান্ত-সংযত-ধীর ভঙ্গীতে গীত হয়; তাহা একক ও দ্বৈত বা সমবেত সবই হইতে পারে। সেগানের মধ্যে মাধুর্য ও সূক্ষ্ম সুরবোধের পরিচয় মিলে। অমার্জিত সমাজের ভক্তিগীতি ও ধর্মগীতি দুইই আজ লোক-সঙ্গীত রূপে সকল বৈশিষ্ট্যকে ফুটাইয়া তুলিয়াও আদিম মানুষের ধর্মসঙ্গীতের সুরের মতো নাই। ইহাও একক, দ্বৈত বা সমবেত হয়। আমাদের আলোচ্য গান-গুলি এই পর্যায়ের।

কিন্তু, আদিম মানুষের ধর্মসঙ্গীত যেমন রুক্ষ তেমনি উচ্চগ্রামের। তাহারা মনে করে, যে দেবতা চন্দ্র-সূর্য-মেঘ-বৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা ধরেন, তিনি নিশ্চয়ই প্রচণ্ড শক্তিশালী। অতএব, সেই প্রচণ্ডতাকে ফোটাইবার জন্যে সুর ও বাদ্যের মধ্যেও তাহা প্রতিফলিত করা হয়। অপর দিকে, তাঁহার নিবাস জগৎ হইতে বহুউচ্চে, বহুদূরে, বহুনীচে কল্পিত হওয়ায়, তাঁহার কর্ণে পৌঁছাইবার জন্য সুরকে যতোদূর সম্ভব উচ্চগ্রামে তুলিয়া ধরা হয়। রচনাভঙ্গীর মধ্যেও বিশেষত্ব থাকে। অসীম শক্তিশালী নিষ্ঠুর দেবতা ক্ষুদ্র মানুষের প্রার্থনায় হয়তো কর্ণপাত করিবেন না,—এইরূপ ধারণা থাকায় তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা, অনুনয় যেমন ব্যক্ত হয়, তেমনি একই কথা বারবার বলিয়া তাঁহাকে মানুষের প্রার্থনা সম্পর্কে সচেতন ও অবহিত করিবার চেষ্টা লক্ষিত হয়[১]।

সমাজের তিনটি স্তরকে মনে রাখিলে ভক্তি ও ধর্মীয় লোকসঙ্গীত সম্পর্কে আমাদের মন্তব্যগুলিকে বোঝা সহজ হইবে। আদিম, অমার্জিত ও মার্জিত —সমাজের এই তিনটি স্তর। আমাদের বর্তমান সঙ্কলনের গানগুলি মধ্য স্তরের—অমার্জিত সমাজের। কাজেই ভাব, সুর ও ভঙ্গী—সর্বদিক দিয়াই ইহা আদিম ও মার্জিত সমাজের মাঝামাঝি স্থানের।

১ *Maria Leach (Editor)* : **Standard Dictionary of Folk lore Mythology and Legend,** *pp. 931-932.*

দেবতাকে প্রশংসা করিয়া স্তোত্র রচনার প্রবণতা মার্জিত সমাজেও লক্ষিত হইয়া থাকে। এই ধরণের ভক্তি-কবিতা দিয়া গীতিকবিতা ও নীতি-কবিতাও রচিত হইতে পারে। অমার্জিত সমাজের স্তোত্রকবিতা ও গান-গুলির মধ্যে অনেক সময় হেঁয়ালী লক্ষ্য করা যায় —ইহা রচনাভঙ্গীর এক বিশেষত্ব। আধুনিক যুগের ধর্ম ও ভক্তিসঙ্গীতে আনুষ্ঠানিকতা যেমন কমিয়াছে, আবেগ, উন্মাদনা এবং অনুভূতির সূক্ষ্মতা ও নিবিড়তা তেমনি বাড়িয়াছে॥

....২

'প্রার্থনা ও আত্মনিবেদন'[১] গুচ্ছে ধৃত গানগুলির মধ্য দিয়া গায়ক-রচয়িতার যে মনোভাবটিকে পাই, তাহা এই শিরোনামের মাধ্যমেই ব্যক্ত হইয়াছে। ভগবানের ঐশ্বর্য ও মহিমাকে সর্বত্র অনুভব করিয়া কবিগণ মোহ মুক্ত হইতে চাহিয়াছেন এবং দীন ভাবে আপনাকে শ্রীভগবানের পদপ্রান্তে নিবেদিত করিয়া দিতে চাহিয়াছেন। এই গীতিগুচ্ছের মধ্যে (সং ১ হইতে সং ১৭ পর্যন্ত) আমরা মোটামুটি ভাবে এই কয়টি ধারার সন্ধান পাই :

(ক) ভগবান কোনো সাম্প্রদায়িক দেবতা নহেন, তিনি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের। তাই মুসলমান কবি 'ঠাকুর জগন্নাথ'-এর শরণ লইয়াছেন (সং ১)।

(খ) ঈশ্বর পরমকারুণিক, সর্বশক্তিমান্‌, সর্বব্যাপী। তাঁহাকে 'দয়াল বন্ধু' (সং ১), 'দয়াল হরি' (সং ২), 'দয়াময় হরি' (সং ৫), 'দীননাথ' (সং ৮) বলা হইয়াছে।

(গ) ভগবানের উপর ঐশ্বর্যের ভাব আরোপিত হইয়াছে। এইজন্য কবিগণ তাঁহাকে 'বিপদ-ভঞ্জন হরি' (সং ৬) বলিয়াছেন। 'ওই নাম জপে হরি-ত্রিপুরারি শমনকে জয় কইরাছে' (সং ১২)। ঐশ্বর্যগুণান্বিত বলিয়াই ভক্ত ভগবানকে দাস্য ভাবে ভজনা করিয়াছেন : 'থাকে যেন তোমার চরণে দাসত্ব' (সং ৫)।

১ এই নামটি আমাদের দেওয়া। শ্রীহট্টে ইহা 'নাম কীর্তন' বা 'গোবিন্দ কীর্তন' নামেই পরিচিত। ভাবের দিক ধরিয়া আমরা এই প্রকার নাম দিয়াছি।

(ঘ) ঈশ্বরকে কেবল 'হরি', 'দয়াল', 'দীননাথ' প্রভৃতি নামই দেওয়া হয় নাই, তাঁহাকে স-রূপ বলিয়াও কল্পনা করিয়া ভক্ত তাঁহার দর্শন-প্রার্থী হইয়াছেন : 'নয়ান ফিরাও, রূপ দেখি' (সং ১) ; 'বাঁচাও দেখা দিয়া' (সং ৩) ; 'এসে দাঁড়াও হে ত্রিভঙ্গ বেশে' (সং ৪)।

(ঙ) রচয়িতার মনের গ্লানি, ক্ষোভ, খেদ, নৈরাশ্য এবং মোহান্ধ হইয়া থাকিবার জন্য আত্মধিক্কার, অন্তিম বিচারে যমের ভয়।

আসিলে শমন, করিবে বন্ধন
আপনার বলে টেনে নিবে।
ভাই-বন্ধু যারা—পলাইবে তারা,
কেহ নাই কাছে রবে ॥—সং ৬

(চ) পরপারের জন্য কামনা, ইহ জাগতিক ধনসম্পদের প্রতি অনাস্থা। 'হরি দিন তো গেল, সাঞ্জা হল, পার করো আমারে' (সং ১১) ; 'হয় রে, পারইতাম পারইতাম করি দিন তো যায় মোর গইয়া রে' (সং ১৩)।

(ছ) কাছে টানিয়া লইলেন না বলিয়া ঈশ্বরের প্রতি অভিমান : 'হাতে কড়ি আছে যার, হরি, তারে করো পার' (সং ১১) ; 'পয়সার আশায় ভালোবাসা বাসে পরস্পরে' (সং ১৭)।

(জ) অনুভূতির নিবিড়তায় অশ্রু মোচন : 'দিবা নিশি আমার ঝুরে দুটি আঁখি' (সং ৫)।

(ঝ) ঈশ্বরের নাম-গান করা এবং সেই নামের মাধ্যমেই তাঁহাকে পাইতে চাওয়া : 'মুখে হরেকৃষ্ণ বলো একবার' (সং ৬) ; 'বল্ রে বল্, হরি বল্—বদন ভইরে' (সং ৭) ; 'দিবা-নিশি মুখে বলো হরি-হরি,' কেননা, 'নামে ভক্তি, নামে মুক্তি—নামে পুরে মন-বাসনা' (সং ৮) ; 'হরির নাম লও মন রে,' কারণ, 'ওই নাম এমন মধুর-মিঠা' (সং ৯) ; 'হরির নাম বিনে গতি নাইরে—প্রেম-স্বরে ডাইকো মন তাঁরে' (সং ১০) ; 'হরি হইতে হরিনামে অধিক মাহাত্ম্য' (সং ১২)।

(ঞ) নিতাই-প্রসঙ্গ। 'অতি যতন কইরে পরম রতন দয়াল নিতাই আইনাছে,' (সং ১২) ; 'হরি-নামের মালা নিতাই দিল আমার গলে' (সং ১৩)।

হিন্দু-মুসলমান সকলেই এই ধরনের গান রচনা করিয়াছেন,—সর্বপ্রকার

সাম্প্রদায়িকতাকে দূরে ঠেলিয়া। রূপকের মধ্যে নৌকা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা খুব ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সকল গানের সাহিত্যিক মূল্য খুঁজিতে যাওয়া বৃথা। ভক্তের মন ও গায়কের কণ্ঠ মিলিয়া যাহা হৃদয়-বেদ্য হয়, সাধারণ ভাবে পড়িলে তাহার মধ্যে রস পাইব কেমন করিয়া।

'প্রার্থনা ও আত্ম নিবেদন' পর্যায়ের গানগুলি আসলে 'গোবিন্দ-কীর্তন' বা 'নামকীর্তন'। এই 'গোবিন্দ-কীর্তন' শ্রীহট্টের ভাব ও ধর্মজীবনের একটি বিশিষ্ট দিক। কিন্তু ইহাতে মধুর রসের বিকাশ হয় নাই, হইয়াছে ঐশ্বর্যময় শ্রীহরির। 'হরি' এখানে ঈশ্বরের নামান্তর মাত্র—বৈষ্ণবের কৃষ্ণ নহেন। 'গোবিন্দকীর্তন'-এর পরিচয় এবং উহার সহিত শ্রীহট্টবাসীর মানসিক যোগ সম্পর্কে বর্তমান গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

'গোবিন্দ-কীর্তন'-এর গানগুলির সহিত নাচা হয়। কীর্তন সাধারণতঃ তিন প্রকারের : নগর কীর্তন, গোবিন্দ কীর্তন (শ্রীহট্ট অঞ্চলের) এবং পালা বা লীলা কীর্তন। গোবিন্দকীর্তনের মধ্যে যে নৃত্য লক্ষ্য করা যায়, তাহার সহিত নগর সঙ্কীর্তনেরই মিল রহিয়াছে। পালা কীর্তনের মধ্যে যে কোমল ও মনোরম আবেশ জড়ানো আছে, তাহার সহিত উদ্দণ্ড নৃত্য খাপ খাইবে না বলিয়াই হয়তো আখরের ভূমিকা আনিয়া উহার প্রকোপকে সঙ্কুচিত করা হইয়াছে। লীলাকীর্তনের নৃত্য-গীতের ভঙ্গীও তাই মৃদু।

গোবিন্দকীর্তন বা নামকীর্তন মূলতঃ শ্রীভগবানের জয়গীতি। ঐশ্বর্য স্বরূপ সগুণ ভগবানের নাম-গীতির মধ্যেও তাই সমবেত সাড়ম্বর গীতি ও নৃত্যোচ্ছ্বাস ধ্বনিত হইয়াছে।

এই গোবিন্দকীর্তনের নৃত্যরূপের মধ্যেই লোকনৃত্য রূপে ইহার বৈশিষ্ট্য লুকাইয়া আছে। এক হিসাবে দেখিলে ইহার মধ্যে গণজীবন ও গণতন্ত্রের স্বরূপকেও অনুভব করা যাইবে[১]। ধনী-নির্ধন-শিক্ষিত-অশিক্ষিতের একত্রে নৃত্য-গীত-বাদ্য, সকলের একত্রে আত্মশোধন ও আত্মবোধন কামনা, শ্রীভগবানের চরণতলে জীবনকে পুষ্পরূপে ঢালিয়া দিবার নিবিড়তম আকূতি, পুরোহিতের মাধ্যমে দেবতাকে আহ্বান না জানাইয়া সরাসরি আহ্বান এবং পরিশেষে ধূলিতে গড়াগড়ি,—এ সবই যেন এক শ্রেণীহীন গণতান্ত্রিক

১ *Gurusaday Dutt* : The Folk Dances of Bengal (1954). *pp. 75-79*

জীবনকে নির্দেশ করে। আরাধনার চরমতম মুহূর্তে উচ্চনীচ সকলেই যেখানে ভেদ ভুলিয়া দেবতার "চরণ ধূলায় ধূলায় ধূসর" হইয়া যায়, সেখানে মানুষ রূপে চিরকালের সত্য পরিচয়টাই কেবল জাগিয়া থাকে।

'প্রার্থনা ও আত্মনিবেদন' পর্যায়ের গানগুলির মধ্যে কয়েকটি গানের সুর সম্পর্কে নির্দেশ পাওয়া গিয়াছে। যেমন, 'ঝুমুর' ও 'মালসীকীর্তন' (ইহা কিন্তু গোবিন্দকীর্তনের অঙ্গীভূত নহে) : পরবর্তী পরিচ্ছেদে 'ঝুমুর' ও 'মালসী কীর্তনে'-র পরিচয় গ্রথিত হইল ॥

....৩

'ঝুমুর' আসলে সাঁওতালী গান বলিয়া সাধারণতঃ অনুমিত হইয়া থাকে। হয়তো সাঁওতালদের মধ্যে এই গানের ব্যাপক প্রচার লক্ষ্য করিয়াই এই প্রকার অনুমান করা হইয়াছে। বাঙলা দেশের সীমান্ত অঞ্চলে—বীরভূম-বাঁকুড়া-মেদিনীপুর এবং মানভূম-সিংভূম-ধলভূম অঞ্চলের আদেল বাসিন্দাদের জীবনে এই গান এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লইয়া থাকে।

সংস্কৃতে 'ঝুমরি' নামে এক শৃঙ্গার-রসপ্রধান রাগিণীর নাম মিলে। হিন্দীতে পাওয়া যায় 'ঝুমর'। যোগেশচন্দ্র রায়-বিদ্যানিধি মহাশয় অনুমান করিয়াছেন[১]—সংস্কৃত 'ঘূর্ণ' ধাতু হইতে 'ঝমরি' বা 'ঝুমর' আসিয়া থাকিবে। এই ভাবে বিদ্যানিধি মহাশয় ইহার অর্থ করিয়াছেন, "নিম্নশ্রেণীর নারী দ্বারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া অশ্লীল নৃত্য ও গীত।"

স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের মন্তব্য এই : "The expression *Jhumur* is a generic term applied to dances or songs which do not fall under any specific class but are of a miscellaneous character, particularly with erotic association.

"Thus a *Jhumur* song may be defined as a miscellaneous song of an erotic character and a *Jhumur* dance as a miscellaneous dance. The name *Jhumur* may have originated from brass anklet bells making a 'Jhum, Jhum' sound on dancers' feet."[২]

জীবনের বিচিত্র দিক ও ব্যাপার ঝুমুর গানের বিষয়-বস্তু হইতে পারে,

১ 'বাঙ্গালাভাষা' অভিধান, দ্বিতীয় ভাগ

২ *Gurusaday Dutt* : The Folk Dances of Bengal (1954), *p 43*

তবে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাই ইহার প্রধান বিষয়। "রাধাকৃষ্ণের প্রণয়গীতই ঝুমুরের প্রধান বিষয় কিন্তু উহা সাধারণতঃ রুচি বিগর্হিত ভাষা ও ভঙ্গীতে গাওয়া হইয়া থাকে। ঝুমুরে পুরুষেরা নৃত্যের সহিত মাদল ও বাঁশী বাজায় আর স্ত্রীলোকেরা দলবদ্ধভাবে নৃত্যের সহিত গান গাহিয়া থাকে[১]।"

ঝুমুর গানের রূপ পশ্চিমবঙ্গের কোনো-কোনো গানে প্রভাব ফেলিয়াছে। ফলে, ঝুমুর গানের অনেক প্রকার ভেদ ঘটিয়াছে,—সেগুলিকেও ঝুমুর গান বলা চলিতে পারে। এই বিবিধ ঝুমুর গানগুলির কোনো-কোনোটির মধ্যে সুরের নক্সা বিস্তৃত। খাঁটি সাঁওতালী ঝুমুর দুই, তিন বা চারিটি স্বরের মধ্যেই শেষ; কিন্তু অনেক ঝুমুর আছে যাহাতে সাত স্বর এবং বহু প্রকারের অলঙ্কার প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

সুরের দিক দিয়া ঝুমুর গান প্রাণোচ্ছল এবং তালের দিক দিয়া ইহা কাহারবা তালের সগোত্র। ঝুমুরের স্বর প্রয়োগে কি সুর রচনায় এক স্বর হইতে দূরবর্তী আর এক স্বরে হঠাৎ যাওয়ার ফলে সুরের মধ্যে এই গতিচ্ছলতা আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

বাঙলার লোকনৃত্যগুলিকে স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্ত মহাশয় কয়েকটি উৎস ও প্রেরণার দিক হইতে ভাগ করিয়াছেন। তাঁহার মতে—ঝুমুরের মধ্যে ক্রীড়া প্রবৃত্তি (Play Motive)টই প্রধান। ঝুমুর নৃত্য একক, দ্বৈত এবং সমবেত তিন প্রকারেরই হইতে পারে; নারী ছাড়া পুরুষেরাও ঝুমুর নাচ নাচিতে ও গান গাহিতে পারে। একক ঝুমুর নাচ বাগদি-বাউরী-ডোম মেয়েরা ঢোল-মাদলের তালের সহিত নাচিয়া থাকে। এই নাচের মধ্যে 'তাণ্ডব-প্রবৃত্তি'-ই মুখ্য; হাত-পায়ের অবাধ সঞ্চালন এবং দেহের দুলুনি ইহার বৈশিষ্ট্য। দ্বৈত ঝুমুর সাধারণতঃ দুইজন মেয়ে ঢোলের তালের সহিত নাচে। দাঁড়াইয়া, উবু হইয়া বসিয়া, ঝুঁকিয়া দেহের সহিত বিভিন্ন অঙ্গগুলি সঞ্চালিত করিয়া এই নাচ নাচা হয়।

সমবেত ঝুমুর নাচ সম্পর্কে দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন, "when applied to the group dance of the category of folk dances, the term *Jhumur* is applicable only to the *Kora Jhumur* dance, which is

১ ৺ক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় : সঙ্গীত দর্শিকা (প্রথম খণ্ড ভূ সং ১৩৬৯), পৃ ২২৯

performed by women dancers of the Korā caste, forming into several single rows with the arms and hands of dancers in each row interlaced and clasped together to form a chain. The shoulders of the dancers touch each other so as to form a closely knit chain, symbolising a close tribal solidarity." দার্জিলিঙের মোঙ্গলীয় মেয়েরাও ঝুমুর নাচে, তবে তাহাদের ঝুমুরের সহিত কোরাদের ঝুমুরের তফাৎ আছে।

কিন্তু শ্রীহট্ট জেলার ঝুমুর গান ও নাচ সম্পর্কে দত্ত মহাশয় কোনো মন্তব্য করেন নাই। তাঁহার সংগ্রহের মধ্যেই যে ভক্তিমূলক ঝুমুর গান ছিল, তাহা তিনি বিস্মৃত হইয়াছেন। বর্তমান সঙ্কলনের ৫, ৬, ৭, ৮, ১১, ১২, ৮৩, ৮৪ এবং ২১৮ সংখ্যক গানগুলি ঝুমুর গান। এই গানগুলির বিষয়-বস্তু মধুর রসের রসিক-চূড়ামণি লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ নহেন ; বিপদ-ভঞ্জন, দুঃখহরণ, দয়াময়, ঐশ্বর্যগুণান্বিত শ্রীহরি, কিংবা দেহতত্ত্ব। ইহা শৃঙ্গাররসাত্মক নহে, খাঁটি ভক্তি-রসের গান। অশ্লীলতার প্রশ্ন এখানে অবান্তর।

তালের দিক দিয়াও ইহা কাহারবা নহে—একতাল। এইসব বিবেচনা করিয়া আমাদের মনে হয়,—বাঙলা দেশের পশ্চিম সীমান্তে যাহা ঝুমুর নামে চলিয়া থাকে, পূর্বসীমান্তে তাহা নামের দিক দিয়া এক হইলেও বিষয় ও তালের দিক দিয়া এক নহে। রাধাকৃষ্ণ লীলার মধুর রসের দিকটা এখানে ঐশ্বর্যময় হইয়া উঠায় ইহা সাধারণ ভক্তি-গীতিতে পর্যবসিত হইয়াছে এবং ভক্তিমূলকতা শেষে দেহতত্ত্বেও সঞ্চারিত হইয়াছে। ঝুমুরের মধ্যে নৃত্যের দিকটাই প্রধান। মনে হয়, কৃষ্ণ ও গোবিন্দকে স্মরণ-মনন-কীর্তনের উপলক্ষে যে নাচ,—তাহাই সর্বত্র ঝুমুর নামে খ্যাত হইয়াছিল। নতুবা পশ্চিম ও পূর্ব সীমান্তের 'ঝুমুর'-এর মধ্যে কোনো সম্পর্ক-সূত্র স্থাপন করা যায় না॥

....৪

'মালশ্রী' একটি রাগের নাম। এই 'মালশ্রী' হইতেই 'মাল্‌সী' আসিয়াছে, যেমন আসিয়াছে 'ধানশ্রী' হইতে 'ধানসী'। প্রাচীন পুস্তকাদিতে 'মালশ্রী' এবং 'মালসী' দুইই পাওয়া যায়। ইহা সায়াহ্নকালে গেয়।

'সঙ্গীত দামোদর'-এ লিখিত হইয়াছে : "শক্রোত্থানং সমারভ্য যাবদ্দুর্গা-

মহোৎসবম্‌”— শক্রোত্থানের সময় হইতে দুর্গাপূজা পর্যন্ত সময়টিই এই রাগের পক্ষে উপযোগী।

শক্রোত্থান বা ইন্দ্রধ্বজ প্রাচীন বাঙলাদেশে এক বিশেষ উৎসব বলিয়া পরিগণিত হইত। তখনকার দিনে দুর্গাপূজাও এতখানি ব্যাপকতা লাভ করে নাই। কাজেই এই উৎসব তখন একটি বড়ো উৎসবই ছিল। এখন যে সময়ে রাধাষ্টমীর ব্রত উদ্‌যাপন করা হয়, সেই সময়টাই হইল শক্রোত্থানের সময়। কালে-কালে সেই উৎসবের গুরুত্ব মন্দীভূত হইয়া আসিলে দুর্গোৎসব প্রাধান্য পায় বলিয়া অনুমান করা যায়।

দুর্গাপূজার সময় বাঙলা দেশে ‘আগমনী’ ও ‘বিজয়া’ গান গীত হইয়া থাকে। ইহা ‘উমাসঙ্গীত’নামে পরিচিত। উমাই শ্যামা বলিয়া ‘শ্যামাসঙ্গীত’-ও শাক্ত পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। উমাসঙ্গীত ও শ্যামাসঙ্গীত মিলিয়াই শাক্ত পদাবলী।

এই ‘আগমনী’ ও ‘বিজয়া’ গানই পূর্ববঙ্গে ‘মালসী গান’ বা ‘মালসী জাগের গান’ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উমা ও শ্যামা এক বলিয়া শ্যামা-সঙ্গীতও ‘মালসী’ নামে পরিচিত হইয়াছে। ডাক্তার শ্রীসুকুমার সেন মহাশয় লিখিয়াছেন, “দেবী বিষয়ক গান “মালসী” নামে প্রসিদ্ধ। জয়নারায়ণ শিব বিষয়ক গানকে “মায়ূর” বলিয়াছেন। দুটি নামই কি মূলত রাগিণীর নাম—মালবশ্রী ও মায়ূর—হইতে আসিয়াছে? হয়তো এই ধরনের গান গোড়ায় প্রধানত এই দুই রাগিণীতেই গাওয়া হইত[১]।” “মালসী গান রচয়িতাদের মধ্যে স্ত্রীলোক এবং মুসলমানও ছিলেন[২]।” দেবী বিষয়ক মালসীগান অতঃপর ব্যাপকতা লাভ করিয়া সম্বৎসরে গীত যে কোনো ভক্তি-গীতি বুঝাইতেই ব্যবহৃত হইতে থাকে। সাধারণভাবে এই শ্রেণীর ভক্তিগীতি ‘মালসী কীর্তন’ নামে অভিহিত হয়[৩]।

বর্তমান সংগ্রহের ১৪ ও ১৫ সংখ্যক গান দুইটি মালসী কীর্তনের উদাহরণ। ইহার দুইটিতেই আনন্দময়ী ভগবতী ও মায়ের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু

১ ডাক্তার শ্রীসুকুমার সেন: বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১৯৪৮), পৃ ৯৬৫
২ ঐ, পৃ ৯৬৮
৩ ‘মালসী’ গান সম্পর্কে স্বর্গীয় ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় অন্য ভাবে আলোচনা করিয়াছেন: বাঙলার সাধনা (বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ, ফাল্গুন, ১৩৬০), পৃ৩৩-৩৯

'আগমনী' বা 'বিজয়া'-র কোনো প্রসঙ্গই ইহাতে নাই। গান দুইটি সম্বৎসরে গীত হইবার জন্য নির্বিশেষ ও অনানুষ্ঠানিক ভক্তিগীতি মাত্র। মালসী গানের বিবর্তন ধারার ইহা আধুনিকতম স্তর[১] ॥

....৫

'মনঃশিক্ষা' এই কথাটি হইতে স্পষ্টই বোঝা যায়—গায়ক, রচয়িতা এবং শ্রোতার মনকে ইষ্টের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া তুলিবার জন্যই ইহা রচিত, গীত এবং শ্রুত হইয়া থাকে। ইহা যেন গায়ক বা রচয়িতার আপন মনের প্রতি আপন মনের উক্তি। বস্তু জগতের বিচিত্র বন্ধন এবং আবিলতায় আমাদের মন ভক্তিময় নিষ্কাম জগৎ হইতে নিরন্তর সরিয়া আসিতেছে। মনঃশিক্ষার গান যেন সেই সরিয়া আসা মনকে ভগবৎ প্রসঙ্গ স্মরণ করাইয়া দেওয়া। মনকে এই গানের মাধ্যমে এই রূপে 'শিক্ষা' দেওয়া হয় বলিয়া এই ধারার গানকে বলা হয় 'মনঃশিক্ষা' গান[২]।"

মন ভবসাগরে বাণিজ্যের ভরা ভাসাইয়া দিশেহারা হইয়াছে অথবা পৃথিবীতে ভক্তির বাণিজ্য করিতে আসিয়া মোহে মজিয়া পথ ভুলিয়াছে। সেই মোহে-মজা মনকে বৈরাগ্যের বাণী শোনাইয়া আবার ভক্তির পথে টানিয়া লইবার জন্যই এই ধারার গান রচনা করা হইয়াছে।

মনঃশিক্ষার গানগুলির মধ্যে রচয়িতা যে 'মন'কে উদ্দেশ করিয়া অন্তরের আকূতি অঞ্জলিরূপে নিবেদিত করিয়াছেন, সে 'মন' বাহিরের বা অপরের নহে, কবিরই নিজের। কবিগণ বিশ্বাস করেন, আপনার অন্তরের মধ্যেই একজন 'রসিক' ও 'অচিন' মানুষ আছেন—যিনি আবিলতায় ও বিপদে মানুষকে উদ্ধার করিয়া আলোকের পথে নির্ভুল নির্দেশে চালিত করিবেন। দেহের রূপগত বাঁধনের মধ্যেই 'অরূপ' সেই 'মন'কে 'মনের মানুষ'-ও বলা চলে। দেহতত্ত্বকে স্বীকার করিয়া বাউলের দর্শনকে সম্মুখে ধরিলে 'মনঃশিক্ষা'র গানগুলির ভাব-উৎস ও আন্তর-প্রেরণাকে উপলব্ধি করা যাইবে।

১ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁহার "বাঙ্গালার বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন মুসলমান কবি" (দ্বি সং ১৯৬২) গ্রন্থে যে 'মালসি' রাগের গানটি উদ্ধৃত করিয়াছেন (সং ১১৬, পৃ ১০৩) তাহাতে উমা বা শ্যামার প্রসঙ্গ নাই। উহা শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনের গান।

২ বর্তমান লেখকের অপ্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থ 'প্রান্ত-উত্তর বঙ্গের লোকসঙ্গীত' হইতে উদ্ধৃত।

সঙ্কলিত মনঃশিক্ষার গানগুলির মধ্যে (সং ১৮ হইতে সং ৪৫ পর্যন্ত) নিম্নলিখিত ধারাগুলির সন্ধান পাওয়া যায় :

(ক) বিচিত্র ও বিভিন্ন সম্বোধনে 'মন'-কে সম্বোধনের মাধ্যমে মনের স্বরূপ নির্ণয়ের প্রচেষ্টা; 'মন'-এর দুইটি দিক প্রতিফলিত হইয়াছে : একদিকে কাণ্ডারীরূপী 'মন'—এই 'মন' বিশুদ্ধ পরমাত্মা ; সম্বোধন তখন 'মন-মাঝি' (সং ১৮), 'অমূল্যি মানিক' (সং ২২), 'সোনার ময়না,' 'সুয়া' (সং ২৪), 'মন-সুজনা' (সং ৩৭), 'পাগেলার মন' (সং ৪০)। অপর দিকে যে 'মন' এই ভব-সাগরে আসিয়া পরমসত্যের অন্বেষণ না করিয়া কামে-প্রেমে মজিয়া বৃথা দিন কাটাইল, সেই 'মন' ; তখন উহাকে 'মন-চাষা' (সং ২০), 'পাষাণ মন' (সং ২০), 'অজ্ঞান মন' (সং ২২), 'মন মাতঙ্গ' (সং ৩০), 'বন্দা' (সং ৪১) প্রভৃতিরূপে সম্বোধন করা হইয়াছে। দুই প্রকারের সম্বোধনগুলি মিলাইয়া লইলে কবির মূল বক্তব্য পরিস্ফুট হয়।

(খ) এই দ্বিতীয় প্রকারের 'মন' ভব-সাগরে বাণিজ্যের নৌকা লইয়া পরম বিপদে পড়িয়াছে, কামে ও মোহে পতিত হইয়া সংসারের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সে ভুলিয়াছে আপনার 'ঘর'—যাহা পরপারে আছে। পরমাত্মার প্রেমে না মজিয়া সে 'মন' স্ত্রী-পুত্রের প্রেমে ও মোহে কাল কাটাইতেছে। কিন্তু আসলে সেই মোহের বাঁধন কামের নিবাস মায়া মাত্র, মরণকালে উহা অর্থহীন হইয়া দাঁড়াইবে। পরম সত্যের প্রেম-স্বরূপকে জীবনে না রাখিতে পারিলে এখানেই কাল কাটাইতে হইবে। কবি তাই সেই 'অজ্ঞান মন'-কে উদ্দেশ করিয়া গাহেন, 'মন, তোরে কেবা পার করে,' কেননা তাহার 'কাণ্ডারী নাই' এবং সেই জন্য 'কান্দিয়া বেয়াকুল হইলাম ভবনদীর পারে আমি অমায়া সাগরে' (সং ১৯)। কবির মনে হইয়াছে,—'মিছা ধান্দাবাজী—এ সংসার' (সং ২৩), 'ঠেকছি ভবের মায়াজালে' (সং ১৯)। 'মন'-কে বলেন, 'ফিরিয়া ঘর না কইলায় তালাস' এবং তাই 'প্রেমের না লাগিল বাতাস' (সং ২০)। কবি বুঝিয়াছেন, 'কাম-নদীতে ঢেউ উঠিয়া, রে পাষাণ মন, আমার কইল সর্বনাশ' (সং ২০), ফলে—'লাভে মূলে সব খোয়াইলাম কামিনীর সঙ্গ পাইয়া' (সং ২২)। ঈশ্বর জীবকে জগতে প্রেরণ করেন প্রেম ও করুণা বিলাইতে, কিন্তু কবি বিপথগামী হইয়াছেন 'লাভ করিতে আইলাম ভবে মা'জনের ধন লইয়া' (সং ২২),

'আপনার আতে ইচ্ছা করি' বেড়ি দিলাম দুইয়ো পায়' (সং ২৯)। 'এই ভবের জিন্দেগী যেমন পোষ মাসের খুয়া' একথা আগে বুঝেন নাই,—এখন মনে হয় 'বেরথা জীবন গাওয়াইলাম—চোরের ছলা বইয়া' (সং ২৪), এবং 'তিরি-পুত্রর গোলাম অইয়া কাটলাম ঘোড়ার ঘাস' (সং ৪৫)। 'মন'-কে আজ তাই শোনান, 'তোমার মরণ কথা স্মরণ হইল না' (সং ২৫)—আজ নরক যন্ত্রণার কথা মনকে মনে করাইয়া দেন (সং ৪০)। অন্তিমকালে এই ভয়ের কথা উল্লিখিত হইবার ফলেই বাউলের 'মনের মানুষ' পর্যায়ের গানগুলির সহিত সামান্য সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও মনঃশিক্ষার গানগুলি বাউল গানের পর্যায় ভুক্ত হইতে পারে নাই।

(গ) অন্তিম দিনের ভয়-যুক্ত চিন্তার সহিত পরপারের কামনাও ব্যক্ত হইয়াছে। এই দিক হইতে 'প্রার্থনা ও আত্মনিবেদন' পর্যায়ের পরপারের কামনার সহিত ইহা সর্বাংশে এক। কবির মনে হয় 'রাইত হইল রে আন্ধি' (সং ৩৯)—জীবনের দিন ফুরাইয়া মৃত্যুর অন্ধকার ঘনাইতেছে। দিনের পর দিন যায়, কবির ওপারে যাওয়া হয় না,—

রাত্রি গেল, বেলা হইল
আফ্‌তাবে কইলা ভর।
আমি তো পড়িয়া রইলাম—
শয়তানের চর ॥—সং ৩৯

রসের সাধনা করিয়াছেন যাঁহারা তাঁহারাই সেই পরপারে গিয়াছেন। কবির ব্যথা : 'রসিক যারা চইলে গেল আমায় সঙ্গে নিল না রে' (সং ৩০)।

(ঘ) কবির এই ব্যথা শেষে অভিমান ও অভিযোগে রূপ লইয়াছে। আল্লা যেমন ইচ্ছা করিয়া কবিকে এই ভব-সাগরের ঘূর্ণি হইতে উদ্ধার করিলেন না, তেমনি কবিও বলেন আল্লাকে-ও সেই সঙ্গে ডুবিতে হইবে—'আল্লা, আমারে ডুবাইতে চাও—ডুবিমু দুইজন' (সং ৩৪)। আল্লার উপর নির্ভরশীলতা এবং পরম যোগ অনুভব করিলেই এমন অভিমান প্রকাশ করা চলে।

সাহিত্যিক মূল্যের দিক হইতে 'প্রার্থনা ও আত্মনিবেদন'-গুচ্ছের গানগুলির সহিত 'মনঃশিক্ষা'র গানগুলির তুলনা করিলে শেষোক্ত শ্রেণীর গানগুলিকে অনেক বেশী সাহিত্যগুণ-মণ্ডিত মনে হইবে। মনঃশিক্ষার

গানগুলির মধ্যে এমন একটা রহস্তমূলকতা রহিয়াছে যাহার ফলে উহা সহজেই মানব-মনের নিকট আবেদনশীল হইতে পারে। ইহাই আবার গানগুলিতে ব্যাপ্তির সুর বাজাইয়াছে। 'প্রার্থনা ও আত্মনিবেদনে'র মধ্যে কোথায় যেন একটা এক-ঘেয়েমী আছে, মনঃশিক্ষার গান তাহা হইতে মুক্ত।

রূপক-উপমার মধ্যে নৌকা ও চাষ-আবাদের কথা ও ভাবানুষঙ্গ ব্যবহৃত হইয়াছে। নৌকা ও চাষাবাদকে রূপক-উপমা হিসাবে ব্যবহার করিবার প্রবণতা বাঙলা সাহিত্যে চিরদিন লক্ষ্য করা গিয়াছে। লোক-সাহিত্য ও সঙ্গীতের মধ্যে উহা ব্যাপকতর ভূমিকা লইয়াছে॥

....৬

সুফী[১] ধর্ম ও সাধনা একান্তভাবে মর্মমুখী; সাধকের ব্যক্তিগত উপলব্ধি এই ধর্ম ও সাধনার একটি বিশিষ্ট দিক বলিয়া ইহাকে ইসলামীয় অতীন্দ্রিয়বাদ বা মরমিয়াবাদ নামে অভিহিত করা যায়।

হজরত মোহাম্মদ জেব্রিলের মাধ্যমে আল্লার বাণী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—তাহাই কোরানশরীফ। কথিত হয়, মোহাম্মদ সেই সকল বাণীর মারিফত বা রহস্যকথা তাঁহার জামাই আলীকে জানাইয়াছিলেন; আলী সেই গুপ্তকথা হাসান, হোসেন, কমীল্ বিন্ যয়দ এবং হাসান বশ্বরী—এই চার জন খলিফাকে জানান। এই চারজন খলিফার সেই গুপ্ত কথাই পরবর্তী কালে সুফী রহস্যবাদ ও মরমিয়াবাদের গোমুখী—ইহা অনেকের ধারণা। কোনো-কোনো সুফী আবার বিশ্বাস করেন, আল্লার নিকট হইতে প্রাপ্ত বাণী দুই প্রকারের: প্রথমটি কোরানে লিখিত হইয়াছে, উহা সর্বসাধারণের জন্য; দ্বিতীয়টি মোহাম্মদের হৃদয়পটে লিখিত রহিয়াছে, তাহা কয়েক জনের জন্য। যে করিয়া দেখা যাক না কেন, কোরানশরীফের ব্যাখ্যাকেই ভিত্তি করিয়া সুফীমতের উদ্ভব হইয়াছে এবং উহারই ফলে ইসলামধর্মের সহিত এই মতের পার্থক্যও সূচিত হইয়াছে। অবশ্য কোরানশরীফের যে একটি মর্মমুখী দিক (যাহাকে 'ইল্‌মে বাতিন' বলা হয়) রহিয়াছে, সুফীগণ যাহাকে

১ আক্ষরিক অর্থ: 'পশমের পোষাক পরিধানকারী'। পশমের পোষাক সংসারের প্রতি নিরাসক্তি প্রকাশ করিবার জন্য ইসলামধর্মের প্রাথমিক যুগে ব্যবহৃত হইত।

টানিয়া বাহির করিয়াছেন বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন,— সনাতনপন্থী ইস্‌লামধর্মিগণ তাহা স্বীকার করিতে চাহেন নাই।

"দর্শনের দিক হইতে ঈশ্বরের একত্ব, জগতের ঈশ্বরময়ত্ব ও প্রতি মানবের ঈশ্বর স্বরূপত্ব; ধর্মের দিক হইতে ঈশ্বর ও মানবের সুমধুর প্রেম ও প্রীতির বন্ধন; নীতির দিক হইতে অর্থশূন্য বাহ্যাড়ম্বর ও আচারানুষ্ঠান অপেক্ষা আন্তর পবিত্রতার উপরই গুরুত্ব আরোপ- উদারতা, পরমতসহিষ্ণুতা, অহিংসা ও বিশ্বপ্রেমই সূফি মতবাদের মর্মের কথা।[১]।" কিন্তু, দর্শন, ধর্ম ও নীতির দিক হইতে একটি সুস্পষ্ট মতরূপে সূফিমত একদিনে বা একযুগে বা একজনের দ্বারাই গড়িয়া উঠে নাই। বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন সাধকের হাতে ইহা গড়িয়া উঠিয়াছে এবং অনেক সময় বিভিন্ন সাধকের মধ্যে মতের অনৈক্যও আসিয়াছে।

সূফি সম্প্রদায়ের মতাদর্শের ভাঙন-গড়নের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে ইহার মধ্যে সুস্পষ্ট দুইটি যুগের সন্ধান পাই: একটি প্রাথমিক যুগ, অপরটি পরবর্তী যুগ। আনুমানিক ৭১৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮১৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাথমিক যুগের কালসীমা। এই সময়কার সূফিমতের সহিত চিরাচরিত ইসলাম মতের খুব বেশী পার্থক্য নাই। সূফিরাও তাঁহাদের রহস্যবাদ, ঈশ্বরের স্বরূপ ও মানবের সহিত সম্পর্ক সম্বন্ধে কোনো স্থির ধারণায় আসিয়া পৌঁছাইতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহাদের মতবাদের দার্শনিক দিক সম্পর্কে সচেতন না হইয়া উহার কর্মমূলক নীতিতত্ত্বের দিকটিকেই তুলিয়া ধরিয়াছেন। সনাতন-পন্থী ইস্‌লাম বিশ্বাসীদের সহিত তখন ইঁহাদের পার্থক্য ছিল সন্ন্যাস (জুহদ) গ্রহণে, দারিদ্র্য (ফাকর্) স্বীকারে, ঈশ্বরের সান্নিধ্য কামনায়।

সূফি মতবাদের পরবর্তীযুগ খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রথম দিক হইতে সূচিত হইয়াছে। এই মতের সহিত একদিকে যেমন প্রাথমিক যুগের সূফীমতের যোগাযোগ নাই, অপরদিকে তেমনি প্রাচীন ও খাঁটি ইস্‌লামমতেরও সাদৃশ্য নাই; অথবা, বলা চলে, এই সূফীমত ইসলাম ধর্মের আচারসর্বস্বতা, ঈশ্বরের ভয়াল ও কঠোর রূপকে অস্বীকার করিয়া এবং অন্যান্য ধর্মের বিভিন্ন উপাদানকে অঙ্গীকার করিয়া এক অনানুষ্ঠানিক, প্রেমময়, আবেগপ্রধান,

১ ডক্টর রমা চৌধুরী: বেদান্ত ও সূফি দর্শন (১৯৪৪), পৃ. ১৬৬

দর্শনচিন্তাসমৃদ্ধ মতবাদের সূচনা করে। মর্মবাদী ভক্ত (আরিফ) এখানে প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্বকে সর্বভাবে অনুভব করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, ঈশ্বরের সহিত মানবের অভেদত্ব স্বীকার এবং আচার অনুষ্ঠানকে (ইসলাম ধর্মে ইহাকে বলে 'শরীয়ত') অস্বীকার করা পুরাপুরি কোরানের বিরুদ্ধে যাওয়া। অবশ্য, অনেক সুফিসাধক ইসলামমতের সহিত সুফিমতের সমন্বয় সাধন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

সুফি-সম্প্রদায়ে ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে একাধিক মত প্রচলিত রহিয়াছে। ইঁহারা ঈশ্বরের একত্ব স্বীকার করেন; কিন্তু ঈশ্বর ও জগৎ অভিন্ন কিনা (এই মতকে pantheism বা বিশ্বাত্মবাদ বলে[১]), ঈশ্বর জগতের মধ্যেই লীন হইয়া (Immanent) আছেন কিনা, কিংবা তিনি জগতের মধ্যে লীন হইয়াও অতিরিক্ত কোনো সত্তা কিনা (এই মতকে Panentheism বা 'ঈশ্বরাধিকত্ববাদ' বলে), কিংবা তিনি কেবলই জগদবহির্ভূত (Transcendent) কিনা—এবিষয়ে সুফিদের মধ্যে একাধিক মত চালু আছে। তবে, মোটামুটি-ভাবে বলা চলে—বিশ্বাত্মবাদের তুলনায় ঈশ্বরাবিকত্ববাদকেই সুফিগণ স্বীকার করিয়াছেন বেশী। এইদিক দিয়া ভারতীয় বৈদান্তিকগণের সহিত সুফিমতের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইবে।

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী সুফি মতানুযায়ী ঈশ্বরের গুণ, কার্য ও নামাবলী সম্পর্কে সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন[২]। ঈশ্বরের গুণ সম্পর্কে সুফীদের মধ্যে দুইটি মত দৃষ্ট হয়; একটি মতে বলা হয়—ঈশ্বর প্রথমে নির্গুণ, পরে সগুণ; অপর মতে বলা হয়—ঈশ্বর সর্বদাই সগুণ। শেষের মতটি রামানুজ প্রমুখ বৈষ্ণব বৈদান্তিকগণেরও মত। সুফিরা ঈশ্বরের গুণ ও কার্যের মধ্যে তফাৎ করেন নাই, তাঁহার গুণকেই দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন; একদিকে রহিয়াছে ঈশ্বরের মহত্ত্ব, সত্য, সৌন্দর্য প্রভৃতি, যাহা তাঁহার কার্য বিশেষ নহে; অপর-দিকে বচন, শ্রবণ, দর্শন, সর্জন, পালন, দণ্ডপ্রদান, ক্ষমা করণ—প্রভৃতি যাহা তাঁহার কার্য বিশেষ। সুফিদের নিকট ঈশ্বরের নাম ঈশ্বর হইতে অভিন্ন। ঈশ্বরের নাম দ্বিবিধ: এক, স্বরূপ বাচক, যেমন—একমেবাদ্বিতীয় (আল্‌আহদ্);

১ বিশ্বাত্মবাদকে সুফীদের ভাষায় 'হমহ্ উস্ত' বলে। ইহা পারস্যবাসী সুফীদের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

২ বেদান্ত ও সুফী দর্শন (১৯৪৪), পৃ ২৭-৩৮

দুই, গুণবাচক, যেমন—করুণাময় (আল্ রাহ্মান)। তাঁহাদের নিকট ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ নাম 'আল্লা'—কারণ উহা তাঁহার অন্যান্য নাম ও গুণাবলীর দ্যোতনা করে।

ঈশ্বর কর্তৃক এই জগৎ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সুফিগণ একমত হইতে পারেন নাই। একদল বলেন, মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের আপনার প্রতিবিম্ব লক্ষ্য করিয়া আত্মজ্ঞান এবং ওই আত্মজ্ঞান হইতে আনন্দ লাভ করিবার জন্যই ঈশ্বর কর্তৃক এই জগৎ হইয়াছে। কেহ বলেন, মানুষকে সঙ্গী রূপে গ্রহণ করিয়া আত্মজ্ঞান ও আনন্দ লাভ করিবার জন্য ঈশ্বর এই পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছেন। কেহ বা বলেন, নিছক উদ্বৃত্ত আনন্দের জন্যই ঈশ্বর কর্তৃক জগদ্‌রচনা; কিংবা নিজের অভিব্যক্তি অথবা করুণাবশতঃ এই পৃথিবী সৃষ্টি হইয়াছে[১]।

সৃষ্টির প্রক্রিয়া সম্বন্ধেও সুফিদের মধ্যে একাধিক মতবাদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেহ বলেন, নিমেষের মধ্যে শূন্য হইতে এই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। কেহ বলেন, প্রথম স্তরে কেবল অব্যক্ত পরমেশ্বর ছিলেন; তিনি আপনার সত্তাকে গুণাবলীতে প্রকাশ করিয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন,—এই মতে তাঁহার গুণ সৃষ্টি ও জগৎ সৃষ্টি একই। তৃতীয় আর একটি মতে বলা হইয়াছে, ঈশ্বরের এই গুণ সৃষ্টি ও জগৎ সৃষ্টি একই ব্যাপার নয়। চতুর্থ মতে—অব্যক্ত পরমাত্মা, তারপর গুণসৃষ্টি, তারপর কার্যসৃষ্টি, তারপর তাঁহার সৃষ্টি Universal, তারপর Particular। পঞ্চম মতানুযায়ী সৃষ্টির স্তর পরম্পরা এইরূপ: প্রথমে অব্যক্ত পরমাত্মা, তারপর সামান্য সৃষ্টি (Universal), তারপর বিশেষ সৃষ্টি (Particular), তারপর নাম ও স্থান সৃষ্টি, অনন্তর নানা-বিধ রূপ-গুণ সৃষ্টি, পরিশেষে নানা প্রকার ভেদসৃষ্টি[২]॥

.... ৭

সুফি সাধনাতে মানবদেহকে একটি বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হইয়াছে। মানুষই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সার-সংক্ষেপ বা উহার প্রতিরূপ। "বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড দ্বিবিধ—অদৃশ্য, অজড় ও আধ্যাত্মিক ভবিষ্যৎ জগৎ; এবং দৃশ্য, জড় ও পার্থিব বর্তমান জগৎ।...মানব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিচ্ছবি-রূপে অদৃশ্য ও দৃশ্য

১ ডক্টর রমা চৌধুরী: বেদান্ত ও সূফীদর্শন (১৯৪৪), পৃ ৩৯-৫০
২ ঐ পৃ ৫০-৫১

উভয় জগতেরই প্রতিরূপ ; এবং তজ্জন্য প্রতি জগতের পাঁচটি উপাদান প্রাপ্ত হইয়াছে। জড় জগৎ হইতে সে অগ্নি, জল, বায়ু, পৃথিবী এবং জড় আত্মা (নাফ্‌স্‌) প্রাপ্ত হইয়াছে। অগ্নি প্রভৃতি চতুর্ভূত তাহার জড় দেহের উপাদান কারণ। জড় দেহ ও জড় আত্মার সমাহারই মানবের পার্থিব স্বরূপ। অজড় জগৎ হইতে সে হৃদয় (কাল্‌ব), আত্মা (রুহ্‌), প্রগাঢ় আধ্যাত্মিক জ্ঞানশক্তি (সির্‌), গভীরতর উপলব্ধিশক্তি (খাফী), এবং গভীরতম অনুভূতিশক্তি (আখ্‌ফা) প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহারা মানবের আধ্যাত্মিক স্বরূপ। ইহারা পার্থিব জড়দেহের অংশ না হইলেও দেহান্তর্গত। হৃদয় বাম পার্শ্বে, আত্মা দক্ষিণ পার্শ্বে, প্রগাঢ় আধ্যাত্মিক জ্ঞানশক্তি উভয়ের মধ্যস্থলে, গভীরতর উপলব্ধি শক্তি ললাটদেশে এবং গভীরতম অনুভূতি শক্তি মস্তিষ্কে (মতান্তরে বক্ষঃকেন্দ্রে) অবস্থিত।

"উপরি উক্ত দশবিধ উপাদানে গঠিত মানব পৃথিবীর হইয়াও পৃথিবীর উপরে। অতএব পার্থিব স্বরূপকে বশীভূত করিয়া আধ্যাত্মিক স্বরূপের যথাযথ উন্নতিই মানবের প্রধান কর্তব্য[১]।"

সুফিগণ বিশ্বাস করিয়া থাকেন, অজড় ও জড় জগতের প্রতিরূপ এই মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর আবির্ভূত হইতে পারেন। কেননা, মানব ঈশ্বর হইতে সৃষ্ট হইয়াছে—সুতরাং ঈশ্বর হইয়াই তাহার শেষ হইবে। যে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের সমগ্র গুণাবলীর অভিব্যক্তি হয় তিনি ও ঈশ্বর এক হইয়া যান, তাঁহাকে "আল্‌ ইন্‌সানুল কামিল্‌" বা "পূর্ণমানব" বা "দিব্য মানব" বলা হয়। একদিকে যেমন তিনি ঈশ্বর ও মানবের মিলিত রূপ, অপরদিকে তেমনি তিনি অন্যান্য মানুষকেও ঈশ্বরাভিমুখী করিয়া তোলেন। যে কোনো মানুষই 'পূর্ণমানব' হইতে পারেন বটে, তবে অনেকে মনে করেন, মোহাম্মদই সর্বশ্রেষ্ঠ 'পূর্ণমানব'।

অবশ্য লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, দিব্য মানবের মধ্যে ঈশ্বরের পূর্ণতম বিকাশ হইলেও তিনিই স্বয়ং ঈশ্বর নহেন ; তিনিও ঈশ্বরের সেবক মাত্র। এইজন্যই পূর্ণমানবকে ধর্মপ্রচারক বলা হইয়াছে, কিন্তু ধর্মপ্রবর্তক বলা হয় নাই এবং একই কারণে তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়াও গ্রহণ করা হয় নাই।

---

১ ঐ পৃ ৭৪-৭৫

ঈশ্বরের সহিত জীবের সম্বন্ধস্থাপন করিয়া মুক্তিলাভই সুফিগণের উদ্দেশ্য। এই সম্বন্ধ স্থাপনের মধ্যে দুইটি স্তর রহিয়াছে। প্রথমে জীবের 'আমিত্বে'র লুপ্তি (ইহাকে 'ফানা' বলে), তারপর ঈশ্বরের মধ্যে স্থিতি (ইহাকে 'বাকা' বলে)। এ বিষয়েও সুফীদের মধ্যে মতদ্বৈধ লক্ষিত হইয়া থাকে। একদল বলেন, ঈশ্বরে স্থিতি লাভ করিয়া মানুষ আপন সত্তা হারাইয়া অনন্ত জীবন লাভ করে ; আপন দলের মত, ঈশ্বরের মধ্যে স্থিতি লাভ করিয়াও মানুষ আপনার সত্তাকে বজায় রাখে।

সুফি মরমিয়াগণের মতানুযায়ী ভক্ত ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একেবারে ঈশ্বরে বিলীন হয় এবং পুনরায় মানুষের মধ্যে ফিরিয়া আইসে। ইহার মধ্যে কয়েকটি স্তর রহিয়াছে। সর্বপ্রথমে মরমী ভক্ত ঈশ্বর হইতে পৃথক হইয়া মানব-সংসারে আসেন বলিয়া কল্পনা করেন ; তারপর সংসার ছাড়িয়া তিনি ঈশ্বরের দিকে যাত্রা করেন। বলা হইয়া থাকে, মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিবার পর ঈশ্বর ও মানবের মধ্যে সাত সহস্র যবনিকার ব্যবধান গড়িয়া উঠে। ঈশ্বরের অংশরূপী মানুষ জীবলোকে আসিবার সময় ঐশ্বরিক গুণাবলী একটি-একটি করিয়া ছাড়িয়া আসে, কিন্তু প্রত্যাবর্তনের কালে আবার একটি-একটি করিয়া ফিরিয়া পায়। ঈশ্বরের রাজ্য আলোকের রাজ্য, জীবলোক অন্ধকারময়। জীব আলোক হইতে অন্ধকারে আসিয়া পুনরায় আলোকেই ফিরিয়া যায়। কিন্তু, সেখানে ফিরিয়া গিয়াই ভক্তের চলা শেষ হইয়া যায় না। জগতের নৈতিক কর্তব্যাদি সম্পাদনের জন্যে তিনি আবার মরধামে অবতরণ করেন। যাঁহারা এইরূপে ঈশ্বরের নিকট হইতে মর্ত্যে ফিরিয়াছেন তাঁহারাই 'দিব্য' বা 'পূর্ণ' মানব বা 'সিদ্ধ' মানব।

ঈশ্বর হইতে ভিন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ, ঈশ্বরের প্রতি পর্যটন এবং শেষে মর্ত্যে প্রত্যাবর্তন—এই তিনটি স্তরে ভক্তের মানসিক অবস্থাও ভিন্ন। "প্রথম অবস্থায় মানব স্বতন্ত্র সত্তাবান্, ঈশ্বর হইতে ভেদে বিশ্বাসী, ঈশ্বর-পারম্মুখ ও জগৎসর্বস্ব। দ্বিতীয় অবস্থায়, ভক্ত ঈশ্বরস্বরূপে বিলুপ্ত, ঈশ্বরের সহিত অভিন্নতা উপলব্ধিমান্, জগদ্‌বিমুখ ও ঈশ্বর সর্বস্ব। তৃতীয় অবস্থায়, ভক্ত ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইয়াও স্বতন্ত্র সত্তাবান্, ঈশ্বরের সহিত অভিন্নতা উপলব্ধি করিয়াও ঈশ্বর ভিন্ন, ঈশ্বর সর্বস্ব হইয়াও জগদ্‌বিমুখ নহেন, জগতে ঈশ্বরের বাণী প্রচারক ও ধর্মগুরু। এই শেষোক্ত অবস্থাই শ্রেষ্ঠ অবস্থা।

অতএব অধিকাংশ সুফিদের মতে, সংসারত্যাগপূর্বক ঈশ্বরলাভই মানবের চরম কাম্য নহে। মানবের সেবাও সমভাবে প্রয়োজন ১।"

কোনো-কোনো সুফি ঈশ্বরের সত্তায় মানবের আরোহণের মধ্যে চারি প্রকার স্তর লক্ষ্য করিয়াছেন। মরমী ভক্তের মানসে আলোকময় ঈশ্বর তাঁহার আলোক প্রতিবিম্বিত করেন। জ্যোতির্ময় ঈশ্বরের এই আলোক-প্রাপ্ত ভক্ত চারিটি স্তরের মধ্য দিয়া তাঁহার নিকটবর্তী হইতে থাকেন। এই চারিটি স্তর এই: "(১) কার্যালোক বা ঐশ্বরিক কার্যাবলী সম্বন্ধীয় আলোক। ঈদৃশ আলোক-প্রাপ্ত ভক্ত উপলব্ধি করেন যে, ঈশ্বরই একমাত্র কর্মকর্তা, এবং তজ্জন্য তিনি স্বীয় স্বতন্ত্র ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন পূর্বক ঈশ্বরেচ্ছা ও আদেশানুসারেই পরিচালিত হন। ... (২) নামালোক বা ঐশ্বরিক নাম সম্বন্ধীয় আলোক। ভক্ত ঐশ্বরিক নামবিশেষ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিলে, তাঁহার স্বীয় স্বতন্ত্র সত্তা বিলুপ্ত হয়, এবং কেহ ঈশ্বরকে সেই নামে আহ্বান করিলে, ভক্তই উত্তর প্রদান করেন, কারণ ঈশ্বরের নামই তাঁহার নাম হইয়া যায়। ... (৩) গুণালোক বা ঐশ্বরিক গুণাবলী সম্বন্ধীয় আলোক। ঈশ্বর যে সময়ে স্বীয় স্বরূপ, গুণ বা নাম ভক্তের নিকট প্রকাশ করেন, সেই সময়ে তিনি ভক্তের মানব-স্বরূপত্ব বিনষ্ট করিয়া (ফানা) তৎস্থলে "পবিত্র আত্মা" (রূহল্ কুদস্) সংস্থাপন করেন। ... (৪) সত্তালোক বা ঐশ্বরিক স্বরূপ সম্বন্ধীয় আলোক। ইহা পরমাত্মার নির্গুণ, নামহীন, নির্বিশেষ শুদ্ধ স্বরূপের অভিব্যক্তি। ইহাই সর্বোচ্চ আলোক। ভক্ত ঈদৃশ আলোক লাভে ধন্য হইলে তিনি ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইয়া পূর্ণমানবত্ব লাভ করেন ২।"

.... ৮

এইবার সুফিদের সাধন পন্থার কর্মময় ও আনুষ্ঠানিক দিকটির পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। এই আনুষ্ঠানিক দিকটিকে স্বীকার করিয়াই তাঁহারা "পূর্ণমানবত্ব" অর্জন করিতে চাহিয়াছেন।

ঈশ্বরকে অনির্বচনীয়, রহস্যময় জানিয়া সেই অদৃশ্য ইষ্টকে (ইহাকে

১ ঐ পৃ ১৩৮
২ ঐ পৃ ১৩৪-১৩৬

'ঘয়ব্' বলে) সম্মুখে রাখিয়া স্ফি ভক্ত সাধনা করিয়া চলেন। প্রতি স্ফি ভক্তই ঈশ্বরের অভিমুখে পথ চলেন বলিয়া তাঁহারা প্রত্যেকেই হইলেন 'সালিক্' (অর্থাৎ 'যাত্রী') এবং সেই চলার পথ রহস্যময় (এই মার্গকে 'তরিকত' বলে)। স্ফি সাধকের এই পথ চলার আরম্ভ হইতে শেস পর্যন্ত অবস্থাকে মূলত: চারিটি ভাগে ভাগ করা যায় : প্রথম, 'ঈমান্' (কোনো অদৃষ্ট বস্তুতে বিশ্বাস স্থাপন করা); দ্বিতীয়, 'ত্বলব' (সেই অদৃষ্ট বস্তুর জন্য অনুসন্ধান করা) ; তৃতীয়, 'ইরফান্' (উক্ত অদৃষ্ট বস্তু সম্পর্কে উপলব্ধিজাত ধারণা বা জ্ঞান লাভ) ; চতুর্থ, 'ফনা-ফীল্-লাহ্' (সেই অদৃষ্ট, রহস্যময় বস্তুর মধ্যে আত্মসত্তার স্থিতি)। চতুর্থ স্তরের শেষভাগে রহস্যময় বস্তুর মধ্যে কেবল স্থিতি নয়, আত্মসত্তা অস্তিত্ব হারাইয়া লীন হইয়া যায় ; ইহাকে 'বকা-বিল্-লাহ্' বলে।

কিন্তু, এই সাধনা একা করিবার উপায় নাই। গুরু বা মুরশিদের (শেখ বা পীর-ও বলে) নিকট শিষ্য বা মুরিদ-কে আধ্যাত্মিক সাধনার পথে নির্দেশ গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু, তাহাও হঠাৎ করিয়া হইবে না। তিন বৎসর শিষ্যকে গুরুর নিকট শিক্ষানবিশী করিতে হইবে। প্রথম বর্ষে মানবসেবা, দ্বিতীয় বর্ষে ঈশ্বরসাধনা এবং তৃতীয় বর্ষে আপনার আত্মার উন্নতি সম্পর্কে সন্তোষজনক ভাবে অগ্রসর হইতে পারিলে মুরশিদ ছেঁড়া কাপড়ের জোড়াতালি দেওয়া পোষাক (ইহাকে 'মুরাক্কাত' বলে) পরাইয়া মুরিদ-কে সাম্প্রদায়িক দীক্ষা দেন। এই সময় হইতেই শিষ্যকে 'সালিক' (বা 'যাত্রী') বলা চলিবে।

স্ফি সাধকের অবশ্য পালনীয় আচারগুলির মধ্যে তিনটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য : প্রথমত: 'দিকর্' (অর্থাৎ ঈশ্বরের নাম জপ করা) ; দ্বিতীয়ত: 'রাবিতা' (গুরু বা মুরশিদের সহিত শিষ্য বা মুরিদের যোগাযোগ রক্ষা করা) ; এবং তৃতীয়ত: 'মুরাক্বিহ্' (সংসার হইতে বিমুক্ত হইয়া শান্ত চিত্তে ঈশ্বরকে ধ্যান করা)। 'দিকর্' দুই প্রকারের হইতে পারে : 'দিকর্ জালী' —ইহা উচ্চৈ:স্বরে ভগবানের নাম কীর্তন ; এবং 'দিকর্ খাফী'—ইহা নীরবে বা নিম্নস্বরে ঈশ্বরের নাম কীর্তন। দেহের বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন রূপে এই নাম কীর্তন করা হয়।

'রাবিতা'-র প্রসঙ্গে বলা হয় যে, কেবল মুরশিদের সঙ্গে যোগাযোগই

রহে, তাঁহার মধ্যেও লীন হইয়া যাইতে হইবে। ইহাকে 'ফনা-ফীশ্-শয়খ্' বলে[১]।

এতদ্ব্যতীত কোরানের কয়েকটি বিশিষ্ট 'আয়েত' (অর্থাৎ শ্লোক)-ও ইঁহারা ধ্যান করেন। প্রাণায়াম এবং যোগমূলক সাধনও ইঁহাদিগকে অভ্যাস করিতে হয়।

এই প্রাণায়াম ও যোগনির্দিষ্ট সাধনের প্রসঙ্গে মানবদেহের কথা আসিয়া পড়ে। সুফিরা মানবদেহের মধ্যেই পরমসত্যকে অন্বেষণ করিয়াছেন। দেহের মধ্যে তাঁহারা ছয়টি 'লতীফহ্' বা 'আলোক-কেন্দ্রে'-র কল্পনা করিয়া লইয়া এবং এই আলোক-কেন্দ্রগুলির মধ্যে স্তরবিন্যাস করিয়া উহাদের পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগও নির্ণয় করিয়াছেন। বিশ্বসৃষ্টির মূলে যে 'মৌলিক আলোক' রহিয়াছে (ঈশ্বর সেই আলোক স্বরূপ), দেহের ছয়টি আলোক-কেন্দ্রগুলিই উহাতে লীন হইয়া যাইবার উপায়।

সুফি সাধকের সাধন-পথের সাতটি সোপান রহিয়াছে। অনুতাপ, সংযম, বৈরাগ্য, দারিদ্র্য, ধৈর্য, ঈশ্বরে বিশ্বাস ও সন্তোষ—সাতটি সোপান বলিয়া কথিত হয়। মতান্তরে—অনুতাপ, আত্মসংযম, বৈরাগ্য, অতীন্দ্রিয়, অধ্যাত্ম-জ্ঞান, প্রেম, সমাধি ও মিলন। কিন্তু, এই সকল সাধনাই তাঁহাদের সব কথা বা শেষ কথা নয়। ইহা উচ্চতর ও কঠিনতর সাধনার ভূমিকা মাত্র। সেই উচ্চতর সোপান চারিটি : অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক জ্ঞান, প্রেম, সমাধি ও মিলন। এইগুলি সাধকের মানসিক অবস্থা (ইহাকে 'হাল্'[২] বলে)। আধ্যাত্মিকজ্ঞান পুরাপুরি উপলব্ধিজাত, বুদ্ধি-বিচারের কোনো ভূমিকা ইহাতে নাই। এই উপলব্ধিজাতজ্ঞানের মধ্যে আবেগ আনে প্রেম। সেই প্রেমাবেগের বশে সাধকের সহিত ঈশ্বরের ভেদজ্ঞান লুপ্ত হইলে আসে সমাধি। সমাধি হইলেই সাধকের সহিত ঈশ্বরের মিলন হয়,—তখনই সাধক বলিতে পারেন 'আন্-ল্-হক্' অর্থাৎ 'আমিই সত্য বা ঈশ্বর'।

সুফিদের নিকট নৃত্য-গীত ও বাদ্যের বিশেষ মূল্য আছে। আখড়াতে সমবেত হইয়া নৃত্য-গীতের মাধ্যমে অধ্যাত্মসাধনা করা হইয়া থাকে।

১ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক: বঙ্গে সূফী প্রভাব (১৯৩৫), পৃ ৮৩-৮৮
২ সোপান ও হাল-এর মধ্যে পার্থক্য আছে। সোপান আনুষ্ঠানিক, তাহাতে সাধকের নিজের কাজ করিবার আছে। হাল—আধ্যাত্মিক, ইহা ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে মনে আসে।

স্থফিদের আখড়াকে বলা হয় 'খান্‌কাহ্‌', সেখানে বসে গানের মাধ্যমেই তত্ত্বালোচনার বৈঠক, ইহাকে বলে 'সমা'। স্থফি সাধক গান গাহিতে-গাহিতে এবং নাচিতে-নাচিতে অনেক সময় ভাবগ্রস্ত হইয়া পড়েন, এই অবস্থাও একটি 'হাল্‌'॥

"ইসলামী ও স্থফি ভক্তি-সঙ্গীত" গুলি সম্পর্কে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কথা হইল—এইগুলির মধ্যে ভারতীয় ও বঙ্গীয় পরিবেশের প্রভাব। ইহা সত্য, স্থফিধর্ম উত্তরভারত হইতে বাঙলা দেশে আসিয়া এখানকার কিছু-কিছু বিশেষত্ব আপনার মধ্যে সংহরণ করিয়া লইয়াছে।

এই ভক্তি-সঙ্গীতগুলি আলোচনা করিবার পূর্বে স্থফি ধর্ম ও সনাতন ইসলাম ধর্মের মূলগত স্থূল পার্থক্যগুলিকে স্মরণ করা দরকার এবং সেই পটভূমিকাতেই গানগুলি আলোচ্য ও বিবেচ্য। দ্বিতীয় কথা এই যে, স্থফি ভক্তিসঙ্গীতগুলি বাউলের তত্ত্বের ভূমিকা হিসাবেও গ্রহণ করা চলে।

স্থফি মতবাদের সহিত ইসলাম ধর্মের পার্থক্য কোথায়? স্থফিগণ বিশ্বাস করেন—ঈশ্বর এই জগতের মধ্যেই লীন (ইহা Pantheism), বা লীন হইয়াও জগদতিরিক্ত কিছু (ইহা Panentheism); যে করিয়াই দেখা যাক না কেন, ঈশ্বরকে জগৎ হইতে তাঁহারা দূরে ঠেলেন নাই। কিন্তু, কোরানে বলা হইয়াছে—ঈশ্বর জগতের মধ্যে নাই, তিনি জগৎ হইতে ভিন্ন। সনাতন ইসলাম মতানুযায়ী এই পৃথিবী মায়া বা মিথ্যা নয়, ইহা সত্য। স্থফিগণ মনে করেন, বিশ্ব এবং ঈশ্বর মিলিয়া একটি তত্ত্ব,—বিশ্ব ব্যতীত ঈশ্বরকে তাঁহারা দেখেন নাই। ইসলাম মতানুসারিগণ যেহেতু ঈশ্বরকে বিশ্ব হইতে পৃথক রাখিয়াছেন, সেই হেতু তাঁহারা ধর্মের দিক হইতে একেশ্বরবাদী হইলেও দর্শনের দিক হইতে দ্বৈতবাদী,—কেননা, ঈশ্বরের একত্ব এবং জগতের সত্যত্ব দুইই তাঁহাদের নিকট স্বীকার্য। এক কথায়—স্থফিরা একতত্ত্ববাদী (Monist), ইসলামপন্থিগণ একেশ্বরবাদী (Monotheist)।

স্থফিদের সাধনার মধ্যে প্রেমই মুখ্য—ঈশ্বরের সহিত মানুষের সম্পর্ক, প্রেমের সম্পর্ক, কারণ ঈশ্বর প্রেমময়। কোরানে কিন্তু ঈশ্বরের যে স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়—ঈশ্বর ক্ষমা ও করুণাময় পরিত্রাতা হইলেও তিনি

কঠোরও। মানুষের সহিত তাঁহার সম্পর্ক প্রভু ও ভৃত্যের, প্রেমিক-প্রেমিকার নয়। এই জন্য, সুফিদের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ যেমন আবেগ, উচ্ছ্বাস ও উন্মাদনায় ভরা, ইসলামপন্থিগণের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ তেমনি ভয়ের। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে যে, সুফি সম্প্রদায়ের উন্মেষের পূর্বেই ইসলামপন্থিগণের মধ্যেই এক সন্ন্যাসীদলের আবির্ভাব হয়, যদিও কোরানে সন্ন্যাস গ্রহণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই সকল ইসলামধর্মী সন্ন্যাসিগণ কোরানে উক্ত মৃত্যুর পর পাপের বিচার, সেই বিচারে পাপীর নরক বাস ইত্যাদি লইয়া সর্বদা আলোচনা করিবার ফলে ঈশ্বরের ভীষণতর, কঠোর ও নির্দয় বিচারক সত্তাটিই মুখ্য হইয়া উঠে। সুফিরা ইহারই বিরোধিতা করেন। এমন কি, ধর্মগুরু মোহাম্মদ পর্যন্ত যখন জেব্রিলের মাধ্যমে প্রথম ঈশ্বরের বাণী শুনিয়াছিলেন তখন তিনি ভয়ে কাঁপিয়া উঠিয়াছিলেন।

ইসলামপন্থিগণের তুলনায় সুফিগণ অনেক উদার। ইসলাম ধর্মিগণ মনে করেন, যাঁহারা কোরানে বিশ্বাস করেন একমাত্র তাঁহারাই 'মুমিন' বা 'বিশ্বাসী'; অপর সকলে 'কাফির' বা 'অবিশ্বাসী'। 'কাফির'-কে 'মুমিন' করিয়া তুলিবার জন্য তাঁহারা সচেতন প্রয়াস পাইয়াছেন এবং 'কাফির'-এর বিরুদ্ধে অভিযান (ইহাকে 'জিহাদ্' বলে) করিয়াছেন। সুফিরা কিন্তু অপর ধর্মাবলম্বী সম্পর্কে সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছেন; 'জিহাদ্-'কে তাঁহারা 'বি-ধর্মী বিনাশ' অর্থে গ্রহণ না করিয়া 'কামনা-বাসনা বিনাশ' অর্থে লইয়াছেন।

সুফিগণ মনে করেন, সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিলে যে কোনো মানুষই ঈশ্বরের প্রতিরূপ হইতে পারেন এবং সেজন্য কোরানের বাণী না পালন করিলেও চলিবে। ইসলাম বিশ্বাসিগণ বিশ্বাস করেন,—মোহাম্মদ ছাড়া আর কেহ ঈশ্বরের বাণী প্রাপ্ত হইতে বা প্রতিরূপ হইতে পারেন না এবং ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইতে হইলে কোরান এবং 'সুন্না' বা 'হাডিথ্' (অর্থাৎ মোহাম্মদ এবং তাঁহার অনুচরদের কার্য ও বাক্যাবলীর লিখিত বিবরণ)-কে অনুসরণ করিতেই হইবে। ইসলামপন্থীরা জীবনে সন্ন্যাসকে গ্রহণ করিতে পারেন নাই, গার্হস্থ্যধর্ম পালনের জন্যেই কোরানে নির্দেশ রহিয়াছে; সুফিরা সেখানে ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস-বাদকে মান্য করিয়া থাকেন।

ঈশ্বর ব্যতীত অপর কাহাকেও মান্য করিবার কথা কোরানে নাই এবং

ঈশ্বরের প্রতি ধাবিত হইবার জন্য কোরানে উক্ত অনুষ্ঠানাবলীই যথেষ্ট, সে জন্য গুরুর বা মুরশিদের কোনো প্রয়োজনীয়তা নাই। কিন্তু সুফিরা সাধনার ক্ষেত্রে গুরুকে অপরিহার্য বলিয়া জানেন। সুফিদের মালা জপা ও নাম কীর্তনও (ইহাকে 'দিকর্' বলে) ইসলাম ধর্ম বিরোধী।

ইসলাম ধর্মে ক্রিয়াবাদ (Activism)-এর প্রাধান্য, সুফিধর্মে নিক্রিয়াবাদ (Quietism)-এর। তাই, ইসলামধর্মীদের মধ্যে উপাসনা ও আচার-অনুষ্ঠানকে বড়ো স্থান দেওয়া হইয়াছে। ইসলাম ধর্মে চারিপ্রকার মতবাদের উল্লেখ করা হইয়াছে—'শরীয়ত,' 'তরীকত,' 'হকীকত' এবং 'মারফত'। 'শরীয়া' হইল ঈশ্বরের সহিত মানুষের সম্পর্ক স্থাপনের জন্য বাহ্যিক আচার-নিয়মের বিধি। সে বিধি এই : প্রতিদিন ভগবানের জন্য পাঁচবার প্রার্থনা ('নমাজ'), ভগবানের নামে রমজান মাসে উপবাস ('রোজা'), আয়ের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ দরিদ্রকে দান ('জকাত'), মক্কা শরীফে তীর্থযাত্রা ('হজ') এবং একমেবাদ্বিতীয় আল্লাকে স্বীকার ('কলেমা')। 'শরীয়া' পালন করাই খাঁটি ইস্‌লামপন্থীর লক্ষ্য। সুফিরা শরীয়তের উপর কোনো প্রকার গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। ইহা ছাড়া অবতারবাদ এবং আত্মার নিত্যতা সম্বন্ধেও ইসলামপন্থীদের সহিত সুফীদের মতের মিল নাই[১] ॥

.... ১০

সুফি ও ইসলামপন্থার মূলগত পার্থক্যের পটভূমিকায় "ইস্‌লামী ও সুফি ভক্তি সঙ্গীত" গুলি পাঠ করিলে উহাদের মর্মোদ্ধার করা সহজতর হইবে। প্রসঙ্গতঃ ভারতীয় এবং বঙ্গীয় আধ্যাত্মিক পরিবেশকেও স্মরণ করিতে হইবে। এই দুইটি কথা স্মরণে রাখিয়া এইবার সঙ্কলিত সঙ্গীতগুলির আলোচনা করা যাইতে পারে।

আলোচ্য গুচ্ছের মধ্যে ধৃত গানগুলির (সং ৪৬ হইতে সং ৬৯ পর্যন্ত) মধ্যে মোটামুটি চারিটি ধারার সন্ধান মিলে : (ক) ভারতীয় আধ্যাত্মিক পরিবেশ (খ) কোরান অনুমোদিত শরীয়তের বিধি, এবং ইস্‌লামী পুরাণ কাহিনী (গ) সুফি তত্ত্ব ও মতবাদ (ঘ) 'তরীকত' ও 'মারফত'। অবশ্য,

১ ডক্টর রমা চৌধুরী : বেদান্ত ও সুফিদর্শন (১৯৪৪), পৃ ১৫৮-১৬১

কোনো-কোনো গানে একই সঙ্গে একাধিক ধারায় মিশ্রণও লক্ষ্য করা গিয়াছে।

(ক) নিরাকার, একেশ্বরবাদী ইস্‌লাম ধর্মে এই জগৎকে মিথ্যা বলিয়া গ্রহণ করা হয় নাই; আবার সন্ন্যাসবাদকে অস্বীকার করিয়া গার্হস্থ্য জীবনকে যেহেতু কোরানে মানা হইয়াছে, সেই হেতু গার্হস্থ্য জীবনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা কিংবা ইহজগৎ হইতে বিদায় লইয়া পরপারের প্রতি খেয়া ভাসানো পূরাপূরি ইসলামধর্ম বিরোধী। শুধু তাহাই নয়, এখানে ঈশ্বরের রূপ পর্যন্ত কল্পনা করা হইয়াছে। গানে দেখি, 'মাবুদ আল্লাজী' বলিয়া সম্বোধন করিলেও উদ্দিষ্ট দেবতা কোরানের আল্লা নহেন, ইনি ভারতীয় কোনো দেবতা বিশেষ। তাহাই যদি না হইবে, তবে ভবসিন্ধুর চক্রে পড়িয়া কবির মনে পরপারের পিপাসা জাগিবে কেন? কবি কেন আল্লাকে উদ্দেশ করিয়া বলেন, 'পার করিয়ে চরণতলে মোরে দেও বাসা'? (সং ৪৬)। কোরানের বিপরীতক্রমে, কবি জগৎকে মিথ্যা বলিয়া জানিয়াছেন,

আর মায়াজালে বন্দী হইয়া
রহিলাম ভুলিয়া।
বাপ-ভাই-তিরি-পুত্র
কেও না যাইবা সঙ্গে ॥—সং ৪৮

এই যে পৃথিবীকে অস্বীকার করিবার প্রবণতা, ইহা তো ইস্‌লামপন্থি-গণের নহে;—যাঁহারা সংসারকে অগ্রাহ্য করেন ইহা তাঁহাদেরই মর্মবাণী হইতে পারে। নিরাকারবাদী হইয়াও তাই অবতারবাদ দ্বারা প্রভাবিত কবি বলেন, 'এই ভিক্ষা চাই ঠাকুর দেখিতাম তোমারে' (সং ৫১) এবং 'ওরে আখেরে ভরসা রাখি নবীজী-র চরণ ধূলার' (সং ৬৫)। কিংবা, 'সাধনা করিলে পাইবায় রূপের দরশন' (সং ৬৮)। এই সমস্ত গানগুলির মধ্যে ভারতীয় প্রভাবকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

(খ) কতকগুলি গানের মধ্যে প্রাসঙ্গিক ভাবে ইস্‌লাম ধর্মের আচার-মূলক দিক অর্থাৎ শরীয়া-র কথা বিবৃত হইয়াছে। ইসলাম পুরাণ-কাহিনীকে স্মরণ করিয়াও গান রচিত হইয়াছে।

কোরানে ঈশ্বর দণ্ডদাতা, শাসনকর্তা রূপে বর্ণিত হইয়াছেন সত্য, কিন্তু

তিনি যে ক্ষমাকারী ও দয়ালু—সে কথাও লিখিত হইয়াছে। ইব্রাহিম, ইউনুস এবং ইউসুফকে আল্লা বিপদকালে উদ্ধার করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। কবি হাছন রাজা সেই পুরাণ কাহিনীর উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—'দয়া ধরো মুই অধমরে, দয়াল বন্ধু, দয়া ধরো মুই অধমরে' (সং ৫১)। একটি গানে মোহাম্মদ, আলি, ফতিমা, হাসান ও হোসেন—ইঁহাদের পাইবার পন্থা ব্যক্ত হইয়াছে (সং ৫৩)। পরবর্তী গানটিতে স্বর্গ-দূতদের শিক্ষক মহরুম কি করিয়া বেহস্ত্ হইতে নির্বাসিত হইয়াছিলেন, তাহারই বর্ণনা দিয়া কবি বলিতেছেন, 'কোরান মানো, আল্লা চিন,' শয়তানের প্রেম কইরো না' (সং ৫৪)। একটি গানে দিনের বিভিন্ন সময়ে বিধান অনুযায়ী নমাজ পড়িবার ও 'হজ' করিবার কথা বলা হইয়াছে (সং ৫৬)। কোরানের নির্দেশ ঠিক-ঠিক পালন করিলে কেয়ামতের দিন, বা হাসরের ময়দানে আল্লা মানুষকে শাস্তি দিবেন না বা কঠোর রূপ ধারণ করিবেন না। বহু গানে কবরে গিয়া আল্লার শাস্তির কথা স্মরণ করিয়া কবিগণ ভীত হইয়াছেন। হয়তো, কোরানে আল্লার যে রূপটি অঙ্কিত হইয়াছে, সেই রূপ অনুযায়ী তাঁহারাও মৃত্যুদিনে শাস্তির ভয়ে বা কবরে গিয়া বিচারের ভয়ে কাঁপিয়া উঠিয়াছেন। শয়তান মহরুমের পথ অনুসরণ করিলে যে বেহেস্তের বদলে দোজখ জুটিবে, কবি সে বিষয়ে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিয়া শেষে বলিয়াছেন, 'মরণ হাসর তরে যাবে, শমনের ভয় রবে না' এবং 'ডাকার মতো ডাকতে পারলে যাইত দিব বেস্তখানা' (সং ৫৪)। কিংবা,

দুই রেকাত নমাজ পড়ি'
হজ করে গি' মক্কার ঘর।
হাসর তরাইয়া লইবা রছুল-পেগাম্বর ॥

অতঃপর,

আয়তুল্লাহ কয়—পড়ো গো নমাজ
জা'গা পাইবায় বেস্তের ঘর ॥—সং ৫৬

দেখিতেছি, নিষ্কাম ভক্তি বা গূঢ় দার্শনিক চিন্তা বা আল্লার সহিত মিলিত হইবার মরমিয়া পথ কোনোটাই এখানে নাই। দোজখের শাস্তি এবং

হাসরের বিচার এড়াইয়া কি করিয়া বেহস্তে অনন্তকাল বাস করা যায়, সেই সকাম দিকটাই এখানে প্রধান।

এই ধারার গানগুলির উৎস ও প্রয়োজনীয়তা বিচার করিলে স্বতঃই একটা বিরোধিতা লক্ষ্য করা যাইবে। মনে হয়, যে সকল কবি এই সকল গানগুলি রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা অনেক সময় একই গানে কোরানের বিধান ও সেই বিধানের যে বিরোধিতা করিয়াছেন, সে সম্পর্কে সচেতন নহেন। তাঁহাদের শিক্ষার অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটিকে কিংবা ধারণাশক্তির অভাবকে ইহার জন্য হয়তো দায়ী করা চলিতে পারে; কিন্তু, তাহার চেয়ে সঙ্গত হয়—যদি পরিবেশকে দায়ী করি। মনে হয়, একই কবি কখনো পুরা কোরান দ্বারা কখনো বা স্থফি ও ভারতীয় প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন; ইহার ফলে একই গানের মধ্যে কিংবা একই কবির লেখা বিভিন্ন গানের মধ্যে দুই বিরোধী ভাব আসিয়া গিয়াছে। দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটি স্পষ্ট হইবে। ৬২-সংখ্যক গানের প্রথমাংশে শরীয়তের প্রতি যে নিষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে, গানের শেষে তাহা নিঃশেষে অন্তর্হিত হইয়াছে এবং সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব দিয়া উহা শেষ হইয়াছে। ৬৪-সংখ্যক গানের মধ্যে মদিনাবাসী ইমামদের প্রতি যে শ্রদ্ধা নিবেদিত হইয়াছে কিংবা মদিনায় যাইবার জন্য কবির যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটা হিন্দু আবহাওয়া আসিয়া গিয়াছে। ৬৯-সংখ্যক গানটিতে তো সরাসরি ফতিমাকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিয়া উহার ইসলামী আবহাওয়াকে ডালেমূলে উৎপাটিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ৫৭-সংখ্যক গানে পড়ি,

দীন ভবানন্দে বলইন,
দুনিয়ার মায়া সবে ছাড়ো—
জঙ্গলবাসী হও রে মন আল্লার কারণ রে।
তেগি' পাবায় নিস্তার তুমি হ—
হাসরের ময়দানের বারে॥—সং ৫৭

কিন্তু, আল্লাকে পাইবার জন্য কোরানে সংসার ত্যাগ করিবার নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। আসল কথা, ইস্‌লাম প্রতিবেশকে গ্রহণ করা হইয়াছে, কিন্তু কবিরা বোধ হয় ভাব-কে উহার বিপরীত বা অন্য অর্থে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছেন। অথবা, আবদুল্লা আল্‌ বুখারী, আবু বকর্ আল্‌ কালাবাধী

(মৃত্যু ৯৯৫ খৃ:), হুজয়িরি এবং বিশেষরূপে আবু হামিদ মহম্মদ আল্ গাজালী (মৃত্যু ১১১১ খৃ:) প্রভৃতি প্রথম যুগের স্ফিগণ, যাঁহারা সনাতন ইস্লামধর্মের সহিত স্ফিধর্মের একটা সমন্বয় সাধন করিতে চাহিয়াছেন বা পারিয়াছেন, তাঁহাদের দূরতম ও পরোক্ষ প্রভাব এখানে কার্যকরী হইতে পারে। গাজালী তো স্ফি হইয়াও ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে ভয়ের সম্পর্কটিকে (যাহা ইসলাম ধর্মসম্মত ও স্ফিধর্ম-বিরুদ্ধ) পুনরুদ্ধার করেন। এই সকল বিভিন্ন ব্যাপার ও বিচিত্র মানস মিলিয়া এই ধারার গানের মধ্যে এই বিরোধিতা আনিয়াছে।

(গ) স্ফিধর্ম, মত ও মরমিয়াবাদ ব্যক্ত হইয়াছে যে সকল গানে, সে গুলির মধ্যে কবির সারল্য ও আন্তরিকতা সহজেই অনুভূত হইয়া থাকে। এই গানগুলি পড়িলেই কবির অন্তরের আনন্দটি সরাসরি হৃদয়কে স্পর্শ করে।

স্ফিগণের আচারানুষ্ঠানের মধ্যে ঈশ্বরের নাম জপ ও স্মরণ এবং কীর্তন সর্বাগ্রে উল্লেখ যোগ্য। উচ্চৈঃস্বরের ঈশ্বরের নাম কীর্তন করাকে বলা হয় 'দিক্র্ জালী'; নীরবে বা নিম্নস্বরে যে নাম কীর্তন তাহাকে বলে 'দিক্র্ খাফী'[১]। গানে তাই বলা হইয়াছে, 'ও ভাই নাম জপ'রে গুরুরি ছাড়িয়া' (সং ৪৮)। কিন্তু, নাম জপা বা মালা জপাকেই বোধ হয় শ্রীহট্টের স্ফী কবি বড়ো কথা হিসাবে দেখেন নাই। কেননা, তাঁহাদের কণ্ঠে শুনি, মিলবে নারে প্রাণের খোদা তছবি জপিলে' (সং ৫২)।

কোরানের আনুষ্ঠানিক দিককে ইঁহারা অগ্রাহ্য করিয়াছেন, শরীয়া-কে ইঁহারা তাই মানেন না। মুরশিদের নিকট দীক্ষা লইয়া ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে চলাকেই (ইহাকে 'তরীক' বলে) ইঁহারা মান্য করেন। এই পথে চলিয়া ভগবানের প্রকৃত সত্তাকে ইঁহারা জানিবেন (ইহাকে 'হকিক্' এবং যাঁহারা ইহা পালন করেন তাঁহাদের 'হকাইক' বলে) এবং একদিন ভগবানের রহস্যের মধ্যে মরমিয়া সাধক নিজেকে মিলাইয়া দিবেন (ইহাকে 'মারফত' বলে)। তাই ইঁহারা বলেন, 'মিলবে নারে প্রাণের খোদা নমাজ রোজা কইলে' (সং ৫২)। তাঁহারা বলেন, অনুষ্ঠান পালন করিলে বড়ো জোর 'শরার কাজী' নাম হইবে, কিন্তু, সাধনার পথে কিছুই হইবে না। 'তরিকত

---

১ অবশ্য কোরানের কোনো-কোনো শ্লোকও ইঁহারা ধ্যান করিয়া থাকেন।

মঞ্জিলে' (অর্থাৎ 'তরীক' অনুমোদিত পথে) কলিমা-র মধ্য দিয়া নাম জপা, 'হকিকত মঞ্জিলে' আল্লার নামই সার হইবে এবং 'মারিফত মঞ্জিলে' সেই আল্লার মধ্যে বিহার করিতে পারা যাইবে (সং ৬৮)।

শ্রীহট্টের সুফিগণও মনে করেন, প্রেম হইতেই মোহাম্মদ এবং জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, 'আশিক হইয়া খোদা মোহাম্মদ করিলা পয়দা' (সং ৪৯); 'প্রেমেরি কারণ প্রভু-নিরঞ্জন—আহাদের মধ্যে কইলা মিমের মিলন' (সং ৫০); আল্লাকে পাইতে হইলে তাই প্রেম দিয়াই পাইতে হইবে,

আর যদি খোদা ধরতে চাও—
তার সনে পিরিতি বাড়াও।
হয়রে, মিলিব মিলিব খোদা
প্রেমে তার মঞ্জিলে ॥—সং ৫২

সুফিদের সাধনার মধ্যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ও প্রাণায়াম প্রভৃতি রহিয়াছে। আব, আতস, খাক ও বাদ দিয়া প্রস্তুত এই জড় দেহের মধ্যেই তাঁহারা খোদাকে খুঁজিয়াছেন। এই জন্য প্রথমে গুরু বা মুরশিদের সহায়তা লইতে হইবে; কেননা, গুরুর বচনই কলিমার বচন :

গুরুর বচন কইলমা সাধন
ভুইলো না রে মন।
সাধন করিলে পাইবায়
রূপের দরশন রে ॥—সং ৬৮

দেহ সাধনার প্রসঙ্গে তাঁহারা বলিয়াছেন,—এই দেহ যেন আল্লার বাস করিবার ঘর। নমাজ-রোজা ভুলিয়া যাও; রোজাকে রোজা হিসাবে না দেখিয়া সেই ঘরের খুঁটি মনে কর, নমাজকে মনে কর সেই ঘরের ছাউনি (সং ৬১)। ৬৩-সংখ্যক গানেও এই একই কথা বলা হইয়াছে। এই দেহেই আল্লা লুকাচুরি খেলিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহার স্বভাবই তাই, তিনি ধাঁধাবাজ, 'আমার আল্লা ধান্ধাখুর' (সং ৬৭)। তনুর মধ্যেই তাঁহাকে পাইবে, নমাজ পড়িয়া লাভ নাই,

আর আল্লাজীর বানায়া ঘর আপনারি তন—
এই তন ছাড়িয়া নমাজ

পড়ো কি কারণ।

যেই দিকে ফিরিয়া চাই—সেইদিকে প্রাণ-প্রিয়া ॥—সং ৪৫

সুফীদের মানসিক উদারতার শেষ নাই। পর ধর্মের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা, সহিষ্ণুতা ও বিশ্বাস অসীম। তাই তাঁহারা আল্লাকে 'নিরঞ্জন' (সং ৬৬) এবং 'রাধা' (সং ৫৯) বলিতে পিছপা' হন নাই,—অবশ্য বাউলগণ এই মিশ্রণের ফলেই উদ্ভূত হইয়াছিলেন। অকুণ্ঠ চিত্তে তাই ইঁহারা বলিয়াছেন,

মছলমানের 'আল্লা-আল্লা'—

ইন্দুয়ে বলে 'হরি-হরি'।

এগো, যে যেলা পাইয়া আইছে হ' ॥—সং ৬১

চতুর্থ অধ্যায়

॥ বৈষ্ণব গীতাবলী ॥

....১

সঞ্চয়িত 'বৈষ্ণব গীতাবলী'-কে কেন 'পদাবলী' অভিধা দেওয়া হয় নাই, প্রথমেই সে সম্পর্কে কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক। রাধা-কৃষ্ণ প্রেম-তত্ত্ব যে এগুলিতে প্রতিবিম্বিত হয় নাই, কিংবা বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যের ভাব-প্রতিবেশ যে কবিগণ ফোটাইতে পারেন নাই, অথবা বৈষ্ণব মহাজনদের দ্বারা রচিত বৈষ্ণব পদাবলীর রচনাভঙ্গীকে যে আলোচ্য কবিগণ সন্তোষ-জনক সার্থকতায় আয়ত্ত করিতে পারেন নাই,—এমন নহে। যে সকল গানে বৈষ্ণব ভাবানুষঙ্গ ও রচনা-ভঙ্গী নিখুঁতভাবে প্রতিফলিত করিয়াও শেষ পর্যন্ত বাউল-ভাটিয়াল প্রতিবেশকেই মুখ্য করিয়া তোলা হইয়াছে, সে সকল গানকে সরাসরি এই শ্রেণী হইতে খারিজ করিয়া বাউল-ভাটিয়াল স্তবকে আবদ্ধ করা হইয়াছে। বাউল ও ভাটিয়ালের উদ্দেশ্যকে স্মরণে রাখিয়া বৈষ্ণব প্রতিবেশে যে সকল গান রচিত হইয়াছে সে গুলিকে বাদ দিয়া বাকী সেই গানগুলিকেই বর্তমান শিরোনামার নীচে স্থান দেওয়া হইয়াছে,—যাহা সর্বপ্রকারে বাউল-ভাটিয়ালের ভাব-প্রতিবেশ হইতে মুক্ত। তবু, কেন এই শ্রেণীর রচনাকে 'পদাবলী' না বলিয়া, 'গীতাবলী' বলা হইল?

ইহার উত্তরে বলিব, 'বৈষ্ণব পদাবলী' খণ্ড গীতি-কবিতা হিসাবে আমরা পড়ি বটে, কিন্তু আসলে উহা একটি বিশেষ স্তবক বা পর্যায় ধরিয়া কয়েকজন কবির 'পদ' ক্রমান্বয়ে সাজাইয়া পালাকীর্তনের আকারে গীত হয় এবং উহাতে মূল গায়েনের 'আখর' একটি প্রয়োজনীয় ভূমিকা লইয়া থাকে। বর্তমান সংগ্রহের গানগুলি পালাকীর্তনের আকারে গীত হইবার জন্য গ্রথিত হয় নাই, 'আখর' ইহাতে অনুপস্থিত। দ্বিতীয়তঃ, বৈষ্ণব পদ কীর্তনের একটি বিশিষ্ট সুর-রূপ এবং গায়ন-পদ্ধতি আছে; যদিও ঝাড়খণ্ডী, গড়ানহাটী, রানীহাটী, মনোহরশাহী প্রভৃতি নামীয় কীর্তন রহিয়াছে তবুও ইহাদের সাধারণ বিশেষত্ব—ইহারা 'কীর্তন'। কিন্তু বর্তমান গানগুলির সুর শ্রীহট্টের লোক-সঙ্গীতের সুর বা উহাদ্বারা প্রভাবিত। তৃতীয়তঃ, রচনাভঙ্গীর দিক

হইতে ধরিলে দেখি—পদাবলী-সাহিত্যের বিশিষ্ট ছন্দ ও অলঙ্কার ইহাতে নাই। এই তিনটি কারণে আমরা 'পদাবলী' অভিধা গ্রহণ করি নাই।

বর্তমান সঙ্কলনে ধৃত বৈষ্ণব গীতিগুলির অধিকাংশরই রচয়িতা শ্রীহট্টবাসী নিরক্ষর বা অর্ধশিক্ষিত মুসলমান কবিগণ। একদা শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবর্তিত প্রেমধর্ম বঙ্গে ও বহির্বঙ্গে যে ভাবের বন্যা বহাইয়া দিয়াছিল, তাহা হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার বেড়াকে ভাঙিয়া দিয়া বাঙ্গালীকে এক অভিনব ও সর্বপ্লাবী প্রেম-চেতনায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। সেই সাংস্কৃতিক মিলনের সোনার ফসল হইল—মুসলমান বৈষ্ণব কবিদলের রচা এই ধরনের পদ ও গীতাবলী।

বাঙলা সাহিত্যের কয়েকজন গবেষক ও সঙ্কলক এই ধরনের পদ ও গান-গুলির সঙ্কলন ও আলোচনা ইতিপূর্বে করিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য মহাশয় মুসলমান বৈষ্ণব কবিদের পদ ও গানের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের মনোবৃত্তি লক্ষ্য করিয়াছেন। মুসলমান কবিগণ-কর্তৃক এইরূপ গান ও পদ রচনার পিছনে তিনি কয়েকটি কারণ দর্শাইয়াছেন। বঙ্গীয় মুসলমানগণের অধিকাংশেরই পূর্বপুরুষ হিন্দু : ভগবানকে প্রেমাস্পদ-রূপে যেখানে হিন্দুগণ কল্পনা করিয়াছেন, এই নবদীক্ষিত মুসলমানগণ তাহা ভুলেন নাই। সূফী প্রেম-ধর্মের প্রভাব, নিছক লৌকিক প্রেমগীতি রচনার জন্য রাধা-কৃষ্ণলীলার প্রতিবেশ গ্রহণ এবং প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব—প্রভৃতি কারণে ইঁহারা বৈষ্ণব গীতাবলী রচনা করিয়াছেন। কিন্তু সর্বত্র তাঁহারা খাঁটি বৈষ্ণব পদ রচনা করিতে সমর্থ হন নাই। ডাক্তার শ্রী শশিভূষণ দাশগুপ্ত ইহার কারণ নির্ণয় করিয়াছেন।

আলোচনার সৌকর্যার্থে আমরা বর্তমান চয়নিকার বৈষ্ণবগীতিগুলিকে কয়েকটি স্তবকে সাজাইয়াছি : (ক) গৌরাঙ্গের প্রতি (খ) শ্রীকৃষ্ণের প্রতি (গ) জল আনা (ঘ) বাঁশীর প্রতি (ঙ) সখীর প্রতি (চ) বাসক-সজ্জিকা ও বিপ্রলব্ধা (ছ) আক্ষেপ ও প্রেমের স্বরূপ (জ) শ্রীকৃষ্ণের উক্তি॥

....২

বহু বর্ষ ধরিয়া বহুতর কবির লেখনী সঞ্চালনার ফলে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের যে একটি বিশিষ্ট ও সুস্পষ্ট রূপ আমাদের মনের পটে রেখ্

টানিয়া গিয়াছে,—শ্রীহট্টের পল্লীকবিদল তাহাতে কোনো নতুনতর সুরের যোজনা করিতে পারেন নাই বা করেন নাই। না করিয়া ভালোই হইয়াছে। তাহাতে আমাদের মনে বৈষ্ণবতার সম্পর্কে যে একটি বিশ্বাস বাসা বাঁধিয়া আছে, সে বাসার ভিত নড়িয়া উঠিত।

গৌরাঙ্গ-কে লক্ষ্য করিয়া দুই রকমের পদাবলী হইতে পারে : এক, গৌরাঙ্গের জীবন ও জীবন-কাহিনী রূপায়িত হইয়াছে যে সকল পদে ; ইহা নিছক গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ। দুই, গৌরাঙ্গকে শ্রীরাধার ভাব-মূর্তি ধরিয়া লইয়া রাধা-প্রেমের বিচিত্র প্রকাশ লক্ষ্য করা ; ইহা 'গৌরচন্দ্রিকা'। শ্রীহট্ট হইতে সংগৃহীত বর্তমান গান গুলির সবই গৌরাঙ্গ-বিষয়ক মাত্র, 'গৌর-চন্দ্রিকা' নহে। দ্বিতীয়তঃ সঞ্চয়িত গানগুলির মধ্যে যে গৌরাঙ্গের ভাব-মূর্তি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, তিনি অন্তরে কৃষ্ণ ও বাহিরে রাধার যুগল সত্তা নহেন। শ্রীহট্টের কবিগণ বরং বাহিরেই তাঁহাকে কৃষ্ণ জানিয়া নিজেরা রাধা সাজিয়াছেন, নতুবা তাঁহাকে কেবলই তাঁহারা রাধা সাজাইয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ শ্রীরাধা ও গোপীগণ ব্যতীত অপর কেহ কামনা করিতে পারেন না। শ্রীহট্টের কবিগণ রাধা হইয়া শ্রীকৃষ্ণরূপী শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গ কামনা করিয়াছেন বটে, তবে তাহার মধ্যে লীলার ইঙ্গিত নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ যেন অনেকটাই সম্প্রদায় বহির্ভূত শ্রীভগবান হইয়া উঠিয়াছেন।

'গৌরাঙ্গের প্রতি' শীর্ষক স্তবকটির মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি ধারার সন্ধান পাওয়া যাইবে:

(ক) গৌরাঙ্গদেব যাহা দিয়া বঙ্গবাসীকে মাতাইয়া ছিলেন, তাহা নাম গান। নাম-প্রেমের মালা গাঁথিয়াই তিনি সবাইকে একসূত্রে বাঁধিয়াছিলেন। শ্রীহট্টের কবিগণ এই নামগানকেই ভব-যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইবার উপায় হিসাবে দেখিয়াছেন ;—এখানে বৈষ্ণবতার ইঙ্গিত ততখানি নাই, যতখানি রহিয়াছে সম্প্রদায় নির্বিশেষে গৌরাঙ্গ নামধেয় ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণের ইঙ্গিত।

একবার গৌর গৌর গৌর বইলে
ডাক রে রসনা :

যারে ডাকলে অঙ্গ শীতল হবে—
দূরে যাবে ভব-যন্ত্রণা ॥—সং ৭০

কবি বলেন, 'আমার ঘুরছে শমন পাছে পাছে' (সং ৭১) : সেই শমন-ভয় হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তিনি গৌরাঙ্গের শরণ লইয়াছেন। বৈষ্ণবতার ইঙ্গিত এখানে স্পষ্ট নয়।

(খ) শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ দর্শন করিয়া সেই দর্শনজনিত আনন্দ-উল্লাস ও জ্বালাময় অসহ্য সুখানুভূতিকে কিছু-কিছু গানের আধারে ধরিয়া রাখা হইয়াছে। এই রূপ-দর্শনজাত গানগুলির মধ্যে দুইটি ভাগ লক্ষ্য করা যায় : একদিকে গৌরাঙ্গকে শ্রীরাধা সাজানো হইয়াছে, তখন তাঁহার বিরহিণীর মূর্তি ; অপরদিকে তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ সাজাইয়া কবিরা বিরহিণী শ্রীরাধার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু, আশ্চর্যের কথা এই যে, শ্রীগৌরাঙ্গকে শ্রীকৃষ্ণই করা হউক বা শ্রীরাধাই করা হউক,—কবিরা যেন গানের শেষে লীলার প্রসঙ্গ অপেক্ষা আত্মসমর্পণের ভাবটিকেই বড়ো করিয়া ফেলিয়াছেন। ইহাকে বৈষ্ণব রসচেতনার দিক হইতে ত্রুটিপূর্ণ বলা অপেক্ষা আঞ্চলিক একটি বিশেষত্ব হিসাবে নির্দেশ করাই শ্রেয়।

শ্রীগৌরাঙ্গের রাধিকারূপ অঙ্কন করিয়াছেন কবি এই বলিয়া,

দেখ আসিয়া, নব নাগরী গো,
সুন্দর গৌরাঙ্গ রায়।
নাগরী গো, সুন্দর কপালে সুন্দর তিলক—
সুন্দর নামাবলী গায় ॥···
না জানি কোন্ রসে ভাসে—
গৌরায় কখন্ কান্দে, কখন্ হাসে ;
প্রেমানন্দে রাধার গুণ গায় ॥—সং ৭৩

কিন্তু গানের শেষ পর্যন্ত লীলাপ্রসঙ্গ বজায় থাকে নাই,—কবি তখন গৌরাঙ্গের পদতলে আশ্রয় খুঁজিতেছেন : 'হরি, জনমের মতো বিকাই রাঙা পায়'। উল্টা দিকে, শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীকৃষ্ণমূর্তি রচনা করিয়া কবি নিজেকে বিরহিণী শ্রীরাধার আসনে স্থাপনা করিয়াছেন। শ্রীরাধার মতো কবি গাহিয়াছেন,

আমি কি হেরিলাম গো নদীয়াপুরে।

সোনার বরণ গৌরাঙ্গ চান্দ—
দেখলে প্রাণ বিদরে ॥—সং ৭৪

কিন্তু এখানেও গানের শেষে লীলাপ্রসঙ্গের চেয়ে আত্মসমর্পণ বড়ো হইয়াছে—

ওহে নদীয়াবাসী গো,
মন দিলাম রূপপানে, প্রাণ দিলাম পিছনে—
জাতিকুলমান সবই দিলাম
আমি পাইনা চরণ কেনে ॥—ঐ

আর একটি গানেও কবি আরম্ভ করিয়াছেন এই বলিয়া,

গৌর, রূপে আমার পাগল করিলে গো—
যন্ত্রণা আর সহে না প্রাণে ॥—সং ৭৬

কিন্তু পরবর্তী স্তবকেই কবির দাস্য ভাব ফিরিয়া আসিয়াছে, 'ওরে, পাব নি গো যুগল চরণ…জীওনে-মরণে'। এদিক দিয়া ৭৯-সংখ্যক গানটিকে ব্যতিক্রমধর্মী বলিতে হয়—ইহাতে আগাগোড়া লীলাপ্রসঙ্গ বজায় আছে। গানটিকে এইজন্য এই ধারার একটি শ্রেষ্ঠ গান বলা চলে।

(গ) গৌরাঙ্গদেবের জীবনে ঘটা কিছু-কিছু ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া গান রচিত হইয়াছে। নাম-প্রেম বিতরণ, শচীর দুলাল হিসাবে জগতে অবতরণ এবং নিতাই ও জগাই-মাধাই প্রসঙ্গ এই ধরনের গানগুলির বিষয়। ৭৮, ৮১, ৮২, ৮৩ ও ৮৪-সংখ্যক গানগুলি এই দলে পড়ে ॥

……………………………………………………………………৩

'শ্রীকৃষ্ণের প্রতি' গুচ্ছের গানগুলির মধ্য দিয়াও এই সত্যের প্রতিফলন ঘটিয়াছে। এখানেও গানের মধ্যে লীলাপ্রসঙ্গ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণ লইবার ও আত্মসমর্পণ করিবার বাসনাই প্রবলতর সুরে বাজিয়াছে। এইদিক হইতে বিচার করিলে 'গৌরাঙ্গের প্রতি' ও 'শ্রীকৃষ্ণের প্রতি' গুচ্ছদ্বয়ের মধ্যে ভাবগত বিশেষ পার্থক্য অনুভূত হইবে না।

এখানেও কবি আরম্ভ করিয়াছেন 'বলো বন্ধু, তুমি নি আমার রে' বলিয়া ; কিন্তু পরবর্তী স্তবকেই বলিতে শোনা যায়—'শ্রীচরণে অইতাম দাসী আমি ও মৃত কালেতে' (সং ৮৫)। পরের গানটিতে এই কথাটি স্পষ্টতর হইয়াছে,

সোনাবন্ধু পিওরায়, তুমি বিনে প্রাণ রাখা দায়
এগো, পড়িয়াছি সঙ্কট-সায়রে—
না দেখি গো উপায় ॥—সং ৮৬

কিংবা,

আর আমি তোমার, তুমি আমার
আর কিছু নাই।
ওরে জনমের মতো যেন
দাঁড়াইবার জা'গা পাই ॥—সং ৮৮

৮৭-সংখ্যক গানটিতে অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের জন্য শ্রীরাধার প্রেম-ব্যাকুলতা ও লীলাপ্রসঙ্গ নিরবচ্ছিন্ন ধারায় বহমান।

'জল আনা'-র গান দুইখানির মধ্যে কোনো নতুন ভাব-ব্যঞ্জনা নাই। প্রথম গানটির মধ্যে (সং ৮৯) রসাভাস ঘটিয়াছে। 'নন্দের গোপাল' ননী চুরি করিয়া যেখানে শিশু সাজেন, সেখানে বাৎসল্য রসের সুন্দর পদ রচিত হইতে পারে; কিন্তু সেই ননীচোরা গোপালই যখন একই গানের মধ্যে প্রেম-বিলাসী শ্রীকৃষ্ণ হইয়া যমুনা-পথ-গামিনী শ্রীরাধার পথ আটকাইয়া 'পরিবাদ' দেন—তখন তাহাতে রসচ্যুতি ঘটে। অপর গানটি (সং ৯০) একটি সুন্দর গান।

'বাঁশীর প্রতি' লক্ষ্য করিয়া শ্রীরাধার উক্তিগুলি বৈষ্ণব গীতি-সাহিত্যের সম্পদ। ব্যক্তি অপেক্ষা বস্তু এবং রূপের আকর্ষণ অপেক্ষা সুরের আকর্ষণ এই স্তবকের গানগুলির মধ্যে প্রখর হইয়া উঠায় প্রেমের তীব্রতা ও তীক্ষ্ণতা ইহাতে অনেক বেশী। কথার কান্না অপেক্ষা সুরের কান্না যে অধিকতর মর্মস্পর্শী এবং প্রেমিকের রূপ-সত্তা অপেক্ষা তাঁহার হস্তধৃত বাঁশী যে প্রেমিকাকে উতলা করিতে অধিকতর সক্ষম—'বাঁশীর প্রতি' গীত গানগুলি সেই সত্যের ইঙ্গিত বহন করিতেছে।

শ্যামের বাঁশী শ্রীরাধাকে ঘরের বাহির করিয়াছে (সং ৯১), তাঁহার কুল-মানের ভয় দূরে গিয়াছে (সং ৯২)। বাঁশীর জালাময় আহ্বান তিনি সহিতে পারেন না, দিবা-নিশি কাঁদিয়া মরেন (সং ৯৩)। তাঁহার মনে হয়, দাসী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পদপ্রান্তে আপনাকে ঢালিয়া দেন, কিন্তু শাশুড়ী-ননদী বাদ সাধে (সং ৯৩)। কুলের বাধা ও বাঁশীর আহ্বানে বিহ্বল শ্রীরাধা

তাই শ্রীকৃষ্ণকে 'নিষ্ঠুর বন্ধু' বলিয়া সম্বোধন করেন এবং যে বাঁশ দিয়া সেই বাঁশী প্রস্তুত হইয়াছে,—সেই বাঁশের ঝাড় উপড়াইতে চাহেন (সং ৯৭); কিংবা, সখীদের অনুরোধ করেন—শ্রীকৃষ্ণের হাতের বাঁশীটি কাড়িয়া আনিতে (সং ৯৮)। কিন্তু, পরক্ষণেই অভিমান আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরে—কেননা, প্রেম জাগাইয়া কৃষ্ণ আজ রাধাকে ফেলিয়া অন্যত্র বিদায় লইতেছেন। রাধা বলেন, বাঁশী রাখিয়া যাও: 'অবশ্য আসিবায় তুমি—ওই বাঁশীর লাগিয়া রে' (সং ১০০)। বৈষ্ণব পদাবলীর পাঠক-শ্রোতার নিকট ইহার একটিও নতুন কথা নহে।

বাঁশীকে গঞ্জনা দিয়া শ্রীরাধা যে সকল উক্তি করিয়াছেন, তাহা যেন অনেকটাই তাঁহার প্রেম-কাতর মনের বিলাপ ও স্বগতোক্তি। ইহা যেন নিরালায় রহিয়া আপন অন্তরতরসত্তাকেই আপন দুঃখ-কাহিনী শুনাইয়া দেওয়া। নিজেই ইহার বক্তা, নিজেই ইহার শ্রোতা। কিন্তু, 'সখীর প্রতি' গুচ্ছে আবদ্ধ গানগুলি কেবল একার কথা ও কাজ নহে। শ্রীরাধার প্রেম এখানে হয় প্রাথমিক স্তরে থাকিবার জন্য প্রকাশের ভাষা পাইয়াছে,—নতুবা পরিণত হইবার জন্য সঙ্কল্পে দৃঢ় হইয়াছে। আবার কখনো তিনি সখীর নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিয়াছেন কিংবা অনুরোধ জানাইয়াছেন।

এই স্তবকের গানগুলির মধ্যেও কোনো নতুন কথা নাই। কালিয়ার রূপ দর্শন করিয়া শ্রীরাধার মন আলুলায়িত হইয়াছে (সং ১০১), তিনি বলেন, 'সদাই আলাই' মাইল কালায় মোরে' (সং ১০২): 'হৃদ্‌কমলে জলছে আনল—আনলে জল দিলে আর নিভে না গো' (সং ১০৩)। সখীকে বলেন: 'দারুণ পিরিতের ফাঁস আপন খেদে লাগাইছি—বলো সই, উপায় কি করি' (সং ১০৪)। কৃষ্ণকে কোথায় পাওয়া যায়, সে প্রশ্ন তিনি সুধাইয়াছেন: 'আমার বন্ধু আনি' দেও গো তোরা' (সং ১০৭) এবং 'বন্ধের নাম শুনাও গো প্রাণ সই' (সং ১০৮)। তিনি তমালডালের সহিত আপনাকে বাঁধিয়া রাখিতে চাহেন,

> তমালডালে বাজও হে বেণু—
> তমালডালে লাগছে গো রাধা-শ্যামের পদের রেণু।
> ওরে, তমালডালে আমার গলে গো
> আমি একাত্র বান্ধিয়া থই ॥—সং ১০৮

পরিশেষে কোকিলকে সখী-ভাবে ডাকিয়া কহেন,

বিনয় করি' বলি, কোকিল রে কোকিল,
রাধার উকিল অইয়ো।
এগো, শ্যাম-বিচ্ছেদে রাই-দুখিনীর সংবাদ
জানাইয়ো রে ॥—সং ১১৩

কথার আন্তরিকতা ও সুরের নিবিড়তা এই সকল গানকে অপূর্ব শ্রী-মণ্ডিত করিয়াছে ॥

'বাসক-সজ্জিকা ও বিপ্রলব্ধা' স্তবকে আবদ্ধ গানগুলির মধ্যে প্রত্যাশিত বৈষ্ণব সাহিত্যের পরিবেশ হইতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি নাই। এখানেও শ্রীরাধা বাসর জাগিয়াছেন সঙ্গীবিহীন হইয়া, শ্রীকৃষ্ণ না আসিবার জন্য প্রথমে মনে জাগিয়াছে ক্ষোভ ও অভিমান, পরে প্রতিনায়িকার প্রতি ঈর্ষা; বিফল রাত্রি শ্রীরাধাকে প্রেমের গভীরতা ও উহার জ্বালাময় সত্তার দিকটি সম্পর্কে সচেতন করিয়া তুলিয়াছে; প্রেমের বিহ্বলতায় সখীদের বিবিধ প্রশ্ন করিয়াছেন এবং পরিশেষে মানবিক জগৎ ছাড়িয়া নিসর্গ-জগতের সহিত মিতালী করিয়াছেন আপনার দুঃখকাহিনীকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট ব্যক্ত করিবার জন্য। এখানেও ব্যর্থ প্রতীক্ষার বাসর-রাত্রির অবসানে নায়ক যখন প্রতিনায়িকার সহিত লীলা-বিলাসে নিশি যাপনের চিহ্ন অঙ্গে মাখিয়া শ্রীরাধার সম্মুখীন হইয়াছেন, অভিমানিনী শ্রীরাধা ঠিক বৈষ্ণব পদাবলীর বিপ্রলব্ধা নায়িকার মতোই বলিয়াছেন, 'ছুঁইয়ো না, ছুঁইয়ো না কালা, ছুঁইয়ো না, ছুঁইয়ো না মোরে' (সং ১২১)। তফাতের মধ্যে শুধু এই,—বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রীরাধা সঙ্কেতকুঞ্জে অভিসার করিয়া তবে নায়কের প্রতীক্ষা করিয়াছেন; বর্তমান ক্ষেত্রের গানগুলিতে অভিসারের ইঙ্গিত ফোটে নাই,—শ্রীরাধা যেন আপনার গৃহাঙ্গনেই প্রতীক্ষা করিতেছেন।

'আক্ষেপ ও প্রেমের স্বরূপ' বর্ণিত হইয়াছে যে সকল গানে, যথার্থই সেগুলি বৈষ্ণব গীতি-সাহিত্যের সম্পদ-স্বরূপ। এই পর্যায়ভুক্ত গীতাবলীর মাধ্যমে কবিগণ প্রেমসম্পর্কে তাঁহাদের নিবিড় চেতনা ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনু-
উহার দেশ-কাল-নিরপেক্ষ সর্বাতিশায়ী, বিরুদ্ধধর্মময় জ্বালাগর্ভ

স্বরূপটিকে সার্থকতম ভাবে ও সুরে রূপ দিয়াছেন। প্রেম সম্পর্কে শ্রীহট্টের লোক-কবিদের চিন্তা-স্রোত বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যের কবিদলের ভাবনার সহিত সমান্তরাল ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে। এই পর্যায়ের গানগুলির মাধ্যমে তাঁহারা প্রেমের যে স্বরূপটিকে অনুধাবন করিতে চাহিয়াছেন, তাহার রূপরেখা এই :

(ক) প্রেমের তল নাই,—যতই গভীরে যাওয়া যাক না, উহা গভীরতর দিককে নির্দেশ করিয়া শেষ পর্যন্ত রহস্যময় ও অবোধ্যই থাকিয়া যায়। এই রহস্যময়তা ও অবোধ্যতাই প্রেমের স্বরূপ, উহাই অন্তরে এক অসহ্য সুখানুভূতির সৃষ্টি করে। সেই জ্বালাময় স্বরূপই প্রেম সম্পর্কে যে আপাত-বিরাগের সূচনা করে, তাহাই আক্ষেপানুরাগ। প্রেমের সেই রহস্যময়তাকে স্মরণ করিয়াই শ্রীরাধা বলেন, 'প্রেম কইলাম তার মর্ম না জানিয়া' (সং ১২৬); আক্ষেপ করিয়া বলেন, 'আর আগে যদি জানতাম গো এমন—ও সই পিরিতে মন দিতাম না কখন' (সং ১২২)। আজ তাঁহার নিকট এই অসহ্য জ্বালার চেয়ে মৃত্যুই কাম্য : 'আনো তো কটরা ভরি,' আমি জ'র খাইয়ে মরে যাই' (সং ১৩০)।

(খ) এই প্রেমের এমনই স্বরূপ,—ভুলিতে চাহিলেও ভোলা যায় না,—অনির্বাণ শিখায় তাহা অন্তরকে দহন করিয়া চলে : 'ধাক্‌ধাকাইয়া জ্বলছে আনল—নিবাইতে আর শক্তি নাই' (সং ১২৩)। আবার এমনই উহার বিপরীত ও বিরুদ্ধ রীতি যে 'ও জ্বালা সইতে গেলে উঠে দ্বিগুণ হইয়া' (সং ১২২)।

(গ) প্রেমের মধ্যে পরিপূর্ণ তৃপ্তির স্বাদ কখনই নাই। অথচ, তৃষ্ণার ইঙ্গিত উহাতে অপার। তৃষ্ণা ও তৃপ্তির মিলন কোনোদিনই হয় না, কোনো প্রেমিকই সেই মিলন সাধন করিতে পারেন না : 'আমার মনে চায় সর্বদায় যৈবনদান প্রেম খেলায়—কিন্তু প্রেমিক পাওয়া দায়' (সং ১২৩)।

(ঘ) প্রেম পুরুষের জীবনে বহুর মধ্যে একটি ঘটনা, কিন্তু নারীর জীবনে উহাই সব ঘটনা। প্রেমের পূর্ণতা ও স্বরূপকে তাই প্রেমিক যতখানি না উপলব্ধি করিতে পারেন, প্রেমিকা তাহার চেয়ে বেশী পরিমাণে পারেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ব্যতীত প্রেমের উপলব্ধি সম্ভব নয়।

(ঙ) প্রেমের প্রারম্ভ ও পরিণতির মধ্যে বিস্তর ভাবগত ব্যবধান

রহিয়াছে। ইহার শুরু সুখের কিন্তু শেষ দুঃখের। কালার প্রেম 'তিতা-মিঠা' : তাই শ্রীরাধার মনে হইয়াছে : 'এগো পন্থে যাইতে মধুর লোভে গুড় বলি' খাইয়াছি চিটা' (সং ১২৮) ; 'আগে যে বাড়াইয়া প্রেম শেষে দেয় জ্বালা' (সং ১৩৩)। 'প্রথমকু পিরিতে মজা, দ্বিতীয়ে পিরিতে সাজা গো—' (সং ১৪০)।

(চ) কাল্পনিক উপেক্ষা ও অবজ্ঞাকে স্মরণ করিয়া অভিমান প্রকাশ এবং অসহায়ত্ব অনুভব প্রেমের আর একটি দিক। চাওয়া ও পাওয়ার দ্বন্দ্বে প্রেমিক-প্রেমিকার মন ক্ষত-বিক্ষত হয় : 'আর যার জন্যে, মন টানে গো— ও সই, সেই নাহি ফিরিয়া চায়' (সং ১২৩)। 'এগো, আমি যারে ভালোবাসি সে আমারে বলে নাটা' (সং ১২৮)। 'আমার দরদী নাই জগতে—আমি একা ভাবি এ ভব-সংসারে' (সং ১২৯)। 'আপন-আপন বলি যারে সেও তো আপন হইল না রে' (সং ১৩৪)।

(ছ) প্রেম সম্পর্কে শ্রীরাধা কয়েকটি সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছাইয়াছেন ; সখীদের নিকট তিনি তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। যেমন, 'প্রেম করো সই মানুষ চাইয়ে—মইলে যারে মিলে' (সং ১২৪)। 'এগো পিরিতি পিঞ্জিরার পাখী—ছুটলে ধরা যাব না' (সং ১৩৫)। 'সহজ পিরিত হইতে পারে— দুইজন হইলে একমনা' (সং ১৩৯)। ১৪০-সংখ্যক গানখানি এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য : 'পিরিতের ছেল বুকে যার, কলঙ্ক তার অলঙ্কার' ; 'সদায় থাকে উদাসিনী গো' ; 'ক্ষুধা-নিদ্রা নাই রে তার মনে, জল-ধারা দুই নয়নে গো' ; 'সদায় থাকে ঘোর নয়নে গো' ; 'লোকের নিন্দন পুষ্প-চন্দন' ; 'কেবল বন্ধু বন্ধু বন্ধু সার'।

(জ) অভিমান করিয়া প্রেমিককে 'কঠিন হৃদয়' ও 'পাষাণ-বান্ধা হিয়া' বলা হইলেও শেষ পর্যন্ত প্রেমিকেরই গৌরব ঘোষণা করা হইয়াছে : 'আর আমার বন্ধু পরশমণি—কতো লোহা মানায় সোনা গো' (সং ১২৬)।

বৈষ্ণব পদসাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ ভূমিকা খুব বেশী নাই। শ্রীরাধার খাতিরেই শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ ঘটিয়াছে। সঙ্কলিত বৈষ্ণব গীতাবলীর অন্তিম গানটি 'শ্রীকৃষ্ণের উক্তি'। শ্রীরাধার অভিযোগ এই গানে শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ হইতে বুমেরাং হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। যে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে 'কঠিন হৃদয়' বলিয়া বিশেষিত করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকেই যখন গাহিতে শুনি—

মাইয়ার মন পাষাণে বান্ধা

দয়া নাই অন্তরে।

রাধা রাধা রাধা বইলে—

ভাই, অন্য কথা নাই মুখেতে ॥—সং ১৪১

তখন প্রেমের ক্ষেত্রে নর-নারীর পারস্পরিক অভিযোগের মাধুর্য-সৌরভে বিস্মিত হই ॥

পঞ্চম অধ্যায়

॥ বাউল ॥

"...সংস্কৃত বাতুল শব্দের প্রাকৃত রূপ বাউল। যাঁহারা বাতাধিক তাঁহারা পাগল, যাঁহাদের আচরণ সাধারণের তুল্য নহে, লোকে তাঁহাদিগকে পাগল বা বাতুল বলে, এরূপ সাধারণ সমাজ বহির্ভূত আচার-ব্যবহার-সম্পন্ন ধর্ম-সম্প্রদায় বাউল[১]।" বাউল ভাবের পাগল, রসের সাধক। এই অর্থে হিন্দী 'বাউরা' (অর্থ: পাগল) কথাটির সহিত ইহার ধ্বনি ও ভাবসাদৃশ্য রহিয়াছে। ইষ্টের জন্য ইঁহারা 'ব্যাকুল' বলিয়া অনেকে 'ব্যাকুল' হইতে 'বাউল' আসিয়াছে বলিয়া মনে করেন। ইঁহাদের বাহ্যজ্ঞানহীনতা দেখিয়াই হয়তো রাঢ় দেশে ইঁহাদিগকে 'ক্ষেপা' বা 'ক্ষেপা বাউল' বলা হয়। প্রেমের পথে রসের সাধনা করেন বলিয়া এবং ইঁহাদের সাধনায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রভূত ভাব আছে বলিয়া কোথাও কোথাও (বিশেষতঃ নবদ্বীপে) ইঁহাদিগকে বলা হয় 'রসিকবৈষ্ণব'। বাউলের সহিত 'আউলে'র কথাও আসে। অনেকে 'আকুল'-কে 'আউলে'র উৎস বলেন।

'আউল' বা 'আউলিয়া' বাউল সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত এক শ্রেণীর মুসলমান ফকির,—বর্তমানে 'আউল' ও 'বাউল' এক হইয়া গিয়াছে[২]। বাউলের এই স্বাভাবিক চেতনশূন্যতা সূফীদের 'দেওয়ানা'-কে স্মরণ করাইয়া দেয়। ভাবের ঘোরে, রসের নেশায় মত্ত থাকেন বলিয়াই বাউলগণ স্বতন্ত্র থাকিতে ভালোবাসেন, সামাজিক জীবন পূর্ণভাবে যাপন করেন না,—আপনার সাধ্য-সাধন কথা সম্পর্কে তিনি নীরব। বাহিরের কেহ যাহাতে সহজে তাঁহাদের ধর্ম ও সাধনার কথা জানিতে বা বুঝিতে না পারেন সেই জন্য তাঁহাদের গান অনেক সময় প্রহেলিকাধর্মী ভাষা, ইঙ্গিত ও সঙ্কেতময়।

---

১ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গবীণা, পৃ ৪৫১। অক্ষয়কুমার দত্ত : ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় (প্রথম ভাগ, ১৩১৮), পৃ ২৩৪

২ মুহম্মদ এনামুল হক্ : বঙ্গে সূফী প্রভাব (১৯৩৫), পৃ ১৮৯-৯০

বাউলদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা আদৌ নাই,—হিন্দু-মুসলমান সকলেই বাউল সম্প্রদায় ভুক্ত হইতে পারেন। তবে, মূলতঃ যাঁহারা মুসলমান তাঁহাদিগকে 'ফকির' বলা হইয়া থাকে। আনুষ্ঠানিক ভাবে ইহারা 'শরীয়ত'-বাদী নহেন বলিয়া ইঁহাদিগকে 'বে-শরা ফকির'-ও বলা হয়। ইঁহাদের সাধনা রহস্যমূলক বলিয়া ইঁহাদের অপর নাম 'মারফতী ফকির'।

বেশবাস দেখিলেই বাউলকে চেনা যায়। ইঁহারা গৈরিক আঙরাখা পরেন, মালা-তিলক ধারণ করেন, বড়ো-বড়ো চুল-দাড়ি রাখেন। চুল রাখা বা উঁচু করিয়া বাঁধা না বাঁধা বাউলের নিজের ইচ্ছা। ভিক্ষার সময় হাতে লাঠি ও নারিকেলের খোলা, কাঁধে ঝুলি লন। গানের সঙ্গে বাজানো হয় লাউয়া, বা গাব-গুবা-গুব বা গুপীযন্ত্র বা একতারা। নাচের সময় কোমরে ডুবকী, পায়ে নূপুর বাঁধিয়া লন। মুসলমান ফকিররা পরেন সাদা বা গেরুয়া লুঙ্গী, গায়ে ওই রঙের আঙিয়া এবং গলায় প্রবাল বা স্ফটিকের মালা ব্যবহার করেন[১]।

বাউলের এই বেশবাসের মধ্যেই তাঁহার মনের পরিচয় রহিয়াছে। এই পোষাক গৃহীর পোষাক নয়। বাউল যখন গান গাহিয়া থাকেন তখন নাচেনও। সেই নৃত্যের প্রতি পদক্ষেপে এবং চোখের দৃষ্টিতে গৃহজীবন ও সংসারের প্রতি প্রবল উপেক্ষার ভাব আছে[২]॥

.... ২

স্বর্গীয় ক্ষিতিমোহন সেন-শাস্ত্রী, ডাক্তার শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত, এবং ডাক্তার শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় দীর্ঘকাল ধরিয়া পরিশ্রম করিয়া বাঙলার বাউল-সম্প্রদায় ও তাঁহাদের উৎপত্তি-ক্রমবিকাশ সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা করিয়াছেন[৩]। উপেন্দ্রনাথ বাবুর মতে—মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ

১ অক্ষয়কুমার দত্ত: ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় (প্রথম ভাগ, ১৩১৮) পৃ ২৩৩

২ "বাউলদের বাহিরেও বাউলিয়া মতের বহু-লোক এবং সাধনা আছে। তাঁহাদের বাণীতে গানে ও রচনায় তাহা দেখা যায়। আবার বাউলদের মধ্যে অবাউলও অনেক আছে। বাউল-ভাব হইল অন্তরের সত্য। বাহিরের এই ভাগ-বিভাগে ইহার পরিচয় দেওয়া চলে না।"—ক্ষিতিমোহন সেন: বাঙলার বাউল (১৯৫৪), পৃ ৫০

৩ ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী: বাঙলার বাউল (১৯৫৪)। শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য: বাঙলার বাউল ও বাউল গান (১৩৬৪), *Dr S. B. Dasgupta:* Obscure Religious Cults (1962), *pp 157-187.*

বিজয়'-এ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত'-এ, চণ্ডীদাসের রাগাত্মিকা পদের মধ্যে 'বাউল' কথাটি ব্যবহৃত হইলেও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত 'বাউল' শব্দটি কোনো একটি নির্দিষ্ট ধর্ম-সম্প্রদায়ের লোক বুঝাইতে ব্যবহৃত হয় নাই। "আনুমানিক ১৬৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ পৌনে তিনশতবৎসর ইহার উৎপত্তি, বিস্তৃতি ও পরিণতির শেষ অবস্থা-কাল বলিয়া আমরা ধরিতে পারি[১]।"

বাউলধর্মের মূল ভিত্তি হইল—গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম। ইহার উপর তান্ত্রিক বৌদ্ধ-সহজিয়া ধর্ম ও সূফীধর্মের প্রভাবও যথেষ্ট আছে। আসলে বাউলধর্ম একটি মিশ্রধর্ম। ইহার মধ্যে বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, সূফী, মুসলমান—সকলের এক বিচিত্র মিশ্রণ ঘটিয়াছে। তবুও, বাউল ধর্মের এমন একটি বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে, যাহার ফলে উহার খাঁটি বৈষ্ণবধর্ম, তান্ত্রিক বৌদ্ধ-সহজিয়া ধর্ম কিংবা সূফীধর্ম হইতে অনেকখানি পৃথক। সূফীধর্ম মূলতঃ জ্ঞানমূলক আর বাউলধর্ম যোগক্রিয়ামূলক।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে বাঙলাদেশে 'সৌখীন বাউলে'র আবির্ভাব হয়। ইহা বাউল গানের ইতিহাসের এক বিবর্তন। এই ধরনের বাউলদের মধ্যে কুমারখালি নিবাসী হরিনাথ মজুমদার (যাঁহার ভণিতা কাঙাল ফিকিরচাঁদ), এবং পাবনা জেলার গোলোকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (যাঁহার ভণিতা দীন বাউল) নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা আনুষ্ঠানিক বাউল নহেন—বাউল ধর্মের সকল তত্ত্বও গানে আলোচিত হয় নাই। এই ধরনের গানগুলিকে খাঁটি বাউলগান বলিয়া অনেকেই স্বীকার করিতে চাহেন নাই। রবীন্দ্রনাথের গানে ও কবিতায় বাউলের মিষ্টিকতা ও সুর প্রতিধ্বনিত হইয়াছে।

বাঙলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাউলদের আড্ডা রহিয়াছে। এক-একটি অঞ্চলে এক-একজন বাউল বিখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। আজ পর্যন্ত যিনি শ্রেষ্ঠ বাউল সাধক ও গীতি-রচয়িতা হিসাবে বিবেচিত হন, তিনি ফকির লালনশাহ। লালন নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার ভাঁড়রা গ্রামে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ নাগাদ জন্মগ্রহণ করেন,—এবং ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাস নাগাদ মারা যান। সেই হইতে কুষ্টিয়া বাউলদের একটি আড্ডা হইয়াছে।

---

১ বাঙলার বাউল ও বাউল গান (১৩৬৪), পৃ ১৩২। কিন্তু ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় লিখিয়াছেন: "মহাপ্রভুর বহু পূর্বেই বাউলিয়া মত ও বাউলদের নাম পাই"—পৃ ৪৮। পুনশ্চ, "মহাপ্রভু এবং তাঁহার সঙ্গীরা অনেক সময় বাউল বলিয়া নিজেদের অভিহিত করিয়াছেন। কাজেই বুঝা যায়, বাউলদের তাঁহারাও জানিতেন।"—পৃ ৫০

বাউলদের অন্যান্য আড্ডার মধ্যে বিখ্যাত হইল—নবদ্বীপ ও কেঁদুলি। রাঢ় দেশের মধ্যে বর্ধমান জেলার পশ্চিমাংশ হইতে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর পর্যন্ত বাউলগানের বর্তমান আস্তানা। মধ্যবঙ্গের নদীয়া, শিলাইদহ; উত্তরবঙ্গের কিছু অংশ, ঢাকার নরসিংদি; এবং শ্রীহট্ট জেলাতেও প্রচুর বাউল দেখা যায়[১]। আচার-অনুষ্ঠানের দিক হইতে বিভিন্ন অঞ্চলের বাউলদের মধ্যে একটু-আধটু পার্থক্য লক্ষিত হইয়া থাকে।

বাউল যে গান গাহিয়া থাকেন তাহার নামও 'বাউলগান'। এই গানেই তাঁহাদের সব কথা, সব তত্ত্ব ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহাদের তত্ত্বকথাকে অন্য কোনো বই-পুস্তকে রূপ দেওয়া হয় নাই[২]। তত্ত্বের দিক ছাড়িয়া দিলেও নিছক সাহিত্য হিসাবে বা গীতিকবিতা হিসাবে অনেকগানই উপভোগ্য। বৈষ্ণব তত্ত্ব ও ভাব-প্রতিবেশকে স্বীকার করিয়াও যেমন বৈষ্ণব কবিতায় কয়েকজন কবির ব্যক্তিগত হৃদয়-দোলা লাগিয়াছে এবং গীতিকবিতা হিসাবে তাহা একটি স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইতে সক্ষম হইয়াছে,—বাউল গানে তাহা সেই পরিমাণে না থাকিলেও সাহিত্যিক মূল্য নিশ্চয়ই আছে। সাধন পথে গীতিরচয়িতাদের ব্যক্তিগত ভাব ও ভাবনা, আশা-নৈরাশ্য ও আনন্দ,—উহাতে ব্যবহৃত উপমা-রূপক-অলঙ্কার, সুর ও ছন্দ—সবই সাহিত্য-রসিক ও গীতিরসিকের আদরণীয় বস্তু।

বাউলগান নৃত্যসম্বলিত বলিয়া তাহা ছন্দপ্রধান। এইখানেই বাউল গানের সহিত ভাটিয়ালী গানের পার্থক্য। সুর হিসাবে বাউলগান ভাটিয়ালীর তুলনায় অনেক বেশী সরল ও সহজ। বাউলের গানে সুরসম্পর্কের চেয়ে ভাবসম্পর্কের স্থান বেশী।

বাউলের গানের ছন্দ ও সুর লইয়া কোনো প্রকার গবেষণা হয় নাই। ভবিষ্যতের কোনো গবেষক এই কাজ করিলে গুণীর প্রশংসা পাইবেন।

---

১ ভক্ত হরিনাথ মজুমদার বাউল সঙ্গীতের বৃহৎ সজ্ঞ সৃষ্টি করিয়া নিজে ফিকির চাঁদ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঢাকা জেলায় "চারমর্দন গ্রামে" সুধারাম বাউলের সুবৃহৎ কেন্দ্র আছে, তাঁহার বহু শিষ্য মিলিত হইয়া ঢাকা বিক্রমপুর সেরেজাবাজ গ্রামেও একটি কেন্দ্র-স্থাপন করিয়াছেন।—প্রবাসী, পৌষ, ১৩৩৫ পৃ ৩৭৭

২ এ সম্পর্কে ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের মন্তব্য: "ঝুঠা বাউলেরাই নিজেদের পরিচয় গ্রন্থে রাখিয়া গিয়াছেন।"—পৃ ৫০। পুনশ্চ "বাউলদের মধ্যে 'পুথ্যা' (পুথিয়া) ও 'তথ্যা' (real) এই দুই রকম আছে।...'অপুথিয়া' বাউলদের সবচেয়ে ভাল পরিচয় দিয়াছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ।"—বাঙলার বাউল (১৯৫৪), পৃ ৫৬

বাউলের গান ও নাচের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। নীচে বাউল গানের বিশিষ্ট অংশগুলির একটি আঞ্চলিক বিবৃতি সঙ্কলিত হইল :

"...ফকির-সকল সমবেত হইয়া "ফকিরি-গান" গাহিয়া থাকে। বিস্তৃত প্রাঙ্গণে একখানি ক্ষুদ্র চাঁদোয়া খাটাইয়া, কেরাসিনের মৃদু আলোকে, অগণিত নিরক্ষর সরল-প্রাণ কৃষাণ শ্রোতার সমক্ষে এই সকল ফকিরগণের নানাবিধ অঙ্গ-ভঙ্গী সহকারে নৃত্য-গীতে রাতের পর রাত কাটিয়া যায়।

"...একজন "মূল-গায়ন" গান গাহিতে থাকে, পিছনে "পাছ-দোয়ার" ধুয়া ধরিয়া "পাছ-দোয়ার"-কি করে। বাবরী চুল ও লম্বা দাড়ীওয়ালা "মূল-গায়নে"র হাতে একটি একতারা বা গোপীযন্ত্র টুং টুং করিয়া বাজিতে আরম্ভ করে। "পাছ-দোয়ার"-দের কাহারও হাতে খঞ্জনী, কাহারও হাতে খোল বা তবলা বাঁয়া। "মূল-গায়ন" একতারা বাজাইয়া ঢিলে আল্‌খাল্লা ঝুলাইয়া, অঙ্গ দোলাইয়া, নূপুর পায়ে নাচিতে ও গাহিতে থাকে।

"এই গানকে "মুরশিদা বা ভাবগান" কহে। এই গানে প্রধানতঃ দুইটি পদ বা অংশ আছে। "গুরুপদ" "মুরশিদ পদ" ও "শিষ্য পদ" তাহা ছাড়া "উপর পদ" ও "নীচপদ" আছে। "উপর পদে" শুধু দেহতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব ও অনুভূতির কথা। নীচের পদে সাধন ও ভজনতত্ত্ব[১]।"

বলা দরকার, মুরশিদা বাউল গানেরই একটি অংশ[২]।

পশ্চিম বঙ্গের বাউলদের নাচের বিশেষত্ব কি, তাহার বিস্তৃত বিবরণ শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ মহাশয় তাঁহার পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সে বিবৃতি এই :

"দল বেঁধে বসে গেছে গোল হ'য়ে,—মাঝখানে একটু প্রশস্ত জায়গা। প্রায় প্রত্যেকের হাতে একতারা, কিন্তু সে একতারা পশ্চিম-ভারতের ভজন-পন্থী গায়কদের একতারা নয়,...। ...বাঙলার বাউলদের এই একতারা একমাত্র তাদেরই হাতে ছাড়া ভারতের আর কোন প্রদেশে দেখা যায় না। ...

১ প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫, পৃ ২১৯

২ এই প্রসঙ্গে ক্ষিতিমোহন সেন-শাস্ত্রী মহাশয়ের এই মন্তব্যটি প্রণিধান যোগ্য : "স্থাড়া সহজিয়া কর্তাভজা প্রভৃতি সবাই আপনাকে বাউল বলেন। আবার বাউলদের মধ্যেও বহু ভাগ-বিভাগ আছে। তাঁহাদের সবারই আদি বীরভদ্র বা চৈতন্য মহাপ্রভু বলা চলে না।"—বাঙলার বাউল (১৯৫৪), পৃ ৫০

"...বাঙলা দেশের এই দলের বাউলদের সবচেয়ে বড় গুণ হোলো বাঁ হাতে বাঁয়া-র উপর তাল দিয়ে, ডান হাতে এক আঙুলে একতারায় তালে তালে ঝঙ্কার তুলে, পায়ে বাউলের কাঁসার বাঁকা নূপুরের শব্দে নৃত্য ও একসঙ্গে গান গাওয়া। এইটি বাউলদের একটি আশ্চর্য ক্ষমতা। আমার মতে এই বিশেষত্বটিও বাঙলারই একটি নিজস্ব বিশেষ গুণ।...

"...এদের নাচে বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় হোলো, এরা গানের প্রত্যেক কথাকে কখনো নাচের ভঙ্গীতে বা মুদ্রাভিনয়ে প্রকাশ করতে চেষ্টা করে না। দুই হাতে দুই যন্ত্র থাকার দরুন হাতের সাহায্যে কোনপ্রকার অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করবার কোন উপায় এদের নেই। মুখে সাধারণত থাকে আত্মভোলা একটি হাসি-খুসি ভাব। দেখে মনে হয় এরা গান শোনায় কেবল কণ্ঠস্বরে নয়, দেহভঙ্গীতেও। গান গেয়ে, নেচে তারা গানের সমগ্র রসটিকে ফুটিয়ে তোলে।...

"এদের নাচে সামনের দিকে বিভিন্ন চলনে এগিয়ে চলাই হোলো প্রধান বিশেষত্ব। বৃত্তাকারে এগিয়ে চলা, সামনে এগিয়ে গিয়ে পিছিয়ে না এসে ঘুরে গিয়ে আবার সেইমুখী চলা, এই হোলো এদের নাচের মূল চাল। পাশের দিকে চলতে দেখি না। কিন্তু এক জায়গায়ও অনেকক্ষণ নানা ভঙ্গীতে নাচে। এরা কখনো কোমর দোলায় না বা গলাকে ডাইনে-বাঁয়ে দ্রুতছন্দে কখনো নাচায় না। গানের তাল সাধারণতঃ তিন ও চার মাত্রা ছন্দে। ছন্দ-বৈচিত্র্য আনবার জন্যে গানের মাঝেমাঝে প্রায়ই অন্য ছন্দের নানা প্রকার অলঙ্কার জুড়তে দেখি।

"আমার নিজের ধারণা এ নাচের মূল উৎস হোলো বাঙলা দেশের প্রাচীন পাঁচালী গানের আদর্শের নাচ।...

"বাউলের নাচ ঐ আদর্শেই গঠিত এক ধরনের পাঁচালী নাচ। কোন বিশেষ একটি বিশেষ রীতিতে বাঁধাধরা নাচ এ নয়। যখন যে বাউল যেখানে যে নৃত্য-ছন্দ পেয়েছে তাকেই গ্রহণ করেছে সহজভাবে। যতদূর মনে হয় চেষ্টাকৃত কোন নৃত্যরূপ পছন্দ করে নি। গান গাইবার রীতিতে তারা যত প্রকার ছন্দ পেয়েছে তাকেই নৃত্যে রূপ দেওয়ার চেষ্টা থেকেই তাদের নাচের উদ্ভব, বৈচিত্র্য ও উৎকর্ষ। যার নাচতে ভালো লেগেছে সে নেচেছে, যার ইচ্ছা করেনি সে নাচে নি। তাদের গানের আনন্দকে এক সঙ্গে গানে ও

নৃত্যে ফুটিয়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা থেকেই এ নাচের উদ্ভব।...[১] ”

বাউল-মুরশিদা গানের নৃত্য সম্বন্ধে গুরুসদয় দত্ত মহাশয় তাঁহার পুস্তকে মন্তব্য করিয়াছেন[২]। সে মন্তব্যের প্রাসঙ্গিক অংশ এই : 'আনন্দ লহরী' (বা 'গাবগুবাগুব') একতারা, করতাল এবং ডুবকী সহযোগে বাউলের নাচ একক বা সমবেত দুই-ই হইতে পারে।

"Sometimes ordinary villagers dress up as *Baul* on festive occasions and perform the dance in groups with appropriate instruments. In such group *Baul* dances there is one leader who leads the song and the rest of the group sing the burden in chorus.

"*Baul* dancing and singing are not associated with any particular occasion or festivity, and are performed as an act of joyous spiritual self-expression on the part of the Baul, and also as an act of spiritual education of the community...

"...*Baul* songs are often sung with the singer seated, without any dance accompaniment...

"The most striking feature of the *Baul* dance and of the tune of the *Baul* song is a spirit of joyous self-forgetfulness and fluidity of rhythmic movement which is in complete accord with the sentiments of the songs. The *Baul* tune with its ripples of rise and fall resembles the surface of a large tank or lake wrinkled by the spring breeze.

"The basic movement in the *Baul* dance consists in standing with the whole weight of the body alternately on each leg. The other foot is then brought up to the one on which the weight is resting, but without its being placed flat on the ground. Both knees are slightly bent and the foot which was drawn up is moved slightly sideways after which the weight is transferred on it. The movement is then repeated with the other leg. Sometimes a hop is made with the left leg while the right leg is thrown forward with a kick. The hands are engaged in playing on a musical instrument, often only one hand but sometimes

---

১ শান্তিদেব ঘোষ : গ্রামীণ নৃত্য ও নাট্য (১৮৮১ শকাব্দ) পৃ ৪৭-৫৩

২ *Gurusaday Dutt* : The Folk Dances of Bengal (1954), *pp 71-74*

both. Usually one hand is held near the waist, while the other is held fairly high up above the head.

"The *Baul* dance may be regarded as the Dance of Spiritual Love and Spiritual Union...

"The dance step accompanying the *Murshīdi* song is the simple *Baul* step and is often nothing more than a slow rhythmic walk with slight bending of the knees at each beat of time. The dance is not a necessary accompaniment of *Murshīdi* songs which are as often, or rather quite frequently, sung while seated."

....৩

বাউলের ধর্মসাধনার মধ্যে কয়েকটি বিশেষত্ব রহিয়াছে[১]। তাঁহাদের যে সাধনা তাহা চিরাচরিত আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া নয়। ইহাই বাউলসাধনার প্রথম বিশেষত্ব।

বাউল কি চাহেন, তাঁহার ইষ্ট কি? মানবদেহকেই বাউল একটি ক্ষুদ্র বিশ্ব হিসাবে কল্পনা করিয়াছেন এবং যোগসাধনার মধ্য দিয়া এই স্থূল দেহের মধ্যেই পরমসত্য ও সত্তাকে খুঁজিয়া চলিয়াছেন। এই পরমসত্যই তাঁহার ইষ্ট, তাঁহাকেই বাউল বলেন 'অচিন পাখী', 'মনের মানুষ,' 'রসের মানুষ' বা 'ভাবের মানুষ'। বাউল কখনও ঈশ্বরকে চাহেন নাই,—প্রেম-রস-লীলাময় এই 'সহজমানুষ' বা 'অধরমানুষ'-কেই বারে বারে দেহের খাঁচায় আবদ্ধ করিবার জন্য মাথা কুটিয়া মরিয়াছেন।

সুতরাং বাউলের সাধনায় মানবদেহ হইল ভিত্তি, দেহই তাঁহাদের সাধনার অবলম্বন, দেহ তাঁহাদের নিকট এক অমূল্য সম্পদ। দেহ ভাণ্ড-কেই তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া কল্পনা বরিয়া লইয়াছেন,—ইহার মধ্যেই আকাশ-সমুদ্র-পর্বত-অরণ্য-নদী, ইহার মধ্যেই সপ্তলোক, সপ্তপাতাল, সপ্তসাগর ও সপ্তদ্বীপ রহিয়াছে বলিয়া তাঁহার ধারণা। এই দেহের মধ্যেই সেই 'অচিন মানুষ', 'মনের মানুষ'-রূপী 'কৃষ্ণ', 'আল্লা' বা 'সাঁই'-এর নিবাস; এই দেহের মধ্যেই 'মহারস' বা আনন্দের অমৃতধারা প্রবহমান। পরমতত্ত্ব মন্দিরে নাই, মক্কায় নাই,—দেহই দেউল, দেহই 'কাবা'।

১ অক্ষয়কুমার দত্ত : ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (প্রথম ভাগ, ১৩১৮) পৃ ২৩১-২৩৫

বাউলের দেহসাধনার সহিত 'প্রকৃতি-সাধন' অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বাউলের সাধনা প্রেমের সাধনা, রসের সাধনা,—তাই তাঁহার সাধন পন্থাকে বলাকে বলা হয় 'রাগের ভজন' বা 'রাগের করণ' বা 'রাগের আচার।' দেহকে তাঁহারা সাধনার ভিত্তি বলেন, নারীদেহ বা 'প্রকৃতি' সেই প্রেম বা রসের সাধনার উপায়। কিন্তু, তাই বলিয়া বাউল ইন্দ্রিয়চারী বা কদাচারী নহেন। দেহকেই অবলম্বন করিয়াই তাঁহারা দেহোর্ধ্বে উঠিয়াছেন,— কামকে স্বীকার করিয়াই প্রেমের রাজ্যে পাড়ি জমাইয়াছেন। 'প্রকৃতি'-কে তাহারা সন্তানসৃজনের বা কামবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উপায় হিসাবে দেখেন নাই। 'প্রকৃতি'ই পরমসত্যকে লাভ করিবার উপায়।

মানবদেহের সারবস্তুকে বাউলের ভাষায় বলা হয় 'বিন্দু'। এই 'বিন্দু' রক্ষা করাই বাউল সাধনা। এই 'বিন্দু'ই তাঁহাদের জীবনের পুঁজি, উহাই তাঁহাদের নিকট শ্রীভগবানের স্বরূপসত্তা 'পুরুষ' এবং 'প্রকৃতি', 'বীজ' এবং 'রজঃ'—এই দুইয়ের মিলনেই সেই পূর্ণতাকে পাওয়া যাইবে। ডাক্তার শ্রী উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় বাউল সাধনার প্রক্রিয়াটি সংক্ষেপে এই ভাবে জানাইয়াছেন :

"প্রকৃতির সত্তা যেমন রজে, পুরুষের সত্তা তেমনি বীজে। এই রজো-বীজের মিলনে যেমন সৃষ্টি, অপরদিকে ইহাই তেমনি শৃঙ্গার-বিলাসের মূল। দেহের মধ্যে মস্তকে সহস্রদলপদ্মে বীজ-রূপে পরমাত্মা অবস্থিত। তাঁহার স্বরূপ স্থির, নিস্তরঙ্গ, অচঞ্চল, কিন্তু লীলা-কারী বলিয়া বীজ-রূপী তিনি রজো-রূপী প্রকৃতির রসাস্বাদনের জন্য প্রকৃতির সহিত মিলিত না হইয়া পারেন না। তাই রজঃপ্রবর্তনের তিন দিন তিনি মস্তক হইতে নামিয়া আসিয়া রজের সহিত মিলিত হইয়া প্রকৃতির মূলাধারে আত্মপ্রকাশ করেন। রজের মধ্যে তিনি মিলিত হন বটে, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ ও রজের স্বরূপ বিভিন্নমুখী। রজঃ অগ্নিময়ী, সৃষ্টিক্রিয়া-রূপিণী ও আকর্ষণ-কারিণী ; ইহাই কাম-স্বরূপিণী। কিন্তু বীজ অচঞ্চল ও প্রেমস্বরূপ। জল ও দুধের মতোই ইহাদের মিলন, কামের সঙ্গে প্রেম একেবারে মিশ্রিত। সুতরাং জল ও দুধকে পৃথক করিতে হইবে। এই দুধই অচঞ্চল বীজ। ইনিই লীলাময় 'সহজ মানুষ'। এই সহজ মানুষের বা মনের মানুষের আবির্ভাব হয় প্রকৃতির রজে। প্রকৃতির দেহাধারে তিন দিনের জন্য ইঁহার আবির্ভাব ঘটে। তারপর

চতুর্থদিনে আবার নিত্যস্থানে স্বরূপে তাঁহার অবস্থিতি ঘটিয়া থাকে।”

“এই তিনদিনই বাউলদের সাধনার প্রশস্ত সময়। ইহাই ‘মানুষ ধরা’র সময়। এই তিনদিনের শেষে পূর্ণভাবে সহজ মানুষের আবির্ভাব হয়। ইহা সাধকের অনুভূতি সাপেক্ষ। এই সহজ মানুষের স্বরূপের অনুভূতি শৃঙ্গারে অচঞ্চল বীজোদ্ভূত আনন্দানুভূতি। এই আনন্দানুভূতিকে যোগ-ক্রিয়ার দ্বারা ক্রমাগত উর্ধ্বমুখী করিয়া দ্বিদলপদ্ম পর্যন্ত উঠাইলে অটলবীজরূপী ঈশ্বর-রূপের সঙ্গে শৃঙ্গার লীলাময় সহজ-মানুষ-রূপের মিলনে নিরন্তর অপরিসীম শৃঙ্গারানন্দের অনুভূতি জাগে। মূলতঃ পরমতত্ত্বের স্বরূপই এই প্রকৃতি-পুরুষের মিথুন-ঘটিত মহোল্লাসময় অবস্থা। এই অবস্থা-লাভই বাউল সাধনার চরম লক্ষ্য। ইহাই তাহার আত্মোপলব্ধি—‘সহজ’-অবস্থা লাভ[১]।”

বাউলের এই সাধনপথকে তিনটি স্তরে বিন্যস্ত করা যায় : ‘আত্মতত্ত্ব’ ‘পরতত্ত্ব’ ও ‘গুরুতত্ত্ব’[২]। ‘আত্মতত্ত্ব’ হইল—পুরুষ, শ্রীকৃষ্ণ, আত্ম, ভোক্তা, শক্তিমান। ‘পরতত্ত্ব’ হইল—প্রকৃতি, শ্রীরাধা, পরতত্ত্ব, ভোগ্যা, শক্তি। ‘গুরুতত্ত্ব’ এই দুইয়ের মিলিত অবস্থা। প্রথমস্তরে নাম ও মন্ত্রোচ্চারণ; দ্বিতীয় স্তরে ‘ভাব’-সাধনা—এই স্তর হইতেই ‘প্রকৃতি সাধন’ আরম্ভ হয়। তৃতীয় স্তর ইহারই পরিণতি—রস ও প্রেমের সাধনে।

কিন্তু, এই যোগমূলক সাধনা একা-একা করিবার উপায় নাই। ক্রিয়া-মূলক সাধনা বলিয়া ইহাতে পূর্বসূরীর অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে। এই জন্য বাউল-সাধনার ক্ষেত্রে গুরু-র গুরুত্ব অপরিসীম, তাঁহার উপদেশ-নির্দেশ অপরিহার্য। মুসলমান ফকিররা গুরুকে ‘মুরশিদ’ বলিয়া থাকেন। বাউলের গুরু-শিষ্য আর ফকিরের মুরিদ-মুরশিদ এক। সাধকের নিজের মধ্যেই আত্মস্বরূপের উপলব্ধি বটে, কিন্তু গুরু, মুরশিদ, পীর তাঁহাকে আলোক না দেখাইলে তিনি এক পা অগ্রসর হইতে পারেন না। বাউলের কাছে গুরু দুই রূপে আবির্ভূত হন : একদিকে তিনি মানবরূপী, অপরদিকে গুরুই পরম-তত্ত্ব, গুরুই শ্রীভগবান। ভগবানই গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়া ভক্ত সাধককে

১ বাঙলার বাউল ও বাউল গান (১৩৬৪), পৃ ৩৭২-৭৩

২ “...সাধনার প্রথমে প্রবর্ত, দ্বিতীয়ে সাধক, তৃতীয়ে সিদ্ধ।”—ক্ষিতিমোহন সেন : বাঙলার বাউল (১৯৫৪), পৃ ৫২

পরিচালিত করিয়া থাকেন। সুতরাং সেই গুরুর কৃপা ও অনুগ্রহই বাউলের প্রথম কাম্য[১]।

বাউলের সাধনা 'দমের সাধনা'। এই 'দমের সাধনা'-র প্রসঙ্গে দেহস্থিত বিভিন্ন চক্র ও নাড়ীর কথা উঠিয়া পড়ে।

হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্রে মানবদেহের অভ্যন্তরে যথাক্রমে ছয়টি 'চক্র' ও চারিটি 'কায়'-কে কল্পনা করা হইয়াছে। 'চক্র'-গুলির আকৃতি যেন এক-একটি পদ্মের মতো। হিন্দু তন্ত্রের ছয়টি চক্রের (ইহাকে 'ষট্‌চক্র' বলে) অবস্থান এইরূপ: মূলাধার চক্র—ইহা গুহ্যদেশ ও জননেন্দ্রিয়ের মাঝখানে অবস্থিত, নিম্ন-দিকে প্রস্ফুটিত, চতুর্দল, রক্তবর্ণ। স্বাধিষ্ঠানচক্র—জননেন্দ্রিয়ের মূলে, চিত্রিণী নাড়ীতে অবস্থিত, ষড়দল, সিঁদুর বর্ণ। মণিপুরচক্র—নাভি-মূলে অবস্থিত, দশদল, মেঘবর্ণ। অনাহত চক্র—হৃদয়-প্রদেশে অবস্থিত, দ্বাদশদল, বাঁধুলির মতো উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ। বিশুদ্ধ চক্র—কণ্ঠদেশে অবস্থিত, ষোড়শদল, ধূম্রবর্ণ। আজ্ঞাচক্র—ভ্রূদ্বয়ের মাঝখানে অবস্থিত, দ্বিদল, শুভ্রবর্ণ। এই ছয়টি চক্র বা পদ্ম ছয়টি শক্তিদেবীর অধিষ্ঠান ক্ষেত্র বলিয়া কল্পিত। যথা, মূলাধার চক্রে ডাকিনী শক্তি, স্বাধিষ্ঠান চক্রে রাকিণী শক্তি, মণিপুর চক্রে লাকিণী শক্তি, অনাহত চক্রে ত্রিনেত্রাশক্তি, বিশুদ্ধ-চক্রে শাকিনীশক্তি এবং আজ্ঞাচক্রে পরশিব ও সিদ্ধকালীর বাস।

ইহা ছাড়াও আজ্ঞাচক্রের উপরে সহস্রদল বিশিষ্ট একটি পদ্মকে কল্পনা করা হইয়াছে। ইহার নাম 'সহস্রার,' নিম্নদিকে প্রস্ফুটিত, প্রভাতসূর্যের মতো ইহা দীপ্তিশালী। ইহারই অভ্যন্তরে পরমাত্মা ব্রহ্ম উপবিষ্ট আছেন।

বৌদ্ধতন্ত্রে 'চক্রে'-র বদলে 'কায়' কল্পিত হইয়াছে, এবং তাহা ছয়টির বদলে চারটি। নাভিদেশে 'নির্মাণকায়,' হৃদয়ে 'ধর্মকায়,' কণ্ঠে 'সম্ভোগকায়' এবং মস্তকে 'মহাসুখকায়'-এর অবস্থান। এই চারিটি কায়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যথাক্রমে—লোচনা, মামকী, পাণ্ডরা ও তারা।

বাউল ধর্ম ও সাধনা হিন্দু ও বৌদ্ধ—দুই তন্ত্রদ্বারাই কম-বেশী প্রভাবিত।

১ "আসলে সাধকদের অন্তরের মধ্যস্থ আদর্শ মানস-গুরুই...প্রেম সাধনার আসল গুরু। বাহিরের গুরু ও সাধুরাও এই পথে সহায়। তাই তাঁহারাও নমস্য।
"বাউলেরা বলেন, সাধনার ক্ষেত্র, উপাস্য ভগবান্ এবং গুরু যখন আমাদেরই অন্তরের মধ্যে, তখন নিজের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা চাই।"—ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী: বাঙলার বাউল (১৯৫৪), পৃ ৪

তন্ত্রে, হিন্দুতন্ত্রই বাউলধর্মের কাঠামোকে গড়িয়া তুলিয়াছে।

হিন্দুতন্ত্রে বলা হইয়াছে যে,—মূলাধারচক্রে সৃষ্টিরূপা কুণ্ডলিনীশক্তি সুপ্তা রহিয়াছেন। প্রাণ ও অপান বায়ুর ক্রিয়ার দ্বারা সেই শক্তিকে জাগ্রত করিয়া সুষুম্না নামক নাড়ীর মধ্য দিয়া ক্রমেই উপরের দিকে তুলিতে হইবে। সেই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অনুভূতিকে সহস্রারে অবস্থিত পরমশিবের সহিত মিলিত করিতে পারিলেই ত্রিগুণাতীত পরম অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

হিন্দুতন্ত্রের এই প্রাণ-অপান বায়ুর ক্রিয়াই বাউলের নিকট 'দমের সাধনা'। 'বিন্দু' (বীজ)-কে ধারণ এবং তাহাকে উর্ধ্বগতি দানই বাউলের সাধনা। এই উর্ধ্বায়নের জন্যই শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। বাউলের যিনি ইষ্ট, সেই 'সহজ মানুষ,' বা 'মনের মানুষে'র লীলাস্থান হইল দুই ভ্রূর মাঝখানে আজ্ঞাচক্রে (কিন্তু তাঁহার নিত্যস্থান সহস্রারে)। দমের সাহায্যে দেহস্থিত 'বিন্দু'-কে আজ্ঞাচক্রে 'সহজ মানুষে'র অবস্থিতিক্ষেত্রে তুলিতে পারিলেই পরমাত্মার লীলাময় স্বরূপ উপলব্ধি করা যাইবে বলিয়া বাউলের বিশ্বাস। সৃষ্টির সাধারণ গতি হইল উপর হইতে নীচের দিকে ; কিন্তু বাউলের সাধনা বিপরীত গতিতে চলে—তাহা নীচের দিক হইতে উপরের দিকে। এই জন্যই বাউলের সাধনাকে 'উজান বাওয়া' বা 'উল্টা কলের' সাধনা বলা হইয়াছে।

ডাক্তার শ্রীউপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য মহাশয় এই ব্যাপারটিকে এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন : "এই সহজ মানুষ এক অপ্রাকৃত দেহধারী কেবলমাত্র অনুভূতিগম্য, নিবিড়, অচঞ্চল মিথুনানন্দ-স্বরূপ। সেইজন্য তিনি 'ভাবের মানুষ'। তাঁহাকে বাউলরা 'দমের মানুষ' ও বলিয়াছে, কারণ 'দম' বা কুম্ভকের দ্বারাই তিনি অনুভূতিগম্য। এই সহজ মানুষকে 'ধরিয়া' ক্রমাগত উর্ধ্বদিকে 'উল্টাকলে' বা 'উজানবাহিয়া' লইয়া আজ্ঞাচক্রে দ্বিদল পদ্মে উপনীত করিতে পরিলেই প্রকৃতি-দেহের সহজমানুষ অর্থাৎ গভীর আনন্দানুভূতির সহিত পুরুষ-দেহের অটল ঈশ্বরের মিলন একটা চরম মিথুনানন্দের অনুভূতিসৃষ্টি হইবে। উহাই পরমাত্মার লীলাময় স্বরূপ। এই আনন্দই সাধনার চরম কাম্য[১]।"

১ বাঙলার বাউল ও বাউলগান (১৩৬৪) পৃ ৪২১-২২

এই যে বায়ু বা দম—তাহাই যোগসাধনা বা বাউল সাধনার মূলগত ভিত্তি এবং সেই বায়ু বা দমের অবলম্বন হইল নাড়ী। নাড়ীর মাধ্যমেই বায়ুর চলাচল ঘটিয়া থাকে,—নাড়ীর মার্গেই সাধকের দেহস্থিত স্থূল বায়ু সূক্ষ্ম বায়ুতে পরিণত হয়। বায়ুই যদি শক্তি হয়, তবে সেই শক্তি সঞ্চারণের পথ নাড়ী। বাউলের সাধনাতে মানুষের দেহস্থিত কয়েকটি নাড়ী বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

মানবদেহের অসংখ্য নাড়ীর মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না—এই তিনটি নাড়ীই প্রধান। ইহাদের মধ্যে সাধনার ক্ষেত্রে সুষুম্না নাড়ীরই গুরুত্ব সর্বাধিক। সুষুম্না নাড়ী মেরুদণ্ডের মাঝখানে অবস্থিত,—মূলাধার চক্র হইতে সহস্রদল পর্যন্ত ইহার বিস্তৃতি।

সুষুম্নার বাম দিকে ইড়া এবং দক্ষিণ দিকে পিঙ্গলা নাড়ী অবস্থিত। দুইটি নাড়ীই সুষুম্নাকে দুই দিক হইতে পাকে-পাকে জড়াইয়া ধরিয়া শেষে আজ্ঞা-চক্রে আবার একত্রিত হইয়াছে। মূলাধার চক্রে এবং আজ্ঞাচক্রে অর্থাৎ আরম্ভে ও শেষে এই তিনটি নাড়ী একত্রিত হইয়াছে বলিয়া স্থানদ্বয়কে 'ত্রিবেণী' বলা হয়। বহু বাউলগানে 'ত্রিবেণী'র উল্লেখ মিলে।

উপরে বাউলের সাধনা ও ধর্ম সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল। বাউল ধর্ম ও সাধনার যাহা বিশেষত্ব অর্থাৎ দেহের মধ্যেই ইষ্টকে অন্বেষণ করা, প্রকৃতি-সাধন, দমের ক্রিয়া, গুরুর প্রাধান্য, রূপকে অবলম্বন করিয়াই অরূপের পথে যাত্রা,—তাহার সব কয়টিই ভারতে চলিত কোনো না কোনো ধর্ম সাধনার মধ্যে পূর্ব হইতেই ছিল। বিশেষতঃ যে সমস্ত ধর্মের সমন্বয়ে বাউল ধর্ম ও সাধনার কাঠামো নির্মিত হইয়াছে সেই বৈষ্ণব সহজিয়া, বৌদ্ধ সহজিয়া, হিন্দুতন্ত্র, সূফী ধর্ম প্রভৃতির মধ্যেও তাহা লক্ষিত হইয়া থাকে। প্রসঙ্গতঃ নাথ সম্প্রদায়ের কথাও উল্লেখ করা যায়। বাঙলার বাউলগণ ওই সমস্ত ধর্ম ও সাধনা হইতেই গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে নিজেদের সাধ্য-সাধন তত্ত্ব ও পন্থাকে গড়িয়া লইয়াছেন[১]॥

---

১ বাউলের ক্রিয়ামূলক আচার সম্পর্কে ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের মন্তব্য:
"বাউলেরা বলেন, জীবনের সার অমৃত হইল তাহার প্রেম ও প্রেমের ব্যাকুলতা; প্রেম কোনো তত্ত্ববাদ নহে। তাহারই Physical পথ হইল কায়াসাধন। চারি চন্দ্রের ভেদ প্রভৃতি স্থূল কায়াসাধনও সেই চিন্ময় পথ নহে। আসলে আপনার মধ্যে বিশ্বের পরিচয় এবং যোগও এক চিন্ময় ব্যাপার। ইহাকে বাহ্যরূপে পরিণত করিতে গেলেই বিপদ। চারি চন্দ্রের ভেদ হইল তন্ত্রের ও যোগশাস্ত্রের দাসত্ব। তাহাতে অনুরাগ-পথের কি আছে?" পৃ ৫২। পুনশ্চ, "কিন্তু চার চন্দ্রের ভেদেও কায়িক ব্যাপার। তাহা হইতেও উচ্চতর ভাবসাধনা-ওয়ালা বাউল আছেন।"—বাঙলার বাউল (১৯৫৪), পৃ ৪৯

....৪

স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত, রবীন্দ্রনাথ, স্বর্গীয় ক্ষিতিমোহন সেন, অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক মনসুর উদ্দীন, ডাক্তার শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত এবং ডাক্তার শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—ইঁহারা বাউলের তত্ত্ব, দর্শন, আচার ও মরমিয়াবাদ সম্পর্কে বিস্তৃত, সন্তোষজনক এবং নির্ভরযোগ্য আলোচনা করিয়াছেন। ইঁহাদের আলোচনা পাঠ করিলে বাউলদের সম্পর্কে দুইটি সুস্পষ্ট মত পাই। একদল গবেষক বাউলের তত্ত্ব ও দর্শনের মধ্যে রহস্য ও মরমিয়াবাদকেই মুখ্য ধরিয়াছেন এবং তাঁহাদের আচার ও ক্রিয়ামূলক অনুষ্ঠান গুলিকে হয় উপেক্ষা করিয়াছেন, নয় প্রাথমিক গুরুত্ব আরোপ করিতে চাহেন নাই :—রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতিমোহন এই দলে[১]। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বাউলের আচার ও গুহ্য অনুষ্ঠান সম্পর্কে অনেক তথ্য জানাইয়াছেন—সম্ভবতঃ বাউলদের সম্পর্কে ইহাই তাঁহার নতুন কথা। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ই সর্ব প্রথম বাউলধর্মের কাঠামো ও উপাদান সম্পর্কে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে আলোচনা করিয়াছেন। বাউলগান আলোচনা করিয়া ব্যক্তিগত ভাবে আমার মনে হইয়াছে, বাউলগান আচার ও রহস্যের সমন্বয়। অবশ্য, বলা দরকার, এই সমন্বয়ের ইঙ্গিত উপরোক্ত গবেষক ও আলোচকগণ অল্পবিস্তর লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহাদের ইঙ্গিত ও মন্তব্যকেই প্রসারিত করিয়া লইয়া বলিতে পারি,—বাউলগান আলোচনা কালে আচার, রহস্য, সুর, নৃত্য, বাদ্য,—কোনোটাকেই উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করা সঙ্গত নয়।

স্বর্গীয় ক্ষিতিমোহন সেন-শাস্ত্রী মহাশয় বাউলের তত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া বেদ-উপনিষদ এবং ভারতের অন্যান্য সাধনার ধারাতে উপনীত হইয়াছেন। তিনি বাউলের মন্তব্যকে মান্য করিয়া বলিয়াছেন, বাউলমত বেদেরও পূর্ববর্তী—"যতকাল মানব, ততকাল এই সহজ বাউলিয়া মত। বেদ-পথ তো সে দিনের" (পৃ৩)। তিনি বেদ-সংহিতার মানবধর্ম ও

১ উনবিংশ শতাব্দীর সৌখিন ও শিক্ষিত বাউল সম্প্রদায়ও এই দলভুক্ত। রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতিমোহন বাউলের আদর্শকে কোনো ধর্ম-বিশ্বাস বলিয়া মানেন নাই। ডাক্তার শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের মন্তব্য "...for them (রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতিমোহন) Bāul represents more a spirit of unconventional approach to divinity through unassumed love and piety than any precise religious cults"—Obscure Religious cults (1962), p. 160

মরমীবাদকে বাউল-ধর্মের মধ্যেও লক্ষ্য করিয়াছেন। "অথর্ববেদকে তো বাউলেরা নিজেদেরই প্রাচীনতম বাণী বলেন" (পৃ ১১)। "বাউলদের মতে" "আমার সর্ব চরাচর আসিল আমার 'আমি' হইতে, আমার মনের মানুষ বা পুরুষ হইতে"…ঋগ্‌বেদেও পুরুষসূক্ত বলিলেন, পুরুষের মন হইতেই জন্মিল চন্দ্রমা, চক্ষু হইতে হইল সূর্য, মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি, প্রাণ হইতে বায়ু (পৃ ১১-১২)। "ঠিক বাউলদের মত অথর্ববেদও বলিলেন, এই অপরাজেয় মানব-মন্দিরের মধ্যে অষ্ট চক্র এবং নব দ্বার" (পৃ ১৭)। "এই মানবদেহ দিনে-দিনে কমলের মত ফুটিয়া চলিয়াছে[১] —হৃদয়কমল চল্‌ছে গো ফুটে কত যুগ ধরি। অথর্বেও নানা স্থানে নানা প্রসঙ্গে অমৃতের ফুলের কথা আছে—অমৃতস্য পুষ্পম্‌" (পৃ ১৭)। বাউল ও তন্ত্রের মধ্যে মিল ও অমিল উভয়কেই তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন: "তান্ত্রিকদের সঙ্গে বাউলদের কায়াবোধ এবং কায়া যোগেরই মিল দেখা যায়। অনুরাগতত্ত্ব কিন্তু বাউলদের বিশেষত্ব। তাহার কিছুই তন্ত্রে মেলে না। বেদাচার এবং লোকাচারের বিরুদ্ধে বাউল ও তন্ত্র সমান বিদ্রোহী" (পৃ ১৯)। বাউলগানের হেঁয়ালিকে তিনি বেদেও (তাহাকে 'ব্রহ্মোদ্য' বলে) লক্ষ্য করিয়াছেন।

সংহিতার পরবর্তী যুগের বিভিন্ন গ্রন্থ ও সাধনার মধ্যেও ক্ষিতিমোহন বাউলিয়া তত্ত্বকে আবিষ্কার করিয়াছেন। "আপনাকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে আপনার মধ্যে দেখাই তো বাউলের সার সাধনা।…উপনিষৎ বলিলেন, বাহিরে সর্বত্র যাঁহাকে দেখিতেছ অন্তরের মধ্যেও তিনিই অন্তরময় পুরুষ" (পৃ ২৪)। "মহাভারতে বাউলিয়া বহু তত্ত্ব আছে" (পৃ ২৮)। "পুরাণের অনেক স্থলেই 'বাউলিয়া' তত্ত্ব দেখা যায়" (পৃ ২৯)। "এই দুই ধর্মই (জৈন ও বৌদ্ধ) দোষে-গুণে ক্রমেই একেবারে বাউলিয়া মরমী বলিয়া চলিতেছিল" (পৃ৩১)। "রামানন্দের মধ্যেই বাউলিয়া তত্ত্বের সারমর্ম পাই" (পৃ ৩৫)। "শূন্যতত্ত্ব বাউলদের এক বড় কথা। কবীর তো শূন্যের ঐশ্বর্য দেখিয়া মুগ্ধ" (পৃ৩৮)। "সন্তদের সঙ্গে বাউল ভাবের মিলের বিষয়ে লিখিতে গেলে শেষ নাই"[২] (পৃ ৪৪)।

---

১ সাম্প্রতিক গবেষকগণ এই ফুলের ব্যাখ্যা অন্যরূপ করিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ এই অধ্যায়ের দশম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২ উত্তরভারতের সন্তদের মতের সহিত বাউলিয়া মতের পার্থক্য ডাক্তার শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় লক্ষ্য করিয়াছেন: বাঙলার বাউল ও বাউল গান (১৩৬৪), পৃ ৫১৭-২২

ক্ষিতিমোহনের এই সকল মন্তব্য বিস্তৃতরূপে উদ্ধৃত করিলাম এইজন্য যে, ইহা হইতে বাউলধর্মের উপাদান ও ইতিহাস সম্পর্কে তাঁহার ব্যক্তিগত ধারণাটিকে স্পষ্টরূপে প্রণিধান করা যাইবে। বাউলের আদর্শ ও তত্ত্বসম্পর্কে ক্ষিতিমোহন যাহা বলিয়াছেন, তাহা হয়তো একপেশে। তাহার চেয়ে যদি বলা যায়, ভারতের বিভিন্ন ধর্ম ও সাধনাকে আপনার মধ্যে সংহরণ করিয়া লইয়াই তবে বাউলের উৎপত্তি হইয়াছে,—তবে তাহা বোধ হয় আরো ঠিক হয়। বাউল ধর্ম ও তত্ত্ব সম্পর্কে বর্তমানে আমাদের যে ধারণা, বেদ, সংহিতা এবং উত্তর ভারতের অন্যান্য ভাবসাধনার মধ্যে তাহার বিশিষ্ট উপাদানকে মানিয়া লইয়াও বলিতে পারা যায়,—'গোষ্ঠী' বা 'মত' রূপে বাউলের উৎপত্তি খুব বেশী দিন হইল হয় নাই। বাউলধর্মের কাঠামোর মধ্যে সহজিয়া বৈষ্ণবতা ও সূফীধর্মের কথা তিনি প্রায় অনুল্লিখিতই রাখিয়াছেন। বাউল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত ক্ষিতিমোহন শাস্ত্রীরই অনুরূপ, অবশ্য তাঁহার নিজস্ব বিশিষ্ট চিন্তাধারায় তাহা অনুরঞ্জিত[১]।

রবীন্দ্র-পরবর্তী গবেষকগণ সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বাউলের তত্ত্ব ও আদর্শকে বিচার করিয়াছেন,—অবশ্য উহার ইঙ্গিত অক্ষয়কুমার দত্তই দিয়া গিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে সর্বাগ্রে ডাক্তার শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত এবং অতঃপর ডাক্তার শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের আলোচনা ও গবেষণা উল্লেখ-যোগ্য। ডাক্তার দাশগুপ্ত প্রথমে বাউলের বিশেষতত্ত্বগুলি লক্ষ্য করিয়া তারপর বাউলের উপাদানগুলির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। বাউল ধর্মের উপাদানের মধ্যে দুইটি প্রধান—সহজিয়া বৈষ্ণবধর্ম ও সূফীধর্ম। বাউলের ইষ্ট 'মনের মানুষ' বা পরমতত্ত্ব এই দুইয়ের মিলনে গড়া। ডাক্তার দাশগুপ্তের আলোচনায় বাউল ও সহজিয়া, বাউল ও সূফীধর্মের পার্থক্যও স্পষ্ট হইয়াছে। বাউলের 'মনের মানুষ'-এর স্বরূপটি তাঁহার আলোচনায় সুন্দর ফুটিয়াছে। ডাক্তার দাশগুপ্ত যে আলোচনার পত্তন করেন, ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাহাকেই বিস্তৃত রূপ দিয়াছেন। বাউলের যোগাচার মূলক গুপ্ত সাধনার দিকটি তাঁহার আলোচনাতেই সর্বপ্রথম ব্যক্ত হইয়াছে।

১ *Rabindra Nath Tagore* : The Religion of Man (1931) দ্রষ্টব্য। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের যে ইংরাজী প্রবন্ধ যুক্ত হইয়াছে—তাহাতে সকৃৎ সূফী ধর্মের উল্লেখ রহিয়াছে।

বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সহজিয়া মতের সহিত বাউলদের মতের পার্থক্য আছে। ইহা সত্য, সহজিয়াদের গুরুবাদ, মানব দেহকেই বিশ্বের সার-সংক্ষেপ বা প্রতিরূপ বলিয়া গ্রহণ, সহজ পথে সহজ স্বরূপকে অনুধাবন—ইত্যাদি বাউলের মধ্যেও মিলে। কিন্তু স্থফীধর্মের প্রভাবে বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সহজিয়াদের 'সহজ' (অর্থাৎ 'পরমতত্ত্ব') বাউলদের হাতে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে,—কি তত্ত্বের দিক হইতে, কি উহার রূপায়ণের দিক হইতে। বৌদ্ধ সহজিয়াগণ 'সহজ'-স্বরূপকে নর-নারীরূপী প্রজ্ঞা-উপায়ের দ্বৈতসত্তার অদ্বৈত অনুভূতিকে মনে করিয়াছেন এবং উহাকে 'মহাসুখ' নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহা যৌন-যোগাচারমূলক। বৈষ্ণব সহজিয়াগণ ইহার মধ্যে প্রেমের সুর যোজনা করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট 'সহজ'-এর ধারণা অন্য প্রকার: 'সহজ'-সত্তাকে তাঁহারা বুঝিয়াছেন নর-নারীরূপী রাধা-কৃষ্ণের যুগল প্রেমানুভূতিকে; অর্থাৎ মানবীয় প্রেমকেই তাঁহারা ভগবৎ প্রেমের স্তরে উন্নীত করিয়াছেন,—সরাসরি ভগবানের (বা 'সহজ') জন্য মানুষের প্রেমোৎকণ্ঠা ইহাতে নাই। কিন্তু, বাউলগণ যখন'সহজ'-কে 'মনের মানুষ' নাম দিয়াছেন, তখন সেই 'সহজ'-কে ('মনের মানুষ') আপনারই দেহস্থিত সূক্ষ্ম অনুভূতিকে বোঝাইয়াছেন। 'সহজ' ('মনের মানুষ') সম্পর্কে বাউলের এই ধারণার পশ্চাতে স্থফী ধর্মের প্রভাব রহিয়াছে; অবশ্য, আপনার দেহের মধ্যেই 'সহজ'-কে অন্বেষণ করিবার ইঙ্গিত বৌদ্ধ সহজিয়া সরহপাদের দোহাতেও মিলিয়াছে। 'সহজ'-কে এইরূপে 'ব্যক্তিগত অনুভূতি'রূপে নির্দেশ করিবার যে প্রবণতা বৌদ্ধসহজিয়াগণ দেখাইয়াছেন, স্থফীধর্মের প্রেরণা পাইয়া বাউলদের নিকট তাহাই স্পষ্ট এবং প্রকট হইয়াছে।

'মনের মানুষ'—যিনি সাধকদের দেহের মধ্যেই লুকাইয়া আছেন,—তাঁহার বিরহে ও তাঁহাকে পাইবার জন্য বাউলের যে মিলনোৎকণ্ঠা, তাহার সহিত বৈষ্ণবের প্রেমধর্মেরও পার্থক্য আছে। পরমসত্তার সহিত বৈষ্ণব সাধকের যে বিচ্ছেদ তাহা অনির্বচনীয় এক ভেদ ও অভেদের অবস্থা—অর্থাৎ ইহা "অচিন্ত্য ভেদাভেদ"; বলা বাহুল্য, ভেদ বা দ্বৈতবাদকে স্বীকার না করিলে ইহা সম্ভব নহে। কিন্তু, বাউলগণ কোনো সময়েই দ্বৈতবাদকে স্বীকার করেন নাই, অদ্বৈতবাদকেই তাহারা গ্রহণ করিয়াছেন[১]।

১ ইহার কারণ সুফী ধর্মের প্রভাব। সুফীরাও অদ্বৈতবাদী।

বৈষ্ণব সহজিয়াদের কাছে নর-নারীর রাধা-কৃষ্ণের নাম ধরিয়া প্রেমটাই মুখ্য এবং সেই প্রেমের পথেই তাঁহারা পরমকে পান। ভক্ত এখানে প্রত্যক্ষভাবে পরমের জন্য পথ চাহিয়া বসিয়া থাকেন না। বাউলগণ কিন্তু পরমসত্তার সহিত প্রত্যক্ষরূপে ব্যক্তিগত অনুভূতি দিয়া প্রেম করিয়া থাকেন। ইহার কারণ, তাঁহারা অদ্বৈতবাদকে স্বীকার করিয়াছেন। ফলে, বাউলের নিকট তাঁহার 'মনের মানুষ' একান্তভাবেই তাঁহার নিজস্ব ও ব্যক্তিগত অনুভূতি দিয়া গড়া ; এবং 'মনের মানুষ'কে চিনিয়াই তাঁহারা আপন সত্তাকে চিনিতে পারেন। তাঁহাদের নিকট 'মনের মানুষ' আর কেহই নহেন, ভক্তেরই আপন বিশুদ্ধ সত্তা। 'সহজ' বলিতে তাঁহাদের নিকট তাই যাহা 'সহজাত,' যাহা 'সহ-জ'। এই দিক হইতে বিচার করিলে উপনিষদের আত্মোপলব্ধির তত্ত্ব এবং বাউলিয়া তত্ত্বে প্রভেদ কিছু নাই। অবশ্য, উপনিষদে আত্ম-উপলব্ধির জন্য যে প্রেমের কথা বলা হয় নাই সুফীধর্ম তাহাই শোনাইয়াছে। সুতরাং, বাউলের তত্ত্বের মধ্যে উপনিষদ, সহজিয়াদের 'সহজ' এবং সুফীদের প্রেমধর্মের এক বিচিত্র সংমিশ্রণ হইয়াছে[১] ॥

.... ৫

যে সুফীধর্ম ও আদর্শ বাউলিয়াদের এতোখানি প্রভাবিত করিয়াছে, তাহার সম্পর্কে আলোচনা এই প্রসঙ্গে করা যাইতে পারে। সুফীধর্মের উৎপত্তি ও ইতিহাস এবং উহার সাধারণ বিশেষত্ব সমূহ পূর্বেই হয় স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে, নতুবা প্রাসঙ্গিক ভাবে এই অধ্যায়ের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে করা হইয়াছে। বর্তমান পরিচ্ছেদে উহার অন্যান্য দিক সম্পর্কে সাধারণ ভাবে মন্তব্য করা হইবে।

বাঙলা দেশের সুফীদের ধ্যান ও মনন ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ও সপ্তদশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত উত্তরভারতের সুফী চিন্তাধারার সহিত সমস্রোতে বহিয়া আসিয়াছে। পারস্য-সমরকন্দ হইয়া সুফীধর্ম যখন ভারতে প্রবেশ করে, তখন উহাতে প্রাচ্য ভাবধারার পলি পড়িয়াছে। অতঃপর ক্রমেই পূর্বদিকে

১ *Dr. S. B. Das Gupta* : Obscure Religious cults (1962) *pp-164-181*

বহিয়া-বহিয়া যখন বঙ্গদেশে উহা আসিয়া পৌঁছাইল, তখন সুজলা-সুফলা শ্যামশ্রী বঙ্গের পেলবতা এবং বঙ্গবাসীর ভাবালুতা উহাতে আর এক প্রস্থ রঙ ধরাইয়া দিল। পারস্য ও বঙ্গের নিসর্গ শত-শত সূফী ভজন-কবিতার মর্ম-মূলে রস সেচন করিয়া উহাকে হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী করিয়া তুলিয়াছে।

ভারত ও বাঙলা দেশের এক একজন বিখ্যাত সূফী সাধককে কেন্দ্র করিয়া যুগে-যুগে সূফীদের মধ্যে অনেক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল। সম্প্রদায়গুলি নিজেদের মধ্যে মূলগত একটি ঐক্যকে অঙ্গীকার করিয়া লইয়া অঞ্চল ও সাধকের ভিত্তিতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছিল। বহু সূফী সম্প্রদায়ের মধ্যে বাঙলাদেশে সুহ্‌রবর্‌দীয়হ্‌, চিশ্‌তীয়হ্‌, কলন্দরীয়হ্‌, মদারীয়হ্‌, অদমীয়হ্‌, নকশ্‌বন্‌দীয়হ্‌ এবং কাদিরীয়হ—এই কয়টি সম্প্রদায় উল্লেখ-যোগ্য[১]।

মানবদেহের মধ্যে ছয়টি আলোক-কেন্দ্রের ('লত্বীফহ্‌'-এর) কল্পনা নকশ্‌বন্‌দীয়হ্‌ সম্প্রদায়ই করেন। মদারীয়হ্‌ সম্প্রদায় 'দিকর্‌' বা নাম-কীর্তনের পদ্ধতিতে বিশিষ্টতা আনেন। কলন্দরীয়হ্‌ সম্প্রদায়ের অনুপ্রাণনায় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে বাঙলাদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চলে সূফী ও হিন্দু যোগ-পদ্ধতিকে মিশ্রিত করিয়া পুঁথি রচিত হইয়াছিল[২]। চিশ্‌তীয়হ্‌ ও সুহ্‌রবর-দীয়হ্‌ সম্প্রদায়ের মধ্যে আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য আখড়াতে মিলিত হইয়া নৃত্য-গীত-বাদ্য একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য ছিল। সূফীদের এই নৃত্য-গীত-বাদ্য স্পষ্টতঃই অনৈস্লামিক। ভাবুক বঙ্গবাসীকে ইহা সহজেই নাড়া দিয়াছিল।

বাঙলার সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে সূফী প্রভাব অনেক। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক্‌ বঙ্গে সূফী ধর্ম ও সংস্কৃতির স্বরূপ ও প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন[৩]। তাঁহার মতে, উত্তর ভারত হইতে সূফীধর্ম ও সংস্কৃতি বঙ্গদেশে আসিয়া অনেক আঞ্চলিক সংস্কৃতিকে অঙ্গীকার করে; এবং বাঙলা ও সূফী সংস্কৃতির মিলনে বাঙলাদেশে দুইটি বস্তুর উদ্ভব হয়:

---

১ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক্: বঙ্গে সূফী প্রভাব (১৯৩৫), পৃ ৯৩-১১৯

২ আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ: বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ (প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা) পৃ ৯, ১৪, ৬৭, ৮১, ৮৬, ১৩০, ১৩৮, ১৯২, ২২৩। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক্ ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন।

৩ বঙ্গে সূফী প্রভাব (১৯৩৫), পৃ ১৮৭-২৪৯

(ক) বাউলধর্মের উৎপত্তি (খ) লৌকিক ইস্‌লাম ধর্মের উৎপত্তি।

বাঙলার বাউলধর্ম ও সংস্কৃতি যে একটি মিশ্র সংস্কৃতি ও ধর্ম একাধিক গবেষকের গবেষণা তাহা প্রমাণ করিয়াছে। সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মের কাঠামোর উপর স্ফী, ইস্‌লাম এবং ভারতে প্রচলিত অন্যান্য অপ্রধান ধর্মের বিভিন্ন ও বিচিত্র প্রলেপ দিয়া বাউল ধর্মের উদ্ভব হইয়াছে— ইহা অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন। বলা চলে,—উত্তর ভারত হইতে আগত স্ফী সংস্কৃতির পরিণাম বাউলিয়া তত্ত্বের মধ্যে, এইখানেই বাঙলার সংস্কৃতিকে অঙ্গে ধারণ করিয়া স্ফী মতবাদের পরিবর্তন ও পরিণতি ঘটিল।

বাঙলাদেশে স্ফী ধর্মের অপর পরিণতি ও পরিবর্তন লৌকিক ইস্‌লাম ধর্মের মধ্যেও সংলক্ষ্য। স্ফী দরবীশগণ যখন বাঙলাদেশে ব্যাপকভাবে আসিতে থাকেন, তখন এখানে বৌদ্ধোত্তর যুগের তান্ত্রিকতার বিভীষিকা চলিতেছে। মানুষের মন স্বভাবতঃই তখন দিশেহারা। এমতাবস্থায় মুসলমান স্লতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু সংস্কার ও সংস্কৃতির আবহাওয়ায় পুষ্ট মানুষদের স্ফীগণ প্রেমের বাণী শোনাইয়া তাহাদিগকে আধা-মুসলমান করিয়া তুলিলেন—ইহাই 'লৌকিক ইস্‌লাম ধর্ম'। ইহারা পুরাপুরি আরবের মুসলমান হইল না এবং হিন্দু সংস্কৃতিকেও খানিক-খানিক আঁকড়াইয়া রহিল। এই লৌকিক ইস্‌লাম ধর্ম একান্ত ভাবেই বঙ্গসংস্কৃতির দ্বারা পুষ্ট ও প্রভাবিত।

এই লৌকিক ইস্‌লাম ধর্মের ফলেই বঙ্গে পীরবাদের উৎপত্তি ; খাঁটি মুসলমানদের নিকট পীরবাদের কোনোই সার্থকতা নাই। পীরকে আল্লার প্রতিভূরূপে বিশ্বাস ও পূজা করা, তাঁহার সমাধিতে 'দরগা' নির্মাণ, সেই দরগায় পূজা নিবেদন, সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালা, ধূপ-ধুনা দেওয়া, শিরণী মানা, পীরের নামে পুকুর কাটা, জটা রাখা, দরগায় মাটির ঘোড়া স্থাপন করা, পীরের সংখ্যা 'পাঁচ' বলিয়া নিরূপিত করা—ইত্যাদির মধ্যে হিন্দু সংস্কারকে লক্ষ্য করা যাইবে।

কিন্তু, তাই বলিয়া স্ফী মতবাদই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের উৎস—এমন কথা যাঁহারা বলিয়া থাকেন,[১] তাঁহাদের কথা স্বীকার্য নহে। ডাক্তার

[১] ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়: ইসলামিক মিষ্টিসিজ্‌ম্ (ইণ্ডোইরানিকা, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা) ; এবং ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক : বঙ্গে স্বূফী প্রভাব (১৯৩৫), পৃ ১৭১-১৮০

শ্রীসুকুমার সেন, ডাক্তার শ্রীরমাচৌধুরী এবং ডাক্তার শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রভৃতি এই মতের বিরোধিতা করিয়াছেন। বৈষ্ণবের কীর্তনের উপর সুফীদের 'সমা'-র প্রভাব সম্পর্কে ডাক্তার দাশগুপ্ত বলিয়াছেন, সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের আলবার সম্প্রদায়ের মধ্যেও নৃত্য-গীতের পন্থা দৃষ্ট হয়: ভাগবত পুরাণেও (১১-৫-৩২, বঙ্গবাসী সং) তাহার নজির আছে[১]। ডাক্তার চৌধুরী লিখিয়াছেন, "সুফী মরমিয়াবাদ বহুলাংশে বৈষ্ণব মরমিয়া বাদের সমতুল হইলেও, অধিকাংশ সুফী মরমীগণ দর্শনের দিক হইতে অদ্বৈতবাদী ও বিশ্বাত্মবাদী, কিন্তু বৈষ্ণব মরমিয়াগণ অচিন্ত্য ভেদাভেদ-বাদী ও ঈশ্বরাধিকত্ববাদী[২]।"

ডাক্তার শ্রীসুকুমার সেন মহাশয় বলেন,[৩] ঈশ্বরকে প্রেমিকরূপে কল্পনা বা নৃত্য-গীতের মধ্য দিয়া তাঁহাকে ভজনা করার মধ্যে সুফী প্রভাব অন্বেষণ করা নিপ্রোজন। বৌদ্ধ মহাযান মতে এবং ভাগবতে (১১-১-৩৮) উহার ইঙ্গিত আছে। সুফী সাধকের 'হাল' এবং বৈষ্ণবের 'দশা'-র সাম্য নিতান্তই আকস্মিক। সুফীদের সাধনায় ভগবান প্রিয় ও প্রিয়া দুই-ই হইতে পারেন কিন্তু বৈষ্ণব সাধনায় ভগবান সর্বদাই প্রিয়। বৈষ্ণবের প্রেম সাধনায় সখী-দূতীর যে বিচিত্র ভূমিকা আছে, সুফী প্রেমে তাহা একেবারে অনুপস্থিত। "বাঙ্গালা গীতি-কবিতায় সুফী প্রভাব যদি কিছু পড়িয়া থাকে তবে তাহা সপ্তদশ শতকের শেষার্ধের পূর্বে নয়, এবং তাও আসিয়াছিল হিন্দীর মাধ্যমে।"

.৬

শ্রীহট্ট জেলা হইতে সংগৃহীত বাউলগান গুলিকে আলোচনার সুবিধার জন্য আমার চারিটি স্তরে বিন্যস্ত করিয়াছি: (ক) মনের মানুষ (খ) পীর-মুরশিদা ও গুরুর প্রতি (গ) দেহতত্ত্ব (ঘ) সাধন কথা। এই চারিটি স্তরকে পৃথক পৃথক ভাবে বিশ্লেষণ করিলে বাউল তত্ত্ব ও সাধনা সম্পর্কে শ্রীহট্টের বাউলদের নিজস্ব ধারণাটিকে স্পষ্ট করিয়া লওয়া যাইবে। সকলের আগে 'মনের মানুষ' পর্যায়ের গানগুলিকে আলোচনার জন্য লওয়া যাইতেছে।

---

১ *Dr. S. B. Das Gupta:* Obscure Religious cults (1962), *p 169*
২ ডক্টর রমা চৌধুরী: বেদান্ত ও সুফী দর্শন (১৯৪৪), পৃ ১৬৫
৩ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১৯৪৮), পৃ ২৮৩-২৮৭

'মনের মানুষ' পর্যায়ের গানগুলির মধ্যে মনের মানুষের সহিত বাউল-সাধকের সম্পর্ক, সাধকের ব্যথা-ব্যাকুলতা-আকুলতা এবং মান-অভিমানের চিত্র যেমন একদিকে ফুটিয়াছে,—তেমনি অপরদিকে সেই মনের মানুষের রূপ ও স্বরূপের বাণীচিত্রও গানের মধ্যে অঙ্কিত হইয়াছে। বাউল বিভিন্ন ও বিচিত্র সম্বোধনে মনের মানুষকে বিশেষিত ও সম্বোধিত করিয়াছেন,—উহাতে মনের মানুষের এক বিশিষ্ট পরিচয় ব্যক্ত হইয়াছে। মনের মানুষের সহিত বাউলের সম্পর্ক লীলার, আনন্দের, প্রেমের। বাউল-কবি অনেক ক্ষেত্রেই নিজেকে বিরহিণীর আসনে স্থাপনা করিয়া গান রচনা করিয়াছেন। কিছু-কিছু গানে মনের মানুষের কৃপা যাজ্ঞা করা হইয়াছে।

এই 'মনের মানুষ' একদিকে যেমন 'প্রেমিক,' অপরদিকে তেমনি 'পাখী'। বহু গানে তাঁহাকে এক অচিন জগতের অধরা পাখী বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। তনুর খাঁচায় এই অধরা পাখী থাকিয়া-থাকিয়া ধরা দেয় বটে, কিন্তু সেই ধরার আনন্দ প্রাপ্তির বিন্দুতে পৌঁছাইবার আগেই আবার অধরার জগতে ক্ষণেকের মধ্যে উধাও হইয়া যায়। এই যে পাইবার পরক্ষণেই হারাইবার বেদনা, কিংবা, ক্ষণেকের তরে প্রাপ্তির আভাসের মধ্যে চিরকালের না পাওয়ার ব্যথা—ইহাই এই শ্রেণীর গানকে এক কারুণ্যময় আনন্দে ভরিয়া দিয়াছে। মনের মানুষের উদ্দেশে গীত ও রচিত গানগুলিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়—বাউল-কবি কোথায় যেন পূর্ণপ্রাপ্তিকে স্বীকার করিতে চাহেন নাই : তাঁহার মনে চিরদিনই ক্ষণকালের পাওয়ার পর চির-তরে হারানোর বেদনা কিংবা চিরদিনই না পাওয়ার খেদ বাজিয়াছে। মনের মানুষকে চিরতরে পাওয়ার আনন্দ-গীতি এই জন্যই বড়ো শুনিতে পাই না। মনে হয়, না পাওয়ার এই কারুণ্যের মধ্যেই বাউল-কবি আনন্দ অন্বেষণ করিতে ভালোবাসেন,—পূর্ণ প্রাপ্তির চিরস্থায়ী আনন্দের মধ্যে নহে[১]।

সাহিত্যরসের দিক দিয়া বিচার করিলে ইহা নির্দ্বিধায় বলিতে পারি—বাউলগানের সাহিত্যিক মূল্য যদি কোথাও কিছু থাকিয়া থাকে, তবে তাহা

---

১ গুরুসদয় দত্ত মহাশয় এ বিষয়ে প্রায় একই মন্তব্য করিয়াছেন : "The quest can never end because the Beloved, although felt to be dwelling in the same body as the seeker's, ever eludes complete union, and the intoxication of this perpetual search and pursuit of the Beloved, who is always felt to be very very near but just outside reach, fills the *Bāul* with a never-ending madness". The Folk Dances of Bengal (1954), p 72

এই 'মনের মানুষ' পর্যায়ের গানগুলির মধ্যেই[১]। ইহা সত্য—বাউলের গানের মধ্যে সুর ও গীতি অপেক্ষা তত্ত্ব ও ভাবনাই মুখর হইয়াছে এবং সেই তত্ত্বের রূপায়ণের জন্যই সুরের আশ্রয় লইতে হইয়াছে। বাউল গানের অন্যান্য পর্যায়গুলিতে সেই তত্ত্বকাহিনীর তথ্যময় বিকাশ। কিন্তু 'মনের মানুষ' পর্যায়ের গানগুলিতে একদিকে যেমন তত্ত্বের বিকাশ অপেক্ষাকৃত কম, অপরদিকে তেমনি পাওয়া-না-পাওয়ার ব্যক্তিগত আনন্দ-বেদনার গীতি-কাহিনী ইহাতে এক অভিনব সুর ও স্বাদ আনিয়া দিয়াছে। তথ্যের সার-নির্যাস এখানে গীতি-রসের ভিয়ানে সুরের অরূপ-লোকে উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছে—যাহার ফলে ইহা বাউল গীতি-গুচ্ছের মধ্যে সহজেই শ্রেষ্ঠ অংশ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। বলা দরকার, বাউলগানের এই বিশেষ দিকটিই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

মনের মানুষকে 'অধরা', 'পাখী', 'ময়না', 'দিলাল', 'মনরাজা', 'সুজন-পাগল', 'প্রেমিক', 'প্রাণবন্ধু' ইত্যাদি বিচিত্র সম্বোধনের মধ্যে যে অতৃপ্তির ইঙ্গিত, ইষ্টের জন্য বাউল-কবির মানসিক জগতে যে 'ইমোশনের অভিসার' রহিয়াছে—তাহার মধ্য দিয়াই বাউল-কবিরা কোথায় যেন মাঝে-মাঝে রোমান্টিক হইয়া উঠিয়াছেন।

এইবার গানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মনের মানুষ সম্পর্কে শ্রীহট্টের বাউলের ধারণাকে লক্ষ্য করা যাক। মনের মানুষ যে ধরা দিয়াও অধরা থাকিয়া যান, তিনি যে অচিন পুরুষ, তিনি যে ছলনাময় ও রহস্যময় তাহার উদাহরণ এই:

১ কোন্ তারে তার চিঠি চলে—
পাই না রে তার অন্বেষণ।
তারের খবর জানো নি রে মন॥—সং ১৪৩

এই গানেই মনের মানুষকে 'আচানক এক কারিগর' বলা হইয়াছে। 'আচানক' অর্থ 'আশ্চর্যজনক'।

---

১ এ সম্পর্কে ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের মন্তব্য: "এই সব বাণী সাহিত্যরসের আস্বাদনের জন্য নহে। ইহা সাধনার জন্য। হয়তো ইহাতে সাহিত্যরসও আছে। কিন্তু তাহা তো মুখ্য লক্ষ্য নহে।"—বাঙলার বাউল (১৯৫৪), পৃ ৬১

২ তুই ভাই বিষম ধান্ধাখোর—
রে ভাই, মনোচোর ॥—সং ১৪৪

এখানে মনের মানুষ 'ধান্দাবাজ' এবং 'মনোচোর'।

৩ ভাবিয়া দেখ তোর দেহার মাঝে—
ধরতে গেলে না যায় ধরা ॥—সং ১৪৫

মনের মানুষ এখানে 'অধরা'।

৪ ও মন, যাইবায় রে ছাড়িয়া—
কেও না পাইব তোমায়—সংসারে ধুড়িয়া ॥—সং ১৪৬

মনের মানুষ 'অপ্রাপনীয়'।

৫ কইন ছাবাল্ আকবর আলী :
আমি পাইলাম না অন্বেষণ করি'।
দেখা দিয়া কোথায় গেল—
আমারে পরানে মারি' ॥—সং ১৪৭

মনের মানুষের এই অপ্রাপনীয়তা কবিকে নৈরাশ্যে ডুবাইয়া দিয়াছে।

৬ আর উম্মর পাগলে বলে—
শুনোরে ময়না-পাখি :
কোন্ বনে লুকাইলায় তুমি
নয়ানে না দেখি ॥—সং ১৫০

৭ আমারে ছাড়িয়া তুমি কেমন সুখে আছ
রে শ্যাম শুক পাখি,—
আর হৃদ্‌পিঞ্জিরা শূন্য করি'
দিয়া গেলা ফাঁকি ॥—সং ১৫১

এখানে তিনি 'ফাঁকিবাজ'।

৮ আর ইদ্‌রের মাঝে থাকো পাখি,
তনের মাঝে বাসা ;
ও আমি বুঝিতে না পাইলাম তার রে
ওয়রে পাষাণ মন,
ও আমি চিনলাম না তার রইবার বাসা ॥—সং ১৫২

এই সমস্ত দৃষ্টান্তগুলির মধ্য দিয়া মনের মানুষের স্বরূপ বুঝি। দুই-

একটি গানে দেহের মধ্যে মনের মানুষের অবস্থান ক্ষেত্র নির্দেশিত হইয়াছে—

আর মন-রাজা বসি' আছইন
ছত্তর ধরিয়া।—সং ১৪৫

অপর একটি গানে,

পরার বাড়ী থাকো দিলাল
নাইনি রে তোর ঘর।
হায়রে, নবলাখের বাত্তি জলে
দেখিতে সুন্দর॥—সং ১৫৯

এই মনের মানুষই কখনও শ্রীকৃষ্ণ, কখনও গৌর। বাউল ধর্মের আত্মতত্ত্ব ও পরতত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা যেখানে এক হইয়া গুরুতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত, সেখানে শ্রীরাধিকার বেশবাসও শ্রীকৃষ্ণেরই বেশ হইয়া গিয়াছে—ইহাই মনের মানুষের চরম ও চূড়ান্ত রূপ—

আর কেওরের পিন্দন লালনীলা
কেওরের পিন্দন শাড়ী।
আমার শ্রীমতী রাধিকার পিন্দন—
কিষ্ণ-পীতাম্বরী গো॥—সং ১৬৬

মনের মানুষ পর্যায়ের গানগুলির মধ্যে কোথাও তাঁহার লীলাস্থান হিসাবে আজ্ঞাচক্রের কথা উল্লিখিত হয় নাই—ইহা এক লক্ষণীয় ব্যাপার। এই পর্যায়ের গানগুলির মধ্যে ১৭৬ ও ১৭৭-সংখ্যক গান দুইটি বিশেষ ভাবে লক্ষিতব্য। গান দুইটিতে মনের মানুষের সহিত কৌতুক করা হইয়াছে। বাউল গানের মধ্যে কৌতুকের অবসর একেবারেই নাই। কিন্তু, এই গান দুইটির একটিতে মনের মানুষকে 'সোনার বউ', অপরটিতে 'সুন্দরী দিদি' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে,—গান দুইটির আবহাওয়াও অনেক লঘু। যে প্রেরণাতে মনের মানুষকে 'স্বামী' বা 'প্রেমিক' হিসাবে কল্পনা করা হইয়াছে, সেই প্রেরণারই উল্টাফল হিসাবে মনের মানুষ এখানে 'সোনার বউ' হইয়াছেন।

বৈষ্ণব প্রভাব ও প্রতিবেশ বাউল সঙ্গীতের ভিত্তি। সেই প্রভাবের ফলেই মনের মানুষ শ্রীকৃষ্ণ, প্রেমিক হইয়াছেন; সাধক কবি এখানে বিরহিণী

প্রেমিকা, শ্রীরাধা। এই প্রেম ও বিরহলীলা এই পর্যায়ের গানের এক রসময় দিক। 'মনের মানুষ' যেন লৌকিক জগতের প্রেমিক—কবির সহিত মান-অভিমান চলে। সাধক কবি বিরহিণী সাজিয়া তাঁহার প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন। স্থানে স্থানে বাউল-কবির বিরহজ্বালা ও প্রেমের স্বরূপপোলব্ধির মধ্যে বৈষ্ণবপদাবলীর 'আক্ষেপানুরাগ' ও 'রূপানুরাগে'র ছায়াপাত ঘটিয়াছে। অনাবশ্যক মনে হওয়াতে এই ধরনের গানগুলির উদাহরণ দিলাম না,—পড়িলেই তাহা বুঝা যাইবে।

এই মনের মানুষকে পাওয়া যাইবে কোন্ পথে, কী উপায়ে? শ্রীহট্টের বাউল সে প্রশ্নের উত্তরে অনুভূতি ও উপলব্ধিকেই নির্দেশ করিয়াছেন। যেমন,

ওরে তারে-তারে মিল করিলে
পাইবায় তারের দরশন ॥—সং ১৪৩

'তারে তারে মিল' করা বলিতে এখানে প্রকৃতি-পুরুষ, রজো-বীজ, রাধাকৃষ্ণের কথা বলা হইয়াছে। আর একটি গানে পাই,

এক প্রেমে তিনজন বান্ধা—
যেমন সন্ধ্যামালী ফুল ॥—সং ১৪৯

'তিনজন' অর্থে এখানে প্রকৃতি, পুরুষ এবং উভয়ের মিলিত সত্তা 'মনের মানুষ' রূপী পরমসত্য। 'তিন'-এর প্রসঙ্গ অন্যান্য গানেও উল্লিখিত হইয়াছে,

ওরে, তিন ডালে তার পালা পালিছ—
হায়রে পাষাণ মন,
তারে ধরতে গেলে না দেয় ধরা ॥—সং১৫২

'দম সাধনের' মধ্য দিয়াই যে তাঁহাকে পাওয়া যায় সে কথা এই ভাবে বলা হইয়াছে,

আল্লায় বানায়া দিলাল
মন তার জিন্।
পবনে চড়িয়া ঘোড়া
দৌড়াও রাত্রদিন ॥—সং ১৫৭

বাউল সাধনায় গুরু ও মুরশিদের ভূমিকা এবং গুরুত্ব কী ও কতোখানি, পূর্বেই তাহা আলোচিত হইয়াছে। শ্রীহট্টের বাউল কবিদের গানের মধ্যে গুরু-মুরশিদের সহিত তাঁহাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক, সাধনার ক্ষেত্রে গুরু-মুরশিদের অপরিহার্যতা ইত্যাদি বিস্তৃত ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। এই সকল কথা সাধক-কবিরা কেবল কথার কথা হিসাবেই গানের মধ্যে জুড়িয়া দেন নাই, কিংবা কেবল তত্ত্ব হিসাবেই আনেন নাই। গানগুলি পড়িলেই বুঝা যায়—গুরু ও মুরশিদ তাঁহাদের অন্তরের নিভৃততম প্রদেশেও স্থান পাইয়াছেন এবং গভীর আন্তরিকতা ও অকৃত্রিম নিষ্ঠায় সুরের মধ্যে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। এই পর্যায়ের গানগুলির মধ্যে মূলতঃ এই পাঁচটি ধারার সন্ধান পাওয়া যায় :

(ক) সংসার জীবনে আবদ্ধ মানবমনকে গুরুই সাধনার ক্ষেত্রে লইয়া আসেন ; গুরুর নিকট আত্মসমর্পণ ; গভীর ভক্তি, নিষ্ঠা, বিশ্বাস ; গুরুই অন্তিম কালের পরম আশ্রয়।

(খ) গুরুর নিকটেই সকল তত্ত্বের চাবিকাঠি রহিয়াছে ; সাধনার অথৈ পাথারে গুরু-মুরশিদই কাণ্ডারী ; সাধনার ক্ষেত্রে তাঁহার উপদেশ-নির্দেশ অপরিহার্য।

(গ) গুরু-মুরশিদই পরমতত্ত্ব, তিনিই 'আল্লা'।

(ঘ) গুরু-মুরশিদের কৃপা পাওয়া গেল না বলিয়া সাধকের মনে ক্ষোভ, খেদ ও নৈরাশ্য।

(ঙ) গুরু-মুরশিদ প্রেমিক, সাধক প্রেমিকা। মান-অভিমানের লীলা।

কিছু-কিছু দৃষ্টান্ত দিয়া এই সকল কথাকে এইবার স্পষ্ট করা যাইবে।

(ক) আহ্বান, আত্মসমর্পণ, ভক্তি-বিশ্বাস-নিষ্ঠা, অন্তিমের আশ্রয়—

১ হাছন রাজায় বলে—

মুরশিদ, করো তার উপায়।

ভবসিন্ধু উদ্ধারিয়া

রাখো রাঙা পায় ॥—সং ১৭৯

২ অধম আবজলে বলে,—মুরশিদের চরণতলে—

ও আমি আপন হস্তে মায়ার রছি লাগাইয়াছি গলে ॥—সং ১৮০

৩ তন্তর-মন্তর সব ছাড়ো
 মুরশিদের দিকে চাইয়া ॥—সং ১৮৬

৪ অন্তিমকালে দয়ার গুরু
 চরণ-তলে দিয়ো ঠাঁই ॥—সং ১৯৬

(খ) সাধনার নির্দেশক, কাণ্ডারী—

১ মনরে, ছিরিকুলায় ফুটছে ফুল
 বাইরে আগা, ভিতরে মূল।
 তারে চিন' মুরশিদ ভজিয়া ॥—সং ১৮২

২ মুরশিদ ধরিয়ো কাণ্ডার—
 অবুঝ বালকের নৌকা ডুবিব তোমার ॥—সং ১৮৩

৩ মুরশিদ-পদে দিয়া মন—
 শিখ রে সাধন ভজন ;
 লও সার মুরশিদ ভজিয়া।—সং ১৯০,

৪ ফুল যদি ফুটাইতায় চাও
 মুরশিদ ভজ গিয়া ॥—সং ১৯১

৫ ওরে, বাতাইয়া দেও মুরশিদ
 রূপের নিশানা :
 হায় রে, ও রূপের নমুনা ॥—সং ১৯৩

(গ) পরমতত্ত্ব—'আল্লা'—

১ কলিতে ভাবনা কিরে মন—
 ও মুরশিদ নাম যার হৃদয় গাঁথা,
 ও আল্লার নাম যার হৃদয় গাঁথা ॥—সং ১৭৮

২ আর কইন মুরশিদ মজাইদ চান্দে
 ধিয়ানে ধিয়ান—
 ধিয়ানে আছইন মুরশিদ
 পবনে মিলান ॥—সং ১৯২

(ঘ) ক্ষোভ, খেদ, নৈরাশ্য—

১ সকল রইলা মুরশিদের বাড়ী
 আমি রইলাম দূরে ॥—সং ১৮৭

২ মাঝি আমার হাইল ধরে না—
নৌকা ঘুরে বিপাকে।

* * *

এগো, মারিফতের ভেদ ভাঙিতে
মুরশিদ আমার বয়রী রে।—সং ১৮৮

৩ বন্ধু রে, গুরু যারে দয়া করে
একে হয় দুনা।
ভক্তিগুণে শিরের কলসী
দিনে দিনে উনা॥—সং ১৮৯

৪ গুরুর পদে মতি আমার
কবে হবে হায় রে॥—সং ১৯৭

(ঙ) প্রেমিক-প্রেমিকা—
আর স্বামীর মাঝে নারীর বেসাত
নারীর মাঝে স্বামী।
তোমার মাঝে আমি মুরশিদ,
আমার মাঝে তুমি॥—সং ১৮৩

....৮

'দেহতত্ত্ব' ও 'সাধন-কথা' নামে যদিও স্বতন্ত্র দুইটি স্তবক গড়া হইয়াছে তবু আসলে উহাদিগকে এমন দুইটি 'লেবেল আঁটা' ভাগে ভাগ করা যায় কিনা সন্দেহ। কেননা, দেহতত্ত্বের প্রসঙ্গে সাধন-কথা এবং সাধন-কথার প্রসঙ্গে দেহতত্ত্বের কথা বার-বার আসিয়া গিয়াছে। তবে, ভাবগত আপেক্ষিকতার দৃষ্টি হইতে এই রূপ ভাগ করা যাইতে পারে। আমরা এই দুই স্তবকের আলোচনা একসঙ্গে করিতেছি।

এই উভয় পর্যায়ের বাউল-গীতিগুলির মধ্যে বাউলিয়া তত্ত্বের তথ্যময় দিকটির সমধিক বিকাশ ঘটিয়াছে। দেহ কি, সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত ইহার সম্পর্ক

কোথায়, বাউলের আদর্শের সহিত ইহা কোন্ সূত্রে জড়িত, বাউলের ক্রিয়াময় ও যোগাচারমূলক কার্যকলাপের ভিত্তিভূমি রূপে ইহার ভূমিকা কি, দেহস্থিত বিভিন্ন শিরা-নাড়ীর অবস্থান ও সংখ্যা নির্দেশ, দেহকে ভিত্তি করিয়া মুরীদ-মুরশিদের পালনীয় বিবিধ কর্তব্যাদি—সবই এই দুই পর্যায়ের গানগুলির মধ্য দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। দেহতত্ত্ব ও সাধন-কথা গুচ্ছের গানগুলি আলোচনা করিবার পূর্বে দুইটি বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া লওয়া দরকার : (ক) বাউলগণ দেহকেই ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিরূপ মনে করিয়া থাকেন— অতএব বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব (cosmology) সম্পর্কে বাউলদের মতামত কী, এবং দেহকে কিভাবে উহার প্রতিরূপ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন —তাহার আলোচনা (খ) দেহের উপাদান এবং দেহস্থিত বিভিন্ন শিরা-নাড়ীর পরিচয় ও উহাদের সংখ্যার ব্যাখ্যান।

বাউলের আদর্শ একদিকে হিন্দুতন্ত্র, অপরদিকে সুফী মতবাদদ্বারা গঠিত। হিন্দু পুরাণে বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত হইয়াছে। নাসাফী, জীলী প্রভৃতি প্রখ্যাতনামা সুফীগণও তাঁহাদের মতো করিয়া বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্বের রূপরেখা আঁকিয়াছেন। নাসাফী বিশ্বাস করেন, সৃষ্টি দুই রকমের— দৃশ্য ও জড় : এবং অদৃশ্য ও অজড় বা আধ্যাত্মিক জগতের পরিচয় উহার অধিবাসীরাই কেবল দিতে পারেন ; ইঁহারা হইলেন, দেবদূত, ঈশ্বরের দ্বার রক্ষকগণ, জীবজন্তু-তরুলতা-ধাতব দ্রব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, শয়তান এবং বিবিধ অপদেবতা। ঈশ্বরের দ্বার রক্ষকদের মধ্যে মোহাম্মদের স্থান সকলের উপরে ; ইঁহারাই ঈশ্বরের বাণী প্রচার করিয়া থাকেন। দৃশ্য ও জড় জগৎ আবার দুই ভাগে বিভক্ত : স্বর্গ এবং মর্ত। 'স্বর্গ' হইল—নব সংখ্যক স্বর্গ এবং আকাশ ও তারকা ; 'মর্ত' বলিতে পৃথিবী, চারি ভূত (আব, আতস, খাক ও বাদ), বজ্র-বিদ্যুৎ-বৃষ্টি, জীব-তরুলতা-সমুদ্র এবং ধাতব পদার্থের সমাহার। "সৃষ্টির প্রারম্ভে, ঈশ্বর নিমেষ মধ্যে স্বীয় স্বরূপ হইতে আদি ভূতের সৃষ্টি করেন। ইহার নাম "মহম্মদের আলোক" (নুরুল মুহম্মাদিয়া)। ইহাকে "লেখনী"-ও বলা হয়, কারণ ইহা ঈশ্বরাদেশে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লিখিত অথবা সৃষ্টি করে। আদি ভূত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এবং ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বদ্ধ। ইহার অপর নাম "বিশ্বজ্ঞান" (Universal Reason)। ইহা ভবিষ্য বিশ্ব সম্বন্ধে ঈশ্বরের জ্ঞানের মূর্ত প্রকাশ। ইহা সমগ্র জগতের আদিরূপ

অথবা আদর্শ। আদি ভূত হইতে মৌলিকতত্ত্ব, ইহা হইতে নব সংখ্যক স্বর্গ; চতুর্বিধ ভূতগ্রাম (পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ু); আকাশ ও তারকাদি জন্মে। সর্বোচ্চ স্বর্গদ্বয়[১] ব্যতীত অপর সপ্ত স্বর্গকে "পিতৃসপ্তক" ও চতুর্ভূতকে "মাতৃচতুষ্টয়" নামে অভিহিত করা হয়। উক্ত "পিতৃসপ্তক" ও "মাতৃচতুষ্টয়" হইতে ধাতু, উদ্ভিদ ও জীবজন্তর উদ্ভব হয়। ইহারা "সন্ততিত্রয়" নামে অভিহিত। পরিশেষে মানব সৃষ্টি হয়[২]।"

"জীলীর মতে, সৃষ্টিক্রম নিম্নলিখিত রূপ :—অব্যক্ত পরমাত্মা স্বীয় স্বরূপ প্রকটীকৃত করিতে অভিলাষী হইয়া সর্বপ্রথম স্বীয় নামের আলোক হইতে মহম্মদের আলোক সৃষ্টি করেন। ইহাই বিশ্ব-চরাচরের আদিভূত। এই আলোকের উপর তিনি "সর্বজয়ী দাতা" ও "করুণাময় ক্ষমাকর্তা" এই নাম-দ্বয়ের জ্যোতিঃ বিকিরণ করিলে, উহা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায়; এবং ঈশ্বর দক্ষিণ অংশ হইতে অষ্টবিধ স্বর্গ ও বাম অংশ হইতে নরক সৃষ্টি করেন। পুনরায় তিনি, আদি ভূতের প্রতি পরিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, তাহা তরলত্ব প্রাপ্ত হইয়া জলে পরিণত হয়। তৎপরে, তিনি ইহার প্রতি ঐশ্বর্য প্রধানা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, উহা তরঙ্গ, ফেন ও বাষ্পরূপ প্রাপ্ত হয়। ফেনরূপ স্থূল অংশ হইতে তিনি সপ্তভুবন ও তল্লোকবাসী; এবং বাষ্পরূপ সূক্ষ্ম অংশ হইতে সপ্তস্বর্গ এবং তল্লোকবাসী দেবদূতের সৃষ্টি করেন। তৎপরে, তিনি জল হইতে ব্রহ্মাণ্ড পরিবেষ্টী সপ্ত-সমুদ্র সৃষ্টি করেন[৩]।"

ভারতীয় পুরাণে বলা হইয়াছে, ব্রহ্মাণ্ড চতুর্দশ ভুবনের (সপ্তলোক ও সপ্ততল) সমাহার। সপ্তলোক এই : ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক, সত্যলোক বা ব্রহ্মলোক। সপ্ততল : অতল, পাতাল, বিতল, সুতল, তলাতল, রসাতল ও মহাতল। বিশ্ব অগণিত ব্রহ্মাণ্ডের সমাহার।

শ্রীহট্টের বাউলগণ অবশ্য বিস্তৃত ও সূক্ষ্মরূপে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা করেন নাই। বিভিন্ন গানের মধ্যে প্রাসঙ্গিকভাবে তাঁহারা সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে সামান্য ইঙ্গিত

১ এই স্বর্গদ্বয়ের নাম 'আর্শ' ও 'কুর্শী'। 'আর্শ' অষ্টম স্বর্গ,—মোহাম্মদ ছাড়া অপর কেহ ইহাতে যাইতে পারেন না।

২ ডাক্তার রমা চৌধুরী: বেদান্ত ও সূফী দর্শন (১৯৪৪), পৃ ৬১-৬২

৩ ঐ, পৃ ৬২-৬৩

করিয়াছেন মাত্র। জল দিয়াই যে সৃষ্টি ও অস্তিত্ব গড়া, এ কথা একটি গানে বর্ণিত হইয়াছে,

ভাইরে ভাই,
কি আচানক আজব লীলা
পাতিয়াছইন মাবুদ।
হায়রে, পানি দিয়া গড়িয়াছইন
সুন্দর অজুদ ॥—সং ২০৩

মানব-সৃষ্টি প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—"দম হইতে আদম পয়দা" (সং ২২২)।

মানবদেহ এই বিশ্বের প্রতিরূপ। সৃষ্টি ও সৃষ্টির প্রতিরূপ এই মানবদেহ—এ দুয়ের মাঝখানে বাউলেরা আর একটি সত্তাকে স্বীকার করিয়াছেন—যিনি দেহকে বিশ্বের প্রতিরূপ হিসাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইনিই 'আল্লা', ইনিই 'মনের মানুষ'। 'আল্লা' বা 'মনের মানুষ' মানবদেহকে বিশ্বের প্রতিরূপ হিসাবে গড়িয়া তারপর নিজেই সেই দেহের খাঁচায় লুকাইয়াছেন। অতএব এই ব্যাপারটির মধ্যে তিনটি তত্ত্বকে পাওয়া যাইবে—বিশ্ব, মানবদেহ এবং এ দুয়ের মাঝখানে আল্লা। বলা দরকার, আল্লা যখন বিশ্ব ও মানবদেহের মিলন-সাধক তখন তিনি কোরান-বর্ণিত 'আল্লা' নহেন।

এই 'আল্লা' বা 'মনের মানুষ'-কে বিচিত্র সম্বোধনে সম্বোধিত ও বিশেষিত করা হইয়াছে। গানে বলা হইয়াছে,

সোনার ময়না ঘরে থইয়া
বাইরে তালা লাগাইছে।
রসিক আমার মন-বানিয়ায়
পিঞ্জরা বানাইছে ॥—সং ২০২

'মন-বানিয়া' দেহ-রূপ পিঞ্জর প্রস্তুত করিয়াছেন 'সোনার ময়না'র রূপ ধরিয়া নিজেই তাহাতে রহিবার জন্য। কখনো বা দেহকে বলা হইয়াছে তাঁহার আবাসস্থল; এবং দেহ-ঘর নির্মাণ করিয়া কোথায় যেন তিনি লুকাইয়াছেন, সাধক আকুলভাবে তাঁহার অন্বেষণ করেন—

বাবই, কই লুকাইলায় রে—
ঘরখিনি বানাইয়া বাবই, কই লুকাইলায় রে ॥—সং ২০৭

তিনি যন্ত্রী হইয়া এই দেহ-যন্ত্রে গান ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছেন

ভাবিয়া দেখ্ তোর মনে—
মাটির সারিন্দারে তোর বাজায় কোন্ জনে ॥—সং ২০৮

এইভাবে দেহ প্রস্তুত কারকের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। দেহ-কে যে বিশ্বের প্রতিরূপ হিসাবে প্রস্তুত করা হইল,[১] তাহার উপাদান কি এবং দেহের পরিচয়ই বা কি? বিশ্বের দুইটি দিক—দৃশ্য (জড়) এবং অদৃশ্য (অজড় বা আধ্যাত্মিক); মানুষ দৃশ্য ও অদৃশ্য উভয় বিশ্বেরই সমাহার। জড় জগৎ হইতে মানুষ আগুন, জল, বাতাস, মাটি এবং 'নাফস্' বা স্থূল আত্মা —এই পাঁচটি উপাদান পাইয়াছে। আধ্যাত্মিক বা অদৃশ্য জগৎ হইতেও মানুষ পাঁচটি উপাদান পাইয়াছে; 'কাল্‌ব' (হৃদয়), 'রুহ' (আত্মা), 'সির' (গভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানশক্তি), 'খাফী' (গভীর উপলব্ধি শক্তি), 'আখফা' (প্রগাঢ়তম অনুভূতি শক্তি)। মানবদেহের বামদিকে 'হৃদয়', ডানদিকে 'আত্মা,' গভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানশক্তি ইহাদের মাঝখানে, কপালে উপলব্ধি-শক্তি এবং মাথায় (বা বুকে) গভীরতম অনুভূতি শক্তির অবস্থান[২]। গানে পড়ি,

আব-আতস-খাক-বাদে—
পিঞ্জিরা বানাইছে সাধে;
সেই পিঞ্জিরায় সুয়া করছে বন্দী ॥—সং ১৯৯

শ্রীহট্টের বাউলেরা 'নাফস' (অর্থাৎ জড় আত্মাকে) লইয়া কাল্‌ব, রুহ, সির্, খাফী ও আখফা-এই ছয়টি 'লতিফা' (অর্থাৎ আলোক-কেন্দ্র)-র কল্পনা করিয়াছেন দেহের অভ্যন্তরে—

আল্লা, প্রথমকু মুরশিদের জিকির দিলা—
জিকির লতিফায়।

১ এ সম্পর্কে 'নূর নছিয়ত' কাব্যে সৈয়দ শাহানূরের বক্তব্য স্মরণীয়—

বস্তী জঙ্গল দরিয়া শুন তনে আপনার,
মোকামে মোকামে মৌলায় পাতিয়াছে পশার।
হায়াত মওত রিজেক দৌলত তনের মাঝে আছে,
তনের মাঝে সুজন পক্ষী কলের উপর নাচে।
—শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৪৫, পৃ ১৩১
তনের মাঝে সপ্তদরিয়া বস্তী-জঙ্গল আছে,
তনের মাঝে মক্কা-মদিনা-চন্দ্র-সূর্য নাচে।
—ঐ, মাঘ ১৩৪৪, পৃ ১৩১

২ তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তম পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

এগো, এক মোকামে ছয় নিশানি—
'আল্লা হু' নাম শুনা যায় ॥—সং ২২৬

'এক মোকামে ছয় নিশানি'র অর্থ হইল—এক দেহে ছয়টি 'লতিফা'র অবস্থিতি। গভীরতম অনুভূতিশক্তির ('আখফা') অবস্থান যে হৃদয়ে ('সিনাবসিনা') সে সম্পর্কে বলিয়াছেন, "আল্লা মুরশিদের আইজ্ঞা জানো ছিনা-বছিনায়" (সং ২২৬)।

দেহের বিস্তৃততর এবং আভ্যন্তরীণ পরিচয় দিতে গিয়া বাউল-কবিগণ কয়েকটি পরিচিত রূপক-উপমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। দেহকে কখনো পাখীর খাঁচা, কখনো ঘর, কখনো 'মাটির সারিন্দা', কখনো নৌকা, কখনো একটি শহর, কখনো রেলগাড়ী, কখনো ইঁদুর, আবার কখনো বা বণিক বলা হইয়াছে। এই সমস্ত রূপক-উপমার আড়ালেই দেহের আভ্যন্তরীণ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। সেই সমস্ত রূপক-উপমাগুলিকে অবলম্বন করিয়া আমরা বাউল-কবির অনুসরণে দেহের বিস্তৃততর পরিচয়টি তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছি।

বাউল গানগুলির মধ্যে বহুশঃ 'দুই' সংখ্যাটির উল্লেখ মিলে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রূপক-উপমার মাধ্যমেই এই সংখ্যাটি ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন, দুই বাতি, দ্বিতীয়ার চাঁদ, দুইজন গুণারী, ইত্যাদি। বাতি এবং চাঁদ আলোকের ইশারা দেয়। দেহের শীর্ষস্থানে আল্লা ও রসুল—এই 'দুই' জনের মিলিত সত্তায় যে পরমতত্ত্ব, শ্রীহট্টের বাউলেরা সেই পরমতত্ত্বের 'রূপ' কল্পনা করেন নাই; ইহাকে তাঁহারা অবয়ব বিহীন একটি আইডিয়া হিসাবেই কল্পনা করিয়াছেন এবং সেই অরূপ সত্যের চতুর্দিক আলোক, গান ও ফুল দিয়া ভরিয়া দিয়াছেন। পরমতত্ত্ব যে জ্যোতিঃস্বরূপ—এই ধারণার মধ্যে কোরানের প্রভাব থাকিতে পারে। বাউলের সহস্রারস্থিত সহস্রদল-পদ্মের রূপ ও রঙের প্রভাব এখানে পড়ে নাই বলিয়াই মনে হয়। যাহা হউক, সেই জ্যোতিঃসত্তার ইঙ্গিত মোমের বাতি, দ্বিতীয়ার চাঁদ প্রভৃতির মধ্য দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। সৈয়দ শাহানুর তাঁহার 'নূর নছিয়ত' নামীয় কাব্যে এবিষয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়াছেন,

তেলে উঠিয়া বলে আমি বাতির লাগাল পাই,
পরকাশ করিয়া ঘর সর্বস্থানে চাই।

শাহানূরের তনে বলে, আমি মনের লাগাল পাই,
নিরলে বসিয়া রূপ নয়ান ভরিয়া চাই[১] ॥

তনু ও মন—রসুল ও আল্লা। তেল-সলিতা এখানে 'দমের' প্রতীক। বাতি—জ্যোতির্ময় পরমতত্ত্ব (তাহাই 'আল্লা')। 'রূপে'-র কথা বলা হইলেও রূপ কল্পিত হয় নাই।

মন-বানিয়া 'সোনার ময়না' হইয়া নিজের আবাসস্থল রূপে যে দেহ-পিঞ্জর নির্মাণ করিয়াছে, তাহার বিশেষত্ব এই,

পিঞ্জরার তিন রকমের কল :
তার মাঝে ভরিয়া থইছে মিঠা পানির জল ॥—সং ২০২

'তিন' সংখ্যাটিকে বাউল-গানে বহুবার পাওয়া যাইবে। প্রসঙ্গের ভিন্নতার সহিত ইহার অর্থেরও ভিন্নতা ঘটে। বর্তমানে দেহের প্রসঙ্গে ইহা ব্যবহৃত হওয়ায় ইহা দেহস্থিত তিনটি প্রধান নাড়ী—ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নার সমাহারকে নির্দেশ করিতেছে। সহজিয়া বৌদ্ধ ও হিন্দু তান্ত্রিকের সাধনা কখনই প্রান্তস্থিত দক্ষিণ ও বামকে অবলম্বন করিয়া নহে,—তাহা উহাদের মাঝখানে। বাউলদের ধারণা এইখানে তাহাদের সহিত সাদৃশ্য রক্ষা করিয়াছে। তাহারাও মধ্যস্থিত সুষুম্নাকেই সাধনার ভিত্তি-রূপে নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু অন্যত্র এই 'তিন'-এর ব্যাখ্যা অন্যরূপ। কখনও ইহা বাউল সাধনার তিনটি স্তর—প্রবর্ত-সাধক-সিদ্ধ (বা আত্মতত্ত্ব-পরতত্ত্ব-গুরুতত্ত্ব), কখনও বা 'আহাদ' বুঝাইতে আলিফ, হে, দাল—এই তিন বর্ণকে, কখনো বা স্বর-ব্যঞ্জন-যুক্তবর্ণ বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে। নীচে 'তিন-'এর প্রসঙ্গে অন্যান্য রূপক-উপমা উদ্ধৃত হইল :

ডাইনে বাঁউয়ে দুকুছা নালা
যাইয়ো না মন কখনেতে।
ও তার মধ্যের নালায় বেপার-তিজার
জানইন সাধু আলিমগণে রে ॥—সং ২১৬

দক্ষিণ-বাম ছাড়িয়া মাঝের নদী বাহিয়া চলিবার ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্নাকে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী এই তিনটি নদী-রূপও বলা হয়, এই ত্রিধারা 'ত্রিবেণী' নামে খ্যাত।

১ শ্রীহট্ট সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৪৫, পৃ ১১

বহু গানে তাই 'তিপুর্ণিয়া' (সং ২১৬, ২২৫, ২৩১)র উল্লেখ পাই। এই 'ত্রিবেণী'র ঘাটেই পরমতত্ত্বের মুক্তা মিলিবে—

বন্ধুয়ারে, ডাইনে ছাট, বামে ছাট,
মধ্যে তিপুর্ণিয়ার ঘাট—
ডুব দিলে মিলে এক মুতি।—সং ২২৫

দেহের দক্ষিণ-বামস্থিত দুই নাড়ী ইড়া-পিঙ্গলাকে নির্দেশ করিবার জন্য দেহকে শহরের সহিত উপমিত করিয়া বলা হইয়াছে—শহরের মধ্য দিয়া দুইটি নদী প্রবাহিত হইতেছে—"আর উলাই-নালাই দুইটি নদী শ'রের ভিতর" (সং ২২৪)। এই দুই দিক ছাড়িয়া তৃতীয় দিক অর্থাৎ মাঝের দিক অর্থাৎ ত্রিবেণীতেই রহিয়াছেন পরমতত্ত্বরূপী আল্লা: "এগো, ত্রিপুর্ণিয়েতে ধিয়ান কইলে 'আল্লা হু' নাম শুনা যায়" (সং ২২৬)। সর্বত্রই দেখা যায়. মধ্য পন্থাকে শ্রেয় ও খাঁটি বিবেচনা করা হইয়াছে—

বন্ধুয়ারে, ডাইনে ফুল, বামে ফুল
আকাশে পাতালে মূল—
মাঝের ফুলে ধরিয়াছে কলি॥—সং ২২৫

এই মাঝ নদীতে নৌকা ভাসাইতে পারিলেন না (অর্থাৎ সুষুম্না নাড়ীর পথ বাহিয়া উর্ধ্বমুখী সাধনা করিতে পারিলেন না) বলিয়া সাধকের মনে কখনো বা জাগে অনুতাপ-অনুশোচনা,

আর একটি নদীর তিনটি নালা
বাইতে আমি পাইলাম না।
এগো, সেই নদীতে ডুব দিলে
তন্ত্র-মন্ত্র লাগে না॥—সং ২৩৭

'তিন' সংখ্যাটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নদী-নালার রূপকে ব্যবহৃত হইয়াছে।

'চার' সংখ্যাটির ব্যবহারের মধ্যে বাউলগণ কোনো মতি স্থিরতার পরিচয় রাখেন নাই। বিভিন্ন পরিবেশে ইহারও বিভিন্ন অর্থ করা হইয়াছে। কখনো ইহা মানব দেহের উপাদান—আগুন-বাতাস-জল-মাটি—এই চারটিকে বুঝাইয়াছে; কখনো 'আলম-ই-হাউত'-কে বাদ দিয়া 'আলম-ই-লাহুত', 'আলম-ই-জবরুত,' 'আলম-ই-মলকুত' এবং 'আলম-ই-নাছুত' মানব দেহস্থিত এই চারি মোকামকে নির্দেশ করিয়াছে; কখনো 'আহমদ'

(আল্লার নিরানব্বুইটি নামের অন্যতম) শব্দটি নির্দেশ করিতে আলিফ্, হে, মিম ও দাল—এই চারটি আরবী বর্ণকে লক্ষ্য করিয়াছেন। চারি কলেমা (যথা, কলেমা তয়েব, কলেমা শাহাদত, কলেমা তৌহিদ ও কলেমা তমজীদ), ইসলাম ধর্মের চারিটি সাধনার পথ (যথা, শরীয়ত, তরীকত, হকীকত ও মারীফত), চারি ইমাম (যথা, হজরত আবুবকর, হজরত আলী, হজরত ওসমান, ও হজরত ওমর)—প্রভৃতি বিচিত্রভাবে 'চারি' সংখ্যাটিকে ব্যবহার করা হইয়াছে। তবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহা মানবদেহের উপাদান চতুষ্টয় ও মোকাম চতুষ্টয়কে বুঝাইয়াছে।

'চার' সংখ্যাটিকে আমরা নিম্নলিখিত রূপক-উপমার মধ্যে পাইয়াছি: ২০৪-সংখ্যক গানে পাইতেছি—দেহ-রূপ শহরের চারটি কাচারি আছে ; ওই গানেই আবার পাই 'চারি জনে শহর বেড়া'। প্রথম চারি-কে যদি 'চারি মোকাম' বলি, দ্বিতীয় চারিকে তবে 'চারি ইমাম' বলিতে হয়। ২১২-সংখ্যক গানে যখন পড়ি: "চাইর তক্তার নাওখান আমার পড়ব বালু-চরে", তখন স্পষ্ট বুঝি দেহ-নাও চারিটি উপাদানে গঠিত। "বাড়ীর পিছে চাইর কিয়ার জমিন, বন্ধে আসি' খরিদ কইল" (সং ২১৩)—ইহাও চারি মোকামকে নির্দেশ করে।

'ছয়' সংখ্যাটি সম্পর্কে অবশ্য সন্দেহের অবকাশ কম। বহুকাল ধরিয়া ইহা ষড়রিপু-কে নির্দেশ করিয়া আসিতেছে এবং আমাদের বর্তমান বাউল কবিগণও উহার অন্যথা করেন নাই। কিন্তু, গানের মধ্যে 'ছয়' সংখ্যাটির ব্যবহার দেখিয়া মনে হয়—কবিগণ সর্বত্র উহাকে 'রিপু' বা 'শত্রু' অর্থে প্রয়োগ করেন নাই। "আগে-করে ছয় জন মাঝি, জলদি বাইয়া যাও" (সং ২০২)—ইহা যখন বলা হয়, তখন দেহ-নৌকার অনু-কূল শক্তি হিসাবেই সংখ্যাটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু, রিপু কী করিয়া সাধন-নৌকার স্রোত বাহিবার অনুকূল শক্তি হইবে? কিংবা, পরমতত্ত্বের দেহস্থিত আবাসস্থলকে একটি ফুল-বাগানের সহিত উপমিত করিয়া সেই বাগানের মালী হিসাবে যখন 'ছয়'-এর উল্লেখ করা হইয়া থাকে, তখন উহাকে স্বীকার করিয়া নেওয়া যায় না। আবার, ২১৪-সংখ্যক গানে বলা হইয়াছে, "এগো, ডাইনা-বাঁউয়া ছয়জন মাঝি" ; সাধনার নৌকা বাহিবার জন্য ছয় রিপুকে তো শত্রু বিবেচনা করা উচিত, তাহা না করিয়া উল্টাটাই

করা হইয়াছে। 'ছয়'-কে যে নতুন কোনো অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে এমনও তো নহে। যেখানে বলা হইয়াছে—দেহ-জমিনের স্বর্ণ-শস্য "ছয় বলদে চরিয়া খাইল" (সং ২১৩), কিংবা "দেহার মাঝে ছয়টি রিপু থাকে আমার সঙ্গে" (সং ২১১)—সেখানে কবিগণ ছয়ের অন্য কোনো ব্যাখ্যাকে নিশ্চয়ই মনে স্থান দেন নাই। মনে হয়, 'ছয়' সম্পর্কে তাঁহাদের এই বিপরীত ধারণা অনবধানতা বশতঃ আসিয়া গিয়াছে।

দেহকে বহুবার বহুস্থলে একটি ঘরের সহিত উপমিত করিয়া উহার দরজার সংখ্যা 'নয়' বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। গানে তাই বলা হইয়াছে, "ওরে, নয় দরজা বন্ধ করিয়া দম সাধন কর" (সং ২০৩)। দেহ-রূপ শহরের "নয়টি থানা" (সং ২০৪) রহিয়াছে। পরমতত্ত্বের আবাসস্থলের "খিড়কিকাটা নয় নিশানা" (সং ২০৫)। "একই ঘরে নয় দরজা" (সং ২১৩)। এই 'নয়'-এর ব্যাখ্যা কি? হিন্দু যোগশাস্ত্রে দেহের একাদশটি দ্বারের কথা জানা যায়: দুই চোখ, দুই কান, দুই নাক, মুখ, নাভি, মূত্র ও মলদ্বার এবং ব্রহ্মরন্ধ্র। ইহা হইতে দুইটিকে বাদ দিয়া কি 'নয়' করা হইয়াছে? নবগ্রহের সহিতও ইহা কোনো যোগাযোগ আছে বলিয়া মনে হয় না। কিংবা, ইহা কি শ্রীহট্টের বাউলদের কোনো বিশেষত্ব?

'দশ' সংখ্যাটিকে যে সকল গানে (সং ২১৯, ২৩২) পাওয়া গিয়াছে, সে সকল গান হইতে ইহাকে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের সমাহার বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায়। অথবা, ইহা একদিকে আব, আতস, খাক, বাদ ও নাফস্ এবং অপরদিকে কাল্‌ব, রুহ, সির, খাফী, আখফা—এই দশটি উপাদান।

'চৌদ্দ' সংখ্যাটি (সং ২০০)-কে এই ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়: সুফি-সাধক-কল্পিত সপ্তভুবন ও সপ্তগ্রহের সমাহার। সপ্তভুবন এই: মানবগণের আবাসস্থল 'জীবাত্মভুবন'; ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসী উপদেবতাগণের (জিন্-দের) আবাসস্থল 'ভক্ত জন ভুবন'; ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাসী উপদেবতা-গণের (জিন্-দের) আবাসস্থল 'ভূতজন ভুবন'; শয়তানের (ইবলিস্) উত্তর পুরুষদের আবাসস্থল 'কামুক জন ভুবন'; দানবদের বাসভূমি 'অমিতা-চারিজন-ভুবন'; পরম অবিশ্বাসী ও ঈশ্বরদ্রোহীদের নিবাসভূমি 'অধার্মিক

জন ভুবন'; সর্প ও বৃশ্চিক অধ্যুষিত 'ক্লেশসঙ্কুল ভুবন'। সপ্তগ্রহ এই : আদমের বাসভূমি চন্দ্র; দেবদূতের বাসভূমি বুধ ও শুক্র; ধর্মপ্রবর্তকগণের বাসভূমি সূর্য; মৃত্যুদূতের নিবাসভূমি মঙ্গল; করুণাদূতের আবাস বৃহস্পতি এবং মোহাম্মদের আলোক-সঞ্জাত শনি[১]। প্রসঙ্গতঃ ভারতীয় পুরাণ-কথিত সাতটি 'লোক' এবং পৃথিবীর নিম্নস্থ সাতটি 'তল'-এর কথাও উল্লেখ করা দরকার।

'ষোলো' সংখ্যাটির (সং২০২, ২০৪) ব্যাখ্যা এই : ইহা পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় ও ছয়টী রিপুর সমাহার॥

দেহকে বাউলেরা কখনই কেবল একা সাধকের বলিয়া ভাবেন নাই। এই দেহের মধ্যে যেমন বিশ্ব বাঁধা পড়িয়াছে, তেমনি আরো কয়েকটি আইডিয়া রূপী মানুষ বা মানুষরূপী আইডিয়াও ইহার মধ্যে রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে বাউলগানের মধ্যে প্রাপ্তব্য তিন, পাঁচ, আট, বারো এবং আঠারো প্রভৃতি সংখ্যার মর্মোদ্ধার করা যাইবে।

'তিন' সংখ্যাটির ব্যাখ্যা পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে আমরা একভাবে দিয়াছি। উহার আরো একটি দিক আছে,—ভাবগত সঙ্গতির জন্য যাহা পূর্বে আলোচিত হয় নাই। গানে পাই,

> একটি ফুলের তিনটি রসে আদম-শহর
> সিং দরজা খুলিয়া রাখলে লুছকা কি সুন্দর॥—সং ২০৪

কিংবা,

> ছাড়িয়া দে তোর ভবের আশা
> তিন ঠাকুরের মেল।—সং ২১৪

আবার,

> আর এক নায়ে তিন জন,
> দুই জন গুণারী—
> গো নায়ের একজন কাণ্ডারী॥—সং ২১৭

১ ঐ পৃ ৬৩-৬৪

শেষে, আর তিন অক্ষরে মিল করিয়া
দমের বাঁশী বাইয়ো ॥—সং ২২৩

'তিন ঠাকুর'—আল্লা, মোহাম্মদ, আদম ; 'এক নায়ে তিনজন'-ও তাহাই। 'দুইজন গুনারী'—মোহাম্মদ ও আদম এবং 'একজন কাণ্ডারী'—আল্লা। 'তিন অক্ষর' হইল আলিফ, হে, দাল অর্থাৎ 'আহাদ' অর্থাৎ আল্লা। কিন্তু, আদমের শহরে 'একটি ফুলের তিনটি রস' কি ? 'তিনটি রস' কি আল্লা, মোহাম্মদ, আদম ? তাহা হইলে 'একটি ফুল,' বলিতে আল্লা হয় না। মনে হয়, আল্লা একদিকে 'একটি ফুল', অপর দিকে তিনজনের একজন।

অনেক সময় দেহের মধ্যে তিনজনের মিলনের কথা না বলিয়া কেবল দুইজনের মিলনের কথা বলা হইয়াছে : হয় মানুষ ও আল্লার, নয় মানুষ ও মোহাম্মদের কিংবা, আল্লা ও মোহাম্মদের। মোহাম্মদকেই আল্লার 'দোস্ত' বলা হইয়াছে বলিয়া আল্লা ও মোহাম্মদ অনেক ক্ষেত্রেই এক হইয়া গিয়াছেন! এবং এই কারণে মানুষ ও মোহাম্মদের মিলনই বেশী করিয়া উক্ত হইয়াছে। 'তিন অক্ষরে মিল' করিবার কথা যখন বলা হইয়াছে—তখন মানুষ ও মোহাম্মদের মিলন কথাই বর্ণিত হইয়াছে। আল্লা, রসুল (মোহাম্মদ) এবং মানবের নিত্য মিলন[১] —

হকির কাছিমের বাণী
আল্লা-রছুল এক জানি—
এক না হইলে কেমনে দুনিয়া রয়।
এক-দুইয়ে মিলন করি' ভবনদী যাবে তরি'—
চাইয়া দেখ,—তোর এই দেহাতে রইছে দুইয়ের মেলা ॥—সং ২০৬

লক্ষ্য করা দরকার, সাধনার ক্ষেত্রে এখানে নারী বা প্রকৃতির কথা উল্লিখিত হয় নাই। হয় তো, আদম বলিতে এখানে নরনারীর মিলিত সত্তাকেই বোঝানো হইয়াছে। বৈষ্ণব-প্রভাব এখানে পড়ে নাই। আবার, বৈষ্ণব প্রভাবের অনুপস্থিতির দরুনই দেহের মধ্যে পাঁচজন মানুষকে (যথা,

১ কবি সৈয়দ শাহানুর তাঁহার 'নূর নছিয়ত' নামক কাব্যে লিখিয়াছেন,
আল্লা-নবী দুই তন একই তনে খেলা।
মোকাম কাজল আন্ধী কে বুঝিল লীলা ॥
—শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা বৈশাখ১৩৪৫, পৃ ১১

মোহাম্মদ, আলি, ফতিমা, হাসান ও হোসেন) অনুভব করিতে বলা হইয়াছে[১] যেখানে সেখানে প্রেমের প্রসঙ্গ নাই, বরং একটি গানে (সং ৬৯) ফতিমাকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। ২০০-সংখ্যক গানটিতে "একতনে পাঞ্জতন" অনুভব করিবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা হইলে দুই ধারার কল্পনা পাইতেছি। একটিতে মানবদেহ আল্লা-রসুলের মিলনভূমি ; অপরটিতে মানবদেহে মোহাম্মদের সহিত অপর চারজন রহিয়াছেন।

অবশ্য, নর-নারীর মিলিত সত্তার কথাও যে উল্লিখিত হয় নাই, তাহা নহে। মানবদেহ বলিতে কেবল নর, বা কেবল নারী নহে—উভয়েরই মিলিত রূপ। যেমন,

পুরুষ-রমণীর খেলায় দুইয়ের আটআনি।
তাতে বন্ধে দশ মিশাইয়া
ঘর কইল রুশ্‌নি ॥—সং ২৩২

কিন্তু, এই রমণী 'প্রিয়া' রূপে আসেন নাই, আসিয়াছেন 'মা' রূপে—

মায়ের চারি, বাপের চারি,
আল্লার দেওয়া দশ।
আঠারো মুকামের মাঝে
ফিরে মায়া-রস ॥—সং ২১০

এই স্তবক দুইটি হইতে মানবদেহের পরিপূর্ণ উপাদান সম্পর্কে শ্রীহট্টের

---

১ 'নূর নছিয়ত' কাব্যগ্রন্থে কবি সৈয়দ শাহানূর বলিয়াছেন,

পাঁচজন বরজখ আছৈন আপনার তন,
তনের মাঝে বরজখ আছৈন শুন দিয়া মন।
বরজখের মাঝে শুন এ তিন ভুবন।
*　　*　　*　　*
বরজখের মাঝে শুন পাঁচ আইনির বিচার
আল্লা-নবীর খেলা-লীলা বরজখের মাঝার।
—শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, মাঘ ১৩৪৪, পৃ ১৩৪।

'বর্জক' এই আরবী শব্দটির অর্থ 'বিভেদ' (বিভেদের পর্দা)। ইহা ইসলামীয় রহস্যের মূল একটি দিক। স্বর্গ-মর্তের মাঝখানে ইহা অবস্থিত, মরণের পর মানবাত্মা শেষ বিচারের জন্ত এইখানে থাকে। শ্রীহট্টের বাউল পাঁচজনকে 'বর্জক' বলিয়াছেন ; কিন্তু, ডাক্তার শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁহার 'বাঙলার বাউল ও বাউল গান' গ্রন্থে (১৩৬৪) ইহার অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন : "ফকিররা এই 'বর্জক' শব্দটিকে 'মুর্শিদ' বা গুরু বলিয়া বুঝিয়াছে। গুরু-আল্লা ও মানুষের মধ্যবর্তীস্থলে অবস্থিত। ইনি মানুষ ও আল্লার মধ্যে সংযোগ-সাধন করেন (পৃ ৫১৬)।"

বাউলের মতামত জানা যায়। ইঁহাদের মতে—মানবদেহ তাহা হইলে মাতা-পিতা ও আল্লার মিলন ক্ষেত্র হইতেছে। পুরুষ ও রমণীর প্রত্যেকের নিকট হইতে চারটি (আব, আতস, খাক ও বাদ) করিয়া আটটি এবং আল্লার নিকট হইতে দশটি (পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় ও পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়)—মোট এই আঠারোটি উপাদান ও গুণ দিয়া মানবদেহ প্রস্তুত।

অনেক গানে 'বারো' সংখ্যাটি উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার অর্থ বোঝা যাইতেছেনা। বারো-মাসের অমাবস্যার সহিত ইহার যোগ থাকা বিচিত্র নয়। যাহা হোক, ২০৯-সংখ্যক গানের পাদটীকায় ইহার একটি ব্যাখ্যা খাড়া করিয়াছি॥

....১০

এতক্ষণ ধরিয়া বিশ্বসৃষ্টি ও সেই সৃষ্টির প্রতিরূপ মানবদেহের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হইল। এইবার দেহের অভ্যন্তরে 'মনের মানুষের' অবস্থান ও বাসস্থানের পরিচয় দিই।

বাউলগণ 'মনের মানুষ'-কে বিচিত্র সম্বোধনে ডাকিয়াছেন। যথা, 'সুয়া' (সং ১৯৯), 'পাখী' (ঐ), 'সোনার ময়না' (সং ২০২), 'দম-সুয়ারী' (সং ২০৬), 'বাবই' (সং ২০৭), 'ঠাকুর কালাচান্দ' (সং ২১৪), 'রসরাজ' (সং ২১৫), 'শ্যাম' (সং ২১৭), 'লীলমণি' (সং ২২০)—ইত্যাদি। দেহের মধ্যে দুই ভ্রূর মাঝখানে দ্বিদল পদ্মে, আজ্ঞা চক্রে ইঁহার লীলা হয়, যদিও তাঁহার নিত্যস্থান সহস্রারে। হিন্দুতন্ত্রে আজ্ঞাচক্রের উপরে যে সহস্রদল বিশিষ্ট পদ্মকে কল্পনা করা হইয়াছে (অর্থাৎ সহস্রার) তাহা নিম্ন-দিকে প্রস্ফুটিত, প্রভাত সূর্যের মতো দীপ্তিময়। এই সহস্রারেই পরমাত্মা ব্রহ্ম উপবিষ্ট রহিয়াছেন। শ্রীহট্টের বাউলেরা কিন্তু এবিষয়ে অভিনব চিন্তার পরিচয় দিয়াছেন। কি আজ্ঞাচক্র, কি সহস্রার—প্রচলিত কোনো বর্ণনার সঙ্গেই 'মনের মানুষে'র অবস্থান ক্ষেত্রের বর্ণনার মিল নাই।

শ্রীহট্টের বাউলেরা আজ্ঞাচক্রের দ্বিদল পদ্ম বা সহস্রারের সহস্রদল পদ্ম—কোনো পদ্মেরই কল্পনা করেন নাই। অবশ্য তাঁহারা একটি ফুলের কল্পনা করিয়াছেন এবং সেই ফুলকেই পরমতত্ত্বের প্রতীক বা বাসস্থান বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। নীচের উদ্ধৃতিগুলি হইতে তাহা স্পষ্ট হইবে :

(ক) ভাই রে ভাই,

হাওয়ায় পাতা হাওয়ায় গাছ

হাওয়ায় ফুটে ফুল।

ওরে, সেই ফুল চিনিতে পারইন

মোহাম্মদ রছুল[১] ॥—সং ২০৩

(খ) একটি ফুলের তিনটি রসে আদম-শহর—সং ২০৪

(গ) শুন, সেই বাগানের কথা বলি—ইন্দ্রপুরে ছয়জন মালী।

লক্ষ লক্ষ পুষ্পকলি

ভ্রমর করে মধুপান ॥—সং ২০৫

(ঘ) ২২১-সংখ্যক গানে 'কদম ফুল', 'চাম্পা-নাগেশ্বর ফুল' এবং 'বলওয়া ফুল' নামে এই ফুলকে বিশেষিত করা হইয়াছে।

(ঙ) ও মন রে, উপরে গাছের জড়

জমিনে ডাল-পাল।

দম হইতে আদম পয়দা

ফুল ফুটিয়াছে জড় ॥—সং ২২২

(চ) বন্ধুয়া রে, ডাইনে ফুল, বামে ফুল

আকাশে-পাতালে মূল—

মাঝের ফুলে ধরিয়াছে কল্লি ॥—সং ২২৫

(ছ) ফুলের মাঝে মজিয়া থাকিয়ো তুমি—

ফুল তুড়িয়া মধু খাইয়ো।

এগো, ঝাকে-ঝাকে ভমরা অইয়া

মধু লইয়া উড়িয়ো ॥—সং ২৩৩

এই সমস্ত বর্ণনা হইতে বুঝিতেছি (ক) কোনো বিশেষ ফুল নয়, নির্বিশেষ ফুল-কে পরমতত্ত্বের প্রতীক বলা হইয়াছে; (খ) সেই ফুলের কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা নাই,—তাহা এক বা একলক্ষ হইতে পারে; (গ)

---

১ কিন্তু সৈয়দ শাহানূর তাঁহার 'নূর নছিয়ত' কাব্যে বলিয়াছেন—গুরুই সেই ফুলের সন্ধান দিবেন,—"মুরশিদ বাতাইলে পাইবায় ছায়ার (বরজখের) মাঝে ফুল।" কবিদের কল্পনা এখানে নিজেদের মধ্যে সঙ্গতি রক্ষা করিয়া চলে নাই।

এই ফুল মানবদেহের শীর্ষদেশে ফোটে, কিন্তু তাহা দুই ভ্রূর মাঝখানে কি ব্রহ্মতালুতে,—সে বিষয়ে কোনো ইঙ্গিত নাই। ইহার 'আকাশে-পাতালে মূল' এবং 'জমিনে ডাল-পালা' দেখিয়া ইহার রূপ কল্পনা করিবার উপায় নাই। ইহা শুধু একটি বা অনেক ফুল নহে, কোনো কোনো কবির কাছে একটি গোটা ফুলেরই বাগান।[১]

আজ্ঞাচক্র বা সহস্রারের নাম উল্লিখিত না হইলেও ফুল-রূপী 'মনের মানুষে'র বিরাজস্থলের কয়েকটি নাম দেওয়া হইয়াছে। যেমন, 'রঙমহল', 'আচানক ইন্দ্রপুরী,' 'ইন্দ্রপুরের বালামখানা,' 'ছিরিকুলা' বা 'শ্রীকুলা' (সং২০৫), 'শ্রীপুর' (সং ২২৩), 'দিলালপুর,' 'বিন্-আকাশের চান্দ' (সং ২২৫)। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত কাল্পনিক স্থানের নামগুলি 'মনের মানুষের' অরূপসত্তার প্রতিই ইঙ্গিত করিতেছে। একটি গানে আছে,

আর প্রাণ-বন্ধে বিরাজ করইন
নীল সায়রের মাঝে।—সং ২২৩

অপর একটি গানে,

মনের মানুষ দাঁড়াই আছে গো
রসের কোঠাতে।—সং ২৩৬

'রসের কোঠা'-ই 'নীল সায়র' হইয়াছে।

কিন্তু, স্বরূপে তিনি রূপহীন,

আর আলিফেতে ভর করিয়া
লামে নৈরাকার।
তবে দেখা অইত ওরে
শ্রীপুরের ছৈলাব॥—সং ২২৩

অর্থাৎ তাঁহার অবস্থান ক্ষেত্র যদিও আছে, রূপ নাই, তাহা অনুভূতিগম্য

১ পরমতত্ত্বের নিবাস স্থলে ফুল বা ফুল বাগানের কল্পনা শ্রীহট্টের অন্যান্য বাউলেরাও করিয়াছেন। সৈয়দ শাহানূর তাঁহার 'নূর নছিয়ত' কাব্যে দেহের অভ্যন্তরে কেবল 'ফুল বাগান'-কেই কল্পনা করেন নাই; সেই সঙ্গে মুরশিদ-কেই আল্লা-স্বরূপ বা তত্ত্ব-স্বরূপ জানিয়া তাঁহাকে সেই বাগানের কেন্দ্র-বাসী বলিয়াছেন,

তনের মাঝে বাগান-বাড়ী ফুল বৃন্দাবন,—
বাগান-বাড়ীর মাঝে আছে মুরশিদের আসন।
—শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৪৫, পৃ ১২

মাত্র ; তাঁহার প্রতীক ফুল, কিন্তু স্থূল আকৃতি নাই[১]। ইঁহার যদি কোনো রূপ থাকিয়াই থাকে, তবে তাহা প্রেমিক-প্রেমিকার যুগল-সত্তার আনন্দ-রূপ : "কোন্ রূপেতে আশিক-মাশুক বসিয়া করে খেলা"—(সং ২০৬)।

দেহের শীর্ষদেশে ইঁহার অবস্থান : দেহরূপ ঘরের চালে ইনি বসিয়া আছেন,

সকল ঘর বিচারি' দেখি—
টুল্লিয়ে দুয়ার।
সেইখানে বসিয়া আছইন
বন্ধুয়া আমার ॥—সং ২০৭

দেহের অভ্যন্তরে তিনি রূপে বা অরূপে বা প্রতীক ফুল রূপে, 'নীল সায়রে' বা 'রসের কোঠায়,' দাঁড়াইয়া বা বসিয়া যেমন ভাবেই থাকুন না কেন,—তাঁহার চতুর্দিক সঙ্গীতময়[২]। তিনি সঙ্গীত-রাজ্যের মানুষ :

(ক) সেই সুয়ার বুলিখিনি—শুনতে হয়—মধুর বাণী ;—সং ১৯৯
(খ) মাঝে বইয়া হরিদাসে হারি কইয়া চল্‌তেছে।—সং ২০২
(গ) মন-কানাইয়ে বাজায় বাঁশী জঙ্গলের ভিত্তর।—সং ২০৪
(ঘ) ওরে, আজবলীলা রঙ-মহলে হয় কলের গান।—সং ২০৫

---

১ সৈয়দ শাহানুর তাঁহার 'নূর নছিয়ত' কাব্যে লিখিয়াছেন,

'লাহুল' দরিয়ার মাঝে পরান-বন্ধুর খেলা,
ধরিমু-ধরিমু করি বেরথা জনম গেল।

লাহুল' অর্থ 'সীমাহীন' ; আল্লা-রূপী পরমতত্ত্ব রূপ ও অবয়বহীন, তিনি শূন্যময় ও সীমাহীন—

শূন্যে শূন্যে আবে পবন শূন্যে শূন্যে যায়,
পলকের মাঝে মন ভুবন বেড়ায়।

এই কাব্যেরই অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন,

নাই তার সাথী-সঙ্গী, নাই তার পর,
মন ডুবে নাই থাকে সদায় চরাচর।
নাই তার মুণ্ড-আঙকি, নাই তার অঙ্গ,
নাই তার রবি-শশী নাই তার সঙ্গ।
* * * *
সরূপার নিকটে আছে নিরূপার বাস,

—শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, মাঘ ১৩৪৪ ॥ বৈশাখ ১৩৪৫

২ "পঞ্চস্বরে বাদ্য বাজে নিকুঞ্জ মাঝার"—নূরনছিয়ত : সৈয়দ শাহানুর ॥ শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৪৫, পৃ ১১

(ঙ) আর দমে নাম মিল করি,' আল্লা, বাঁশী উপর ধিয়ান করি' গো—সং ২২০

(চ) ঘরের মাঝে শ্রীকুলার হাটের রব শুনি।—সং ২৩২

(ছ) হায়, ঘুরাঘুর্ ঘুর্ঘুরাঘুর্, ঘুরতে আছে রঙ্গে রে।—সং ২৩৪

ফুলের প্রসঙ্গে পরিশেষে একটি বক্তব্য আছে। অনেক সময় ফুলের কল্পনার মধ্যে 'তিন' সংখ্যাটিকে আনা হইয়াছে এবং ডাহিন-বামের তুলনায় মধ্যের ফুলকেই প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হইয়াছে :

বন্ধুয়ারে, ডাইনে ফুল, বামে ফুল,
আকাশে-পাতালে মূল—
মাঝের ফুলে ধরিয়াছে কলি।—সং ২২৫

সৈয়দ শাহানূর তাঁহার 'নূর নছিয়ত' কাব্য-গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন,

মুরশীদ বাতাইলে পাইবায় ছায়ার মাঝে ফুল,
একজনের কলি হয়, আর একজনের ফুল ॥

কার 'কলি,' কার ফুল, সে বিষয়ে কোনো ইঙ্গিত নাই। ২২৫-সংখ্যক গান হইতে বুঝি—মাঝের ফুলেরই 'কলি'! কিন্তু 'কলি' তো ফুলের তুলনায় অসম্পূর্ণতার প্রতীক। তবে কি আধ-ফোটা ফুলকে পূর্ণ করিবার ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে? ফুল ও কলির সম্পর্ক এখানে স্পষ্ট হয় নাই।

'মনের মানুষে'র অবস্থান ক্ষেত্র আলোক, ফুল ও গানে ভরিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই কল্পনাটির মধ্যে একটি কমনীয় মাধুর্য জড়াইয়া আছে। 'মনের মানুষ'-এর রূপ-অবয়ব নাই (যদিও তাঁহার বসা ও দাঁড়ানোর ইঙ্গিত আছে), জ্যোতির্ময় সেই সত্তা গান ও ফুলের রাজ্যে অবস্থিতি করেন, এই কল্পনার মধ্যে সৌন্দর্য বোধের পরিচয় আছে ॥

.... ১১

অনন্তর বাউল ধর্মের সাধন-কথা ব্যক্ত করা যাইতে পারে। যে 'মনের মানুষ' দেহেই লুকাইয়া রহিয়াছেন, কাছের সেই মানুষ সাধনা ব্যতীত দূরের হইয়া যান ; কাছের মানুষকেই আরো কাছে পাইবার জন্য বাউলের সাধনার শেষ নাই। বাউলের জীবন-ডোর লুকাইয়া থাকা মানুষকে খুঁজিয়া বাহির করা,—চেনা দেহের মধ্যে অচিন-কে আবিষ্কার করা।

বাউলের সাধনা তাই রহস্যের সাধনা। সুফী মতের প্রভাবের ফলে ইঁহারা 'মারীফত' বা রহস্যের দিকটাকেই গ্রহণ করিয়াছেন। ইসলামের চারিটি পন্থা রহিয়াছে: শরীয়ত, তরীকত, হকীকত ও মারীফত। ইহার মধ্যে 'শরীয়ত' একেবারেই কর্মপ্রধান আনুষ্ঠানিক দিক, 'মারীফত' মর্মপ্রধান রহস্যবাদের দিক। বাউলেরা আচারমূলক ধর্মকে তাঁহাদের নিজেদের মতো করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন— কিন্তু 'মারীফত'ই তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য। ইসলামের আনুষ্ঠানিকতাকে তাঁহারা সর্বদা এবং সর্বত্র উপেক্ষা ও অস্বীকার করিয়া থাকেন। শ্রীহট্টের বাউল-কবি সৈয়দ শাহানূর তাই তাঁহার 'নূর নছিয়ত' কাব্যে বলিয়াছেন,— শরীয়ত দেহের চর্ম, তরীকত দেহের মাংস, হকীকত হাড়, কিন্তু মারীফত-ই দেহের সারাৎসার মজ্জা—

শরীয়ত দেখ ভাই আকলের উপরে
তরীকত কহি ভাই গোস্ত বোলইন যারে।
হকীকত শুন ভাই হাড় বোলইন যারে,
মারিফত হাড়ের গোদা সকলের ভিতরে।

হাসান বসূরী একজন বিখ্যাত সুফী দরবেশ ছিলেন। সেই দরবেশের কথা স্মরণ করিয়া তিনি মারীফতের ইতিহাস এই ভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন,

আল্লার বালক শুন আদম ছফী হৈলা,
আদম ছফীর বালক শুন নূর-নবী হৈলা।
নূর-নবীর বালক শুন মৌলা আলী হৈলা,
মৌলা আলীর বালক শুন হাছন বছরী হৈলা[১]।

প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার, হাসান বসূরীর এই ইতিহাস লেখকের মানস কল্পিত মাত্র।

অচিন-কে আবিষ্কার করিবার জন্য বাউল মোটামুটি ভাবে এই কয়টি পন্থাকে অবলম্বন করিয়া থাকেন: (ক) দেহের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা (খ) দমের সাধন (গ) প্রকৃতি ভজন (ঘ) গুরুর নির্দেশ পালন। এই চারি দফায় বাউলের কর্ম-পন্থাকে বিশ্লেষণ করিলে তাঁহার সাধন-পথ সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যাইবে।

(ক) দেহের প্রতি দৃষ্টি : বাউল গাহেন, "দেখ চাইয়া তোর দেহার

১ শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৪৫, পৃ ১৪-১৫

মাঝে লাগছে রসের চিকি" (সং ১৯৯)। দেহের ঘরেই পরমতত্ত্বকে অন্বেষণ না করিয়া যাহারা বই-পুস্তকের মধ্যে তাঁহাকে খুঁজিয়া থাকেন, তাঁহাদের ভুলের শেষ নাই,

কোরান-হদিছ পড়ো ভাই,
আপন ঘরের খবর নাই—
তত্ত্ব জাইনে মত্ত হইয়ে মরার আগে মরো।—সং ২০৪

দেহের মধ্যেই 'বাজীকররূপী' সেই মানুষ লীলা করিয়া বেড়াইতেছেন : "দেখ্ চাইয়া তোর দেহের মাঝে বাজেকরের খেলা" (সং ২০৬)। দেহেই পরমতত্ত্ব "দিবা নিশি আইসা-যাওয়া করে"। দেহের মধ্যেই যেমন পরমতত্ত্ব, তেমনি দেহেরই ছয়টি বৃত্তি সেই প্রাপ্তির পথে বাধাস্বরূপ : "দেহের মাঝে ছয়টি রিপু থাকে তোমার সঙ্গে" (সং ২১১)। দেহের মধ্যে ইঁদুররূপী 'মনের মানুষ'-কে ছয়-রিপু-রূপী বিড়াল আসিয়া ধরিয়া খায় : "হায় রে, কোন্ দেশের বিলাই আসি'—মায়ার উন্দুরা ধরিয়া খাইল" (সং ২১৩)।

(খ) দমের সাধন : বাউলের সাধনা দমের সাধনা এবং তাঁহার গতি উল্টা দিকে অর্থাৎ নীচ হইতে উপরের দিকে। দেহের স্থূলতম আত্মা 'নাফস্' ; অতঃপর ক্রমোচ্চ স্তরগুলি এই : নাছুত, মলকুত, জবরুত, লাহুত, হাউত। 'হাউত' সৃষ্টির সূক্ষ্মতম স্তর। 'লাহুত' ঈশ্বরের আবির্ভাব স্থান,—সৃষ্টির প্রথম স্তর। সাধক এই স্তরে আপনাকে উন্নীত করিলে ঈশ্বরের সহিত একাত্ম হইয়া যান। 'জবরুত'-এর স্তরে উন্নীত হইলে সাধক ঈশ্বরের ঐশ্বর্যের পরিচয় ও স্ব-শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হন ; ইহা সৃষ্টির দ্বিতীয় স্তর। 'মলকুত'-এ পৌঁছিলে সাধক পবিত্র হন, কলঙ্কময় চিন্তা পরিত্যাগ করেন। ইহা সূক্ষ্মদেহী দেবদূতগণের স্থান। 'নাছুত' মানুষের রক্ত-মাংসের স্তর। বাউলগণ এই জড় ও স্থূল স্তর হইতে ক্রমেই সূক্ষ্মতর স্তরে উঠিতে থাকেন। কয়েকটি উদ্ধৃতি দিলে ইহা স্পষ্ট হইবে।

"ওরে, নয় দরজা বন্ধ করিয়া দম সাধন কর" (সং ২০৩)। দেহের ঘরের নিম্নতম স্তর হইতে দমের সওয়ারী করিয়া স্থূল অনুভূতিকে ক্রমেই উপরে উঠাইয়া সূক্ষ্মতর করিতে হয়: এই জন্য সেই পরম অনুভূতিকে বলা হইয়াছে 'দম-সুয়ারী' : "সই গো সই, দম-সুয়ারী রূপের ঘরে দুই ধারে দুই খেলা করে—" (সং ২০৬)। দমের সহিত 'আল্লা'-র নাম মিলাইয়া তবেই সাধন করিতে

হইবে, "আর দমে নাম মিল করি,' আল্লা, বাঁশী উপর ধিয়ান করি গো—" (সং ২২০)। আল্লার নামের সহিত দম-কে উর্ধ্বমুখী করিতে হয়,

আর তিন অক্ষরে মিল করিয়া
দমের বাঁশী বাইয়ো।
উর্ধ্বমুখে দম খেঁচিয়া
বন্ধুয়ার দিকে চাইয়ো।—সং ২২৩

উর্ধ্বমুখী দমের প্রক্রিয়াটি এইরূপ—

নাভি হইতে তুলিয়া, লতিফায় জরফ দিয়া
গুর্দায় লাগাইয়া দিয়ো তালি।—সং ২২৫

আরো স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে—

নফ্ছের উলটে নাও বাইয়ো রে মনুরা
তুমি নফ্ছের উলটে নাও বাইয়ো।
নাছুত, জমরুত দাঁড় টানিয়া
মালকুতে হাইল ধরিয়ো।—সং ২৩৩

অর্থাৎ সর্বনিম্নস্তর 'নাফস্' হইতে নাছুত, মলকুত, জবরুত, লাহুত প্রভৃতি স্তরে দমকে লইয়া যাইতে হইবে। দম নীচ হইতে উপরে যায় বলিয়া ইহার পথ উল্টা। গানে তাই পাই : "হায়, তুলাতুল্ তুল্তুলাতুল্ উল্টা রঙ্গে নাচে রে" (সং ২৩৪)। "ও তার উল্টা তালা, না যায় খোলা, গো সজনি" (সং ২৩৬)।

এমনি করিয়া, ক্রমেই উর্ধ্বে উঠিয়া সাধক যে চরমতম স্তরে পৌঁছাইবেন, তাহার নাম-রূপ-অস্তিত্ব নাই, সেখানে সবই হেঁয়ালী মনে হইবে; অর্থাৎ সাধক এখানে অসীম শূন্যতায় বিলীন হইবেন,— কেবল জ্যোতির্ময় রাজ্যে বিচরণ করিবেন : 'বিন্-আকাশের চান্দরে নয়নে না দেখিরে, অন্ধকারে করে ঝলমল" :

বন্ধুয়ারে, নফি দরিয়ায় ডুব দিয়া,
লাহুল দরিয়ায় খেলা করিয়া—
ধিয়ানপুরে লাগাইয়ো নাও।
দিলালপুরে গেলাম রে, তাজ্জব দেখিলাম রে
দৌড়ে ঘোড়া, নাহি তার পাও।—সং ২২৫

(গ) প্রকৃতি ভজন : দেহের মধ্যে দমের সাধনের সহিত প্রকৃতি ভজনের কথাটিও মনে রাখিতে হইবে। প্রকৃতি-সাধনের সহিত 'চারিচন্দ্র ভেদে'র কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। 'চারিচন্দ্র' হইল—মল-মূত্র-রজো-শুক্র। বর্তমান সঙ্কলনে 'চারিচন্দ্র'-ঘটিত গান সঙ্কলিত হয় নাই, অতএব এ বিষয়ে আলোচনার সুযোগও নাই। অবশ্য, সকৃৎ ইহার উল্লেখ মিলিয়াছে,

চন্দ্র-ভেদ পাসরিয়া
কতো হইলা ধনী।
ফিরিস্তাগণে মানে চন্দ্র
চিনিবে রোহিণী ॥—সং ২১৭

বাউলিয়া সাধনায় নারীর ভূমিকা অপরিহার্য। তাই গানে গাওয়া হইয়াছে : "তোরা হও যদি কেও ধনী—প্রেম-সূতে বান্ধিয়া রাখো রসের কামিনী" (সং ২২৭)। "নারীর দেহায় কি ধন-রতন যদি চিনলায় না—বা' খালি দেখিয়া দেওয়ানা" (সং ২৩০)। অবশ্য, সাধনার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের গুরুত্ব সমান-সমান :

পুরুষ-নারী সমান করি'
কামানিতে তুলুনি ;
সজনি, প্রেমের ভাণ্ডার কারে দিল বরগনি ॥
নারী যদি না হইত পিরিতের ভাণ্ডার—
পুরুষ না হইত বেগার, হায় হায় ;
সই সই, হায় রে,
বিনা পয়সায় তুলিয়া মাথায় দিছে বোঝা রমণী ॥ —সং ২২৯

কিন্তু, নারীর সহিত সাধন-পথে কামে ও মোহে মজিলে সর্বনাশ হইবে : "নারীর সাথে সাধনেতে মইলা কতো জন।" ঐহিক প্রেমে মজিয়া মানুষ ঐশ্বরিক প্রেমকে হারাইয়া ফেলে—

মাখন জানি' ঘোল-পানি খাইলা কতো জনে—
হকিকী হারিয়া দিল মজাজি কারণে।—সং ২৩১

যে নারী সাধনার সঙ্গীনী হইবেন তিনি বিবাহিতা স্ত্রী নহেন, সাধকের পক্ষে পরকীয়া নারী। যিনি পরকীয়া নারীকে সাধনার সঙ্গীনী করিয়াছেন, তাঁহাকে 'জ্ঞানী' বলা হইয়াছে—

তিরির সঙ্গ করো ভঙ্গ
থাকিতে জওয়ানি।
ভিন্ন তিরির সঙ্গ নিল যে
তারে বলে জ্ঞানী ॥—সং ২২৭

(ঘ) গুরুর নির্দেশ পালন : বাউলের ধর্ম যোগাচার ও ক্রিয়ামূলক বলিয়া ইহাতে পূর্বসূরীর অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে। গুরু-মুরশিদ বাউলের চোখে কতোখানি, পূর্বেই বিস্তৃত ভাবে আমরা তাহার আলোচনা করিয়া আসিয়াছি।

বাউলের সাধনার প্রসঙ্গে পরিশেষে আর একটি কথা বলি। বাউল কখনই হঠাৎ করিয়া পরমতত্ত্বকে একদিনে আয়ত্ত করিয়া ফেলিতে চাহেন না; নির্দিষ্ট পথ ধরিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া তবেই তিনি সাধনার ক্ষেত্রে পূর্ণতা অর্জন করিতে চাহিয়াছেন। এজন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষা করিতে বলা হইয়াছে,

প্রেম-নদীতে সাঁতার দিয়ো তুমি
প্রেম করা শিখিয়া লইয়ো।
পলকেতে ঝাঁপ দিয়ো না
গহীনে না ডুবিয়ো ॥—সং ২৩৩

....১২

বাউলগান তত্ত্বেরই গীতায়ন বটে, কিন্তু, সেই তত্ত্ব সুরের মোড়কেই কেবল মোড়া নহে। ব্যক্তিগত অনুভূতি উহার প্রধানতম ঐশ্বর্য—ইহাই বাউলগানকে সাহিত্যিক মর্যাদায় ভূষিত করিয়াছে। বাউলগান যদি অনুভূতি-বিহীন নীরস তত্ত্বের সুর-রূপই হইত, তবে উহা নিছকই সাম্প্রদায়িক ভজন-সঙ্গীত হইয়া দাঁড়াইত। অবশ্য অস্বীকার করি না, বাউলিয়া সম্প্রদায়ের ভক্তি-সাধনাই ইহার রচনার ও শ্রবণের উৎস রূপে কাজ করিয়া থাকে। তবু, ইহার রচনাভঙ্গী ও সুর-রূপের মধ্যে এমন একটা বিশিষ্ট হৃদয়স্পর্শী আবেদন রহিয়াছে,—সম্প্রদায়-নির্বিশেষে রসিক পুরুষ তাহাতে নাড়া খাইবেন। বাউলের রূপক-উপমা, তাঁহার রোমান্টিকতা ও মিষ্টিকতা অর্থাৎ নৃত্য-গীত-বাদ্য—গানের এই ফলিত দিকগুলিকে বাদ দিয়া কেবল কথাকে গ্রহণ করিলেও অনেকে সাহিত্য-স্বাদ পাইতে পারিবেন।

ব্যক্তিগত স্পর্শটুকু আছে বলিয়াই কর্ম-প্রধান তত্ত্বের রাজ্যে মর্মের কাঁদন শোনা গিয়াছে। ফলে ইহা একটি সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর তত্ত্বের রূপায়ণ হইয়াও বিশেষ একজনের "সৃষ্টি সুখের উল্লাস"-এর আভায় উজ্জ্বল হইয়াছে,—সকলের হইয়াও তাহা কেবল একজনের হইয়া গিয়াছে। বলিয়া রাখি, এমন ব্যাপার খুব বেশী ঘটে নাই।

সাধকের অভিমান, খেদ, নৈরাশ্য, অনুতাপ ও অনুশোচনা বাউলগানের একটি বিশিষ্ট দিক—এই দিকটি আমাদের আলোচনায় এতক্ষণ অনুল্লিখিত ছিল। এই কথাটির উল্লেখ করিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করি। ২১১, ২১২, ২১৫, ২২৩, ২২৪ ও ২২৫-সংখ্যক গানগুলির মধ্যে ইহার ইঙ্গিত রহিয়াছে। একদিকে অভিমান, 'মনের মানুষ' সাধনার পথে সহায়তা করিলেন না বলিয়া। অপর দিকে অনুশোচনা, "আমি আইলাম, আমি রইলাম, আমি চিনলাম না"॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

॥ ভাটিয়াল ॥

নদী-স্রোতের সপক্ষ বা নিম্নদিককে বলা হয় 'ভাটি'; সেই ভাটিতে নৌকা ছাড়িয়া দিলে তাহা আপনিই বাহিত হইয়া চলে, কোনো প্রকার আয়াস সে জন্য স্বীকার করিতে হয় না। এই 'অনায়াস'-ই অলস মুহূর্ত রচনা করে, মানুষের মনের লুকানো সুখ ও শোককে তাহার নিকট স্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরে। ভাটির টানে নৌকা ছাড়িয়া মাঝি-মাল্লা সেই অলস মুহূর্তের ভাবনা ও কামনাকে যে গানে রূপ দিয়া থাকে, তাহাই 'ভাটিয়ালী' গান। 'ভাটি'র সহিত 'আলী' এই তদ্ধিত প্রত্যয় যোগ করিয়া পদটি গঠিত হইয়াছে। কোনো কোনো অঞ্চলে, বিশেষতঃ শ্রীহট্ট জেলাতে, 'আলী'-র পরিবর্তে 'আল' এই তদ্ধিত প্রত্যয় যুক্ত হওয়াতে উহা 'ভাটিয়াল' হইয়াছে।

'ভাটিয়ালী' মূলতঃ নদী-প্রধান পূর্ববঙ্গের জিনিস। পশ্চিম বঙ্গের মাঝিরা যখন ভাটিয়ালী গান গাহিয়া থাকে, তখন তাহা ভাবে ভাষায় ও সুরে পূর্ববঙ্গের ভাটিয়ালী দ্বারাই প্রভাবিত হইয়া থাকে।

কেহ-কেহ ভাটিয়ালী গানের উৎপত্তির কাল নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যেমন—স্বর্গীয় ক্ষিতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত 'সঙ্গীত দর্শিকা' (তৃতীয় সং ১৩৬৯) গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বলা হইয়াছে, "এই সুর (অর্থাৎ ভাটিয়ালী গানের সুর) কবে সৃষ্ট হইয়াছিল জানা নাই, তবে পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাঙলা, মিথিলা ও আসামে ইহা সর্বপ্রথম প্রচলিত হয়[১]।" বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণ এইরূপ সিদ্ধান্তের পশ্চাতে কোন প্রকার কারণ দেখান নাই। এ সম্পর্কে অধিকতর গবেষণা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

'ভাটিয়ার,' 'ভাটিয়ারী,' 'ভাটিয়াল' নামে সঙ্গীতশাস্ত্রে এক রাগের নাম

১ পৃ ২২৫

পাওয়া যায়। কথিত আছে, বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা 'ভর্তৃহরি' ইহার সঙ্কলন করেন বলিয়া ইহা ভর্তৃহারিকা, এবং তাহা হইতে ভটিয়ারী, ভাটিয়ারী নামে প্রসিদ্ধ। ললিত ও পরজ যোগে ইহা উৎপন্ন; 'সা' বাদী; 'মা' সম্বাদী[১]। ঋ ও দা কোমল। ইহার সময় দিবা প্রথম প্রহর। ইহার সহিত আমাদের আলোচ্য ভাটিয়ালী গানের কোনোই সম্পর্ক নাই। 'ভাটিয়ালী' লোক-সঙ্গীত, 'ভটিয়ার' বা 'ভাটিয়ারী' রাগসঙ্গীত।

'ভাটিয়াল' বা 'ভাটিয়ালী' গান মাঝি-মাল্লার গান। ইহার উৎপত্তি ও ব্যুৎপত্তি হইতে সহজেই তাহা বুঝা যায়। কিন্তু, কালক্রমে 'ভাটিয়াল' বা 'ভাটিয়ালী'র অর্থের পরিবর্তন হইয়াছে,— অর্থের প্রসারের ফলে ইহা এখন কৃষক বা রাখালের জীবনেরও যে কোনো 'অলস মুহূর্তের গান' হইয়া গিয়াছে। তাই রৌদ্রতপ্ত প্রান্তরে গোরু-মহিষ ছাড়িয়া দিয়া তরুতলে শায়িত রাখালের গীতি কিংবা গোধূলি বেলায় চারণ-ক্লান্ত রাখালের গো-মহিষের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গীতি অথবা ধান্য রোপণ ও কর্তনের কালে, পাট নিড়াইবার কালে কৃষকের গীতি—সবই আজ ভাটিয়াল বা ভাটিয়ালী নামে চলিয়া থাকে। কিন্তু যে করিয়া দেখা যাক না কেন, একটা জিনিস ইহার মধ্যে খুবই স্পষ্ট : ভাটিয়াল বা ভাটিয়ালী প্রান্তরের গান, উন্মুক্ত অম্বরতলের গান, নদী-স্রোতের গান—কোন ক্রমেই ইহা গৃহকোণের গান নহে। ইহার উৎপত্তির সহিত যেমন কর্মগত 'অনায়াস' জড়িত হইয়া আছে,—ভাবানুষঙ্গের মধ্যে তেমনি জীবনের মুক্তি স্থান জুড়িয়াছে। ভাটিয়ালী গানের দীর্ঘবিলম্বিত উদার উদাস সুর-রূপের মধ্যে তাহাই রূপায়িত হইয়াছে।

ভাটিয়ালী সমবেত কণ্ঠের গান নহে,—ইহা একক কণ্ঠের গান। সমবেত কণ্ঠের গানের মধ্যে জীবনের দ্রুতি ও গতি। একক কণ্ঠের গানের মধ্যে জীবনের স্থিতি। একক কণ্ঠের গান বলিয়াই ইহাতে জীবনের মর্ম-কথা শান্ত, গম্ভীর, দীর্ঘস্থায়ী সুরের মধ্যে এমন শুদ্ধ ভঙ্গিতে রূপ পাইতে পারে। এই সুর মুক্তির সুর এবং এই মুক্তি আকাশ, নদী, মাঠ ও প্রান্তরের।

আবার প্রান্তরের গান বলিয়াই ইহার কথার মধ্যে ছন্দের অস্পষ্ট একটা আয়োজন থাকিলেও বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োজন নাই—ব্যবহৃতও সর্বত্র হয় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্য একতারা বা দোতারা বাজানো হইয়া থাকে।

---

১ নগেন্দ্রনাথ বসু : বিশ্বকোষ

ভাটিয়ালী গানের বিষয়বস্তু কি?—মাঝি-মাল্লা ও কৃষক-রাখালের লৌকিক জীবনের সুখ-দুঃখ প্রেম-ব্যথাই ইহার বিষয়বস্তু। এক হিসাবে বলিতে গেলে—ভাটিয়ালী গানের মূল বিষয় প্রেম এবং এই গান কেবল বিরহেরই গান। মিলনের গান মধুর এবং সচরাচর তাহার সুর উদ্দাম। বিরহের গান মধুরতর এবং সচরাচর তাহার সুর দীর্ঘসঞ্চারী। ভাটিয়ালী গানের পরিবেশগত উৎস এবং সুরই যদি বিষয়বস্তুকে নির্দিষ্ট করিয়া থাকে, তবে বলিতে হইবে— সেই বিশিষ্ট সুর বিরহকেই ফোটাইবার জন্য, মিলনের কথাকে নহে।

মাঝি-মাল্লার ভাটিয়ালী গানের মধ্যে স্বাভাবিক কারণেই নদী-নৌকা, পাল-বৈঠা, উজান-ভাটি, খেয়া বাওয়া ইত্যাদির অনুসঙ্গই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সমস্ত অনুসঙ্গই সমস্ত গানের পটভূমিকা, উহাই সমস্ত গানের রূপক-অলঙ্কারের অবলম্বন।

রাখালিয়া দুই ধরনের— গোরু ও মহিষের। গোরুর রাখালের তুলনায় মহিষের রাখালের জীবন অনেক কষ্টকর ও বিপদসঙ্কুল। এইজন্য মহিষের রাখালের ভাটিয়ালী গানের কথায় কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এই ধরনের ভাটিয়ালী গানের পরিবেশে গোরু-মহিষ, রৌদ্র-বর্ষা, সন্ধ্যা-সকাল, মাঠ-প্রান্তর প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। কৃষকের ভাটিয়ালী গানে শস্য, ক্ষেত্র, বর্ষা, গার্হস্থ্যজীবন ইত্যাদি প্রতিবেশ হিসাবে মিলে।

কিন্তু ভাটিয়ালী গানের বিষয়বস্তুর এই বিশুদ্ধতা আজিকার দিনে আর নাই। ইহার লৌকিক দিকটি আজ অনেকটাই খোয়া গিয়াছে। তাই আজিকার দিনে ভাটিয়ালী গানের কথায় ও প্রতিবেশে মাঝি, রাখাল ও কৃষকের জীবনের লৌকিক দিকটি একেবারেই অবহেলিত, এমন কি অনুপস্থিত বলিলেও চলে। আজ সেই মাঝি, রাখাল ও কৃষকের জীবন-প্রতিবেশকে ঘিরিয়াই ভাটিয়ালী গান গীত ও রচিত হইতেছে বটে, কিন্তু সেই প্রতিবেশের সবটাই হয় বাউলের তত্ত্বকথা কিংবা গৌড়ীয় বৈষ্ণব বা সহজিয়া বৈষ্ণবের ভক্তি-কথা দিয়া ভরা ও গড়া। এমন কি, বিষয়বস্তুর দিক দিয়া ভাটিয়ালী গানের সহিত বাউল বা সহজিয়াতত্ত্বের গানের কোনো পার্থক্যই লক্ষিত হইবে না। ভাটিয়ালী গানের বিষয়বস্তুর ইতিহাসে ইহা এক বিশেষভাবে লক্ষিতব্য বিবর্তন এবং এই বিবর্তনকে না বুঝিয়া লইলে

ভাটিয়ালীগানকে অনেক ক্ষেত্রেই ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। শ্রীহট্ট জেলা হইতে সংগৃহীত ভাটিয়াল গানগুলিকে এ বিষয়ে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ভাটিয়ালী গানের বিষয়বস্তুর বিবর্তন হইল—লৌকিকতার দিক হইতে তত্ত্বকথার দিকে।

এই প্রসঙ্গে বাউল ও সারিগানের সহিত ভাটিয়ালী গানের পার্থক্য লক্ষ্য করিতে হইবে[১]। বিষয়বস্তুর দিক দিয়া বাউল ও ভাটিয়ালী গানের মধ্যে কোনো পার্থক্যই হয়তো নাই[২], কিন্তু সুরের দিক দিয়া দেখিলে উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যাইবে। প্রথমতঃ বাউল কেবলই তত্ত্বাশ্রয়ী গান,— ভাটিয়ালী উৎসমুখে লৌকিক, পরে তত্ত্বাশ্রয়ী। দ্বিতীয়তঃ বাউলের গানে নিয়ম-বাঁধা তাল আছে, কিন্তু ভাটিয়ালী গানের কথায় ছন্দ থাকিলেও সুরের মধ্যে স্পষ্ট ও নিয়ম-বাঁধা তাল নাই। কথার মধ্যেও যে ছন্দ থাকে, তাহা স্পষ্ট ও মুখর নহে। মোটকথা, ভাটিয়ালী গানের রচনার মধ্যে কোনো প্রকার চাতুর্যের বা ছন্দৈশ্বর্যের পরিচয় নাই। ইহার 'কথা'গুলি এক-এক গুচ্ছ করিয়া এক-এক বারে উচ্চারিত হয় এবং দুইটি করিয়া পর-পর গুচ্ছের মধ্যে একটা দীর্ঘ টানা সুরের রেশ থাকে। দুই উচ্চারিত শব্দগুচ্ছ বা অক্ষর সমষ্টির মধ্যে দীর্ঘ সঞ্চারী সুরের অস্পষ্ট বা সুস্পষ্ট রেশ থাকে বলিয়াই বোধ হয় ভাটিয়ালী গানের 'তাল' থাকে না। কিন্তু তাই বলিয়া অক্ষর গুচ্ছ এবং এই বিলম্বিত রেশের মধ্যে proportion-এর খুব বেশী ব্যত্যয় ঘটে না,—অন্ততঃ একটা সুষমা, একটা সুরসামঞ্জস্য, একটা sense of proportion থাকেই থাকে।

এইভাবে পর-পর অক্ষরগুচ্ছের ব্যবধানের সৃষ্টির সঙ্গে টপ্পাজাতীয় গানের কিছু মিল আছে। কিন্তু তফাৎও আছে : ভাটিয়ালীতে একটানা সুরের যে ব্যবধান রচিত হয়,—টপ্পাতেও তাহাই হয়, কিন্তু তাহা 'জমজমা'

১ ভাটিয়ালী ও সারি গানেব মধ্যে সারিগানকেই প্রাচীনতর বলিয়া মনে হয়। কারণ, সারিগান সমবেত সঙ্গীত, মানুষের সমাজে যখন ব্যক্তিচেতনা নাই, ইহা সেই সময়কার গান। ভাটিয়াল একক সঙ্গীত,—পুরা ব্যক্তিচেতনার গান। এই হিসাবে ভাটিয়ালীকে সারির তুলনায় আধুনিক মনে হয়।

২ অবশ্য, সারির বিষয় বস্তু objective-ও হইতে পারে, হইয়াও থাকে। ভাটিয়াল কিন্তু সর্বদাই Subjective বিষয় লইয়া রচিত হয়। সারিগান সাম্প্রতিক ব্যাপার, সামাজিক আচার-অনাচার, শ্লেষ-বিদ্রূপাত্মক ঘটনাকে ভিত্তি করিয়াও রচিত হইতে পারে।

নামক তারের সাহয্যে। তাহা ছাড়া, টপ্পায় তালের নিয়ম বিশেষভাবে লক্ষিত হয়,—ভাটিয়ালীতে তাহা নাই।

সারি গানের সহিতও ভাটিয়ালী গানের রচনা ও সুরগত পার্থক্য আছে। প্রতিবেশের দিক হইতে বিচার করিলে ভাটিয়ালী ও সারির মধ্যে মিল রহিয়াছে: উভয়ই নদী ও নৌকার গান। কিন্তু, মিলের চেয়ে অমিলটাই বেশী। ভাটিয়ালী একক কণ্ঠের, সারি সমবেত কণ্ঠের: ভাটিয়ালী স্থিতির গান, সারি গতির। ভাটিয়ালীতে প্রতিযোগিতার কোনো ইঙ্গিত নাই। সারি গানের কথা ও রচনারীতি বৈঠার তালের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, —ভাটিয়ালীর কথার ছন্দ মুখর ও স্পষ্ট নহে। বৈঠার তালের সহিত সারির সুর নিয়ন্ত্রিত বলিয়া উহা দ্রুত এবং তাহার ফলে দীর্ঘস্থায়ী নহে। বিষয়বস্তু অবশ্য ভাটীয়ালী ও সারি উভয়েরই এক হইতে পারে—শ্রীহট্ট হইতে সংগৃহীত বর্তমান সারি গানগুলিই তাহার প্রমাণ।

ভাটিয়ালী গানের সুর অন্যান্য অনেক পল্লিগীতির সুরের ভিত্তি[১]। রূপকথা বা 'পরণকথা' বলিবার সময় মাঝে মাঝে যে গান গাওয়া হয়—তাহা ভাটিয়ালীর সুরেরই অনুকরণে। অনেক মেয়েলী গানেও ভাটিয়ালীর সুরের প্রভাব আছে। কোনো কোনো পর্ব-সঙ্গীতে, কৃষক ও মাঝির জীবনের অন্যান্য গানে, বিশেষ বিশেষ পাহাড়িয়া গানে এবং এমন কি, বাঙলার বাহিরে সুদূর মণিপুর অঞ্চলের লোকসঙ্গীতে ভাটিয়ালী গানের সুরের নক্সা অনুসৃত হয়। শুধু তাহাই নহে, যে সমস্ত গানে ছন্দের প্রকাশ খুব প্রবল, তাহাদের মধ্যেও ভাটিয়ালী গানের সুরের আভাস দেখা যায়।

ভাটিয়ালী গানের সুরের প্রয়োগ কৌশল বিশ্লেষণ করিলে মনে হয়, তাহাতে এমন সব 'কাজ' থাকে যাহা মোটেই পল্লিসঙ্গীতের উপযোগী সাদামাটা 'কাজ' নহে। এমন কি, ইহার মধ্যে টপ্পার অনুকূল এমন সব সুরের প্রয়োগ আছে এবং সেই সবপ্রয়োগ পূর্ব হইতেই বাঙলাদেশের অন্যান্য গানে প্রভাব বিস্তার করিয়া এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল—যাহার ফলে টপ্পা নিতান্ত বিদেশী (বাঙলাদেশের পক্ষে বিদেশী) গীতরীতি হইয়াও

---

১ শ্রীনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় ভাটিয়ালী গানের সুরের সহিত গুজরাটের 'মাঢ' এবং বিহার প্রদেশের 'বিহার' সুরের মিল লক্ষ্য করিয়াছেন।—বাঙলা সংস্কৃতি (ভাদ্র ১৩৬৩), পৃ ১৪৩

এতো সহজে বাঙলা গানের আসরে একটি স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছে।

কীর্তনগানের মধ্যেও ভাটিয়ালী গানের প্রভাব যথেষ্ট লক্ষ্য করা যায়,—অথচ কীর্তন শিল্পসঙ্গীত[১]। গরানহাটি, মনোহরশাহী, রানীহাটি ইত্যাদি কীর্তনগানের প্রবর্তক যাঁহারা—সেই নরোত্তমদাস ঠাকুর, শ্রীনিবাস আচার্য, শ্যামানন্দ ঠাকুর প্রভৃতি ছিলেন ধ্রুপদ সঙ্গীতে বিশেষজ্ঞ এবং অধিকারী। ইঁহারাও শিল্পসঙ্গীত কীর্তনের মধ্যে ভাটিয়ালী গানের প্রভাবকে মান্য করিয়াছেন। অবশ্য ইহা দ্বারা একথা বলা হইতেছে না যে কীর্তনগান পল্লিসঙ্গীত।

লয়ের দিক হইতে ধরিলে লোকসঙ্গীতের সুরকে দুই ভাগে ভাগ করা চলে। একটি দ্রুত লয়ের সুর,—ঝুমুর গানকে উহার দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। আর একটি বিলম্বিত লয়ের সুর—ভাটিয়ালী তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত। প্রসঙ্গতঃ বাঙলা দেশের লোকসঙ্গীতের সুরগত বিশেষ বৈশিষ্ট্যটিকে স্মরণ করা দরকার। অন্যান্য প্রায় সকল দেশের লোকসঙ্গীতই দুই, তিন, চার বা পাঁচটি স্বর দিয়া গঠিত ; কিন্তু বাঙলাদেশের লোকসঙ্গীতে সাতটি স্বরেরই প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সুরের নক্সার দিক দিয়াও বাঙলার লোকসঙ্গীত অনেক বেশী জটিল এবং সমৃদ্ধ। ভাটিয়ালী যদি বাঙলার লোকসঙ্গীতের একটি বিশেষ এবং উল্লেখযোগ্য দিক হইয়া থাকে, তবে বলিতেই হইবে, ইহাতে সাত স্বরের ব্যবহার ও জটিলতা রহিয়াছে। এই কারণে ইহাও মনে করা যাইতে পারে যে, বাঙলাদেশে লোকসঙ্গীতের সহিত শিল্পসঙ্গীতের এবং শিল্পসঙ্গীতের সহিত লোকসঙ্গীতের মিলন ও মিশ্রণ সহজ এবং বহুল ভাবেই হইয়াছিল।

প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীতের সুরের মধ্যে 'ভাওয়াইয়া' ও 'চট্‌কা' বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। 'ভাওয়াইয়া' বা 'চট্‌কা' কোনো বিষয়বস্তুকে নির্দেশ করে না,—ইহারা সুরের লয়কে নির্দেশ করে মাত্র। 'চট্‌কা' দ্রুত

১ "কীর্তনের টেকনিক এক সময়ে এরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিল যে কীর্তনকে পল্লীসঙ্গীত বা folkmusic এর অন্তর্ভুক্ত করা চলে না।" —খগেন্দ্রনাথ মিত্র : কীর্তন (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, বিশ্বভারতী), পৃ ৫৭

লয়ের, ইহা 'ঝুমুর' তুল্য। 'ভাওয়াইয়া' বিলম্বিত লয়ের, ইহা ভাটিয়ালীর তুল্য[১]॥

....২

বর্তমান সঙ্কলনে মোট উনষাট-টি (সং ২৪১—সং ৩০০) ভাটিয়াল গান ধৃত হইয়াছে। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা এই উনষাটটি গানকে সাতটি স্তরে বিন্যস্ত করিয়াছি : মনের প্রতি, বৈষ্ণব প্রতিবেশে, সূফী প্রতিবেশে, মনের মানুষ, দেহতত্ত্ব, পীর-মুরশিদা ও গুরুতত্ত্ব এবং লৌকিক। ভাটিয়াল গানের স্বরূপ নিরূপণ কালে বলিয়াছি, বিষয়ের দিক হইতে বাউল ও ভাটিয়ালের মধ্যে তফাৎ বড়ো নাই, উভয়ের মধ্যে সুরের তফাৎটাই সত্যকারের তফাৎ। সঙ্কলিত উনষাটটি ভাটিয়াল গানের মধ্যে বাউল ভাবেরই প্রতিফলন ঘটিয়াছে (লৌকিকগুলি নিশ্চয়ই বাদ পড়িবে)। এই জন্য যে সমস্ত গানের বক্তব্য বাউলগানের প্রসঙ্গে একবার আলোচিত হইয়াছে, বর্তমান প্রসঙ্গে তাহা পুনরায় আলোচিত হইবে না।

'মনের প্রতি' গুচ্ছের গীতিগুলি (সং ২৪১—সং ২৪৭) বাউলগুচ্ছের মধ্যে ব্যক্ত ভাবধারায় কোনো নতুন সুরের যোজনা করে নাই। বাউলগুচ্ছের গানগুলির মধ্যে পরমতত্ত্বের অচিন-মোহন-গোপন-গহীন স্বরূপটিকে ফুলের রূপ দিয়া ব্যক্ত করিবার যে প্রবণতা লক্ষিত হইয়াছে, 'মনের প্রতি' স্তবকের গানগুলি সেই ধারারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছে। এই পরমতত্ত্বকে পাইবার জন্য সাধক-মন চির-অতৃপ্তি ও চির-তৃষ্ণার বহ্নি-জ্বালাকে শমী বৃক্ষের মতো বুকের ভিতর অনির্বাণ দীপ্তিতে জাগাইয়া রাখে এবং 'মন'-কে পটভূমি রাখিয়া সেই ফুল-রূপী আইডিয়ার প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির অতন্দ্র সুখ-বেদনাকে সুরের আল্পনায় সুন্দর করিয়া তুলিয়া ধরে। ইহা 'মনের প্রতি' পর্যায়ের একটা দিক। ২৪১-সংখ্যক গানটি পূরা এবং ২৪৩-সংখ্যক গানটির অন্তিম স্তবক এই ভাবের দৃষ্টান্তস্থল।

'মনের প্রতি'-র আর একটি সুর-ধারা 'প্রার্থনা ও আত্মনিবেদন'-এর

---

১ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁহার "বাঙ্গালার বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন মুসলমান কবি" (দ্বি, সং ১৯৬২) গ্রন্থে বিবিধ প্রকার ভাটিয়ালীর উল্লেখ করিয়াছেন (পৃ ৩৫-৩৬), যথা, 'করুণ ভাটিয়াল,' 'দুঃখি ভাটিয়াল,' 'নাগোধা ভাটিয়াল'।

মধ্যেই লক্ষ্য করা গিয়াছে : সেই ভবের মায়ায় বন্দী আত্মার চিরস্থায়ী ক্রন্দন, সেই বৈরাগ্যের ধ্রুব সুর, মৃত্যুর দিনে হাসরের মাঠে আল্লার বিচারের বিভীষিকা দর্শন, এবং কবরে বসতিকালে শাস্তি প্রাপ্তির অমূলক ও সমূলক আশঙ্কা বিজ্ঞাপন। কোনো নতুনত্বই এখানে দেখা যাইবে না। ২৪২, ২৪৪-২৪৭-সংখ্যক গানে তাহারই ক্লান্তিদায়ক পুনরাবৃত্তি।

'বৈষ্ণব প্রতিবেশে' যে সকল ভাটিয়াল গান (সং ২৪৮—সং ২৬০) রচিত হইয়াছে, তাহাও কোনো নতুন ভাবনার ইঙ্গিত বহন করে নাই। 'বৈষ্ণব গীতাবলী' এবং বাউলগুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত বৈষ্ণব পরিবেশে রচিত গানগুলিতে যে ভাব প্রকাশের আয়োজন—এখানেও তাহাই। সুরের দিক ছাড়িয়া দিলে, কথার দিকে কিছু বিশেষত্ব আছে বলিয়া ইহাকে 'বৈষ্ণব গীতাবলী'র পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। বস্তুতঃ এই গানগুলির যাহা কিছু বৈশিষ্ট্য, তাহা সুরের মধ্যেই লুকানো রহিয়াছে।

'সূফী প্রতিবেশে'-র ভাটিয়াল গানগুলির (সং ২৬১—সং ২৬৪) প্রসঙ্গেও এ কথা খাটে। 'ইসলামী ও সূফী' গানগুলির আলোচনাকালে দেখিয়াছি, শ্রীহট্টের কবিকুল অনভিজ্ঞতার জন্যই হউক বা ধারণার অসম্পূর্ণতার জন্যই হউক,—ইসলামী মত ও তত্ত্বকে সূফী মত ও তত্ত্বের সহিত গুলাইয়া ফেলিয়াছেন ; এবং আরো আশ্চর্যের কথা, একই কবির রচিত একই গানের মধ্যে এই দুই মত ও ভাবের অপ্রত্যাশিত ও বিচিত্র মিশ্রণ ঘটিয়াছে। 'সূফী প্রতিবেশে' রচিত ভাটিয়াল গানগুলিতেও তাহার প্রতিধ্বনি শোনা যাইবে। কবি যখন পরম নিশ্চিন্ততায় গাহিয়াছেন,

কোরানে শুইনাছি আমি
এই দেহাতে আছ তুমি.
তোমার নাম করিম গফফার ॥—সং ২৬১

তখন সে 'কোরান' যে প্রচলিত 'কোরান' নয়, কবির সূফী তত্ত্বাদর্শ দিয়া গড়া, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। কারণ, কোরানে আল্লার অবস্থিতি দেহের অভ্যন্তরে তো নয়ই, উপরন্তু তিনি জগতের বহির্ভূত। কোরানে যে আল্লা নিরাকার সেই আল্লাকেই উদ্দেশ করিয়া সূফী মতবাদী কবি গাহিয়াছেন, "আমি দেখতে চাইলে না দেখি তোমারে-হ" (সং ২৬২)। আবার, এই একই গানেই কোরানের অন্তর্ভুক্ত একটি 'দরুদ' উদ্ধৃত করা হইয়াছে! এই

প্রবৃত্তির মূলকারণ ইসলামী ও স্থফী উভয় মতাদর্শ সম্পর্কে ধারণার অস্পষ্টতার মধ্যে কিংবা উভয় মতের মধ্যে সমন্বয় বিধান করিবার প্রয়াসের মধ্যে,—তাহা সহসা বুঝিয়া উঠা যায় না।

'মনের মানুষ' পর্যায়ের গানগুলিতে (সং ২৬৫—সং ২৮০) একই সঙ্গে স্থফী ও বৈষ্ণব প্রতিবেশ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই ধারার গানেও কোনো নতুন স্থর ঘোষিত হয় নাই। রূপক-উপমাও সেই একই। এখানেও মানব -দেহকে একটি বৃক্ষের সহিত উপমিত করিয়া পরমতত্ত্বকে সেই বৃক্ষের সর্বোচ্চ শাখায় উপবিষ্ট পাখী (যেমন, 'মনিয়া,' 'সোনার বরণ ভুতা' ইত্যাদি)-রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। যেখানে দেহ-কে বৃক্ষের সহিত উপমিত করা হয় নাই, সেখানেও সেই পরমতত্ত্বের আবাসস্থলকে পরিচিত নামেই (যেমন, 'দিলালপুর', 'সোনাপুর', 'তিরপুর্ণ্যি', 'শ্রীকুলার হাট') বিশেষিত করা হইয়াছে। কি বৈষ্ণব, কি স্থফী প্রতিবেশে রচিত গানে—সর্বত্রই পরমতত্ত্বকে 'বন্ধু' বা 'কালা' বা 'আল্লা' বলা হইয়াছে,—কবি সেখানে অভাগী শ্রীরাধার ভূমিকা লইয়াছেন। এখানেও 'মনের মানুষ'-কে ছলনাময় বলা হইয়াছে,—তিনি ধরা দিয়াও অধরা থাকেন,—নাড়া দেন কিন্তু সাড়া দেন না। এখানেও কবি সে জন্য ক্ষোভ, খেদ এবং পরিশেষে অভিমান করিয়াছেন, কখনো বা তাঁহার আগমন প্রত্যাশায় তিনি বাসর জাগিয়া প্রতীক্ষমান। বাউলধর্ম অনুমোদিত ক্রিয়াকাণ্ডময় পন্থার সাহায্যে সেই 'মনের মানুষ'কে পাইবার উপায় ব্যক্ত হইয়াছে ; কখনো বলা হইয়াছে, 'হিদ্‌রের মাঝে আছইন কালা নয়ানে না দেখি' এবং 'হুভ লোভ ছাড়িলে পাইবায় কালার দরশন' (সং ২৭৬)। 'মনের মানুষে'-র অবস্থিতি ক্ষেত্র গানের স্থরে ভরিয়া দেওয়া হইয়াছে, ইহাও বাউল গানের আলোচনা কালে লক্ষ্য করিয়াছি। এখানে কবি গাহিয়াছেন,

আর কোন পন্থে গেলায় রে বন্ধু
নিলয় না পাই।
গুন্‌গুনানি শব্দ শুনি—
ডাকিতে উদেশ নাই॥—সং ২৭৩

স্থতরাং, কোনো দিক দিয়াই কোনো নতুন প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয় নাই॥

....৩

'দেহতত্ত্বে'-র গানগুলির (সং ২৮১—সং ২৮৯) মধ্যে অন্ততঃ তিনটি গানকে এ প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য গ্রহণ করা যাইতে পারে। 'মনের মানুষ'-এর লীলাস্থান আজ্ঞাচক্রের দ্বিদলে ;—দেহের অভ্যন্তরস্থ ষট্চক্রের মূলাধারে প্রকৃতি-দেহে রজো প্রবর্তনের দিবসত্রয় ইনি আবির্ভূত হইয়া থাকেন। শ্রীহট্ট হইতে সংগৃহীত এই গীতি-সঙ্কলনে যৌন-যোগাচারের এই ধরনের গান দেওয়া হয় নাই। তবে, ভাটিয়ালের পর্যায়ভুক্ত একটি গানে উহার ক্ষীণ ইশারা পাইতেছি। দেহ-বৃক্ষের উচ্চ ডালে (অর্থাৎ দুই ভ্রূ-র মাঝখানে 'আজ্ঞাচক্রে' বা আরো উপরে 'সহস্রারে') পাখী-রূপী যে 'মনের মানুষ' বসিয়া আছেন, নিম্ন দিকের মাটিতে (অর্থাৎ 'মূলাধার চক্রে') তিনি আহারের জন্য নামিয়া আসেন :

সুন্দর কালিয়া রে,
আধারের লাগিয়া রে
জমিনে লামিল রে— ॥—সং ২৮৭

পরবর্তী গানটিতেও (সং ২৮৮) এই ভাবের ইঙ্গিত আছে, যে বৃক্ষের উপর তত্ত্ব-রূপী 'পাখী' বসিয়া আছে, সেই বৃক্ষের 'বারোটি ডাল' ; চার রঙের (সাদা, কালো, লাল, হলুদ) চারটি পাতার আড়ালে সেই গাছেই কখনো সে একটি ফুল হইয়া ফোটে। 'ফুল'-এর স্থানটি সুরে পূর্ণ। 'ফুল' যদি রূপ, সুর তবে অরূপের ইশারা দেয়। রূপে ও অরূপে মিলিয়াই তাঁহার পূর্ণ রূপ। কিন্তু, ইহাও সত্য—তিনি নিরাকার, অসীম, অবয়ব হীন। তাই সেই তত্ত্বের সমুদ্রকে বলা হইয়াছে 'লাহুল দরিয়া' (সং ২৮৮)। এই দরিয়ার প্রসঙ্গে আর একটি কথা উঠে। হিন্দুতন্ত্রে দেহের মধ্যেই সপ্ত সমুদ্র কল্পিত হইয়াছে বটে, কিন্তু 'সপ্তসমুদ্রই' দেহের একমাত্র দিক নয়। শ্রীহট্টের কবি এ সৃষ্টিকেই জলময় বলিয়াছেন এবং দেহ যদি সৃষ্টিরই সার-সংক্ষেপ হয়, তবে ন্যায়-শাস্ত্রের দিক হইতে দেহও জলময় হইবে। অতএব, সেই জলময় দেহ-সত্তাতেই তাঁহারা আল্লার কুদরতিকে লক্ষ্য করিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন,

আশমান কালা, জমিন কালা,
কালা দরিয়ার পানি ;

পানির মাঝে বইছে আল্লায়
কুদ্‌রতের নিশানি।—সং ২৮৯

দেহতত্ত্বের বক্রী গানগুলিতে পূর্বে আলোচিত ভাবনার-ই পূর্বানুবৃত্তি। এখানেও 'দেহ'-কে 'ঘর,' 'চরকা' বা 'নৌকা' রূপে কল্পনা করা হইয়াছে এবং সেই ক্ষুদ্র দেহে বৃহৎ আল্লার প্রতিচ্ছবি কেমন করিয়া পড়ে, তাহা ভাবিয়া কবিকুল বিস্ময় মানিয়াছেন : 'কোন্ কলে বানাইলা ঘর নিলয় না জানি' (সং ২৮১) ; 'কোন্ রঙ্গিলায় বানায় চরখা নিলয় না জানি' (সং ২৮৫)। এ দেহের মধ্যেই 'বিনন্দ নাগর' সাজিয়া তিনি আছেন (সং ২৮২)। আমাদের দেহের ছয় রিপু এবং কর্মজগতের বিচিত্র প্রতিবন্ধকরূপী ননদী-শাশুড়ী তাঁহার প্রতি পথ চলিতে বাদ সাধে (সং ২৮৩)। রসুল অর্থাৎ মোহাম্মদ, 'আলিফ' অর্থাৎ আল্লা এবং মুরশিদের নাম করিয়া চোখ মুদিয়া ধ্যান করিলেই সেই তাঁহাকে পাওয়া যাইবে, অতএব, 'সায়বানী সই, মনের কবট খুল' (সং ২৮৯)। ইহা ছাড়া, 'ত্রিবেণী' এবং উল্টা সাধনার কথাও বলা হইয়াছে প্রসঙ্গতঃ।

কয়েকটি গানে ব্যবহৃত কয়েকটি সংখ্যার অর্থভেদ করিতে পারা যায় নাই। মনে হয়, এই সংখ্যাগুলি কোনো আঞ্চলিক ভাবধারা বা গুহ্য কোনো ভাবনাকে নির্দেশ করে। যেমন, 'চল্লিশা নি ছয়-ষাট্টিয়ে মিলায়' (সং ২৮৩)। অপর একটি গানে,

আর আষ্ট আঙ্গুলা কোদালখিনি
ষোল্ল আঙ্গুইলা ডাঁটি ;
সেই কোদালে কাটিয়া তুলত
মনার আপন ঘরের মাটি রে।—সং ২৮৪

২৮৬-সংখ্যক গানেও এই তথ্য মিলিয়াছে। পাদটীকায় যদিও আমরা ইহার একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দিয়াছি, তবু মনে মনে তুষ্ট হইতে পারি নাই। মাটি কাটার প্রশ্ন কেন ? এই মাটি কি ? দেহের চারটি উপাদানের একটি কি ? আগে পাইয়াছি 'জল'। সেই জলের সহিত এই মাটির কোনো যোগাযোগ আছে কি ? এ বিষয়ে তূষ্ণীভাব অবলম্বন করিতেছি।

সাধারণ ভাবে বিচার করিলে 'পীর-মুরশিদা ও গুরুতত্ত্বে'-র গানগুলির (সং ২৯০—সং ২৯৬) মধ্যে কোনো গভীর ও সুস্পষ্ট তত্ত্বের বিকাশ হয়

নাই। এই দিক হইতে বিচার করিলে, বাউল গানের অন্তর্ভুক্ত এই নামীয় গানগুলি তত্ত্বের দিক দিয়া অপেক্ষাকৃত ব্যাপক। একটি সুস্পষ্ট তত্ত্বকে সেখানে পাওয়া যাইবে। আলোচ্য গানগুলিতে তত্ত্ব যতো না প্রতিফলিত হইয়াছে, অনুভূতি তাহার তুলনায় অনেক বেশী রূপে প্রতিফলিত হইয়াছে।

তত্ত্বের দিক হইতে একমাত্র ২৯৪-সংখ্যক গানটিই এ প্রসঙ্গে উল্লেখ যোগ্য। বাউল সাধনায় গুরু-মুরশিদের ভূমিকা অসীম ও অপরিহার্য। সেই সূত্রে গুরু মুরশিদই শিষ্য-মুরিদের নিকট পরমতত্ত্বের প্রতীক হইয়া দাঁড়ান, মুরশিদকে তাই আল্লা-র অব্যবহিত পরে একই নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করিতে দ্বিধা আসে নাই : 'আর আল্লায় দিলা ডাইল-চাইল, মুরশিদ দিলা হাঁড়ী।' আর একটি গানেও বলা হইয়াছে, গুরু-মুরশিদকে ভজনা করাই আল্লার ভজনা করা।

আর সত্যি করি' আইলাম বা' গুরু
ভজিতাম তোমারে—
বা' আল্লা, ভজিতাম তোমারে।—সং ২৯৬

'জনমে-মরণে, জীবনে-জীবনে মুরিদ-মুরশিদের এই যোগ লক্ষ্য করা হইয়াছে, 'তোমার আমার হইব দেখা—মুরশিদ, রোজ কিয়ামতে রে' (সং ২৯৪)। সংসারের আবিলতা হইতে মুক্তি পাইয়া দিশেহারা ভক্তের নিকটে আশ্বাসের বাণী মুরশিদই শোনাইয়া থাকেন, তাঁহার করুণাময় আশিসই ভক্তের পাথেয় : 'হায় রে, কেবল মাত্র মুরশিদের দোওয়া—মুই বেয়াকল' (সং ২৯৫)। সাধন-তরী যখন ঘূর্ণীর মুখে পড়িয়াছে, তখন ভক্ত আকুল কণ্ঠে বলেন, 'পার করো চাই দয়ার মুরশিদ আমার বালক সকল লইয়া রে' (সং ২৯৪)।

সাধনার পথকে নদী ও নৌকার সহিত উপমিত করিবার প্রবণতা বাঙলা দেশে চিরকালই আছে,—লোক-সঙ্গীতে সেই প্রবণতা ব্যাপক হইয়াছে। এই সাধন-তরীর কাণ্ডারী এবং মূল সওয়ারী রূপে পীর-মুরশিদকে কল্পনা করা হইয়াছে (সং ২৯২, ২৯৩)। দমের সাধন বাউলের সাধনার একটি মূল অংশ। সাধকের সেই 'মন-পবনের নাও' হইলেন গুরু-মুরশিদ ॥

....৪

'লৌকিক' গুচ্ছের গানগুলিকেই (সং ২৯৭—সং ৩০০) আমরা প্রাথমিক

সুরের ভাটিয়াল বলিয়া চিহ্নিত করিতে চাহিয়াছি এবং তাহার কারণও নির্দেশ করিয়াছি। উপরে আলোচিত ভাটিয়াল গানগুলি সুরের দিক ছাড়িয়া দিলে কথার দিক হইতে নির্ভেজাল 'বাউল' গানই। বাউলিয়া তত্ত্বের অভিভব এই গানগুলি এড়াইতে পারে নাই।

'লৌকিক' সুখ-দুঃখ, প্রেম-ব্যথাকে অবলম্বন করিয়া রচা ভাটিয়াল গান এখন খুবই কমিয়া আসিয়াছে। নদী ও নৌকার ভাবানুষঙ্গের সহিত বঙ্গবাসী তাহার মানসিক জীবনকে এমন করিয়া পাকে-পাকে অধ্যাত্মজীবনের সহিত জড়াইয়া লইয়াছে যে, নৌকায় বসিয়া কিছুতেই তাহার পক্ষে নিছক লৌকিক দুঃখ-সুখকে সুর-রূপ দিতে পারে না। ইহার পরবর্তী ফল হিসাবে দেখি, নৌকা ছাড়াও ভূমিতে যে ভাটিয়াল সুরের গান, তাহাও তত্ত্বধর্মী হইয়া পড়িয়াছে। তত্ত্বশূন্য, খাঁটি একখানি সত্যকার ভাটিয়াল গান পাওয়া এখন সত্যই সহজ নহে।

আলোচ্য গুচ্ছের গানগুলির মধ্যে আলোচনা করিবার কিছু নাই। প্রত্যেকটি গানেরই সুর বিরহের বা ব্যর্থ প্রতীক্ষার বা বঞ্চিত জীবনের। এই ব্যথা-ব্যর্থতা-বঞ্চনাই এই গানগুলিকে একটি চিরন্তন সম্পদে বিভূষিত করিয়াছে। একটি গানে (সং ২৯৮) রাধার উল্লেখ থাকিলেও আসলে তাহা লৌকিকই; এ গানের শেষে কবির পরপারের বাসনা নিতান্তই বেমানান —উহাকে একটা রীতি হিসাবে মনে করিয়াই গানটিকে 'লৌকিক' বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছি। প্রত্যেকটি গানের শেষে রচয়িতার ভণিতাও 'লৌকিক' গান হিসাবে ইহাদের বিশেষত্ব খানিকটা করিয়া কাড়িয়া লইয়াছে,—ভণিতাগুলি না থাকিলে লৌকিকতার সুর আরো প্রখর হইত বলিয়া মানি। ৩০০-সংখ্যক গানটিকে এই ধারার শ্রেষ্ঠ গান বলি। বিধবার জীবনের অসহায়ত্ব ও বঞ্চিত জীবনের শূন্যতা এ গানটিকে হাহাকারে ভরিয়া দিয়াছে—এবং বিশুদ্ধ লৌকিক গানের সুরটিকে মরিতে দেয় নাই।

ভাটিয়াল গানের গায়ন-পদ্ধতি সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছি, তাহারই আলোকে সঙ্কলিত গানগুলিকে বিচার করিতে বসিলে, প্রয়োগ করিয়া তাহা দেখাইতে হয়। কাজেই সে প্রসঙ্গ স্থগিত থাকুক। ছন্দের প্রসঙ্গে দেখা যাইবে, প্রায় সব গানেই নিয়মিত একটা ছন্দ আছে; তবে অন্ত্য মিল অনেক গানেই নাই, ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার মতো। পড়িলে

যাহাতে ছন্দ থাকে, সুরে ফেলিলে তাহার রূপ খানিকটা পাল্টাইয়া যায়। ভাটিয়ালের সুরে ফেলিলে এই গানই নিষ্প্রাণ কথার জগৎ ছাড়িয়া নদী ও প্রান্তরের নিজস্ব, প্রাণময়, উদার, উদাস সুরে কথা কহিয়া সাড়া দিয়া উঠিবে॥

সপ্তম অধ্যায়

॥ রাগ ॥

....১

'রাগ' গানের রূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তেমন কিছু জানিতে পারা যায় নাই। তবে বিভিন্ন দিক হইতে ইহার সম্পর্কে আলোচনা করা যাইতে পারে।

বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে 'রাগ' শব্দটি বিশেষ অর্থবহ। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'র মধ্য লীলায় আছে,—"ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা রাগ স্বরূপ লক্ষণ।" ইষ্টের প্রতি নিবেদিত প্রেমের প্রগাঢ় ও পরিপক্ক অবস্থার নামই 'রাগ'।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে দুই প্রকার ভক্তির কথা সকলেরই জানা আছে। একটি 'সাধ্যভক্তি,' অপরটি 'সাধন ভক্তি'। 'সাধ্যভক্তি'—সহজাত, জন্ম-জন্মান্তরের তাহার জন্য কোনো প্রকার সাধনার প্রয়োজন নাই; নর-দেহধারীদের মধ্যে কেবল শ্রীচৈতন্যদেবই ইহার অধিকারী। শ্রীকৃষ্ণের জন্য শ্রীরাধা ও শ্রীচৈতন্যদেবের 'রাগ' তাঁহাদের 'আত্মা-'র মধ্যে অনুস্যূত বলিয়া তাঁহাদের ভক্তি 'রাগাত্মিকা'। আর, শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলারসের পরিপোষ্টা সখী-গোপীদের 'রাগ'-এর 'অনুগত' পথে যে সাধারণ বৈষ্ণব ভক্তের ভক্তি, তাহাই হইল 'রাগানুগা,'—সাধনা-লব্ধ বলিয়া তাহা 'সাধন-ভক্তি'।

একদা বাঙলা দেশে সহজিয়া বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। 'রাগাত্মিক' পদাবলীর মধ্য দিয়া তাঁহাদের সাধনা ও সত্য ব্যক্ত হইয়াছে। 'বাউল' ধর্ম একটি মিশ্র ধর্ম;—অন্যান্য ধর্মের সহিত সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব ইহাতে লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং আমাদের আলোচ্য 'রাগ' গানগুলির সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ও সহজিয়া বৈষ্ণবের 'রাগ,' 'রাগানুগা' এবং 'রাগাত্মিকা'ও 'রাগাত্মিক' প্রভৃতির ভাবানুষঙ্গকে কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না।

'রাগ'-এর সহিত বাউলের যে ভাবগত যোগাযোগ রহিয়াছে, তাহা লিখিয়া না বলিলেও চলে। বাউলেরা তাঁহাদের ধর্মমতকে 'রাগের ভজন'

এবং সাধনপন্থাকে 'রাগের করণ' বলিয়া অভিহিত করেন। বাউলের ধর্ম আচার-মূলক,—তাঁহাদের সেই ক্রিয়াচারকে তাঁহারা বলেন 'রাগের আচার'।

শ্রীহট্ট জেলাতে বাউল ও মারফতী গানের পূর্বে 'রাগ' শব্দটি বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যেমন, 'রাগ বাউল,' 'রাগ মারফতী'। বর্তমান গ্রন্থের পরিশিষ্ট ক-তে বিভিন্ন কবির যে অতিরিক্ত গান সঙ্কলিত হইয়াছে, সে গুলির কয়েকটির শিরোটীকায় 'রাগ' শব্দটিকে 'সুর' হিসাবেই ব্যবহার করা হইয়াছে : 'রাগ-রঙীন,' 'রাগ-ভাটিয়ল,' 'রাগ-বিরহিণী,' 'রাগ-এশ্‌কি,' 'রাগ-মইউর,' 'রাগ-হরিবংশ'।

'রাগ' যেখানে 'সুর' এবং সেই সুরও যখন বিচিত্র ও বিভিন্ন (যেমন, রঙীন, ভাটিয়ল, বিরহিণী, এশ্‌কি, মইউর), সেখানে 'রাগ' কোনো বিশেষ বিষয়কে নির্দেশ করে না,—বিশেষ কোনো একটি সুরকেও নহে।

শ্রীহট্ট জেলাতেই 'রাগ' শব্দটী 'গীত' অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন 'দৈখুরার রাগ পড়ি খুশী হইব চীত'—অর্থাৎ দৈখোরা নামক কবির রচিত 'গীত' পড়িয়া পাঠকের চিত্ত আনন্দিত হইবে। এখানে এই 'রাগ' শব্দের অর্থ 'গীত' করিয়াছেন পণ্ডিত অধ্যাপক পদ্মনাথ দেবশর্মা[১]।

তবু কেন 'রাগ' নামে একটি বিশেষ গুচ্ছের গান সঙ্কলিত হইয়াছে? 'রাগ' বিভিন্ন 'সুর' অর্থে চলিত থাকিলেও রাধা-কৃষ্ণ লীলাবিষয়ক বিশেষ এক ধরনের গান নামেও ইহার আর একটি পরিচয় ছিল, অনুমান করি। বিশেষ একটি সুরও বোধ হয়। শ্রীহট্টবাসী অনেককেই ইহার পরিচয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছি : তাঁহারা কোনো সদুত্তর দিতে পারেন নাই॥

বর্তমান সঙ্কলনে 'রাগ' এই শিরোনামের নীচে গান সংগৃহীত হইয়াছে মোট চৌদ্দটি (সং ৩০১—সং ৩১৪)। এই গানগুলির মধ্যে এমন কয়েকটি গান পাইতেছি, যেগুলির প্রতিবেশ বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-গীতির। বাউলের প্রতিবেশ সেই সকল গানে আদৌ নাই। এই দিক দিয়া বিচার করিলে

---

[১] সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৫ : 'সিলেট নাগরী' প্রবন্ধ।

এইগুলিকে বৈষ্ণব স্থরেরই একটি প্রসারিত রূপ বলা যায়। ৩০১ হইতে ৩০৬-সংখ্যক গানগুলি এই ধরনের।

বাকী গানগুলিতে বৈষ্ণব প্রতিবেশই ব্যবহৃত হইয়াছে বটে, তবে প্রসঙ্গতঃ বাউলের ভাব ও ইঙ্গিত আসিয়াছে। বাউলের ইঙ্গিত আসিলেই বৈষ্ণব প্রতিবেশের গানের অর্থও সম্পূর্ণ অন্যরূপ হইয়া যায়। ভাবের দিক হইতে অবশ্য নতুনত্ব কিছু নাই, অতএব তাহা অনালোচিতই রহিল॥

অষ্টম অধ্যায়

॥ ধামাইল ॥

....১

'ধামলী' বা 'ধামালি' বা 'ধামালী'[১] শব্দটি বাঙলা সাহিত্যে মোটেই অপরিচিত নহে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ 'রঙ্গ-কৌতুক' করা—এই অর্থে 'ধামালী' ছয় বার ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন, 'না বুঝোঁ রঙ্গ ধামালী'; কিংবা, 'মোরে কেহ্নে বোলএ ধামালী'।

কবি সঞ্জয়ের মহাভারতের পুথিতে[২] দুইটি পঙ্‌ক্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে 'ধামালি' এই একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে,

সারদা সহিতে করে কামকেলি।
রতির সহিতে যেন কামের ধামালি ॥

দৌলত কাজীর 'সতী ময়নামতী'-তে পাই,

তুমি কোন্ তৃণ ছার পতঙ্গ নির্বলী।
বীরের রমণী লইয়া তোহোর ধামলী ॥

'ধামলী' বা 'ধামালী' হইতে অপিনিহিতিতে 'ধামাইলি' এবং তাহা হইতে 'ধামাইল' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্ত মহাশয় অন্যভাবে ইহার উৎপত্তি ও ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করিয়াছেন : "The name *Dhāmāil* may be a derivative of *dhāmal* (from Sanskrit *dhāman*, vigour) or of *dhāmāli* (from *dhayali*—Sanskrit *dhāban*, running or quick stepping.)"[৩]

ডাক্তার শ্রী সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি,—'ধুমালী' ('উল্লাস' অর্থে) হইতে 'ধামালী' আসিয়া থাকিতে পারে। কোনো বিশেষ উৎসবের প্রথমে ভূমিকা হিসাবে যে বাদ্য-যন্ত্রাদি বাজানো হইয়া

---

১ মূর্ধন্যী ভবন (cerebralization)-এর ফলে ইহা 'ঢামালী' রূপেও অনেক স্থানে উচ্চারিত হয়। যেমন, লোচনদাসের 'ঢামালী' পদ।

২ কলিকাতা সুরেন্দ্রনাথ কলেজের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ডাক্তার শ্রী মুনীন্দ্র কুমার ঘোষ এই পুথি লইয়া গবেষণা করিয়াছেন। পুথি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হেফাজতে আছে।

৩ *Gurusaday Dutt* : The Folk Dances of Bengal (1954), *p.46*.

থাকে, তাহাকেও 'ধুমালী' বলে—ইহাও এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিবার মতো। উচ্চাঙ্গ 'ধামার' সঙ্গীতের নাম-সাদৃশ্য ও অর্থটিকেও বিচার করিতে হইবে। 'ধামার' কথাটিরও অর্থ 'উল্লাস'। যেমন করিয়াই দেখা যাক না কেন—উল্লাস, রঙ্গ, কৌতুক ইত্যাদির অনুষঙ্গ 'ধামালী', 'ধুমালী' এবং 'ধামার'-এর সহিত জড়াইয়া আছে।

'ধামালী' গান ও নাচ বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন পরিবেশে, বিচিত্র বিষয়কে অবলম্বন করিয়া গীত ও রচিত হইয়া থাকে। বিবাহের সময় কন্যাকে উদ্দেশ করিয়া কিংবা নব-পরিণীতা বধূ ঘরে আসিলে তাহাকে কেন্দ্র করিয়া যে রঙ্গ-কৌতুকময় গান গাওয়া হয়, তাহা 'ধামালী' বা 'ধামাইল' গান। আবার, রঙ্গ-রসিকতাই ইহার একমাত্র বিষয় নহে। প্রার্থনা ও সামাজিক ব্যাপার লইয়াও 'ধামালী' গান রচিত হইতে পারে। সামাজিক বিষয়-ঘটিত 'ধামালী' গানে রঙ্গ-রসিকতার মাত্রা অনেক সময়েই শোভনতার সীমাকে ডিঙাইয়া যায়। 'ধামালী' আবার 'রাগ'-ও হইতে পারে। ডাক্তার শ্রী সুকুমার সেন মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে ভেলা শাহ্ ফকিরের একটি "ধামালী রাগের" গান সঙ্কলিত করিয়াছেন[১]। অবশ্য এই 'রাগ' ব্যাপকার্থে 'সুর' বোঝাইলে স্বতন্ত্র কথা।

'ধামালী' কেবল মেয়েরাই গায় বা নাচে না। পুরুষেরাও ধামালী গাহিতে ও নাচিতে পারে[২]; তবে, ভিন্ন পরিবেশে ও ভিন্ন উদ্দেশে। মুসলমান সমাজেও ইহা চলিত আছে[৩]।

'ধামলী' বা 'ধামাইল' সমবেত এবং নৃত্য-সম্বলিত গান। মৈমনসিংহ ও শ্রীহট্ট জেলাতেই ইহার সমধিক প্রচার লক্ষ্য করা যায়। নৃত্য-সম্বলিত বলিয়া ইহা ছন্দ-প্রধান। ইহার সুর প্রাণোচ্ছল ও রসোজ্জ্বল। তবে করুণ রসাত্মক বিরহের সুরও যে ইহাতে নাই, এমন নহে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে একটি 'বাউল ধামালি'গান উদ্ধৃত করিয়াছেন[৪]। গানটি বিরহাত্মক। 'বাউল ধামালি' কথাটি হইতে

১ ডাক্তার শ্রী সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড, দ্বি সং ১৩৫৫) পৃ ৯৯০
২ এই কথা কথাশিল্পী শ্রী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মুখে শুনিয়াছি।
৩ ডাক্তার এনামুল হক ও আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ : আরাকান রাজসভায় বাঙলা সাহিত্য, পৃ ৯৫
৪ শ্রী যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য : বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি (দ্বি সং ১৯৬২), সং ৭৮, পৃ ৮১

মনে হয়, বাউলগানের সুরের সহিত 'ধামালী' গানের সুরের অথবা বিপরীত ব্যাপার সাম্প্রতিক কালে ঘটিয়াছে।

'ধামালী' বা 'ধামাইল' নাচ ও গান সম্পর্কে গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে : "...it is a dance of vigorous movements as contrasted with the *Brata* or *Baran* dance. In the two latter dances the steps are a combination of gliding and shuffling movements of the feet without raising them from the ground, and gentleness is the predominating mood. In the *Dhāmāil* dance, on the other hand, the feet are sharply raised from the ground and with vigorous springs alternately moved inward and outward while the dancers proceed in a circle in an anticlockwise direction. There are two principal schemes of movement in the *Dhāmāil* dance. In one, alternate inward and outward springs are made with the right foot, the left foot being used only for taking short steps along the circle in an anti-clockwise direction in the ring. In the other variety, which is of a more feminine character, a light backward step is alternately taken with each foot, and the ground is touched with a light tap on its toes while the heel is kept raised upwards. These movements involve a vigorous exercise of the pelvic, gluteal and abdominal muscles. The *Dhāmāil* dance is invariably performed to the accompaniment of hand claps or cymbals. The outstanding motive of the *Dhāmāil* dance is the spirit of joyous play, but the songs generally relate to the Krishna cult and are spiritual and allegorical. The *Dhāmāil* dance is performed on weddings and other festivals and often at the end of *Brata rituals.*[১]"

শ্রী রাজমোহন নাথ, বি. ই. তাঁহার এক প্রবন্ধে শ্রীহট্টের 'ধামাইল' নাচ ও গান সম্পর্কে নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছেন: "শ্রীহট্টের কথ্য ভাষায় যে সকল গীতিকাব্য গ্রামে গ্রামে সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে বার-মাসী এক অপূর্ব সম্পদ। গ্রাম্য কবি আড়ম্বরহীন ভাষায় গ্রাম্য নায়ক-নায়িকার প্রেম-কাহিনী হইতে আরম্ভ করিয়া নানা-রূপ ধর্মমূলক শিক্ষাপ্রদ কাহিনীগুলি বারমাসীর আকারে গীতরূপে রচনা করিয়াছেন। এই

---

১ *Gurusaday Dutt* : The Folk Dances of Bengal (1954), *p. 46*

গীতিকাগুলি মেয়ে মহলেই বিশেষ আদর পাইয়াছে,—যুবক মহলেও তাহাদের স্থান কম নয়। শারদীয় ৺দুর্গোৎসব উপলক্ষে নবমীর রাত্রে ও দশমীর দিনে শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলায় নৌকা-টানার যে স্ত্রী-আচার প্রচলিত আছে, তাহাতে ধামালী নৃত্য সহকারে এই বারমাসীগুলি এখনও গীত হয়[১]।"

ধামাইল গান ও নাচ আসামের বিভিন্ন স্থানে চলিত আছে। শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ মহাশয় আসামের শিলচরে বাঙালীদের মধ্যে যে ধামাইল নৃত্য ও গান দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন, তাহার বর্ণনা দিয়াছেন এই ভাবে :

"…মাথায় কাপড় দিয়ে শাড়ি পরে গোল হয়ে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গেই গান শুরু হল "যুগল মিলন হইল দেখ সখি শ্যামের বামে রাই দাঁড়াইল।"… গান এবং নাচও আরম্ভ হল ঢিমালয়ে, কিন্তু ধীরে ধীরে দ্রুত ছন্দে বাড়তে লাগল। এ নাচটির নাম "ধামাইল"। অনুমান করি গানগুলিকে ধামাইল বলা হয় বলেই বোধ হয় নাচগুলিও সেই নামে পরিচিত। এই নাচটি গ্রামাঞ্চলের সমাজে জন্ম থেকে বিবাহ পর্যন্ত নানা উৎসব উপলক্ষে এবং বিশেষ বিশেষ ব্রতানুষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হয়। সূর্য-ব্রতের সময় সূর্যোদয়ের পূর্বেই হয় এই উৎসবের আরম্ভ। সমস্ত দিন দাঁড়িয়ে থেকে নৃত্য সহযোগে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক গান গাওয়া হয়, সূর্যাস্তের পর রাধা-কৃষ্ণের মিলনের গান গেয়ে এই উৎসবের সমাপ্তি হয়। সব উৎসব অনুষ্ঠানে এই নাচের সঙ্গে রাধা-কৃষ্ণের লীলার গানই কেবল গাওয়া হয়। এই ধামাইল নাচটি লুপ্তপ্রায় নয়। আজও শিলচরের গ্রামাঞ্চলে অনেক জায়গায় দেখা যায়।

"এই দলবদ্ধ নাচটি…শান্ত প্রকৃতির নয়।…অনেকটা জোরালো। পা তুলে মেয়েরা নাচল। পায়ের ভঙ্গীর বৈচিত্র্য…কিছু বেশী। হাততালিই হল এ নাচের একটি বিশেষত্ব। প্রত্যেক পুরো পদচালির সঙ্গে নানা ছন্দে একবার করতালি থেকে সাতবার পর্যন্ত করতালিতে শব্দ করে তারা নাচল।

১ শ্রীহট্ট গীতিকা: শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৩৪৪। কিন্তু, এই প্রবন্ধেরই শেষে এই সম্পাদকীয় মন্তব্য যোজনা করা হইয়াছে : "শ্রীহট্ট জিলায় নৌকা-টানার কোনও স্ত্রী-আচার আছে বলিয়া কখনও শোনা যায় নাই।
"শ্রীহট্ট জিলায় গ্রাম্য ভাষায় ধামালি শব্দ ব্যবহৃত না হইয়া ধামাইল শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ আসামী ভাষায় "ধেমালি" শব্দের ব্যবহার আছে; 'ধামালি'ও সময় সময় বলা হয়। সম্ভবতঃ ধেমালি ও ধামাইল একই শব্দ। তবে ব্যবহারে অর্থের পার্থক্য হইয়া পড়িয়াছে।"

"পুরো এক পদচালিতে অধিকসংখ্যক করতালি সন্নিবেশ করা বিশেষ দক্ষতার পরিচয়। করতালি দিয়ে নাচবার সময় সামনে ঝুঁকে পড়ে। হাতের ভঙ্গীও...বেশী। কখনো বাঁ হাত কোমরে দিয়ে কেবল ডান হাতে ভঙ্গী করে, কখনো কোঁচড় থেকে যেন কিছু দিচ্ছে এই রকম ভঙ্গী করে নাচতে লাগল। বৃত্তাকারে ডানদিকে[১] পাশাপাশি কিম্বা এক জনের পিছনে অপরে ঘুরতে লাগল। এ নাচটি শেষ হতে সময় লাগল প্রায় মিনিট পনরোর মত[২]।"

"ভাটি অঞ্চলের স্ত্রীলোকেরা "ধামালি" বা "ধামাইল" বলিয়া এক প্রকার গীত গাইয়া থাকেন। সেগুলি অধিকাংশই প্রাচীন ও আধুনিক বৈষ্ণব কবি-রচিত রূপানুরাগের পদ। শ্রীকৃষ্ণ আর গৌরাঙ্গই "ধামাইল" গীতের বিষয়।

"দশ, পনের, কি বিশ-পঁচিশ জন স্ত্রীলোক মুক্ত প্রাঙ্গণে চক্রাকারে দাঁড়াইয়া তালে-তালে করতাল দিয়া নাচিয়া নাচিয়া ধামালি গাহিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগকে "ধামালী" গাইতে দেখা যায় না[৩]।"

ধামালীর অশ্লীলতা, শ্রেণী বিভাগ এবং উহার অস্তিত্ব সম্পর্কে একদা সাময়িক পত্রিকায় কিছু আলোচনা হইয়াছিল। জনৈক প্রবন্ধ-লেখক 'ধামালী'-র মধ্যে 'কৃষ্ণ-ধামালী' নামে আর একটি রূপ দেখিতে পাইয়াছেন। তিনি জানাইতেছেন, "কৃষ্ণধামালীর গান সম্বন্ধে আমাদের দেশের একদল পণ্ডিতের মধ্যে উপভোগ্য মতান্তর আছে। কেহ ইহার মধ্যে উৎকট অশ্লীলতার গন্ধ পাইয়াছেন; তাঁহার মতে ধামালীর শ্রেণী দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—কৃষ্ণ-ধামালী ও শুক্ল-ধামালী। কৃষ্ণ ও শুক্লের মধ্যে প্রভেদ শুধু অশ্লীলতার পরিমাপে। সে জন্যই নাকি উক্ত গান মাঠে গীত হয়, লোকাবাসের বিশুদ্ধ বাতাসে তাহার স্থান নাই। আবার কেহ মনে করেন, ধামালী গানের এক প্রকার অস্তিত্বই নাই—তাহাদের স্বীকার করা শুধু মন-গড়া ছাড়া অন্য কিছুই নহে[৪]॥"

১ গুরুসদয় দত্ত লিখিয়াছেন, Anti clockwise

২ শান্তিদেব ঘোষ : গ্রামীণ নৃত্য ও নাট্য (১৮৮১ শকাব্দ), পৃ ৬৬-৬৭

৩ শ্রী বিজয় নারায়ণ ভট্টাচার্য : ময়মনসিংহের মেয়েলী সঙ্গীত : সৌরভ, অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ ॥ ভারতী, পৌষ, ১৩৩০, পৃ ৮৭৪-৮৭৬।

৪ ভারতবর্ষ, ফাল্গুন, ১৩৪৭, পৃ ৩২১

....২

এই সঙ্কলন-গ্রন্থে মোট আটত্রিশটি (সং ৩১৫—সং ৩৫২) 'ধামাইল' গান স্থান পাইল। বক্তব্যের দিক ধরিলে এই শ্রেণীর গানগুলিতে কোনো নতুন ধারার সন্ধান পাই না;—সে দিক দিয়া বিচার করিলে এগুলি বাউল ভাবাপন্ন। বাউল গানের মতোই ইহার পরিবেশ। আমরা এই গুচ্ছের মধ্যে প্রথমে 'মন' ও 'মনের মানুষ'-এর প্রতি গীত গান, তাহার পর বৈষ্ণব পরিবেশের গান এবং সর্বশেষে 'লৌকিক' জীবনের গানগুলিকে স্থান দিয়াছি। 'লৌকিক' পর্যায়ের গানগুলি সম্পর্কে বিশেষ বক্তব্য এই যে, কয়েকটি গানে রাধা-কৃষ্ণের নাম ও পরিবেশ থাকিলেও আন্তর সুরের দিক দিয়া তাহা নির্বিশেষ প্রেমেরই ; কাজেই ওই গানগুলিকে 'লৌকিক' এই বিশেষণের নীচে রাখা হইয়াছে।

মন ও মনের মানুষের প্রতি গীত গানগুলিতে যথারীতি মনকে শাসন-তিরস্কার এবং সেই অবকাশে কবির আন্তরিক অনুশোচনা, অনুতাপ ও অতৃপ্তির সুর বাজিয়া চলিয়াছে এবং পরিশেষে পরমের চরণতলে মন আপনাকে নিবেদিত করিয়া শমের শান্তিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ বাউলতত্ত্বের আনা-গোনাও লক্ষ্য করা গিয়াছে। সেই সকল তত্ত্বের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আমরা পূর্বেই সারিয়া আসিয়াছি।

সঙ্কলিত 'ধামাইল' গানগুলি শ্রেষ্ঠাংশে বৈষ্ণব রীতি-পরিবেশকে ঘিরিয়া রচা। কিন্তু, এই বৈষ্ণবতা আড়াল মাত্র ; আসলে বাউলের কথা ও ব্যথাকে ব্যক্ত করাই কবির লক্ষ্য। তবে, এখানেও শ্রীরাধা প্রাধান্য পাইয়াছেন এবং বাউলতত্ত্ব ছাড়াও প্রেমের রূপ ও স্বরূপ সম্পর্কে ইতস্ততঃ মন্তব্যের মালা গাঁথা হইয়াছে। বাঁশীকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীরাধার উক্তি নিশ্চিত করিয়া পদাবলী-সাহিত্যের আক্ষেপানুরাগকে স্মরণ করাইবে।

'লৌকিক' পর্যায়ভুক্ত গানগুলিতে দেখি, এখানকার রাধা-কৃষ্ণ তাম্বুল সেবন করেন, শ্রীরাধিকা 'যৈবন' দান করেন। শ্রীরাধার বাড়ীর আনাচে-কানাচে শ্রীকৃষ্ণ 'হাত বাড়াইয়া গুয়া' গ্রহণ করেন এবং শ্রীরাধার কল্পনায় পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণ গামছা পরিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। লৌকিক জীবনের প্রেমকে প্রকাশ করিতে রাধা-কৃষ্ণের মোড়ক ব্যবহৃত হইয়াছে। সত্যই, 'কানু ছাড়া গীত নাই'।

'ধামাইল' গানের নিজস্বতা কথায় নহে, উহার বিশিষ্ট সুরে ও গায়ন-রীতির মধ্যে ॥

নবম অধ্যায়

॥ সারি ॥

'সারি'[১] কথাটির অর্থ—'পঙক্তি' বা 'শ্রেণী'। 'সারি' গানের বিশেষত্বই হইল—ইহা একক কণ্ঠের গান নহে, সমবেত কণ্ঠের গান। সমবেত হইয়া, 'সারি' বাঁধিয়া, সমান লয়ে ও ভঙ্গীতে অঙ্গ সঞ্চালনার সহিত এই গান গাওয়া হয় বলিয়া ইহাকে 'সারি' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এক সঙ্গে সমান তালে অঙ্গ চালনার মধ্যে একটা নিয়ম-বাঁধা ভাব আছে; এইজন্য 'সারি' গানের লয় দ্রুত এবং উহা ছন্দ-প্রধান। ভাটিয়ালী গানের সহিত 'সারি' গানের ইহাই প্রথম ও প্রধান প্রভেদ।

'সারি' গানের মধ্যে লোকজীবন ও লোকসঙ্গীতের একটি ভিত্তিস্থানীয় প্রশ্নের উত্তর মিলিবে। আদিম সমাজে সঙ্ঘবদ্ধতাই পূর্বে আসিয়াছে, পরে উহা হইতেই ব্যক্তি-চেতনার উদ্ভব হইয়াছে। 'সারি' গানকে যদি কর্ম-সঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত করি, তবে স্বভাবতঃই মনে হয়, গণশক্তির এই সমবেত প্রয়োগের মধ্যে সমাজের এক দৃঢ় সঙ্ঘবদ্ধতা প্রতিফলিত হইয়াছে। এই সমবেত চেতনার সাঙ্গীতিক বিকাশের মধ্যে লোকসঙ্গীতেরও আদিমতম স্তরের ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়। এই জন্য বিশুদ্ধ ব্যক্তি-চেতনার গান ভাটিয়ালীকে 'সারি' গানের পরবর্তী বলিয়া মনে হইতে পারে।

'সারি' গানের উৎপত্তি সম্পর্কে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছানো সহজ নহে। ডাক্তার শ্রী সুকুমার সেন মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন: "শাড়ি"[২] (এখন যাকে 'সারি' গান বলা হয়) গান বিগত শতকের আগেই পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে পূর্ববঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিল।" ডাক্তার সেনের মতে তাহা হইলে কি পশ্চিমবঙ্গই 'সারি'র জন্মভূমি?

---

১ শ্রীহট্ট জেলাতে 'স' 'হ' হইয়া অপিনিহিতিতে 'হাইড়' হইয়াছে। দ্রঃ শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৫০, পৃ ১০। বর্তমান সঙ্কলনের ২০২-সংখ্যক গানে পাই: "মাঝে বইয়া হরিদাসে হাবি কইয়া চলতেছে।" ডাক্তার শ্রী সুকুমার সেন মহাশয় লিখিয়াছেন 'শাড়ি'। দ্রঃ ইসলামি বাঙলা সাহিত্য (১৩৫৮), পৃ ১৬৯

২ ঐ

'সারি' কথাটি বাঙলা সাহিত্যের বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সাহিত্যিক কর্তৃক যে ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা হইতেও কোনো সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসা যাইবে না! নীচে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। চর্যাপদে পাই,

আলিকালি বেণি সারি সুণিআ।
গঅবর সমরস-সান্ধি গুণিআ॥—সং ১৭

তাহা হইলে কি হাতী-কেও 'সারি' গান শুনানো হইত? রামপ্রসাদের গানে আছে, "রামপ্রসাদ বলে কালী নামে যাওরে সারি গেয়ে।" আবার, শ্রীকৃষ্ণের লীলাগানের প্রসঙ্গেও 'সারি' গানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে,

সারী সারী গোপীগণ (ভক্তিমতী ও চতুরা)—
সারি সারি চলেছে।
গেয়ে কৃষ্ণ নামের সারি (সারি গান)—
সারি সারি চলেছে।[১]

নিতান্ত আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথও ইহার প্রয়োগ করিয়াছেন,

ওই দেখো কতবার হল খেয়া-পারাপার,
সারিগান উঠিল অম্বরে॥[২]

দেখিতেছি, বিচিত্র পরিবেশে কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে। সন্দেহ নাই, শব্দটির পরিবেশেরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এই সব ছাড়িয়া যদি 'সারি' গান কোন্ কোন্ পরিবেশে গীত হয় তাহার হিসাব লই, তাহা হইলেও খুব একটা সুরাহা হয় না।

বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন সময়ে 'সারি' গান গাওয়া হইয়া থাকে। ছিপ বাহিবার সময় ছিপের দুই কানিতে সারি বাঁধিয়া কিংবা ধান কাটিবার সময় সারি বাঁধিয়া অথবা ছাদ পিটাইবার সময় সারি বাঁধিয়া বসিয়া এই গান গাওয়া হয়। ইহার মধ্যে দুইটি দিক খুবই স্পষ্ট: (ক) সমবেত ভাবে (খ) অঙ্গ সঞ্চালনা। ছিপ বাহিবার সময় হাতে থাকে বৈঠা, ছাদ পিটাইবার সময় একখণ্ড কাঠ এবং ধান কাটিবার সময় কাস্তে। ছিপের পরিবেশ নদী, গতিই উহার মূল লক্ষ্য বলিয়া সকলের একত্র বৈঠা ফেলার প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক; গানের তাল ও ছন্দ তাই একসঙ্গে বৈঠা ফেলিতে

১ ডাক্তার শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত কর্তৃক উদ্ধৃত: সাহিত্যের স্বরূপ (দ্বি সং ১৩৫৩), পৃ ১৩৭-১৩৮
২ গীতবিতান, দ্বিতীয় খণ্ড, বিচিত্র, সং ১০৯

সহায়তা করে। ছাদ পিটাইবার পরিবেশ স্থির, গার্হস্থ্য জীবনের সহিত ইহা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ; সমবেত ভাবে গণশক্তির প্রয়োগের প্রসঙ্গ এখানেও আছে বটে, কিন্তু ক্লান্তি অপনোদনের পরোক্ষ প্রসঙ্গ আছে। মেয়েরাই সাধারণতঃ ইহার গায়ক ; পুরুষেরাও গাহিতে পারে। ধান কাটার পরিবেশ একই সঙ্গে প্রান্তর ও প্রাঙ্গণ, ইহাও স্থির, মূল উদ্দেশ্য ক্লান্তি অপনোদনের সহিত ধান্য প্রাপ্তির আনন্দকে ব্যক্ত করা স্ত্রী-পুরুষ সকলেই ইহাতে অংশ লইতে পারে।

এখন প্রশ্ন, 'সারি' গান মূলতঃ কোন্ পরিবেশের গান,— ছিপের, না ছাদের, না ধানকাটার[১] ? ছন্দের ও তালের আপেক্ষিক প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করিলে ছিপের পরিবেশকেই 'সারি'র মূল পরিবেশ বলিয়া মনে হইতে পারে। কেননা, একসঙ্গে কাস্তে না ফেলিলে বা কাঠ না ফেলিলে ধান কাটা বা ছাদ পিটানো যে হইবে না, তাহা নহে। কিন্তু, বেতালে বৈঠা ফেলিলে ছিপের গতিছন্দ ব্যাহত হইবে।

তবে কি ধরিয়া লইব, ছিপের পরিবেশেই 'সারি' গানের জন্ম ? কিন্তু, উৎপত্তির দিক হইতে ধরিলে এই অনুমান সমর্থন যোগ্য নহে। কেননা, ছিপের মধ্যে যে প্রতিযোগিতার ইঙ্গিত আছে, তাল মানিয়া চলিবার যে কঠোরতা আছে, তাহা আধুনিক মানুষের ঈর্ষা এবং জীবন-যুদ্ধের ক্লান্তি ও একঘেয়েমির ইঙ্গিত দেয়। ছাদ পিটানো আরো আধুনিক ব্যাপার। ফসল কাটাই আদিমতম দিক। এখানে আদিম মানুষের সমবেত হইবার প্রচেষ্টা আছে, কিন্তু নিয়ম পালনের কঠোরতা নাই,— গানের মুক্ত আনন্দকে প্রয়োজনের নিয়ন্ত্রণাত্মক শক্তি আনিয়া গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ করা হয় নাই। প্রয়োজনীয়তা ও বন্ধনকে এবং বিশেষ করিয়া উহাকে পালন করিবার মনোবৃত্তির মধ্যে আধুনিক মনকেই লক্ষ্য করা যাইবে।

আসলে, চর্যাপদ হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যবহারের মধ্যে 'সারি' কথাটিকে যে ভাবে পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে উহাকে 'গান

---

১ শ্রীনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় তাঁহার 'বাঙলা সংস্কৃতি' (ভাদ্র ১৩৬৩, পৃ ১৪৩) গ্রন্থে বলিয়াছেন, "গাথা নামক গানও সারি গানেরই অনুরূপ।" এ সম্পর্কে অধিকতর আলোচনা হওয়া দরকার।

বিশেষ' ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। হয়তো তাঁহারা সর্বত্র 'একটি বিশেষ, ধরনের গান' বুঝাইতেই ব্যবহার করেন নাই, ব্যাপকার্থে 'গান' বুঝাইয়াছেন; তবুও, ইহা মূলতঃ কোন পরিবেশের গান, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিয়াই যায়।

আজিকার দিনে ছিপের পরিবেশটি 'সারি' গানের সহিত যেন বেশী করিয়া জড়াইয়া আছে। আভিধানিকগণ যখন শব্দটির অর্থ করিতে যান, তখন লিখিয়া থাকেন: কুৎসিৎ সামাজিক গান বা নৌকা বাইচ খেলিবার সময় গীত গান[১]। 'সামাজিক' ও 'নৌকা'র পরিবেশের মধ্যে নৌকার পরিবেশটাই প্রাধান্য পাইয়াছে বলিয়া ইহার অপর নাম 'নৌকা বাইচ' হইয়াছে। 'সারি'র অর্থ ও পরিবেশগত যে পরিবর্তন হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ কি!

ছিপের প্রতিযোগিতাকে বলা হয় 'বাইচ খেলা'। আসামে ইহার ঐতিহ্য প্রচলিত থাকিলেও[২] পূর্ববঙ্গে ও শ্রীহট্টে ইহার সমধিক প্রচার লক্ষ্য করা যায়। পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বঙ্গেই বিজয়া দশমীর দিন 'বাইচ' খেলার প্রথা ছিল এবং এখনও পূর্ববঙ্গে তাহা আছে। হিন্দু-মুসলমান সকলেই সমান আনন্দে ইহাতে অংশ লইয়া থাকে। শ্রীহট্টে 'বাইচ'-কে 'বাইছালি'[৩] রূপেও উচ্চারণ করা হয়।

'সারি'-র বিষয় বিচিত্র। সামাজিক, রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সমীক্ষার সহিত আত্মসমীক্ষা এবং কৃষ্ণলীলা-ঘটিত গান ইহার বিষয় হইতে পারে। এই দিক হইতে ধরিলে ইহা Subjective এবং Objective—দুই প্রকারেরই হইতে পারে। ডাক্তার সুকুমার সেন "ইস্‌লামি সারি" গানেরও নিদর্শন উদ্ধৃত করিয়াছেন[৪]।

'সারি' সমবেত কণ্ঠে, প্রতিযোগিতার জন্য, গার্হস্থ্য পরিবেশ হইতে দূরে গীত হয় বলিয়া ইহাতে অশ্লীলতা সময়ে সময়ে প্রশ্রয় পায়। অশ্লীল গান কখনই একা-একা উপভোগ্য নহে; এই জন্য যে গান বহুজনের এবং বহুজন

১ জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস: বাঙ্গালা ভাষার অভিধান

২ "পূর্ববঙ্গে ও আসামে নৌগীতি প্রসিদ্ধ। এর ঐতিহ্যও বহু দিনের। আসামে ইহাকে বলা হয় 'নাও খেলোবা গীত।"—শ্রীসুধাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়: অসমীয়া সাহিত্য (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, ফাল্গুন ১৩৫৯) পৃ ১৫

৩ জনৈক লেখক ইহার ব্যুৎপত্তি এইভাবে নির্দেশ করিতে চাহেন: 'ভূমি চলন' হইতে 'ভূমি ছালি' ('ভুঁইচালি'), তাহা হইতে 'ভাইছালি' এবং তার পর 'বাইছালি'। দ্রঃ শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩৪৪, পৃ ৫১

৪ ইসলামি বাঙলা সাহিত্য (১৩৫৮), পৃ ১৬৯

শুনিবে এবং যাহার বিষয় objective, তাহার মধ্যেই অশ্লীলতা ততো বেশী করিয়া দেখা যাইবে। বর্তমান সঙ্কলনের 'সারি' গানগুলির মধ্যে অশ্লীলতা নাই (অথবা, অশ্লীল বলিয়াই সেই সকল গান সঙ্কলিত হয় নাই) বটে, তবে শ্রীহট্টের 'সারি' গানেও যে অশ্লীলতা ছিল বা থাকিতে পারে, তাহার প্রমাণ আছে। এ বিষয়ে শ্রীহট্টের অন্তঃপাতী প্রতাপগড়ের সুলতান মোহাম্মদের এক কাহিনী স্মরণ করা যাইতে পারে। লঙ্গাই নদী প্রতাপগড়ের রাজ-প্রাসাদের নিকট দিয়া বহিত। "কথিত আছে যে সুলতান-বণিতা স্বীয় প্রাসাদাগ্র হইতে কোন নাবিকের অশ্লীল 'সারিগান' শুনিতে পাইয়া বিশেষ লজ্জিত হন ও স্বামীকে নদী ফিরাইয়া দিতে অনুরোধ করেন[১]।"

শ্রীহট্ট জেলাতে 'বাইচ খেলা' কিরূপে হইয়া থাকে, নীচে তাহার বিবরণ সঙ্কলিত হইল :

"In the north and west of the district, where, in the rains, much of the country goes completely under water, boat races are a source of great amusement. The *Khelnoos*, as they are called, are long narrow canoes, with a peaked stern and prow, which are carved, and painted with the brightest colours. They often carry a crew of forty men, who sit in pairs and paddle with the utmost vigour, while a corybantic individual dances in the centre of the boat, and shrieks out a weird song to the accompaniment of a pair of clashing cymbals. The course is generally a fairly short one, but, as soon as one race is decided, the boatmen paddle slowly back to the starting point, and at once set off again upon their wild career, and the process is repeated time after time till all the competitors are thoroughly exhausted"[২]

এখানে অবশ্য কেবল মাত্র একজনের গানের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে এবং সেই গানকে 'weird' বলা হইয়াছে। কিন্তু 'সারি' গানে বৈঠা চালকগণ পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে এবং সেই গানের অর্থ ও উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট বলিয়া 'weird' বলা চলে না।

'সারি' গানের সুর রবীন্দ্রনাথকেও দোলা দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের

---

১ অচ্যুতচরণ চৌধুরী : শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত (দ্বিতীয়ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩১৭), পৃ ২০৭

২ *B. C. Allen, C.S.* : Assam District Gazetteers (Vol. II : Sylhet), *1905, p.102*

'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে', 'বসন্তে কি শুধুই কেবল ফোটা ফুলের মেলা,' 'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরির খেলা[১]' এবং 'খর বায়ু বেগে[২]' প্রভৃতি গানে 'সারি' গানের সুরের অনুসরণ অথবা প্রভাব রবীন্দ্র-সঙ্গীত সমালোচকগণ লক্ষ্য করিয়াছেন। 'সারি'গানের সুর-প্রভাবান্বিত রবীন্দ্রনাথের সব কয়টি গানই চার মাত্রার দ্রুত ছন্দে রচিত ॥

....২

বর্তমান সঙ্কলনে 'সারি' গান আছে নয়টি (সং ৩৫৩—সং ৩৬১)। ভাবের দিক ধরিলে ইহার প্রথম তিনটি বাউল-ভাবাপন্ন, তার পরের দুইটি বৈষ্ণব পরিবেশঘটিত,— বাকী চারটি লৌকিক প্রেমকে ভিত্তি করিয়া রচিত। আকৃতির দিক হইতে লক্ষ্য করি—প্রায় প্রতিটি গানই দীর্ঘ। গান যেখানে কেবল নিজের মনকে শোনাইবার জন্য স্বভাবতঃই তাহা ক্ষুদ্র হইয়া থাকে। কিন্তু বহুজনে মিলিয়া প্রতিযোগিতা-মূলক আনন্দ-প্রাপ্তি যে গানের রচনাগত উৎস—তাহা ঠিক সেই একই কারণে বড়ো হইয়া যায়। অবশ্য, উল্লেখ করা দরকার ভাটিয়াল গানও দীর্ঘ হয়, অন্ততঃ বর্তমান সঙ্কলনেই তাহা আছে। রচনার দিক হইতে আর একটি জিনিসও লক্ষিতব্য। সারি গানের প্রয়োজনীয়তা যদি বৈঠার তাল মিলাইবার জন্যই আসিয়া থাকে, তবে দেখিতে হইবে, বর্তমান গানগুলিতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে বারংবার শ্বাসাঘাত পড়িতেছে কিনা; অন্ততঃ শ্বাসাঘাতমূলক ছন্দের আয়োজন আছে কিনা। তাল মিলাইবার অপর এক সাধারণ উপায় গানের অন্ত্যানুপ্রাস। কি শ্বাসাঘাত, কি অন্ত্যানুপ্রাস—দুইই যে সর্বত্র সমান ভাবে রক্ষিত হইয়াছে, এমন কথা বলি না। তবে, কথায় যে দোলা ও ঝোঁক অনুপস্থিত, সুরে তাহা অনেক সময় আসিতে পারে। একসঙ্গে একলয়ে বৈঠা ফেলিবার সুযোগ করিবার জন্য অবশ্য দুই-একটি গানে ভিন্নতর উপায় অবলম্বিত হইয়াছে : ধুয়ার মতো এক-একটি গানে এক-একটি বিশিষ্ট পঙ্‌ক্তি বার-বার গীত হইয়াছে। যেমন, "দূতী গো, চলো বিন্দাবন" (সং ৩৫৬); "পিরিতে চাইলায় না আমায়" (সং ৩৫৭); "কি রে হয় হয় হইয়া" (সং ৩৫৮, ৩৫৯);

১ শান্তিদেব ঘোষ : রবীন্দ্রসঙ্গীত (পরিবর্ধিত সং ১৩৬৫), পৃ ১০৬-৭

২ শুভ গুহঠাকুরতা : রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধারা (বৈশাখ ১৩৫৯), পৃ ১১৫

"বাবণ, ছাড়ো আমার মায়া রে" (সং ৩৬০)। অবশ্য, এইগুলিতেও সময়ের ব্যবধানের সমতা নাই।

বাউল-পরিবেশের সারি গান তিনটির রচনাগত একটি সুন্দর ভঙ্গী ফুটিয়া উঠিয়াছে। সারি গানগুলি নৌকা-বাইচ খেলিবার সময় গীত হয়—সুতরাং নৌকা এই গানের মূল পরিবেশ। বাউলের তত্ত্বকাহিনীগুলির ফাঁকে-ফাঁকে নৌকার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও এখানে চিত্রিত হইয়াছে, ফলে নৌকার প্রাধান্য প্রত্যাশিত পরিমাণেই লক্ষ্য করা যাইবে। কিন্তু, এজন্য কবিদের আলাদা করিয়া প্রশংসা করিবার কোনো কারণ দেখি না। বাউলতত্ত্বের ব্যাখ্যার জন্যই নদী ও নৌকার পরিবেশ সর্বত্র ব্যবহৃত হয়। প্রেম প্রকাশ করিবার জন্য বাঙলা সাহিত্যে যেমন রাধাকৃষ্ণের রূপক, আধ্যাত্মিকতার পরিবেশ আঁকিতে তেমনি নদী ও নৌকা। কাজেই, সারি গানের কবিগণ সেই সুযোগটুকু গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র; সচেতন হইয়া নৌকার পরিবেশ আঁকেন নাই। তবে, বাউল যেমন সাধনপথের মানস-মুসাফির—প্রতিযোগি-দল তেমনি যেন কোনো বিশেষ গন্তব্যের যাত্রী—এই ভাব দুইটি এই সকল গানে সুন্দর ভাবে মিলিয়া গিয়াছে।

ঠিক এই একই ভাব বৈষ্ণব-প্রতিবেশে রচিত সারি গান দুইটির সহিতও সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছে। 'দূতী গো, চলো বিন্দাবনে' (সং ৩৫৬) এই কথা বলিয়া বিভিন্ন অলঙ্কারের লোভ দেখাইয়া পথ চলিবার যে প্রেরণা সমস্ত গানটি জুড়িয়া ঢালা হইয়াছে—তাহা প্রতিযোগীদেরই পথ চলার ইঙ্গিত। পরের গানটিতে বিভিন্ন পরিবেশে শ্রীরাধার প্রেমের যে পর্যায়মূলক বর্ণনা আছে, তাহা যেন বৈঠার এক-একটি ক্ষেপকে নির্দেশ করিতেছে।

লৌকিক পরিবেশের সারি গানের সহিত এই ভাবের সামঞ্জস্য আরো তীব্র। কাহিনীর আড়ালে, পর্যায়ধর্মী বর্ণনার ফাঁকে এখানে সত্যি-সত্যি বৈঠার ক্ষেপ ঘন-ঘন উঠিতেছে ও পড়িতেছে এবং নৌকা চলিতেছে॥

দশম অধ্যায়

॥ বিবাহ-গীতি ॥

....১

বিবাহের মধ্যে গানের প্রয়োজনীয়তা ভদ্র ও মার্জিত সমাজেও এখনো ফুরাইয়া যায় নাই—লোক-সমাজের তো কথাই নাই। লোক-সমাজের বিবাহানুষ্ঠানে গান একটি অপরিহার্য অঙ্গ রূপে বিবেচিত হয়। সর্বত্রই মহিলারাই ইহার রচয়িতা, গায়ক ও শ্রোতা। এইজন্য বিবাহ-গীতির মধ্যে মেয়েলি ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট।

বিবাহ-গীতির অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। ঘটকঠাকুর আসিয়া সম্বন্ধ-স্থাপন করিতেছেন যখন, তখন হইতে শুরু করিয়া সমাপ্তি-সূচক অনুষ্ঠানের বর্ণনায় বিবাহের গান শেষ হয়। এই রকমের বিবাহ-গীতি অনুষ্ঠান সমূহের তথ্যমূলক বিবৃতি, তাহাতে সাহিত্যিক কৃতিত্ব প্রকাশের অবকাশ স্বাভাবিক কারণেই কম। আর এক শ্রেণীর বিবাহ-গীতি আছে, যাহাতে বর-কনের বিবাহকালীন মনোভাব, তাহাদের ভাবী যৌন ও দাম্পত্য-জীবনের কাল্পনিক চিত্র অঙ্কিত হয়; বর-কনের পিতা-মাতা ও নিকট স্বজন ও সজনীর মনোভাবও এই শ্রেণীর গানের বিষয়। তৃতীয় অপর আর এক ধরনের বিবাহ-গীতি, আছে যাহাতে রঙ্গ-তামাশা ও কৌতুকই লক্ষ্য। অনেক বিবাহ-বাসরে বর-কনের দুই পক্ষের গায়িকাদের মধ্যে রীতিমতো গানের লড়াই হইয়া যায়। এই সব গানে শ্লীলতার সীমা সহজেই ভাঙিয়া পড়ে।

বিবাহ-গীতির মধ্যে অনেক সময়েতেই ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় থাকে না। পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বঙ্গেই বর ও কনেকে হয় রাম-সীতা নয় রাধা-কৃষ্ণ কল্পনা করিয়া গান গীত হয়। প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের বিবাহ গীতিগুলি এ ব্যাপারে লক্ষণীয় ব্যতিক্রম রক্ষা করিয়াছে। ধর্মনিরপেক্ষ হইবার জন্য প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের বিবাহ-গীতির মধ্যে বাস্তব জীবনের তীক্ষ্ণতা, তীব্রতা এবং কঠোরতা ও প্রত্যক্ষতা যেমন বজায় আছে, অন্যত্র তেমন নাই॥

আমাদের এই গীতি-চয়নিকায় মোট উনিশটি (সং ৩৬২-৩৮০) বিবাহ-গীতি দিয়াছি। বিবাহের অনুষ্ঠান সমূহের ধারাবাহিকতাকে স্মরণে ও সম্মুখে রাখিয়া গানগুলি সাজানো হইয়াছে।

শ্রীহট্টের বিবাহ-গীতির মধ্যে ধর্ম-নিরপেক্ষতা নাই। কনে এখানে "শ্যাম মনো মন-মোহিনী, কৃষ্ণ-প্রেম আহ্লাদিনী" (সং ৩৬৩), "রাইয়া" (সং৩৭৫), "রাই কিশোরী" (সং ৩৭৭); বর এখানে "নদীয়ার চান্দ" (সং ৩৬৮) কিংবা "শ্যাম চান্দ" (সং ৩৭৫)। বর-কনের বাসর-ঘর এখানে রাসবিহারীর কুঞ্জ (সং ৩৭৯)। এমন কি, বর ও কনের মাতাও "নন্দরানী" (সং ৩৭৬) হইয়া গিয়াছেন।

লৌকিক জগতের কিছু-কিছু কাব্যিক বিশেষণ বর ও কনের উপর আরোপিত হইয়াছে। এইগুলির সাহিত্যিক মূল্য আছে। বর কখনও অশ্বারোহী "রাজা" (সং ৩৬৫, ৩৭২), কখনও বা "ছিলটিয়া ছিপাইয়া" (সং ৩৭০)। তাহার একটি রোমান্টিক মূর্তিও বিভিন্ন গানে কল্পনা করা হইয়াছে। আবার কখনও "কইলকাত্তার বেপারী" (সং ৩৬৬)। কলিকাতার বড়ো ব্যবসায়ী হিসাবে তাহার অনেক টাকা-কড়ি আছে, হুকুম করিলে 'ফুলের বাইশা কুড়ি' (সং ৩৬৬) আনাইয়া দেওয়া তাহার পক্ষে মোটেই কষ্টকর ব্যাপার নয়। তাহার হাতে 'সোনার কুটা' (সং ৩৬৭), কনেকে প্রাক্-বিবাহ কালেই সে ফুল তুলিতে সাহায্য করিয়াছে; কিংবা কখনও সে হাতে 'মুতির চাবক' (সং ৩৭০) লইয়া আবির্ভূত হয়, লুণ্ঠনকারীর বেশে কন্যাকে পিতৃগৃহ হইতে ছিনাইয়া লইবার জন্য। কখনও সে কনের গৃহে এক রাত্রির অপরিচিত অতিথি (সং ৩৭২), কখনও কনের অলঙ্কার হারাইলে মুশকিল-আসান রূপে তাহার প্রেমময় আবির্ভাব (সং ৩৬৫)। কখনো তাহার বিশেষণ "বাবুলাল" (সং ৩৬৮) বা "লীলমনি" (সং ৩৭৬)।

উল্টাদিকে কনেও কাব্যিক জগতের বিশেষণে বিভূষিতা হইয়াছে। তাহাকে কখনো 'পরী'-র সহিত উপমিত করা হইয়াছে (সং ৩৬৪), কখনো বা ফুল-বালা হিসাবে কল্পনা করা হইয়াছে (সং ৩৬৭), কখনো সে "রছুল-গঞ্জের মউলা রাণী" (সং ৩৭২) কিংবা "উমরা-জাদী" (সং ৩৮০)। কিছু-কিছু ফুল, বৃক্ষ এবং কাল্পনিক স্থানের নাম, কাব্যিক বিশেষণের প্রচুর প্রয়োগ

—বিবাহ-গীতিগুলির পরিবেশকে খুব রোমান্টিক করিয়া তুলিয়াছে। এই রোমান্টিকতা নব-দম্পতীর বিবাহ-দিবসে নিশ্চয়ই তাহাদের মনে সাড়া জাগায়। অতিশয়োক্তি এবং কল্পনার অতিরেক বিবাহ-গীতিগুলির মূল দুইটি বিশেষত্ব।

বর-কনের মানস কিন্তু সংগৃহীত গানগুলিতে তেমন নাই। বিবাহ হইবার জন্য পিতৃগৃহ হইতে বিদায়ের ব্যথায় কনের ক্রন্দন অথবা বাসর-গৃহে বরের 'ঠমকা' (সং ৩৮০) সম্পর্কে দুই-একটি গানে ইঙ্গিত মিলিতেছে। বর-কনেকে উদ্দেশ করিয়া কিছু রঙ্গ করা হইয়াছে। যেমন, বীরের বেশে আবির্ভূত হইয়া বর কনেকে অপহরণ করিল (সং ৩৭০); কখনো শিকারীর রূপ ধরিয়া বিবাগী হইতে চাহিল বর ; এয়োরা গায়, "তালুক-মিরাশ বেচিয়া রে মনুওর দিমু বিয়া রে" (সং ৩৭১)। ৩৭২-সংখ্যক গানটিতে পর-নারী-ভোগী বিবাহিত স্বামীর পত্নী-প্রেমের নিদর্শন ভাবী জীবনের একটি উপদেশ রূপে গৃহীত হইতে পারে।

আচার-অনুষ্ঠানের বিবৃতি-মূলক গানগুলির মধ্যে সামাজিক জীবনের ছবি মিলে॥

একাদশ অধ্যায়

॥ রচনাভঙ্গী ॥

....১

জেলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সংগৃহীত ৩৮০টি গান পর্যবেক্ষণ করিলে, উহাদের মধ্যে এক বিশিষ্ট রচনারীতির পরিচয় মিলে। এই রচনারীতি একান্তভাবেই লোকসাহিত্যের রচনারীতি। লোকসাহিত্যের এমন কতকগুলি রচনাগত বৈশিষ্ট্য আছে, যে বৈশিষ্ট্য সমস্ত বাঙলা দেশের, এমন কি, নির্বিশেষ ভাবে যে কোনো দেশের লোকসাহিত্যের মধ্যে মিলে।

বর্তমান সঙ্কলনে গ্রথিত গানগুলিকে লক্ষ্য করিয়া আমরা উহাদের রচনাগত কতগুলি সাধারণ সূত্র পাইয়াছি। সেই সূত্রগুলি এই :

১. ধুয়া ;

২. পুনরাবৃত্তি : সমার্থক, বিপরীতার্থক, সংখ্যা-বাচক ;

৩. শৃঙ্খলামূলক বর্ণনা ;

৪. বর্ণনাভঙ্গির বিশেষত্ব ;

৫. অর্থহীন পদ বা পদসমষ্টি দিয়া পংক্তির পাদপূরণ ;

৬. একই গানের মধ্যে প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গি ;

৭. কতকগুলি ব্যাকরণগত বিশেষত্ব ;

৮. বিশিষ্ট উপমা-অলঙ্কার।

পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে উপরের এক-একটি সূত্র সম্পর্কে স-উদাহরণ আলোচনা করা হইতেছে॥

অনেকেরই ধারণা 'ধুয়া' ও 'পুনরাবৃত্তি' একই বস্তু। কিন্তু, লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, উভয়ের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য আছে,—অন্ততঃ আমরা উভয়ের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করিতে চেষ্টা করিয়াছি। 'ধুয়া' হইল—যাহা সমস্ত গানের মধ্যে ধ্রুবতারার মতো স্থির থাকে এবং অবিকৃত ভাব, সুর ও ভঙ্গিতে গানের মধ্যে অসকৃৎ ব্যবহৃত হয়। পূর্ণগানটির মূল ভাব ও ভাষার সহিত ধুয়ার অর্থগত সামঞ্জস্য না থাকিলেও কিছু আসিয়া যায়

না—কেননা, 'ধুয়া' অনেক সময় কতকগুলি অর্থহীন অব্যয়পদেরও সমষ্টি হইতে পারে এবং হইয়া থাকে। ইংরাজী Refrain এই অর্থে ধুয়ার সমার্থক।

'পুনরাবৃত্তি' কিন্তু তাহা নহে। "পুনরাবৃত্তি-র জন্য প্রধান প্রয়োজন একটি শৃঙ্খলা বোধ, সঙ্গতি ও সুষমা বোধ। একটি স্তবক হয়তো গানের মধ্যে পুনরাবৃত্ত হইল,—প্রতিবারের 'পুনরাবৃত্তি'র মধ্যে ভাষায় ঈষৎ পরিবর্ত্তন আসিবেই। কিন্তু, এই পরিবর্ত্তনের পশ্চাতে একটি শৃঙ্খলা ও সুষমা বোধ থাকিবেই। একটি নির্দিষ্ট শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া, একই স্তবককে ঈষৎ পরিবর্তন করিয়া বারংবার গাহিলে তাহা 'পুনরাবৃত্তি' হয়। 'ধুয়া' যেখানে অবিকৃত ও অপরিবর্তিত রূপে বারংবার গীত হয়, 'পুনরাবৃত্তি'-র স্তবক সেখানে একটি রসময় সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে প্রতিবারে ঈষৎ পরিবর্তিত হইয়া গীত হয়। 'ধুয়া'-র মধ্যে বৈচিত্র্য নাই, কিন্তু রসময় বৈচিত্র্যই 'পুনরাবৃত্তি'-র প্রাণ"[১]।

শ্রীহট্ট জেলা হইতে প্রাপ্ত গানগুলির কয়েকটি ধুয়ার দৃষ্টান্ত এই : দয়াল প্রেম বাজারে থাকি—সং ১৭৫। পিরিতে চাইলায় না আমায়—সং ৩৫৬। কি রে হয় হয় হইয়া—সং ৩৫৮। ধন্যি ধন্যি পরীর বিয়া—সং ৩৬৪। কি হয় রে নাইয়া—সং ৩৬৯। 'দুইজনে'—সং ৩৭৪। 'লীলমণি'—সং ৩৭৬। সেই না পানে না লয় সমান—সং ৩৭৮।

গানের মধ্যে এই ধুয়াগুলি যখন ব্যবহৃত হইয়াছে, তখন ইহাদের আক্ষরিক অর্থের চেয়ে সুরগত মূল্যই বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। ধুয়ার দ্বারা গানের মধ্যে ভাবগত কোনো ব্যঞ্জনা সঞ্চারিত হয় না—ইহা একান্ত ভাবেই গানের সুরগত দিক।

শৃঙ্খলাকে ভিত্তি করিয়া যে 'পুনরাবৃত্তি' গানের মধ্যে লক্ষিত হইয়া থাকে, তাহাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় :

১. সমস্ত গান জুড়িয়া শৃঙ্খলাময় পুনরাবৃত্তি ;

২. একটি বিশেষ স্তবক বা একটি বিশেষ পঙ্‌ক্তির মধ্যে একটি বিশেষ ধারা, নিয়ম বা শৃঙ্খলাকে কেন্দ্র করিয়া পুনরাবৃত্তি।

---

১ বর্তমান লেখকের গবেষণা-গ্রন্থ 'প্রান্ত-উত্তর বঙ্গের লোকসঙ্গীত'-এ এ বিষয়ে আলোচনা আছে।

একটি বিশেষ স্তবক বা পঙ্‌ক্তির মধ্যে প্রতিফলিত এই পুনরাবৃত্তিকে আবার তিন রকম ভাবে লক্ষ্য করা চলে :

১. সমার্থক পুনরাবৃত্তি ;

২. বিপরীতার্থক পুনরাবৃত্তি ;

৩. সংখ্যাবাচক পুনরাবৃত্তি।

প্রথমে সমস্ত গান ব্যাপ্ত হইয়া যে পুনরাবৃত্তি, তাহার আলোচনা করিতেছি। বর্তমান সঙ্কলনের নিম্নলিখিত গানগুলির মধ্যে এই ধরনের পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যাইবে : সং ৩৬, ৩৯, ৫০, ১৬০, ১৮৪, ২৪৭, ২৫২, ২৫৫, ২৭৬, ২৮৯, ২৯৩, ২৯৭, ২৯৮, ৩০১, ৩০৭, ৩১২, ৩২৯, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬৩, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৭০, ৩৭২, ৩৭৩, ৩৭৭, ৩৭৮।

৩৬-সংখ্যক গানখানিতে লক্ষ্য করা যায়—একটি বিশেষ শৃঙ্খলাকে সারা গানের মধ্যে স্থান দেওয়া হইয়াছে। ভক্তির পথে চলিতে গেলে সাধক সর্বত্র দৃঢ় ভাবে পা' ফেলিয়া চলিতে পারেন না,—সাধন-পন্থা অনেক স্থানেই তাঁহার অজানা। এই কথাটিকে বুঝাইবার জন্য রচয়িতা লৌকিক জীবনের কয়েকটি বিশেষ দিকের কথা তুলিয়া ধরিয়াছেন গানটির চারিটি স্তবকের মধ্যে ;—প্রতিবারের ভাব প্রায় একই, ভাষাও প্রায় এক—কিন্তু প্রতিবারই ভাষা ঈষৎ পরিবর্তিত হইয়াছে। যেমন,

বানিয়া হইতায় চাও যদি রে মন,
নেক্তি ধরা জানো না রে—
পাইছ না তার কল।···

তার পরের স্তবকে,

গোয়ালা হইতায় চাও যদি রে মন,
দুধ বেচা জানো না রে—
পাইছ না তার কল।···

তারপর,

আর নাইয়া হইতায় চাও যদি রে মন,
হাইল ধরা জানো না রে—
পাইছ না তার কল।···

শেষে,

বেপারেতে যাও যদি রে মন,
পাল্লা ধরা জানো না রে—
পাইছ না তার কল।···

দেখা যাইতেছে, একই ভাব চারিবার আবর্তিত হইয়াছে, কিন্তু প্রতিবারই ভাষা ঈষৎ পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে। আবার চারিবার ভাষা পরিবর্তিত হইবার ভিত্তিরূপে রহিয়াছে—চারিটি দিক : বানিয়া, গোয়ালা, নাইয়া, বেপারী। ইহাদের জীবন ও বৃত্তিই ভাষাকে রূপান্তরিত করিয়াছে। এই যে একটি বিশেষ শৃঙ্খলাকে রক্ষা করিয়া একই ভাবকে বারে বারে তুলিয়া ধরা—ইহাই লোকসঙ্গীতের বিশিষ্ট রচনারীতি।

৩৯-সংখ্যক গানটিতে দেখি, জীবনকে একটি রাত্রির সহিত উপমিত করা হইয়াছে। রাত্রি যেমন কতকগুলি প্রহরের সমষ্টি,—জীবন তেমনি কতকগুলি বিশেষ পর্ব বা স্তরের সমষ্টি। ভক্ত-কবি জীবনের প্রতি প্রহরে তাঁহার 'ছায়ব আল্লাজীর' নাম করিতে চাহিয়াছেন; কিন্তু, ইহলৌকিক আবিলতায় তাহা সম্ভব হয় নাই। আজ জীবনরাত্রির শেষ প্রহরে দাঁড়াইয়া কবি অনুতাপ করিতেছেন, সেই অনুতাপই গানের বিষয়। রাত্রির প্রতি প্রহরের ক্রমান্বয়িক উল্লেখ করিয়া তিনি তাঁহার বক্তব্য উপস্থাপিত করিয়াছেন.

আর দুই প'র রাত্রি যাইতে
ওয়রে মন, মইওতের চিন ;···
তিন প'র রাত্রি যাইতে আমার
মইওতের খবর।···
চারি প'র রাত্রি যাইতে রে
ওয়রে মনা, আসিলা তজ্জুদ।···
পাঁচ প'র রাত্রি যাইতে রে
ওয়রে মনা, আসিলা ফজর।···

রাত্রির প্রহরগুলির এই ক্রমান্বয়িক উল্লেখের মধ্যে যে শৃঙ্খলা রহিয়াছে, সেই শৃঙ্খলার অনুবর্তনের মধ্যেই গানটিতে পুনরাবৃত্তির সুর বাজিয়াছে এবং তাহাই গানটিকে একটি খাঁটি লোকসঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত করিয়াছে।

৫০-সংখ্যক গানের বক্তব্য বিষয় হইল,—আল্লা বিচিত্রভাবে এই পৃথিবী স্বজন করিয়াছেন এবং বিশ্ব-পৃথিবীর প্রতিটি স্বষ্টির পশ্চাতে তাঁহার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সংসাধিত হইয়াছে: 'কারণের জন্যে কাজ করিলা জগতে—।' কবি গাহিতেছেন,

প্রেমেরি কারণ প্রভু-নিরঞ্জন—
আহাদের মধ্যে কইলা মিমের মিলন।…
বেহেস্তের কারণ দুজখ স্বজন…
রাত্রির কারণ সম্মান পাইলা দিনে…
বিবাদীর কারণ হাকিম ভাবে মনে…

এখানে কবি স্বষ্টির কয়েকটি দিকের কথা জোড়ায়-জোড়ায় উল্লেখ করিয়াছেন (যেমন, প্রেম-প্রভু, বেহস্ত-দুজখ, রাত্রি-দিন, বিবাদী-হাকিম) এবং প্রতিবারের ভাব প্রায় এক হইলেও ভাষা সামান্য পরিবর্তিত হইয়াছে। এই বিপরীত জোড়ার পর্যায় ধরিয়া উল্লেখ—ইহা পুনরাবৃত্তিরই আর একটি রকম্‌ফের মাত্র।

১৬০-সংখ্যক গানে একই বিষয়ের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ঘটনার উল্লেখের মধ্যে একপ্রকার শৃঙ্খলাবোধের পরিচয় রহিয়াছে। এই শৃঙ্খলাই গানটির দ্বিতীয় স্তবকের সহিত তৃতীয় স্তবককে পুনরাবৃত্তির স্বত্রে গাঁথিয়া লইয়াছে। ইহার দ্বিতীয় স্তবকে পাই,

আর সর্প হইয়া কামড মারে রে—
ও গৌর, উঝা হইয়া ঝাড়ে।…

এবং তৃতীয় স্তবকে আছে,

আর কোম্ সাপে মাইল কামড় রে—
ও গৌর, সর্ব অঙ্গ জারে।…

প্রথমে সাপের কামড় মারা ও ওঝার বিষঝাড়া, পরে উহারই অব্যবহিত পরবর্তী ফল হিসাবে সর্ব অঙ্গ জর্জরিত হইবার উল্লেখ। তদুপরি, 'ও গৌর' এই সম্বোধনটি অবিকৃত রূপে দুইবার ব্যবহৃত হইয়া পুনরাবৃত্তিকে স্পষ্ট করিরাছে।

১৮৪-সংখ্যক গানের বক্তব্য হইল: 'এই নদীর শতধার, নাও ধরি মুই কি পরকারে।' ভক্ত-কবি তারপর বলিতেছেন—এই জীবন-নদী (বা

ভক্তি-পথ নদী) অতিক্রম করিবার জন্য এক-একজন এক-এক পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন : 'কেহই যায় রে বাদাম তুলে কেহ যায় রে গুণে ; কেহই যায় রে লগি ভরে, কেহ দাঁড় টানে। কেহ যায় রে সার ভাটাতে— কেহ যায় রে জোয়ারের জোরে।'

এই তরীতে ভক্তি-ব্যবসায়ের পণ্য-পসরাও জনে-জনের ভিন্ন : 'কেহই নেয় রে লবণ-মরিচ, কেহই তামা-সীসা ; কেহই নেয় রে মুগ-মুসুরি, কেহই পিতল-কাঁসা।'

গানটির মধ্যে শৃঙ্খলার অনুবর্তনটি খুবই স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ। প্রথমে নদীতে নৌকা বাহিবার সব কয়টি উপায়ের পর্যায় ধরিয়া উল্লেখ (যেমন, বাদাম, গুণ, লগি, দাঁড়, সার ভাটা, জোয়ার), পরে সেই নৌকায় বাণিজ্যের জন্য পণ্যদ্রব্যের তালিকা সঙ্কলন। ইহাই গানটির পুনরাবৃত্তি।

২৪৭-সংখ্যক গানের শৃঙ্খলাজাত পুনরাবৃত্তিটি একটু অন্য ধরনের। ইহার দ্বিতীয় স্তবকে ঘরের উল্লেখ, তৃতীয় স্তবকে ভাইয়ের উল্লেখ এবং সেই ঘরে ভাইয়ের সহিত একত্র বাসের প্রসঙ্গ, চতুর্থ স্তবকে স্ত্রী-র উল্লেখ এবং পঞ্চম স্তবকে স্ত্রী-র সহিত সেই ঘরে একত্র বাসের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। গানটির অন্তর্নিহিত শৃঙ্খলা একটি ঘর, একটি পুরুষ এবং তাহার পরিবারকে ভিত্তি করিয়া প্রতিফলিত হইয়াছে।

২৫২-সংখ্যক গানের শৃঙ্খলা একই ঘটনার স্তরানুক্রমিক বিন্যাসের মধ্যে। শ্রীরাধার প্রতীক্ষা গানটির বিষয়। তিনি চুয়া-চন্দন-ফুলের মালা লইয়া কুঞ্জে বসিয়া আছেন, তিনি 'একেলা মন্দিরে ঝুরি'-তেছেন, শেষে রাত্রি পোহাইল—কোকিল ডাকিল, শ্রীরাধার বাসর-সজ্জা বৃথা গেল। এই ভাবে সন্ধ্যা হইতে সকাল পর্যন্ত ঘটনার অনুস্যূতিতে গানটির মধ্যে একটি শৃঙ্খলার সুর পাওয়া যায়।

সমস্ত গান ব্যাপ্ত হইয়া পুনরাবৃত্তি বলিতে আমরা কি বুঝিয়াছি বা বুঝাইতে চাহিয়াছি, কয়েকটি গান আলোচনা করিয়া তাহা দেখাইলাম॥

....৩

"পুনরাবৃত্তিরই অপর একটি স্তর লক্ষ্য করা যায়, যাহা ধুয়া-র মতো অবিকৃত রহিয়া সারা গানে বার-বার গীত হয় না ; কিংবা পুনরাবৃত্তির মতো

পর্যায় বা নিয়ম রক্ষা করিয়া ঈষৎ পরিবর্তিত রূপে পুনরাবৃত্ত হয় না। ইহা গানের একটি মাত্র পঙক্তির (বা একটি মাত্র স্তবকের) মধ্যেই আবদ্ধ থাকে এবং সেই পঙক্তির বা স্তবকের মধ্যেই পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। অনেক সময় আবার ইহা ঠিক পুনরাবৃত্তি-ও নয়—সমান ওজনের ও সমানধর্মের দুইটি ভাব একটি পঙক্তির দুইটি অর্ধে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়,—তাহাতে ওই একটি পঙক্তির মধ্যেই সমধর্মী দুইটি ভাবের পুনরাবৃত্তি সূচিত হয়। এই ধরনের পুনরাবৃত্তিগুলির প্রধান বিশেষত্ব হইল,—ইহা গানের একটি পঙক্তির বা স্তবকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং সেই পঙক্তি গানের মধ্যে কখনই পুনরাবৃত্ত হয় না।"

এই শ্রেণীর পুনরাবৃত্তিকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করিয়া আলোচনা করিতে পারি।

১. সমভাবার্থক পুনরাবৃত্তি :

আর হায়রে টাকা, হায়রে পয়সা—সং ১৭। আড়িয়ে কান্দে, পড়িয়ে কান্দে, কান্দে সোদের ভাই—সং ২৭। আড়ীকালা, পাতিল কালা,—তাতে রান্ধি' খাই—সং ১০২। ফুলের শয্যা-বিছানায় লজ্জা দিলাম রে দূর—সং ১০৫। প্রাণ কান্দে মোর, ঝুরে গো—সং ১১৮। আনো তো কাটারী ছুরী—বুক চিরি' তোমায় দেখাই—সং ১৩০। সখি গো, প্রথম পিরিতি কইলাম-চুয়াচন্দন দিয়া—সং ১৩১। আর কান্দে কান্দে হাছন রাজায় প্রেমের হতাশ হইয়া—সং ১৪৬। আর পাগল করিলায় গৌর, ও গৌর, দেওয়ানা বানাইলে—সং ১৬০। চৌদিক দি' চৌকি-পা'রা—সং ১৬৭। আর তন ছুড়, মন ছুড়, ছুড় ঘর-বাসনি—সং ১৬৮। আর ভয় দেখি,' তরাস দেখি' নায়ে মাইলাম পাড়া—সং ১৮৬। জ্বইলে হইলাম ভস্ম-ছাই —সং ১৯৬। কোন্ রূপেতে কাফির-শয়তান—সং ২০৬। পাগল-মস্তান হইয়া দেশে দেশে ফিরে—সং ২১১। রাধার এ দুঃখ সময়ের কালেতে—সং ২৫৩। শোভা নাই, ছুরত নাই, কেমনে পাইমু তোরে—সং ২৫৫। চিকন গোয়ালিনি গো, রসের ময়লানি—সং ২৫৯। শূন্য ভরে উড় রে মনিয়া, গাছের বৃক্ষের ডালে—সং ২৬৫। গউর রে, হাটে যাও, বাজারে যাও, কিনিয়া আনবায় কি—সং ২৮৬। লাহুল দরিয়ার মাঝে রে ভাই, ও সাগরের মাঝে রে ভাই, আমার মন মজিয়াছে—সং ২৮৮। আমার মনেরি আনল ওরে, অন্তরে

আগুনির জ্বালা রে—সং ২৯০। বাড়াইয়া প্রেমেরি পিরিত তুমি না যাইয়ো ছাড়িয়া—সং ২৯৫। না জানি পিরিতের ভাও, না জানি তার কল—সং ২৯৫। যবুনারি তীরে-নীরে খেলা করে কানাই—সং ৩০৩। না দেখিলে প্রাণি মোর দহে কলেবর—সং ৩০৪। একে রাধা অল্পতরু, আর তো অবুলা—সং ৩০৭। নিমের গাছে নিমের জড়—সং ৩০৮। জঙ্গালে সে বইস, রে বন্ধু, জঙ্গালে সে যাইয়ো—সং ৩০৯। বিকটী কদম্বের ডালে পত্র সারি-সারি—সং ৩১৪। এক উঝায় নাড়ে-চাড়ে, আর উঝায় ঝাড়ে—সং ৩১৪। আর নিদয়া-নিষ্ঠুর রে বন্ধু—সং ৩২০। কেও বলে মেঘ-মেঘ, কেও বলে কালা—সং ৩২৫। নতুন ফুলের মালা, নতুন গাঁথুনি—সং ৩৪৬। বিনা দাঁড়ে, বিনা বৈঠায়, না জানি কোন কলে—সং ৩৫৩। বিন পেরাগে বিন পাতাসে খালি বেতের বান—সং ৩৫৩। এই না সময়ের কালে কি না কাম করিল—সং ৩৫৮। যাইন মনুওর অরিণী শিকারে, যাইন মহুওর মৃগ শিকারে—সং ৩৭১। না যাও মহুওর দূর দেশান্তর—না যাও মহুওর পর দেশান্তর—সং ৩৭১। সাজন মন্দির-ঘরে—সং ৩৭৪। বাক্যি-মন্ত্র কইয়া পুরইতে স্বর্য অর্ঘ্য দিলা—সং ৩৭৫। রুইলু রুইলু রে পান, পা'ড়ে আর পর্বতে পান—সং ৩৭৮।

২. বিপরীতার্থক পুনরাবৃত্তি :

সুদিন গেল, দুর্দিন আইল, রে পাষাণ মন—সং ২০। আর সোনার বান্ধাইল বাঁশী—রূপার বান্ধা কেনে হিয়া—সং ৯৪। আর আছমান কালা, জমিন কালা, কালা মাথার কেশ—সং ১০২। সার-সুয়া দুইটি পক্ষী রাখিয়াছি ধরিয়া—সং ১৫৩। ঘরখিনি ভাঙারুঙ্গা, দুয়ার কেনে বান্দ—সং ১৫৯। ঘড়ি ঘড়ি উঠে মনে কমি-বেশী নয়—সং ১৬৯। আর গৃহে পাগল, বাইরে পাগল, পাগল সর্বথায়—সং ১৭০। সোনাপুরে রূপ-কলসী তাড়াতাড়ি ভরো—সং ১৯৪। ঘরে বৈরী ননদিনী, পন্থে বৈরী শোভা—সং ২৫৫। দই বেচ' আনা আনা, দুধু বেচ' পণ—সং ২৫৯। সোনার পিঞ্জিরা মনিয়ার, রূপার টাঙ্গুইন—সং ২৬৫। সোনার খাটে বইছ রে মনিয়া, রূপার খাটে পাও—সং ২৬৫। আছমান কালা, জমিন কালা, কালা দুইটি আখি—সং ২৭৬। ডাইনে গঙ্গা, বামে যমুনা, মধ্যে বালুচর—সং ২৭৬। ভাইরে ভাই, উত্তর আল, দক্ষিণ আল, বাও উল্টা, বইঠা ভাঙা নাও—সং ২৮৮। মক্কায় তার দাঁড়ের কোড়া,—মদিনায় মাস্তুল—সং ২৯৩। সোনা না হয় রূপা গো

রাই, পিরিতি গলার মালা—সং ৩০১। কেও কালা, কেও গোরা একই ঘরে থাকি—সং ৩০৭। নাইওর রে, দুখের মন্দিরে সুখে নিদ্রা না যাইয়ো —সং ৩০৮। দুই নয়নে বহে গো ধারা গঙ্গা আর যমুনা—সং ৩১৩। ঘরখিনি বানাইয়া চান্দে বাইরে কইলা বাসা—সং ৩১৪। রূপ দেখিয়া হইয়াছ পাগল গুণের পাগল হইলায় না—সং ৩১৫। উত্তরে-দক্ষিণ ঘর—মাঝে পরীর শইয্যা ঘর—সং ৩৬৪। আরাইয়া তুকাইয়া কান্দইন সোনার বাজুবন্দ—বেলওয়া রূপার কাঙ্কণ—সং ৩৬৫। সোনার বাটায় ধান্য-দূর্বা, ইরার বাটায় লইয়া—সং ৩৭৪। আর জিতিল সে রাধিকা আরইন শ্যামরায়—সং ৩৭৭।

৩. সংখ্যাবাচক পুনরাবৃত্তি :

এগো, একসঙ্গে দুই অঙ্গ হইয়ে—রাইরূপে লুকাইয়া রই—সং ১৬১। একটি ফুলের তিনটি রসে আদম শহর—সং ২০৪। এক-দুইয়ে মিলন করি' ভবনদী যাবে তরি'—সং ২০৬। মায়ের চারি, বাপের চারি, আল্লার দেওয়া দশ—সং ২১০। একপাতা একফুল, তারে কয় সরফুল—সং ২৪১। আট আঙ্গুলা কোদালখিনি,—ষোল্ল আঙ্গুলা ডাঁটি—সং ২৮৬। চাইরি পাতা কালা ধলা বারো ডাল তার দেখতে ভালা—সং ২৮৭। লক্ষি হাজার গুণ তার একইটা মাস্তুল—সং ২৯৩। আর একটি নদীর দুইটি ধারা বাইতে পাইলায় না—সং ৩১৫। এক মিলে এক আসনে, সই, এক আসনে দুই জনে —স্নান করাবো রাধা-কানাই একসনে—সং ৩৭৪॥

যে শৃঙ্খলা সমস্ত গান জুড়িয়া, যে শৃঙ্খলা একটি বিশেষ পঙক্তি বা স্তবকের মধ্যে সমার্থক, বিপরীতার্থক ও সংখ্যাবাচক পুনরাবৃত্তিতে,— সেই একই শৃঙ্খলা বিচিত্রতর ভঙ্গিতে একটি মাত্র পঙক্তি বা স্তবকের মধ্যে লক্ষ্য করা যাইতে পারে। এই ধরনের শৃঙ্খলাগুলি সমভাবার্থক, বিপরীতার্থক বা সংখ্যাবাচক নহে,—কিন্তু উহাদেরই প্রসারিত আর একটি রূপ মাত্র। এখানে শৃঙ্খলা বোধটি আরো সূক্ষ্ম ও বিচিত্র এবং জটিল। মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে—ভাব ও পরিবেশ ঘিরিয়া এই ধরনের শৃঙ্খলা স্ফুট হইয়াছে।

নিম্নে তাহার দৃষ্টান্ত সঙ্কলিত হইল :

আর এ পারে সে পারে নদী—সং ১। আর মাটির বান্ধা দালান-কুঠি, প্রেমের বান্ধা হিয়া—সং ২৫। কেও কাটে ঝাড়ের বাঁশ, কেও পাকায় দড়ি—সং ২৬। একূল-ওকূল সে কূল গেল—সং ৩১। হুবে কইল বন্দী মোরে, লোভে কইল তল—সং ৩৪। ডাইল দিলাম, চাউল দিলাম, সাধু রে, আরো দিলাম ঘি—সং ৪৫। আর কাঞ্চা বাঁশের বাঁশীগুলি তালোয়ার বাঁশের আগা—সং ৯৭। না খায় অন্ন, না খায় জল, নাহি বান্ধে কেশ—সং ১১৯। ধন দিলাম, প্রাণ দিলাম, কূল দিলাম, তোর লাগি'—সং ১৫১। আর সর্প হইয়া কামড় মারে রে—ও গৌর, উঝা হইয়া ঝাড়ে—সং ১৬০। আঙ্খি দিলাম রূপদর্শনে কর্ণ দিলাম নাম শুনি'। এগো, রূপ দিলাম তার অঙ্গের বদল—প্রাণ দিলাম তার নিশানি—সং ১৬৮। ভালা কইলে মন্দ বুঝে, দিলে ভাবে গালি—করলে মানা করে দুনা, হাতে দেয় তালি—সং ১৭০। আর এস্কে আল্লা, এস্কে রছুল, এস্কে আদম খাকি; আদম হইতে হাওয়া পয়দা প্রেম-খেলার লাগি'—সং ১৭৫। আর স্বামীর মাঝে নারীর বেসাত, নারীর মাঝে স্বামী। তোমার মাঝে আমি মুরশিদ, আমার মাঝে তুমি—সং ১৮৩। ভাঙা নাও, পান্থয়া বইঠা, কেমনে বাইয়া যাই—সং ১৮৪। জলের প্রেমিক মীন হইল —ভাসিয়া বেড়ায়। স্থলের প্রেমিক মজনু হইল, কান্দিয়া বেড়ায়—সং ১৮৮। কোন্ রূপেতে হয় কোরান কোন্ রূপেতে হয় মুমিন—কোন্ রূপেতে কাফের-শয়তান। কোন্ রূপেতে আশিক-মাশুক বসিয়া করে খেলা—সং ২০৬। মায়ের চারি, বাপের চারি, আল্লার দেওয়া দশ—সং ২১০। ছাড়ো আশা ছাড়ো বাসা, ছাড়ো অঙ্গের আশ—সং ২২৩। বাপ নাই, মাও নাই, নাই সোদের ভাই—সং ২৪৪। কিনা বুলি বুললে রে বাছা কিনা লইল মনে—সং ২৬৪। আল্লায় দিলা ডাইল-চাউল, মুরশিদে দিলা কড়ি। সমদ্রের পারে নিয়া বসাইলা খিঁচুড়ি—সং ২৬৪। তোমার বাড়ী সোনার মন্দির রে বন্ধু, আমার ভাঙা ঘর—সং ২৬৬। বন্ধু রে, তুমি আমার—আমি তোর—সং ২৭০। তুমি রইলে কই, ওবা' বন্ধু মুই রইলাম কই—সং ২৭৩। ঠগের আশা, ঠগের বাসা, ঠগের গৃহবাস; ঠগ দি' বানাইছইন আল্লায় সয়াল সংসার রে—সং ২৮৫। মাও মইলা, বাপ মইলা, মইলা সোদের ভাই—সং ২৮৬। আট আঙ্গুলা কোদালখানি—ষোল্ল আঙ্গুলা ডাঁটি—সং ২৮৬। আর

তনু ঝুরে, মন রে ঝুরে, আল্লা, ঝুরে দুইটি আঙ্খি—সং ২৯০। ওরে নাও আছে খেওয়ানী নাই আপন কর্ম-দোইষে—সং ২৯৪। আর শিশুকালে কইলে রে বন্ধু আমারে পিয়ার; হায়রে, যুবাকালে ভিন্নবাসো কি দোষ আমার রে—সং ২৯৭। আর ছয় না বচ্ছরের কালে বাপে দানে দিল বিয়া; এগো, বারো না বচ্ছরের কালে স্বামী গেল মারা—সং ৩০০। হাসি না হয়, রসি না হয় বিজুলিয়ার ছাটা—সং ৩০৩। শাশুড়ী ননদী বা কানাই, আর নিজ পতি—সং ৩০৩। শিশুকালে সুস্বামীর ঘর যৈবত কালে রাঁড়ী—সং ৩১১। না কইলু সুস্বামীর সেবা রে, না লইনু ছায়া—সং ৩১১। আর নয়ন দুইটি রত্নভরা তোমার চরণ দুটি রথের ঘোড়া;— তোমার হস্ত দুইটি গুরুর সেবা দাও— সং ৩১৬। নদীর উইঠব ঢেউ, ছুইটব নালা, সর্বস্বধন নিব সোতে—সং ৩২১। মাইয়া ভজন মাইয়া সাধন,— মাইয়ার প্রেমে যে জন মজে : মাইয়া ভজলে ছয়গুণ, নইলে নয়গুণ, আটচল্লিশ গুণ মাইয়ার কাছে—সং ৩২১। আতে ধড়া মাথে চূড়া, গলে ফুলের মালা— সং ৩২৫। শ্যাম না পাইলাম, কূল হারাইলাম, নাম রইল সই কলঙ্কিনী—সং ৩৩৩। এ কূল গেল, সে কূল গেল,—দুই কূল গেল —সং ৩৩৩। আইস বন্ধু, বইস কাছে, খাওরে বাটার পান। ওরে হাসি-মুখে কওরে কথা, জুড়াউক পরান—সং ৩৪৬। কেওরের পিরিত আইসা-যাওয়া, কেওরের পিরিত নিতি। ওয়রে কেওরের পিরিত সোনারূপা, কেও কিনিয়া দেয় ধুতি—সং ৩৪৭। আনো চাই বাবাজীর কিতাব—পড়িয়া দেখি আমি। আনো চাই চাচাজীর কিতাব—পড়িয়া দেখি আমি—সং ৩৬২। উড়ফুল, মালন্তী ফুল ফুটে নানান ডালে—সং ৩৬৭। এক পাক, দুইয়ো পাক, তিনো পাক দিয়া—চারি পাকের কালে পুরইতে ঝারির জল উড়াইলা —সং ৩৭৫। দশ দশ করিয়া পাশা চালইন শ্যামরায়। বিশ বিশ করিয়া পাশা দেখ, তুলইন রাধিকায়—সং ৩৭৭।

লোকসঙ্গীত ও সাহিত্যের রচনারীতির মধ্যে শৃঙ্খলা বোধ ও পুনরাবৃত্তি কতো বিচিত্র এবং গভীর প্রভাব ফেলিয়াছে—উপরে বিভিন্ন দিক হইতে আমরা তাহার স-দৃষ্টান্ত আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ইহা হইতে সহজেই আমরা একটি সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছাইতে পারি : রচনারীতির এই বিশেষত্বের মধ্যে লোকমানসেরই বিশিষ্ট একটি প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়—

লোকজীবনই এই প্রকার রচনারীতিকে আপনার অজ্ঞাতে অনুসরণ করিয়া চলে। লোকজীবনের মধ্যে আবহমান কালচলিত বৈচিত্র্যহীন রীতি-নীতির প্রতি যে অদ্বিধমানসের কুণ্ঠাহীন স্বীকৃতি ও অনুস্মৃতি লক্ষ্য করা যায়—জীবনের প্রতিটি বৈষম্য ও অসামঞ্জস্যের মধ্যে তাহাদের নিজস্ব জীবন-চেতনা এবং রসবোধ দিয়া যে সঙ্গতি ও সুষমাকে সর্বদা ও সর্বত্র তাহারা খুঁজিয়া বেড়ায়—সেই প্রবৃত্তিই তাহাদের সাহিত্যধারার মধ্যে কাজ করিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস ॥

....গ

লোকসঙ্গীত ও সাহিত্যের বর্ণনাভঙ্গির মধ্যেও কয়েকটি বিশেষত্ব রহিয়াছে, যেগুলি রচনাভঙ্গিরই অপর আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক। বর্ণনাভঙ্গির এই বিশেষত্ব অধিকাংশ স্থলেই ক্রিয়াপদ ও ক্রিয়াবিশেষণকে অবলম্বন করিয়া প্রতিফলিত হইয়াছে। বিশেষ্য ও বিশেষণকে ভিত্তি করিয়াও বর্ণনাভঙ্গির এই বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়।

মার্জিত সাহিত্য ও সঙ্গীতের মধ্যে যে সকল উক্তি ও প্রত্যুক্তি, কথা ও কাজ, দৃশ্য ও ভাবানুষঙ্গ, চলন এবং ভঙ্গিমা হয় উহ্য রহিয়া যায়, কিংবা অনাবশ্যক বোধে অনুক্ত থাকে অথবা, অশোভন ও অ-রসময় বলিয়া পরিত্যক্ত হয়,—লোকসঙ্গীতের বর্ণনাভঙ্গির এমনই বিশেষত্ব যে, সেই সকল তুচ্ছ, অনাবশ্যক ও অ-রসময় অংশকেও গানের মধ্যে পরম আন্তরিকতায় স্থান করিয়া দেওয়া হয়। এখানেও লোকমানসের বিশিষ্ট জীবন-চেতনা ও রসবোধ কার্যকরী হইয়াছে। নিম্নে তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল :

সখি গো, প্রথম পিরিতি কইলাম চুয়া-চন্দন দিয়া—সং ১৩১। মাথার কেশ দু ফাঁক করি' রাখিতাম বান্ধিয়া গো—সং ১৫৬। আর কোন্ সাপে মাইল কামড় রে, ও গৌর, সর্ব অঙ্গ জারে—সং ১৬০। উঁচ্চা করি' বান্ধতু খোঁপা, বেড়াইতাম গোকুল—সং ১৬১। কাঙ্খের কলস ভূমিত থইয়া তোমার বানে চাইয়া রই—সং ১৬১। জল ভরিতে গেলা রাধে সোনার নেপূর রাঙা পায়—সং ১৬৪। এগো, মাতিয়া বিনষ্ট দিল ফাত্‌রামি করিয়া—সং ১৭০। আপন জানি কইলাম পিরিত—বন্ধে ভিন্ন বাসে—সং ১৭৩। সোনাপুরে রূপ-কলসী তাড়াতাড়ি ভরো—সং ১৭৪। কোন্ রূপেতে

আশিক-মাশুক বসিয়া করে খেলা—সং ২০৬। বিনা কড়িয়ে অমূল্যধন করে বেচাকিনি—সং ২৩২। হস্তে চাও নজর করিয়া—সং ২৪৩। আপনে মরিয়া যাইতায়, পরার লাগি' কান্দো রে—সং ২৪৭। ঘরতনে বারইয়া গেলে খাওয়ায় বাটার পান—সং ২৪৭। আউলাইয়া মাথার কেশ খোঁপা নাই সে বান্ধে— সং ২৫১। দারুণ আখ্খির জলে আমার ঝিল্‌মিল্ করিয়া যায়— সং ২৫২। হস্ত দিয়া চাও ওগো সখি—সং ২৫৪। তোমার পিরিতে রে বন্ধু তনু হইল মোর ক্ষীণ—সং ২৫৫। তোমার বাঁশীর সুরে ভাটিয়ল নদী উজান ধরে রে— সং ২৫৬। শূন্য ভরে উড়'রে মনিয়া—সং ২৬৫। তোমার বাড়ী সোনার মন্দির—সং ২৬৫। নগরে চলিলাম বা' মুরশিদ তাল্লাস করিয়া—সং ২৬৬। আর অতি না যৈবনের কালে—সং ২৭২। পত্র ফাড়ি' রইদ লাগে আপন কর্ম দোইষে—সং ২৭৬। মোর বাড়ী যাইতে বন্ধু রে, ও বন্ধু, খালায় নালায় পানি—সং ২৮০। আর পইচমে তনে আইল হকির সোনার খড়ম পায়—২৮৯। ভাঙা নায়ের ভাঙা বইঠা, তরাসে ঢালো পানি—সং ২৯২। আর আন্ধারিয়া ঘরের মাঝে চউখে নাই সে দেখি—সং ২৯৩। অল্প বয়সের পিরিতখানি ও তুমি রাখিয়ো বহাল—সং ২৯৫। যে বেলায় করিয়াছিলায় পিরিত তুমি আর আমি—সং ৩১৩। যখনে পিরিত কইলায় চালের কোণায় ধরি'—সং ৩১৩। বিকটী কদম্বের ডালে পত্র সারি সারি—সং ৩১৪। যাইতে যমুনার জলে হস্তে লইয়া ঝারি—সং ৩১৪। আর জ্বালাইয়া মোমেরি গো বাতি নিশি গেল পোসাইয়া—সং ৩২০। নতুন ফুলের মালা, নতুন গাঁথুনি —সং ৩৪৬। আর মধু ছাড়া কমল পুষ্প, রে বন্ধু, ভমরায় বাসে ভিন—সং ৩৪৮। হাত বাড়াইয়া গুয়া দিতে দেখল কপাল-পোড়া গো —সং ৩৫২। মনপবন কাষ্ঠের নাও সারি-সারি গুড়া—সং ৩৩৫। সাড়ী যে পইরাইয়া কইনায় আয়না দিয়া চায়—সং ৩৫৮। কিতাব পড়িয়া কইনায় কান্দইন জারে-জারে—সং ৩৬২। ঘরতন বারইতে পরী—আবে ধরে ছায়া না রে সই—সং ৩৬৪। তার শেষে পিন্দিলা সাড়ী নামে বাঙ্গইন-বিচি না রে সই—সং ৩৬৪। আরাইয়া তুকাইয়া কান্দইন সোনার বাজুবন্দ—বেলওয়া রূপার কাঙ্কণ— সং ৩৬৫। আমি দিমু কোমরের সাড়ী—সং ৩৬৫। সোনার কুটা আতে বা' দামান্দ যাইনি ফুলের তলে—সং ৩৬৭। ডালাইন গাছে এলাইন দিয়া, সুন্দরী বইছইন জোড়

আত করিয়া—বত্তিশডালে শুকাইন মাথার কেশ—সং ৩৭১। কালা না কালিন্দীর জল— আনিলা ভরিয়া—সং ৩৭৪ ॥

....৬

লোকসঙ্গীতের রচনারীতির মধ্যে অপর দুই উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল (১) অর্থহীন পদ বা পদসমষ্টি দিয়া পঙক্তির পাদ-পূরণ (২) একই গানের মধ্যে প্রশ্ন-উত্তরের ভঙ্গিকে গ্রহণ।

লোকমানসে ছন্দ, সুর ও তালের মূল্য অসীম—অর্থকেই তাহারা সর্বদা বড়ো করিয়া তুলে না। একটি বিশেষ ভাবকে পরিস্ফুট করিবার জন্য সেই মূল ও প্রয়োজনীয় ভাবটির অনুষঙ্গ হিসাবে অনেক সময় সমান ছন্দের আর একটি অনাবশ্যক ও অর্থহীন পদ, পদসমষ্টি বা পঙক্তিকে রচনা করা হয়। ব্যাকরণের দৃষ্টি দিয়া বিচার করিতে বসিলে হয়তো দুইয়ের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য থাকে না—কিন্তু, সেই পদ, পদসমষ্টি বা পঙক্তিটি অর্থের দিক দিয়া না হউক, ছন্দের দিক দিয়া মূল ভাবটির মধ্যে একটি সুরগত সুষমা ও পরিবেশগত পূর্ণতা আনয়ন করিয়া থাকে—যাহা লোকমানসকে দোলা দেয়। লোকসঙ্গীতের রচনাভঙ্গির মধ্যে এই রীতিটি একটি উল্লেখযোগ্য রীতি।

বিশ্লেষণ করিয়া ব্যাপারটিকে স্পষ্টতর করা যাইতে পারে। যেমন,

আম ধরে ঝোপা রে ঝোপা
তেঁতই ধরে বেঁকা ;
দেশের বন্ধু বিদেশ যাইতে
আর না হইব দেখা রে ॥ —সং ২৭৯

এই স্তবকটির প্রথম পঙক্তির নিজস্ব একটি অর্থ আছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু দ্বিতীয় পঙক্তিটির সহিত মিলাইয়া পড়িলে স্বভাবতঃই প্রথম পঙক্তিটিকে নিরর্থক বলিয়া মনে হয়। ইহাই লোকসঙ্গীতের এক বিশিষ্ট রচনারীতি। মূল বক্তব্য দ্বিতীয় পঙক্তিতেই আছে বটে,—কিন্তু প্রথম পঙক্তিটির অর্থহীন ধ্বনি সমষ্টি ও সমান ওজনের ছন্দটি উহার পরিবেশসহ ভাবটিকে পরিস্ফুট করিতে সাহায্য করিয়াছে।

কিংবা অপর আর একটি দৃষ্টান্তে,

কদম্ব ডালে থাকো কানাই
কদম্বের তুড় আগা;
শিশুকালে কইলায় পিরিত—
যুবতকালে দাগা ॥—সং ৩২৭

এই স্তবকেও মূল বক্তব্য দ্বিতীয় পঙক্তিতেই আবদ্ধ আছে এবং প্রথম পঙক্তিটির নিজস্ব একটি অর্থ থাকিলেও দ্বিতীয় পঙক্তির সহিত তাহা কোনো প্রকার সঙ্গতি-সূত্রে গাঁথা নহে। কিন্তু, এখানেও এই নিরর্থক পদসমষ্টিই প্রয়োজনীয় ভাবটিকে লোকসাহিত্যের নিজস্ব ভঙ্গিতে সার্থক রূপে প্রকাশিত হইতে সহায়তা করিয়াছে—ইহাও স্বীকার করিতে হইবে।

শুধুমাত্র একটি স্তবকের অন্তর্গত কোনো পঙক্তির মধ্যেই যে নিরর্থক পদ-সমষ্টিকে জুড়িয়া দিবার প্রবণতা লোকসঙ্গীতের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, তাহা নহে ; অনেক সময় এই প্রবণতা কোনো একটি মাত্র পঙ্‌ক্তির বা বাক্যের একটি অর্ধের মধ্যেও সঞ্চারিত হইয়া থাকে। সেই সকল স্থলে নিরর্থক ধ্বনি 'পদসমষ্টি' না হইয়া কেবল একটি মাত্র নিরর্থক পদ হইয়া থাকে। নিম্নে তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছি :

আড়িয়ে কান্দে, পড়িয়ে কান্দে কান্দে সোদের ভাই— সং ২৭। আল্লা রইছইন আলে রে ভাই, রছুন রইছইন কলে—সং ৬৭। ধনি গো, এগেনা-বেগেনা ধনী,—পর কি আপন—সং ১১০। স্বদেশী বিদেশীর সনে বিদেশে পড়িয়া গো রই—সং ১৩০। আর আনভুলা রাধা রে মোর মনভুলা কানু—সং ১৯১। আর রাখালেরই গোরু গো রাখা অনে আর বনে—সং ২৬০। অন্‌চল-পিন্‌চল ঘাট—সং ৩০৬।

"একই গানের মধ্যে উক্তি-প্রত্যুক্তি-মূলক সংলাপের ব্যবহার লোক-সঙ্গীতের অপর এক উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব। বহুগানেই দেখা যায়, উহার এক অংশ প্রশ্ন এবং অপর অংশ তাহার উত্তর। একই গানের মধ্যে প্রশ্ন ও উত্তর সঙ্কলিত করিবার প্রবণতা আদিম সমাজ-জীবনের এক বিশিষ্ট দিককে তুলিয়া ধরে। আদিম সমাজে মানুষের ব্যক্তিগত দিক অপেক্ষা সমষ্টিগত দিকটাই প্রধান ছিল। একই গানের মধ্যে তুইজনের বক্তব্য ধরিয়া রাখিবার মধ্যে ব্যক্তি-ধর্ম অপেক্ষা সমষ্টি-ধর্মটিই মুখ্য হইয়া উঠে। তাহা ছাড়া, মানুষের একক কণ্ঠের গান অনেকটা আধুনিক ব্যাপার। সমবেত

বা দ্বৈতকণ্ঠের গানই আদিম গান। উক্তি-প্রত্যুক্তি-মূলক গানের মধ্যে সেই আদিমতার ইঙ্গিত খুঁজিয়া পাই।"

প্রস্তুত সঙ্কলনের নিম্নলিখিত গানগুলির মধ্যে এইরূপ প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গি গৃহীত হইয়াছে : সং ২৬০, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬২ (প্রথম স্তবক), ৩৬৫, ৩৭০, ৩৭২।

লোকসঙ্গীতের 'রস' বস্তুটি এমন যে—একটি গানকে প্রশ্ন ও উত্তররূপে ভাগ করিলেও উহার অখণ্ডত্বের কিছু হানি হয় না। তাহা ছাড়া, যে গায়ক বা গায়িকা গানের প্রশ্ন-অংশ গাহেন, তিনিই উহার উত্তরাংশও গাহিয়া থাকেন ॥

....৭

কতকগুলি ব্যাকরণগত বিশেষত্বও লোকসঙ্গীতের রচনাগত বিশেষত্বকে নির্দেশ করিয়া থাকে। অবশ্য এই বিশেষত্ব নির্বিশেষভাবে সকল দেশের বা বাঙলা দেশের সকল অঞ্চল সম্পর্কে প্রযোজ্য নহে—ইহা অঞ্চলে-অঞ্চলে, দেশে-দেশে ভিন্ন হইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বাঙলা দেশেরই বিভিন্ন অঞ্চলের লোক-সঙ্গীতের রচনাভঙ্গির মধ্যে ব্যাকরণগত বিশেষত্বের ভিন্নতা লক্ষিত হইয়া থাকে। উপভাষা ও বিভাষার ভিন্নতাই ইহার কারণ।

শ্রীহট্ট জেলা হইতে প্রাপ্ত সঙ্গীতগুলি লক্ষ্য করিয়া উহাদের যে সকল ব্যাকরণগত বিশেষত্বকে আমাদের নিকট সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের লোকসঙ্গীতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য বলিয়া মনে হইয়াছে, নীচে সে গুলির উল্লেখ করিলাম। প্রসঙ্গতঃ আর একটি কথাও মনে রাখা দরকার। ব্যাকরণগত যে বিশেষত্ব 'কাব্যিক বিশেষত্ব' হইতে পারে, তাহাই আবার লোকসঙ্গীতেরও বৈশিষ্ট্য হইতে পারে। এই জন্য নিম্নলিখিত তালিকাটির সহিত 'ভাষা-পরিচয়'-এর 'কাব্য-ভাষা' অংশটিও পঠিতব্য :

১. স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনির (বিশেষ্য ও বিশেষণ পদে) কাব্যিক বিকৃতি ;

২. কৃৎ ও তদ্ধিত-প্রত্যয়ের কাব্যিক ব্যবহার ;

৩. শব্দ দ্বৈত ও অনুকার ধ্বনির বিচিত্র ও ব্যাপক ব্যবহার ;

৪. পদাশ্রিত নির্দেশকরূপে-গুলি-(টি),-খিনি-(খানি),-গেছি-(গাছি) প্রভৃতির ব্যবহার ;

৫. দ্বিতীয়া বিভক্তির অর্থ জ্ঞাপন করিতে ষষ্ঠী বিভক্তির এবং ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থ জ্ঞাপন করিতে দ্বিতীয়া বিভক্তির ব্যবহার; ষষ্ঠী বিভক্তির স্বার্থিক প্রয়োগ ;

৬. সম্বোধন পদরূপে -বা'-, -অবা'-, -আল-, -এগো-, -ওবা'-, -অয়রে- -দ-', - নি-', -বা'-, -বাবই-, -ল-, -হ- ইত্যাদির ব্যবহার ;

৭. কয়েকটি অনুসর্গের কাব্যিক প্রয়োগ ;

৮. বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণের ব্যাপক ও বিচিত্র প্রয়োগ ;

৯. অসমাপিকা ক্রিয়া ও নিমিত্তার্থক অসমাপিকা ক্রিয়ার কাব্যিক ব্যবহার ;

১০. অব্যয়রূপে -আর -, -ওউ-, -কি-, -কিনা-, -কিবার-, -গো-, -নি-, -মু-, -সে-, -মোর-, -তোর- প্রভৃতির প্রয়োগ :

১১. বিশিষ্ট কাব্যিক বাগ্‌ধারার প্রয়োগ :

১২. প্রসারিত ও আগত নতুন অর্থে শব্দের ব্যবহার।

উদাহরণের জন্য 'ভাষা-পরিচয়'-এর সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদগুলি দ্রষ্টব্য ॥

....৮

উপমাও লোকসঙ্গীতের রচনাভঙ্গীর নির্দেশক। উপমার মূল কথা হইল সাদৃশ্য বোধ। এই সাদৃশ্য বোধ যে কবির যতো তীব্র, সূক্ষ্ম, প্রত্যক্ষ ও ব্যাপক তাঁহার উপমার মধ্যে ততো বৈচিত্র্য লক্ষিত হইবে। লোকসঙ্গীতের মধ্যে যে সকল উপমা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা লোকজীবনেরই অনুগামী। মার্জিত সাহিত্যের উপমার সূক্ষ্মতা ও তীব্রতা ইহাতে নাই। ইহার ব্যঞ্জনা একান্ত ভাবেই ইহার নিজস্ব। এই সমস্ত উপমার মধ্যে লোকজীবন, মানস ও রসদৃষ্টির প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। অধিকাংশ উপমাই হয় নিসর্গ জগৎ হইতে আহৃত নতুবা দৈনন্দিন জীবনের পরিবেশ ও অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করিয়া রচিত। নীচে তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল :

ওরে মন-চাষা, তোর ক্ষেতে দেওরে চাষ—সং ২০। মন-মাতঙ্গ সদায় ঘুরে—সং ৩০। আমারে ভাসাইলায় গৈয়ুর সুখছাড়া প্রেম-সায়রে—সং ৭৮। গৌর বিচ্ছেদে প্রেমের এতোই জ্বালা গো নিবাও গো জল-চন্দন দিয়া —সং ৭৯। এগো, পড়িয়াছি সঙ্কট-সায়রে—সং ৮৬। আর প্রেম-ছাটা বড়ো ছাটা

লাগলে উঠে না—সং ৮৭। আমার বন্ধু পরশমণি—কতো লোহা মানায় সোনা—সং ১২৬। কি দাগ লাগাইলে গো সখি প্রেম-কালি দিয়া—সং ১৩১। সহজ পিরিতি সিংহের দুধ—সং ১৩৯। রাধা অইল গঙ্গার মতো—আমি ভাসলাম শেওলার স্রোতে—সং ১৪১। মন-গাড়ী সওয়ার হইয়া আইলাম ঢাকার শ'র বেড়াইয়া—সং ১৪৫। দুই নয়নের জল দিয়া বানাই-লাম ছিয়াইকালি—সং ১৪৭। মন-মইনা—সং ১৫৭। পিরিতে বাবুলের কাঁটা বিন্ধিয়াছে হৃদয়—সং ১৬৯। মাশুকের হুকুমের জিঞ্জিরা আশিকের ফুলের হার—সং ১৭২। এস্কের কার্তুশ—সং ১৭৩। আশায়-আশায় দিন গেল হেলে—সং ১৮০। হৃদয়ের কাছারি— সং ১৮১। দিল-দূরবীণের আয়না ধরি' রাখিয়ো নজর—সং ২৮৩। মন-বানিয়া—সং ২০২। মন-কানাইয়ে বাজায় বাঁশী জঙ্গলের ভিতর—সং ২০৪। ছোটকালের পিরিত ওরে ভাই মিঠা যেমন পানি—সং ২২৪। এস্কের লাগাম বিনে ছওয়ার মানে না—সং ২৩০। মনেরি আনল দিয়া দুই বাত্তি জ্বালাইয়ো—সং ২৩৯। দিবারাত্র এই ভাবনা মন-সায়রে ভাসে—সং ২৫০। এগো, আশার দ্বার বন্ধ করি' লইয়া গেল ছুড়ানি— সং ২৫০। এই রূপ-যৌবন গো তোমার জোয়ারের পানি—সং ২৫৯। গহীনেতে আইসে যায় না দেখি নয়ানে—সং ২৬৭। মনে লয়, পরানের বন্ধুরে গলায় গাঁথিয়া রাখি—সং ৩০৩। বিজুলি চটকের মতন গৌরচান্দ দেখা দিয়া লুকাইলে—সং ৩২৩। মৃত্যুকালে দিয়ো চরণ-তরী—সং ৩২৪। এগো কাঞ্চা সোনা ঝিল্‌মিল্‌ ঝিল্‌মিল্‌— ও সই, চান্দ বটে কি মানুষ বটে—সং ৩২৭। আখির ঠারে শ্যাম-নাগরে দিত চায় ফুলের মালা—সং ৩২৮। গোপনেতে পিরিত করা—আয়ু থাকতে প্রাণে সই গো, ওই প্রেমে মরা—সং ৩৩৫। আর তুমি হও কল্পতরু।আমি হই লতা। ওয়রে, দুই চরণে বান্ধিয়া রাখমু—ছাড়িয়া যাইবায় কোথা—সং ৩৩৮। দুই চরণ বান্ধিয়া রাখতাম দিয়া প্রেম-ডোর—সং ৩৪৫॥

দ্বাদশ অধ্যায়

॥ ভাষা-পরিচয় ॥

১. উপক্রমণিকা :

প্রস্তুত গ্রন্থে সঙ্কলিত গানগুলির মধ্যে শ্রীহট্ট জেলার উপভাষা লক্ষ্য করা যাইবে। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা গানগুলির ভাষার সামান্য পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব। এই পরিচয় বর্ণনামূলক ; আমরা শ্রীহট্টের উপভাষার তুলনামূলক আলোচনা করি নাই কিংবা শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করিতে প্রয়াস পাই নাই। প্রসঙ্গতঃ আরো দুইটি কথা বিশেষ ভাবে মনে করিয়া রাখা দরকার। প্রথমতঃ, আমরা শ্রীহট্টের উপভাষার সকল দিক লইয়া আলোচনা করিব না,—কেবল গানে প্রতিফলিত অংশটুকুরই পরিচয় দিব ; দ্বিতীয়তঃ, সাধু ও চলিত বাঙলা ভাষার সহিত ইহার পার্থক্যটুকুই কেবল লক্ষ্য করিব। তাহা ছাড়া, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ এবং করিমগঞ্জের ভাষার তফাতও আলাদা করিয়া লক্ষ্য করি নাই।

ধ্বনিতত্ত্ব এবং রূপতত্ত্ব—এই দুই দিক হইতেই এই আলোচনা করা হইতেছে।

জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ারসন শ্রীহট্টের উপভাষা সম্পর্কে একদা সামান্য আলোচনা করিয়াছিলেন ; আমাদের আলোচনা আরম্ভ করিবার পূর্বে সেই আলোচনাকে স্মরণ করা দরকার।

পূর্ববঙ্গের মৈমনসিংহ জেলা শ্রীহট্ট জেলার সন্নিহিত এবং শ্রীহট্টের কোনো কোনো অংশের উপভাষা তাই মৈমনসিংহের উপভাষার সহিত সাদৃশ্য রক্ষা করিয়াছে।

"In the west and south of this District, (অর্থাৎ শ্রীহট্ট) especially in Sunāmganj and Habiganj, the language closely resembles that of Mymensingh".

"In North-East and North Sylhet, especially in Jaintiāpur and Karimganj, the language is more corrupt. Sylhet town, which is the head-quarters of the District, being within six miles

of the Jaintiāpur Pargana, lies within the area in which this dialect is spoken, and hence this form of speech is called Sylhettia by Europeans. For this reason it is often wrongly said that the language of the whole Sylhet District is uniform, and the term Sylhettia is incorrectly applied to the dialect of the west of the District, as well as to that of the North-East. The term 'Sylhettia' properly means the language of the town, and not of the District, of Sylhet...১ "

শ্রীহট্ট শহর এবং এই জেলার উত্তর ও উত্তর-পূর্বাংশের ভাষা ইউরোপীয়-গণের নিকট 'সিলেটিয়া' আখ্যা পাইয়াছে। "Natives do not use this title. They call it Jaintiapurī, Pūrba Srīhattiyā, or Ujāniā. The latter means the language of the upper country.২ "

গ্রীয়ারসন শ্রীহট্টের উপভাষার উচ্চারণ ও বানানগত প্রাথমিক বিশেষত্বের দুই-একটি লক্ষ্য করিয়াছেন।

"There are some peculiarities of pronunciation which tend to render it unintelligible to strangers. The inflections also differ from those of regular Bengali, and in one or two instances assimilate to those of Assamese."

"The vowel *a* is sometimes pronounced as in 'ball', and is then transliterated *â*. This is most noticeable when the vowel is followed by a liquid, as in *mānushâr*, of a man ; *nâl*, a rod ; *mān* a maund, *ghâr*, a house. *Ē* is always pronounced correctly and never as the *ă* in hat. As regards consonants, the first point that strikes one is the guttural pronunciation of ক k, like the German *ch.** Then চ *ch* is pronounced like English *s*, and there is no difference between চ *ch* and ছ *chh*. Thirdly প *p* is frequently pronounced like ফ *ph* (not *f* but perhaps *pf*)...Thus *pāp*, sin, does not become *phāph*. In fact, very little distinction is heard between any of the aspirated letters and their unaspirated originals, thus ঘর *ghâr* is almost pronounced *gâr*, and ভারী *bhārī* very much like *bārī*. Sometimes *p* has the sound of *w*, as *supārī*,pronounced *suwārī*.

The sibilant is often, but not invariably, changed to *h*. Thus

১ *Linguistic Survey of India*, Vol. V., Part I (1903), P. 221

২ *Ibid*, P. 224

* This also occurs in South-Eastern Bengali.

hāph for *sāp*, a snake; *hakal* for *sakal*, all. In words borrowed from Hindūstāni (which are common), the *s*-sound is usually preserved. Thus *Sārkar* (not *harkār*) Government ; *sazā*, punishment; *sakht*, hard; *sāmhnē*, before; *samjhite*, to understand. The letter *h* is often dropped, thus *'āti* for *hāti*, an elephant ; *Ka'itam* for *Kahitam*, I said ; so, even, *'atgāõ*, seven villages, for *hāt gāõ*, which is itself for *sāt gāõ*. In Eastern Sylhet (as distinct from the western sub-dialect) *j* is not pronounced as *z*. On the contrary the *z* of Hindūstanī wards is pronounced as *j*. Thus *jamīn*, land, for *zamīn*. The distinction between cerebral and dental consonants has almost (but not quite) vanished. Educated natives can sometimes distinguish between *āṭh-gāõ*, eight villages, and *'at-gāõ*, but not easily..."

"The *Umlaut*, or epenthesis, is noticeable in Sylhettia. A coming '*i*' (*ee*) sound influences a present vowel, if there is a consonant between ; e. g., কন্যা *kanā* (y) is sounded *kainā* (y), কাল (কালি) *kāl* (*kāli*) is pronounced *kāil*. Similarly, চার (চারি) *chār* (*chāri*) is চাইর *sair*, রাত (Standard Bengali রাত্রি *rātri*) is *rāit*, and so on. This influence is even felt by an antecedent উ *u* sound, as in ঘুরিও *ghuriō*, which is plainly *ghuiriō* on a Sylhettia's tongue."[১]

শ্রীহট্টের ভাষার প্রসঙ্গে ছাপার হরফের কথাও উঠিয়া পড়ে। একদা শ্রীহট্টের মুসলমানগণ এক বিশেষ রকমের হরফে বই ছাপাইতেন—বাঙলা হরফের চেয়ে উহাই তাঁহাদের নিকট সহজবোধ্য বলিয়া মনে হইত।
"The Devnagari character is used amongst low cast Mahammadans, especially in the east of the district. They find it easier to master than Bengali, and Bengali books are printed in this character for their benefit.[২] "

এই বিশেষ রকমের হরফকে 'সিলেটী নাগরী' বলা হইয়াছে। 'সিলেটী নাগরী'র ইতিকাহিনী পূর্বেই ব্যক্ত করিয়াছি॥

১ *Ibid*, PP. 224-225

২ *Assam District Gazetteers*, 1905, Vol. II : Sylhet By B. C. Allen, *C. S.*, P. 74

॥ ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology) ॥

২. স্বরধ্বনির পরিবর্তন :

(ক) স্বরধ্বনির আগমন, লোপ, সাধারণ ও কাব্যিক বিকৃতি :

নয়ান—সং ১। নেক্তি—সং ১০। সাঞ্জা—সং ১১। শমন তারে ছুঁইতে (ছুঁইতে) নারে—সং ১৪। চকিদার (চৌকিদার) —সং ১৬। পরামিশ (পরামর্শ)—সং ২৩। জুয়াব (জবাব)—সং ৪০। টেকা-পয়সা—সং ৪২। লাম্বা—সং ৪৩। মক্কার দিকে থইয়া (থুইয়া)—সং ৫৫। আমার কর্ম-দোইষে —সং ৫৮। উন্দুর (ইঁদুর)—সং ৬৭। গৈরব—সং ৬৯। শইয়া (শুইয়া) নিদ্রা যায়—সং ৭৫। যৈবন—সং ৭৫। অখন (এখন)—সং ৭৯। দইরদী (দরদী) —সং ৯১। 'দয়রদী'-ও পাওয়া গিয়াছে। আনল (অনল) —সং ৯৯। জলের ছইলে (ছলে)—সং ১০৩। বস্‌ন (বসন)— সং ১০৯। অবুলা বালা—সং ১১২। দুখুনী—সং ১১৫। ডেঁটা (ডাঁটা)—সং ১২৮। নেপূর (নুপুর)—সং ১৬৪। সাবন (সাবান)—সং ১৬৯। পউদ্মা—সং ১৭৫। ত্বরা ত্বরি—সং ১৯৪। নিশা (নেশা) ২৩১। বণিজ—সং ২৯২। জঙ্গাল (জঙ্গল)—সং ৩০৯। লইজ্জা—সং ৩৪১। ক্ষেমা (ক্ষমা)—সং ৩৫১। চাম্পাফুল —সং ৩৫৭। কাঙ্কাই—সং ৩৬৩। অম্রপত্র (আম্রপত্র)—সং ৩৭৫।

(খ) অন্যান্য পরিবর্তন :

ও > উ : উজন—সং ১০। দুজখ—সং ৪৩। খুঁটা—সং ১২৮। ঢুল (ঢোল) —সং ২০৭। গুসা—সং ২০৯। মুকাম— সং ২১০। নাওয়ের নাই খুল (খোল)—সং ২৯৩। জুড়া (জোড়)—সং ৩৬৮।

উ > ও: দোল (দুল)—সং ৩৬০।

(গ) অপিনিহিতি (Epenthesis) :

ছুইটে (ছুটিয়া) গেল—সং ২। ডাইকো (ডাকিয়ো) মন—সং ১০। লেইখে (লিখিয়া)—সং ১০। সুবুইলি (সুবুলি)—সং ১৪৮। আগুইনি, ইহার পর 'আগুইন' (আগুনি, আগুন)—সং ৫১, ২৫৩। বুইদ্ধি (বুদ্ধি)—সং ২৭০। পাউগুড়ি (পাগুড়ি)—সং ৬০। চউখ (চক্ষু)—সং ১৩৩। সাইক্ষাৎ (সাক্ষাৎ)—সং ৩৭৪।

(ঘ) স্বরসঙ্গতি (Vowel Harmony):

পরবর্তী স্বরের সহিত সঙ্গতি—

বেরথা জীবন— সং ২৪। দুস্তী—সং ৪৪। নদীয়া বেহারী—সং ৭২। প্রাণ পিওসী—সং ৮১। তোষের আনল—সং ৯৯। বেভোর—সং ১০৫। ক্ষেতি (ক্ষতি)—সং ১৩৮। মন্ত্র ঝুড়ে (ঝাড়ে)— সং ১৫৫। সুয়ামী—সং ১৬৩। যুদি (যদি)—সং ১৭৮। দুহাই—সং ১৮১। মুতি (মোতি) —সং ২২৫। উজাগরী (অজাগরী)—সং ২২৬। আমারে না দেয় ছুড়ি (ছাড়ি)—সং ২৮৩। কাল ভুজুঙ্গী— সং ২৮৩। এই গীত রুচিয়া (রচিয়া) দিলা—সং ২৮৯। গাগুরী—সং ৩০৬।

পূর্ববর্তী স্বরের সহিত সঙ্গতি—

পিঞ্জিরা—সং ২৪। সোদের ভাই—সং ২৭। পুত্রু—সং ২৯। জীওন —সং ৭৬। বাজেকর—সং ২০৬। চাবক (চাবুক)—সং ৩৭০।

(ঙ) দ্বিমাত্রিকতা (Bimorism)-র অনুপস্থিতি :

পাগেলা—সং ৪০। লাকুড়ি (লাকড়ি)—সং ২৮০। চামেড়া— সং ২৮১। একেলা—সং ৩২৮। বাঙ্গেলা—সং ৩৬২। তামেশা—সং ৩৭২।

এই ব্যাপার কাব্যেই ঘটিয়া থাকে। খুব সম্ভব দ্বিতীয় অক্ষরে স্বরপ্রাধান্য দিবার জন্যই এইরূপ হয়।

(চ) সন্ধি (Liaison) :

কেওই নায় (না হয়—না অয়— নায়) আপন জন—সং ২৩॥

৩. ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন :

(ক) ব্যঞ্জনধ্বনির আগমন, লোপ, সাধারণ ও কাব্যিক বিকৃতি :

আঙ্খি—সং ১৬। সমদুর (সমুদ্র)—সং ২৭। হিদ্রের মাঝে অগ্নি জ্বলে—সং ৬৩। সয়াল (সকল)—সং ৭৯। বয়রী (বৈরী)—সং ৮৫। পম্থ—সং ৮৯। পঙ্খ (পাখা)—সং ৯০। এতো দিরং (দেরী) কেনে—সং ৯০। জিঙ্গাসা (জিজ্ঞাসা), কাঞ্চা (কাঁচা) বাঁশ—সং ৯৭। বঞ্চিতে না পারি—সং ৯৯। পরতিঙ্গি (পতঙ্গ)—সং ১০৩। ঝাম্পু (ঝাঁপ) —সং ১০৯। দশরাত্র (দশরথ)— সং ১২৪। লেঞ্জ (লেজ)—সং ১৩৪। অঞ্চলের (আঁচলের) ধন কাঞ্চা সোনা—সং ১৪৮। বিধরতা (বিধাতা)—সং ১৬৫। মিছা আশা বঞ্চনি—সং ১৬৮। পুষ্কণ্ডি—সং ২২৮। গগনের চান্দ—সং ২৫৬। কলিঙ্গা

(কলিজা)—সং ২৬৫। শয়নে ভুঞ্জনে—সং ২৭০। বিনন্দ (বিনোদ) নাগর—সং ২৮২। মান্দারের (মাদার কাঠের) চরখা—সং ২৮৫। পরানি কাম্পে ডরে—সং ২৯২। নিকণ্টে মিশিয়া রইয়ো— সং ৩২২। কালিন্দ্রীর (কালিন্দীর) জলে—সং ৩২৬। জারণবীর (জাহ্নবীর) ঘাট—সং ৩২৭। গাঞ্ছা (গামছা)—সং ৩৫২। নাকসিকা (নাসিকা)—সং ৩৬৩। বেলওয়া (বালিকা)—সং ৩৬৫। মালন্তী ফুল—সং ৩৬৭। শ্বশুরাল— সং ৩৬৯। লুটন (লুণ্ঠন)—সং ৩৭০। সাঞ্জানো (সাজানো), রঞ্জনী (রজনী)—সং ৩৭২।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণে এই ব্যাপার ঘটিয়াছে।

(খ) ব্যঞ্জনবর্ণের অন্যান্য বিচিত্র পরিবর্তন :

অল্পপ্রাণ বর্ণ মহাপ্রাণ বর্ণে পরিণত হইয়াছে—

ফিরিতি (পিরিতি)—সং ২১১।

অল্পপ্রাণ বর্ণ নাসিক্য বর্ণে পরিণত হইয়াছে—

পিরথিমী (পৃথিবী)—সং ১২৫।

নাসিক্য বর্ণ অল্পপ্রাণ বর্ণে পরিণত হইয়াছে—

যবুনার (যমুনার) জলে—সং ৯৬।

নাসিক্য বর্ণ (দন্ত্য-'ন'-) অন্তঃস্থ বর্ণে (-'ল'-) পরিণত হইয়াছে—

সরলনী মাখন—সং ১৮। তাল্লুক লিলাম ডাকায়—সং ২১। মিলট (মিনট, মিনিট)—সং ৩৭। জলম (জনম)—সং ১৫৩।

অঘোষ বর্ণ ঘোষ বর্ণে পরিণত হইয়াছে—

গিরিফদার—সং ৬৩। বানে (পানে)— সং ৭৪। যুগতি— সং ২৭৭। কবট—সং ২৮৯। পাতাস (বাতাস)— সং ৩৫৩।

ঘোষ বর্ণ অঘোষ বর্ণে পরিণত হইয়াছে—

দীকি (দীঘি)—সং ৩৭১।

ওষ্ঠ্যবর্ণ কণ্ঠ্য বর্ণে পরিণত হইয়াছে—

উগাড়িয়া (উপাড়িয়া)—সং ৯৭।

মূর্ধন্য বর্ণ দন্ত্য বর্ণে পরিণত হইয়াছে—

পুস্তিপাতা (পুস্তিপাটা)—সং ২৪০।

মহাপ্রাণ-ওষ্ঠ্যবর্ণ (-'ফ'-) উষ্মবর্ণে পরিণত হইয়াছে—

হকির (ফকির)—সং ২৮৯।

(গ) অন্তঃস্থ বর্ণের পরিবর্তন :

অন্তঃস্থ বর্ণের অন্তর্নিহিত -ই- অনেক সময় স্পষ্ট হইয়াছে—

সদায় (সদাই)—সং ৩০। পরমাই (পরমায়ু)—সং ৩৭৬।

অন্তঃস্থ (-য়-) লুপ্ত হইয়াছে—

পে'দা (পেয়াদা)—সং ২৪। জা'গা (জায়গা)—সং ৮৮।

-র-এর পরিবর্তন—

শরীল—সং ২৯। কাটালি-ছুরী—সং ৩৪৯।

(ঘ) উষ্মবর্ণের পরিবর্তন :

-শ-, -ষ-, এবং -স-এর -ছ-এ পরিণতি—

ছেল (শেল)—সং ৯৩। আছমান—সং ১০২। ছির (শির) —সং ১৪০। মছরি (মশারি)— সং ১৫০। রছি (রশি)—সং ১৮০। বরছ (বরষ)—সং ১৩৪। ছাবন (সাবান), গোছল (গোসল)— সং ১৫০।

এখানে উষ্মবর্ণগুলি সব মহাপ্রাণ-অঘোষ তালব্যবর্ণে (palatal) পরিণত হইয়াছে।

উষ্মবর্ণগুলির নিজেদের মধ্যেই পরিবর্তন হইয়াছে,-শ- -হ- হইয়াছে—

হলা (শলা, শলাকা)—সং ২৮৫।

-স- -হ- হইয়া লুপ্ত হইয়াছে—

আইয়া (আসিয়া, অপিনিহিতিতে—আইসিয়া> *আইহিয়া> *আইইয়া)—সং ১৬। বইয়া (বসিয়া)—সং ১৬।

পদের আদি ও মধ্যস্থিত -হ- লুপ্ত হইয়াছে—

আতের (হাতের)—সং ১০। ইরা (হীরা)—সং ৪৩। মা'জন (মহাজন> মআজন> মা'জন)—সং ২২। জা'জ (জাহাজ)—সং ১২৩। চৌকি পা'রা (পাহারা)—সং ১৬৭। স'জ (সহজ)—সং ২৩৬।

(ঙ) কাব্যে ও কথ্য ভাষায় ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হইয়াছে :

তাম্মুক—সং ২১। পাক্কায়—সং ২৬। কয়বরের ভিত্তর—সং ৩৩। কইলকাত্তা—সং ১৪৩। তোপের গুল্লি—সং ১৫৮। নবলাখের বাত্তি—সং ১৫৯। শূল্লি—সং ১৭৫। হাত্তে—সং ১৯৯। ষোল্ল—সং ২০২। কল্লি —সং ২২৫। হুঁক্কা—সং ২৩৫। তাল্লাস—সং ২৬৭। মিন্নতি—সং ৩৩১।

ছাত্তি—সং ৩৩৪। অন্নাথ—সং ৩৪০। উঁচ্চা—সং ৩৫২। তৈল—সং ৩৬৩। ফান্নুস— সং ৩৬৯। পাশ্‌শা—সং ৩৭২। পানের লাল্লি—সং ৩৭২॥

৪. উচ্চারণ-তত্ত্ব (phonetics) :

নিম্নে International phonetic Association-এর দ্বারা ব্যবহৃত ধ্বনি-নির্দেশক বর্ণমালায় তিনটি গানকে পরিবর্তিত করিয়া দেওয়া হইল। ইহা হইতে শ্রীহট্টের উচ্চারণ-বিশেষত্ব বুঝা যাইবে :

alla dərəd nai ni tor—
banaia bhaŋgibai paro nòbin baʃər ॥
a:r maer koler ɟadu ba:alla nilaĕ re
kapia ॥
əlpə bəĕʃer ɟor amar nilaĕ re bhaŋgia ॥
a:r keurəre banao ba:alla lakher
ʃədagər ॥
mui ədhəməre magia phirao—
pòrti ghəre ghər ॥
a:r kòin ni phòkir abdul husən
dilete bhabia—
na ɟani ki hòibò amar kəĕbərer
bhittər ॥

— SONG № 33

a:mar din bɔɽo bɛkla dekhi--—
akul gesi khaia go o ʃoi, mati na dɔraia
a:r ʃar-ʃua duiti pɔŋkhi raikhasi
dhɔria ।
ore du dila hòile pakhi: jaibò re
uɽia go ॥
a:r emɔn jɔtɔner pakhi: ke dibò
dharia
ego bina dɔrmaĕ kòrmu sakri ei
jɔlɔm bhɔria go ॥
a:r bhaibe ra:dharɔmɔn bɔle —
ʃunre kalia ego, nibi'sılɔ mɔneri(ĕ)
anɔ ।
ke dilò jalia go ॥

— SONG № 153

'bɔɽo pa'ɽ tɔne sam rukh anaia
Sat bhaie baŋgela banaila ।
lodhpur tɔne dudh-pati anaia
Sat bhaie baŋgella saõaila ॥
lalpur tɔne lalmati anaia
Sat bhaie baŋgela lepila ।
Silɔt tɔne douɽir sɔki anaia
Sat bhaie baŋgelaẽ thɔõaila ॥
rɔŋpur tɔne ròŋin pati anaia
Sat bhaie baŋgelaẽ bisaila ।
bhati tɔne bhɔni-ɟamɔi anaia
Sat bhaie bhɔnire Sɔ̃pila ॥

— SONG No 373

॥ রূপতত্ত্ব (Morphology) ॥

৫. প্রত্যয় (Formative Affixes) :

(ক) -আ-, -য়া-

মনা—সং ২৭। দেহা—সং ২৮। আউলা সুতা—সং ২৯। গৌরা—সং ৩০। ভুলা মন—সং ৩৫। পুতুলা—সং ১০২। কোকিলা—সং ১০৫। দু-দিলা—সং ১৫৩। লাল-নীলা—সং ১৬৬। আষ্ট আঙ্গুলা মানুষ—সং ২০৮। বাউলা—সং ২৮১। চল্লিশা—সং ২৮১। মতিনাশা—সং ৩৫২।

লাউয়া—সং ১৮৪। ছিলটিয়া ছিপাইয়া—সং ৩৭০।

(খ) -আল-, -আলি-, -আইল-

দিলাল—সং ১৫৯। কামের কামাল—সং ২৩৬। উড়াল বইঠা—সং ২৯২। দখিণাল দরজা—সং ৩৬৪।

বাইছালি—সং ৩৫৩। সোনার বান্ধাইল বাঁশী—সং ৯৫। দখিণাইল চর—সং ১৩৪।

(গ) -ই-, -ইল-, -ইলা-, -ইয়ল-

প্রাণি (প্রাণ)—সং ৬৬। পরানি—সং ১৬৮। শূল্লি—সং ১৭৫।

আগিল গলই—সং ৩৫৩। দুখের দুখিলা—সং ২৭৫। ষোল্ল আঙ্গুইলা ডাঁটি—সং ২৮৪। ঘাটিয়ল মাঝি—সং ২৩৮।

(ঘ) -ইয়া-, -ইয়ারা-

নগরিয়া লোক—সং ১০৪। লাহুলিয়া পন্থ—সং ১৮৯। জঙ্গারিয়া লোহার হলা—সং ২৮৫। ছিলটিয়া ছিপাইয়া—সং ৩৭০। আন্ধিয়ারা ঘর—সং ৩৫১।

(ঙ) -ঈ-, -ঈয়া-

অকূলী—সং ১৬০। পন্থী—সং ১৯৮।

তাপিনীয়া—সং ১৩৬। শিকারীয়া—সং ১৭১। গুণারীয়ে গুণ টানে—সং ১৮৭। কুসঙ্গীয়া—সং ২৩৪। মালীয়া ভাই—সং ৩৭০।

(চ) -উক-, -উয়া-, -উলিয়া-

নাচুক (যে নাচে)—সং ১৮২। পানুয়া বইঠা—সং ১৮৪। খেলুয়া—

সং ৩৫৪। ঘাটুয়া, নাটুয়া—সং ৩৭২। খবর-উলিয়া (খবর-ওয়ালা)—সং ৩৭০।

(ছ) -ওয়ালা-, -ওয়ানী-

মাতোয়ালা—সং ২২৯। খেওয়ানী—সং ২৯৪।

(জ) -দার-

চড়নদার—সং ২৯৬।

(ঝ) -না-

পাকনা আম—সং ১২৮॥

৬. শব্দ দ্বৈত (Reduplication of words) :

(ক) বিভিন্ন শব্দযোগে সৃষ্ট শব্দদ্বৈত :

মিছা আইসা-যাওয়া সার—সং ১২। নিজ-পরিজন—সং ১৭। মান-কুলমান—সং ১৭। কিসের তোমার সান-মান—সং ৩৫। উজন-নিজন ঠিক জানো না—সং ৩৬। আসিবা ঝড়ির তুফান—সং ৬৩। জাড়ে-পেড়ে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাই—সং ৯৭। ওরে হুঁশে-বোধে রহিয়ো—সং ১৩৪। আড়ি-পড়ী, ইষ্ট-কুটুম—সং ১৪২। কৌতূহলে কল-কৌশলে করতেছিলাম প্রেম-খেলা—সং ১৭০। শরম-ভরম—সং ১৭০। নগরে বাজারে—সং ১৭১। ঝড়-বরিষণ—সং ১৭৩। আলা-টিলা করে নায়—সং ১৮৬। দড়ি-পাগা—সং ২০০। মধ্যের নালায় বেপার-তিজার—সং ২১৬। মন আউলা-ঝাউলা—সং ২১৭। ঘোলপানি খাইলা কতো জনে—সং ২৩১। হুভ-লোভ—সং ২৭৬। হিলাইতে ছুলাইতে নাল ছিঁড়িয়া গেল—সং ২৮৫। উলট-কলট করি'—সং ২৮৭। জাতি-যৌবন—সং ৩০৩। যমুনারি তীরে-নীরে—সং ৩০৩। বাতাসে হালিয়া-ঢালিয়া পড়ে—সং ৩০৬। ননদিনী তিলে-পলে জাগে—সং ৩০৭। দণ্ডে-পলে ঘর হইব চুরি—সং ৩০৮। পাগেলা ফকিরের সনে দিদার-মাদার নাই—সং ৩৫৫। রুইয়া আইলাম ফুল-বাগিচা—সং ৩৭১। তালুক-মিরাশ—সং ৩৭১। খানা-পানি—সং ৩৭২।

(খ) সাদৃশ্য বা ঈষদ্ভাব বুঝাইতে :

ঘরখিনি ভাঙাকুঙ্গা—সং ১৫৯। বউ আমার হুঙ্গী-চুঙ্গী—সং ১৭৩। এক্ক-ব্যাক্ক মন রে—সং ২৬০। ছোটোমুট মুনিয়া পাখী—সং ২৬৫। অবচল-

পিনচল ঘাট—সং ৩০৬। দুইটি আঁখি টিলিমিলি—সং ৩১২।

(গ) ব্যতিহার বা পারস্পরিক ভাব বুঝাইতে :

নাচুক লইয়া করে উলামেলা (নাচানাচি)—সং ১৮২।

(ঘ) অনুকার ধ্বনিতে শব্দদ্বৈত :

গুন-গুনাগুন শব্দ—সং ১৬৪। ঘুরাঘুর, ঘুর-ঘুরাঘুর, তুলাতুল, তুলতুলাতুল-সং ২৩৪। মছরির ভিত্তরে উহুর-ঝুহুর বাজে রে—সং ৩৮০॥

৭. পদাশ্রিত নির্দেশক (Enclitic Definitives ; Articles) :

-খান- : সাধের একখান তরী ছিল—সং ২।

-খানি- : অল্পবয়সের পিরিতখানি ও তুমি রাখিয়ো বহাল—সং ২৯৫। লক্ষ্য করিবার বিষয়,—'ভাবময়' বস্তু বুঝাইতেও -খানি- ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা কাব্যেই লক্ষ্য করা যায়।

-খিনি- : ঘরখিনি ভাঙারুঙ্গা—সং ১৫৯। ইহাও কাব্যেই লক্ষ্য করা যায়।

-গুলি- : কাঞ্চাবাঁশের বাঁশীগুলি (-টি-)—সং ৯৭।

-গেছি- : হস্তেতে শঙ্খ পইরে—চাইর গেছিয়ে (গাছিতে) শোভা করে—সং ৩৬৩।

-ছড়া- : এগো, ঝিল্‌মিল্ ঝিল্‌মিল্ কবচছড়া (-গুচ্ছ-)—সং ৩৫২॥

৮. কারক ও বিভক্তি (Cases and Inflexions) :

(ক) প্রথমা বিভক্তি : -য়-, -য়ে-

· ঘোড়িয়ায় (ঘোড়া) লুটন করে, অস্তীয়ে (হস্তী) লুটন করে—সং ৩৭০।

(খ) দ্বিতীয়া বিভক্তি : -য়-

জলের ছলে দেখবে তায় (তাহাকে)—সং ১০৩।

দ্বিতীয়া বিভক্তির স্থলে অনেক সময় ষষ্ঠীর চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে : ওয়ার (উহাকে) দেইখে বদন জুড়ায়—সং ৮৩। দ্বিতীয়া বিভক্তি বুঝাইতে, অনুসর্গরূপে তৃতীয়া বিভক্তিতে ব্যবহৃত -দিয়া- প্রযুক্ত হইয়াছে ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত পদের সহিত -এ- যোগ করিয়া। যথা, কি হইল মোরে (আমাকে) দিয়া—

সং ৩০২। তেমনি, ষষ্ঠী বিভক্তি বুঝাইতে দ্বিতীয়া বিভক্তির আশ্রয় নেওয়া হইয়াছে। যেমন, শ্যামকে (শ্যামের) লাগাল পাইলাম না সই—সং ১৬১।

(গ) পঞ্চমী বিভক্তি :

অনুসর্গ-রূপে ব্যবহৃত -থাকি'- (থাকিয়া, থেকে, হইতে)-র পূর্ববর্তী বিশেষ্য-বিশেষণ পদে -ই-, -এ- প্রভৃতি বিভক্তি চিহ্নের ব্যবহারের মধ্যে বিশেষত্ব আছে। যেমন, দূরই থাকি' (দূরে থাকিয়া, রহিয়া ; দূরের থেকে) মায়ের কান্দন শুনি—সং ২৮৮। পইচমে তনে (পশ্চিম হইতে, পশ্চিমের হইতে) আইল হকির—সং ২৮৯।

(ঘ) ষষ্ঠীবিভক্তি : -আর-

তায়ার (তাহাদের) নাকি সময় যায়—সং ৮২।

বিশেষ্য, বিশেষণ এবং ক্রিয়াপদের উত্তর অনাবশ্যক ষষ্ঠী বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে—

পাগেলার মন (পাগলা মন)—সং ২৯। অসারের জীবন (অসার জীবন)—সং ১৫২। পুষ্পের চন্দন (পুষ্প-চন্দন)—সং ১৬৪। রসিয়ার নাগর—সং ২৫৫। আমি অভাগীর নির্লক্ষ্যী—সং ২৭২। শুকনার কাঠ (শুকনা কাঠ)—সং ২৮০।

এই বিশেষত্ব কাব্যেই লক্ষ্য করা যায়।

(ঙ) সম্বোধন পদ :

আয় বা' (হায় গো তুমি) : আয় বা' নিলাজ কালা রে—সং ৩৩২।

আল' (ওলো) : আল' রাই—সং ৩০২।

এগো (ওগো) : এগো, ডাক দিয়া জিজ্ঞাসা করো—সং ৯৭।

ওবা' (ওহে) : তুমি রইলে কই, ওবা' বন্ধু—সং ২৭৩।

ওয়রে (ওরে) : ওয়রে, নিচিন্তে বসিয়া রইলায়—সং ২০।

দ' (দগো, ওগো) : ঘোড়া মারিয়া যাইন দ' রাজা—সং ৩৬৫।

বা' (হে) : বা' দয়াল বন্ধু—সং ১।

বাবই (বাবাজীবন) : বাবই, কই লুকাইলায় রে—সং ২০৭।

মনুওর : না যাও মনুওর দূর-দেশান্তর—সং ৩৭১।

ল' (লো) : নিবা ল,' সই গো—সং ৩৬।

হ' (হে) : বান্দা হ'—সং ৫৭॥

৯. অনুসর্গ (Post Positional words):

অনে (হনে, হইতে) : পেক অনে পানি ভালা—সং ২৪৭।

আইয়ো (প্রতি, নিকটে, দিকে) : এক সখীয়ে উঠিয়া বলে আর সখীর আইয়ো—সং ৩১০।

আগে (সম্মুখে) : কইলাম তোর আগে—সং ২৪৪।

উপরে (প্রতি) : মজনু আশিক হইল লায়লীর উপরেতে—সং ১৭৪।

করে (পিছে) : বাবণ লাগিল করে—সং ৩৬০।

কারণ (জন্য) : কি দোইষের কারণে বন্ধু আমায় বাসইন ভিন—সং ৩৪৮।

তনে (হইতে) : ঘুমতনে উঠিয়া রাধে কলসী পানে চায়—সং ৯০।

থাকি' (থাকিয়া, থেকে) : ওরে দূরে থাকি' দেখা ভালো—সং ৩২২।

দায় (জন্য) : দিবা-নিশি ঝুরিয়া মরি কালিয়া সোনার দায়—সং ১১১।

দি' (দিয়া) : চৌদিগে দি' চৌকি-পা'রা—সং ১৬৭।

দিয়া (তৃতীয়া বা সপ্তমীর অর্থে) : আর পূর্বে দিয়া উঠে চান্দ, ঘরে বইয়া দেখি—সং ১৯২।

পক্ষ (দূর, দূরে) : দুখের দুখিলা যত, ও আল্লা, তারারে ফালাইলাম পক্ষ রে—সং ২৭৫।

বদল (প্রতিদান) : রূপ দিলাম তার অঙ্গের বদল—সং ১৬৮।

বানে (পানে, দিকে) : কি দোষে অবুলার বানে রে না চাইলায় ফিরিয়া—সং ২৭৪।

বায় (দিকে, প্রতি): কার বায় রইলায় চাইয়া—সং ২০০।

মূর্তি (দিকে, পানে): আগে তোমার দেহার মূর্তি চাইয়ো—সং ২৪৫।

সনে (সঙ্গে, কাছে) . বলিয়ো না গো সজনি আমার সনে—সং ১০২।

হনে (হইতে) : আর শরম হনে মরণ গো ভালো—সং ৯৯।

হুজুর (নিকটে) : মুনিবের হুজুরে—সং ১৪৩। নিবেদন বলি তোর হুজুরে—সং ২৮৩॥

১০. বিশেষণ (Adjectives) :

(ক) বিশেষণের মধ্যে বিশেষত্ব কিছু খুঁজিয়া পাই নাই। প্রত্যয়-নিষ্পন্ন বিশেষণগুলি—যেগুলির মধ্যে খানিকটা আঞ্চলিক বিশেষত্ব ফুটিয়াছে,—সেগুলির উদাহরণের জন্য প্রত্যয়ের অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। কিছু কিছু বিশেষণ আছে—যেগুলি কাব্যিক ভাব ও পরিবেশ এবং রীতিকে উজ্জ্বল করিয়াছে। 'কাব্য-ভাষা' এই শিরোনামার নীচে এই ধরনের বিশেষণের দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হইবে। অন্যান্য বিশেষণ সমূহের নমুনা নীচে রাখা হইল—

আমি অধম গুনাগার—সং ১। গণার দিন তো যায় রে চলে—সং ৮। পয়সা ছাড়া জী'তে মরা—সং ১৭। পিছ্ দুয়ার—সং ১৮। অল্পবয়সের জোড় আমার নিলায় রে ভাঙিয়া—সং ৩৩। আমার মন হইয়াছে দুরাচার—সং ৬৫। আমি তোদেরি পিরিতের মারা (প্রেমাহত)—সং ১০৭। আশা-পথ চাইয়া রই—সং ১০৮। পিরিত করছে না জন আছে ভালো—সং ১১৭। বিসখা প্রেম—সং ১২২। সোনাপুরী আন্ধাইর করি' কোথায় রইলায় প্রেম-পিয়ারী—সং ১৪৭। শোকের ঘরে—সং ১৪৮। নিয়াজ নদী—সং ২১৬। চমক লোহা—সং ২১৬। পাতল স্বভাব—সং ২৩৭। এক্ত-ব্যক্ত মন—সং ২৬০। লাড়িয়া পিতল—সং ২৭৯। আর তনু হইল লড়-খড়—সং ২৯০। তিথিবলা চুল—সং ৩৫২। আধা বয়েস—সং ৩৫৮। ছাবাল রাঁড়ী—সং ৩৬০।

(খ) সংখ্যা ও পরিমাণ-বাচক বিশেষণ :

আষ্ট গণ্ডা কড়ি—সং ২৩। বেড়ি দিলাম দুইয়ো পায়—সং ২৯। চাইর—সং ৩২। আমার বন্ধের জ্বালা দুনা গো—সং ১২৬। পাঞ্ছিয়ায় চি ড়া কুটে—সং ১৬৫। ষোল্ল পাটের নাও—সং ২০২। ডাইনে-বাঁউয়ে দুকুছা (দুইটি) নালা—সং ২১৬। চল্লিশা নি ছয়-ষাট্টিয়ে মিলায়—সং ২৮৩। দুনু (উভয়, দুই) হস্ত—সং ৩০৬।

হয়রে, এককুয়া (একটুকু) ননীর লাগিয়া যাদব গেল দূর—সং ২০৬।

(গ) অনেক বিশেষণ, যেগুলি কাব্য-পরিবেশ সৃজন করিয়াছে—সেগুলির সহিত ষষ্ঠী বিভক্তি ব্যবহার করিবার ফলে এক ধরনের বিশেষত্ব আসিয়া গিয়াছে। ইহার উদাহরণের জন্য 'কারক-বিভক্তি'-র অনুচ্ছেদ এবং 'কাব্য-ভাষা'-র অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য॥

১১. ক্রিয়াবিশেষণ (Adverbs) :

(ক) তৃতীয়া ও সপ্তমী বিভক্তির -এ- যোগে—

আচম্বিতে ডুবল তরী—সং ২। বেরথা ভাবে দিন গাওয়াইলাম—সং-২৯৬। তায়ে (তাহাতে) ক্ষেতি নাই—সং ৩২৪। এরুমাঝে চাইয়া দেখইন চৌদিক হইল পসর রে—সং ৩৭২।

(খ) অসমাপিকা ক্রিয়াপদ যোগে—

পাইকগণ সাজন করি' (করিয়া)—সং ৩৫৪।

(গ) -কু- যোগে—

পয়লাকু (প্রথমতঃ) পড়িয়ো ফজর—সং ৫৬।

ঘ) বীপ্সায় শব্দদ্বৈত করিয়া—

কান্দইন জারে-জারে—সং ৩৬২ ॥

১২. ব্যক্তি-বাচক সর্বনাম (Personal Pronouns) :

(ক) উত্তমপুরুষ (First person)—

পার করো চাই দয়ার মুরশিদ আমার (আমাদের, আমরা) বালক সকল লইয়া রে—সং ২৯৪।

বিনয় প্রদর্শন করিবার জন্য অধম, অধীন, দাস, দীন, বান্দা ইত্যাদি ব্যবহৃত হইয়াছে।

(খ) মধ্যম পুরুষ (Second person)—

সাধারণ : তোমা ভিন্ন আমার কেহ নাই—সং ৫।

তুচ্ছার্থে : মনে লয় যুগুনী হইতাম তুইন বন্ধের কারণ—সং ২৯৫।

(গ) প্রথম পুরুষ (Third person)—

সাধারণ : পাইবায় তারের (তাহার, একবচন) দরশন—সং ১৪৩। তারার (তাহাদের, বহুবচন) নাকি সময় যায়—সং ৮২। দুখের দুখিলা যতো, ও আল্লা, তারারে (তাহাদিগকে, বহুবচন) ফালাইলাম পক্ষ রে—সং ২৭৫।

সম্ভ্রমার্থক : তান না রইবে আইলে শমন—সং ৩৮। যারে ভজতে আইলাম ভবে তাহান (তাঁহার) উদ্দেশ নাই—সং ২৯৬ ॥১

১৩. নির্দেশক সর্বনাম (Demonstrative pronouns) :

(ক) নিকট-নির্দেশক (Proximate Demonstrative)—

এরে দিয়া (ইহা দ্বারা) খুঁড়ইন বান্দায় নিজ ঘরের মাটি—সং ২৮৬।

(খ) দূর-নির্দেশক (Remote Demonstrative)—

ওয়ার (উহাকে, প্রাণিবাচক) দেইখে বদন জুড়ায়—সং ৮৩।

(গ) সাকল্য-বাচক (Inclusive)—

গোকুলের যতোই (সব) নারী মন্ত্রণা করিয়া—সং ৩১৯। সখীগণে মিলিয়া তারা (সকলে) মঙ্গল জোগার গায়—সং ৩৭৭।

(ঘ) প্রশ্নসূচক (Interrogative)—

সাধারণ : কোনু (কোন্) সাপে মাইল কামড়—সং ১৬০। ননী খাইল কুনে (কে)—সং ২৬০। মালা দিমু কুনে (কাহাকে)। কানর (কোথাকার) যম আসিব বন্ধু আমার লাগিয়া রে—সং ২৭২।

(ঙ) অনিশ্চয়-সূচক (Indefinite)—

কেও (কেহ, কেউ) যদি যায় পথে মইরে—সং ১৪। কেহই (কেহ, কেহবা) নেয় রে লবণ-মরিচ—সং ১৮৪।

কেওররে (কাহাকে, কাহাকেও বা) বানাও বা' আল্লা লাখের সদাগর—সং ৩৩। কেওররে (কাহাকে, কাহাকেও) না মানে—সং ১৭৭।

পিরিতি কেওরর (কাহার, কাহারও) জুলা নয়—সং ১৩৬।

(চ) আত্ম-বাচক (Reflexive)—

আপন খোদা আপনে চিন'—সং ২০৪। আপনে মরিয়া যাইতায় সাধু-ভাই—সং ২৪৭॥

১৪. সর্বনাম-জাত বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণ (Pronominal Adjectives and Adverbs) :

দেশ-বাচক : -এথা-

আমি এথা (এখানে) মরি লাজে—সং ১০১।

কাল-বাচক : -অখন-, -অবে-, -এব্লা-, -সেলা-, -যেইবালা-, -যখনে-

১ "তার শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে তাইর (শ্রীহট্ট গ্রাম্য)। উহাই সম্ভ্রমার্থে তাইন (তিনি)।"—শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩৪৬, পৃ ৬০

অখন (এখন) তুমি যাইত্‌রায় ছাড়িয়া—সং ২৭২। উঠ অবে (এবে, এখন) দেখি চান্দ মুখ—সং ২৯৯। এবলা (এখন) লামো আইয়া—সং ৩৬৭। দুইটি আঞ্ঝি লাগি' যাইব সেলা (তখন, সে বেলা)— সং ৩০৮। যেইবালা (যখন, যেবেলা) পিরিত কইলাম, রে বন্ধু, তুমি আর আমি—সং ৩৩৯। যখনে (যখন) যমুনায় যাই—সং ২৭৭।

সাদৃশ্যবাচক : -কিলা-, -কি মতে-, -যেলা-, -কন্নমতে-

কিয়ামতের দিন মুমিন পার হইবায় কিলা (কিভাবে, রূপে)—সং ৬০। কিমতে (কেমনে) রহিতাম আমি কয়বরের ভিত্তরে—সং ২৪৩। যে যেলা (যে ভাবে, রূপে) পাইয়া আইছে হ'—সং ৬১। ছাড়াইলে না ছাড়ের কন্নমতে—সং ২৮৩॥

১৫. সমধাতুককর্ম (Cognate Object) :

পয়সার আশায় ভালোবাসা বাসে পরস্পরে—সং ১৭। আমি ভাবের মরা মইলাম না—সং ১৩৯। বাপে দানে দিল বিয়া—সং ৩০০॥

১৬. অসমাপিকা ক্রিয়া (Conjunctives) :

(ক) সাধু বাঙলা ভাষার অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রত্যয় -ইয়া- সংক্ষিপ্ত হইয়া কবিতায় -ই- রূপ লয়। শ্রীহট্টে তাহা কথ্যভাষাতেই ঘটিয়া থাকে : দাসী বানাই' (বানাইয়া) আমারে—সং ৯১। সদায় জ্বালাই' মাইল— কালায় মোরে—সং ১০২।

(খ) অপিনিহিতির প্রভাবে -ইয়া- প্রত্যয় অন্য রূপ লইয়াছে : আইনা (আনিয়া>আইনিয়া>আইনা) দে মোর প্রাণের বন্ধুরে—সং ১৫১।

(গ) অপিনিহিতির পর -ইয়া- -এ- রূপ লইয়াছে, কিংবা ক্রিয়াপদের সাধুরূপের উত্তর -এ- প্রত্যয় অসমাপিকারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে : ছুইটে (ছুটিয়া>ছুইটিয়া>ছুইটে) গেল—সং ২। হরি বল বদন ভইরে—সং ৭। তুলসী পাতায় লেইখে নাম—সং ১০। পাঁচপীরের পূজারী হইয়ে (হইয়া)— সং ১৫। না বুঝিয়ে রইলাম আমি—সং ৪২। অবশ্য ইহা কাব্যে সর্বত্রই প্রাপ্ত হওয়া যায় ; যেমন, রবীন্দ্রনাথে পাই, 'তোমা হ'তে যবে হইয়ে বিমুখ আপনার পানে চাই।'

(ঘ) অসমাপিকাক্রিয়ার অপর প্রত্যয় -ইলে-র অর্থ জ্ঞাপন করা হইয়াছে -তে- দিয়া: ঝাড়িতে (ঝাড়িলে) না লামে বিষ—সং ১৬০। চালাইতে না চলে তন—সং ২৯০। এই বিশেষত্ব কাব্যেই লক্ষ্য করা যায়। প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষাতেও ইহা ঘটিয়া থাকে ॥

১৭. নিমিত্তার্থক অসমাপিকা (Gerundial Infinitives) :

সাধু বাঙলা ভাষার নিমিত্তার্থক অসমাপিকাক্রিয়ার প্রত্যয় -ইতে- শ্রীহট্টের নিজস্ব ক্রিয়ারূপের বিশেষত্বের জন্য আঞ্চলিক পরিবর্তন লাভ করিয়াছে। এই উপভাষাতে প্রথম পুরুষের সাধারণ রূপে ক্রিয়ার উত্তর -ইত-, প্রথম ও মধ্যম পুরুষের সম্ভ্রমার্থক রূপে -ইতা-, এবং মধ্যম পুরুষের সাধারণ রূপে -ইতায়- প্রত্যয় যুক্ত হইয়া থাকে বলিয়া নিমিত্তার্থক অসমাপিকা ক্রিয়ার বিভিন্ন পুরুষে নিম্নলিখিত রূপ পাওয়া যায়—

(ক) -ইতে-র স্থলে -ইত, প্রথম পুরুষ, সাধারণরূপ— কি ধন নিত (নিতে) চায়—সং ৯৭। রূপে রূপ ধরিত (ধরিতে) চায়—সং ১৯৩। সে নদী বান্ধিত (বান্ধিতে) পারে—সে হয় পাগল— সং ২৩১।

(খ) -ইতে-র স্থলে -ইতা- প্রথম ও মধ্যম পুরুষ, সম্ভ্রমার্থক— ওই বিষ ঝাড়িতা (ঝাড়িতে) পারইন ঠাকুর মজাইদ চান্দে—সং ১৬০।

(গ) -ইতে-র স্থলে -ইতায়-, মধ্যম পুরুষ, সাধারণরূপ—বানাইয়া ভাঙিতায় (ভাঙিতে) পারো নবীন বাসর—সং ৩৩। ও তার দাঁড় বসাইতায় জানো না রে গুণ লইয়া আকুল—সং ৩৬।

(ঘ) -ইতে-র স্থলে -না-

আদায় করনা (করিতে) চায়—সং ২১। ইহার মধ্যে হিন্দী প্রভাব থাকিতে পারে ॥

১৮. ক্রিয়ার কাল ও পুরুষ (Tenses and persons) :

(ক) নিত্য বর্তমান (Simple present)—

প্রথম পুরুষ, সম্ভ্রমার্থক: লাগাম করইন (করেন) নাও— সং ১৬। ফিরইন সাথে-সাথে—সং ২৬৭। যুদি না দেইন বিয়া—সং ৩৭১।

মধ্যমপুরুষ, সম্ভ্রমার্থক: কি দোইষের কারণে বন্ধু আমায় বাসইন (বাসেন) ভিন—সং ৩৪৮।

(খ) নিত্য অতীত (Simple past)—

প্রথম পুরুষ, সাধারণ : কলঙ্কী কইল (করিল) সংসারে—সং ১৭। ঘরে আইস্‌ল (আসিল, অপিনিহিতি) মনোচোর—সং ৩৪৫। শ্যাম আইল না কুঞ্জে—সং ৩৪৬।

প্রথম পুরুষ, সম্ভ্রমার্থক: কি ধন মাঙ্গিলা (মাঙ্গিলেন) শ্যামকালা—সং ৩০১। সাড়ী খসাইয়া ফালাইলা (ফেলিলেন)—সং ৩৬৪।

মধ্যমপুরুষ, সাধারণ: কেন ভুলে রইলায় (রহিলে) রে—সং ৮।

উত্তম পুরুষ : কি দোষ কইলু (করিলাম)—সং ১১৪। রে বন্ধু, হারিলু (হারাইলাম) সকল—সং ২৬৬।

(গ) নিত্যবৃত্ত অতীত (Habitual past)—

উত্তমপুরুষ : উঁচ্চা করি' বান্ধতু (বাঁধিতাম) খোঁপা—সং ১৬১। কলসী লইয়া যাইতু (যাইতাম) জলে—সং ২৫৫। যদি জানিতু (জানিতাম, করণাত্মক অতীত, Past conditional) পিয়া—সং ৩০৫।

(ঘ) সাধারণ ভবিষ্যৎ (Simple Future)—

প্রথম পুরুষ, সাধারণ: সকল দুঃখ যাব (যাইবে) ঘুচে—সং ১৫। মারিবেক (মারিবে) সেই ধারা—সং ৪০।

সম্ভ্রমার্থক : ধন নিতা (লইবেন) বাঁটি'—সং ৩২। ছওয়াল পুছিবা (পুছিবেন) তারা—সং ৪০। কেও না যাইবা (যাইবেন) সঙ্গে—সং ৪৮। যাইতা (যাইবেন) পরী শানের বান্ধিল ঘাটে—সং ৩৬৪। তাইন সে শুনিলে বালী ত্যজিবা (ত্যজিবেন) পরান—সং ৩৭২।

মধ্যমপুরুষ, সাধারণ : দয়া নি করিবায় (করিবে) মোরে—সং ৩।

উত্তম পুরুষ : ডাক দিমু (দিব) কারে—সং ১৯।

(ঙ) ঘটমান বর্তমান (Perfect Progressive)—

প্রথম পুরুষ, সাধারণ : ধাক্‌ধাকাইয়া জলতেছে (জলিতেছে)—সং ১৭৩। করতে আছে (করিতেছে) রূপ ধিয়ান—সং ২০৫। চুইয়া পড়ের (পড়িতেছে) পানি—সং ২৮১। না ছাড়ের (ছাড়িতেছে) কুম্রমতে—সং

২৮৩। প্রাণ বাঁচের (বাঁচিতেছে) না—সং ৩১৫। তন্তর-মন্তর ধরের (ধরিতেছে) না—সং ৩১৫। মনে পড়ের (পড়িতেছে) নি—সং ৩৫১। প্রাণেতে সহের (সহিতেছে) নি—সং ৩৫১।

সম্ভ্রমার্থক : ভুলভ জনম যাইত্‌রা (যাইতেছেন) রে মনা—সং ২৪৪। আইত্‌রা (আসিতেছেন) শ্যাম-কালাচান্দ—সং ৩১৯।

মধ্যম পুরুষ, সাধারণ : আর ওউ যেন দেখ্‌রায় (দেখিতেছ)—সং ১৬। তোমরা নি যারায় (যাইতেছ) গো সখি—সং ২২১। আপনে মরিয়া যাইত্‌রায় (যাইতেছ)—সং ২৪৭।

উত্তম পুরুষ : করতে আছি (করিতেছি) ইন্তেজারী—সং ১৪৭। খালি হাতে যাইয়ার (যাইতেছি)—সং ২৪৬।[১]

(চ) ঘটমান অতীত (Past progressive)—

উত্তম পুরুষ : কৌতূহলে কল-কৌশলে করতেছিলাম (করিতেছিলাম) প্রেম-খেলা—সং ১৭০।

(ছ) পুরাঘটিত বর্তমান (Present perfect)—

প্রথম পুরুষ, সাধারণ : নামের তত্ত্ব জাইনাছে (জানিয়াছে)—সং ১২। স্ত্রী-র কাছে বান্ধিয়া রাখছে (রাখিয়াছে) গো—সং ১১০। কি লেইখাছে (লিখিয়াছে) আমার কপালে—সং ১৮০। সেই পিঞ্জিরায় সুয়া করছে (করিয়াছে) বন্দী—সং ১৯৯। সে হইছে (হইয়াছে) গুরুর চেলা—সং ২০৬। আইছে (আসিয়াছে) না শ্যামকালা—সং ২৫১। আমার খেওয়ানীরে খাইছে (খাইয়াছে) লঙ্কার বাঘে—সং ২৭৫।

সম্ভ্রমার্থক : মাও-বাপ অইছইন (হইয়াছেন) কানা আমার অখনে—সং ৩৫৮।

মধ্যমপুরুষ, সাধারণ : যে সুখে রাইখ্‌ছ (রাখিয়াছ, অপিনিহিতি) যে প্রাণ—সং ৩৩৩।

উত্তমপুরুষ : হইছি (হইয়াছি) দোষী—সং ১০৪।

(জ) পুরাঘটিত অতীত (Past perfect)—

হসন্ত-স্থাপনের উপর শব্দের অর্থ নির্ভর করে। "দিয়ার (=দেও, 'র,' অকারান্ত) হসন্ত হইলে (দিয়ার্) 'দিতেছি'।"—শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা।

প্রথম পুরুষ, সাধারণ : প্রথমে করছিল (করিয়াছিল) পিরিত, হইয়া সদয়—সং ১৬৯। আর আমোদ প্রেম-তরঙ্গে উঠছিল (উঠিয়াছিল)—সং ১৭০।

মধ্যম পুরুষ, সাধারণ : আনবার কালে আনছ্‌লায় (আনিয়াছিলে) বন্ধু আশা-ভরসা দিয়া—সং ২৭২।

উত্তম পুরুষ : একদিন গেছিলাম (গিয়াছিলাম) রে বন্ধু, যমুনার জলে—সং ১৯৩। অতদিন পাল্‌ছিলাম (পালিয়াছিলাম) রে মনিয়া দুধু-কলা দিয়া—সং ২৬৫।

(ঝ) অনুজ্ঞা (Imperarive)—

সামান্য বা বর্তমান অনুজ্ঞা (Simple Imperative) : বলউক-বলউক (বলুক-বলুক) লোকে মন্দ—সং ৯২। বন্ধু থাকউক (থাকুক) সুখেতে—সং ১৬৬। আজুকুয়ার ধেনু গো মাগ্নি রউকা (রহুক) যে বান্ধনে—সং ২৬০। মায়ের পূরউক (পূরিত হউক) মনের সাধ—সং ৩৬৮।

সম্ভ্রমার্থক : আউকা-আউকা (আসুন-আসুন) দয়ার বাবাজী—সং ৩৭২।

ভবিষ্যৎ বা অনুরোধাত্মক অনুজ্ঞা (Future Imperative) : প্রেম-স্বরে ডাইকো (ডাকিয়ো, অপিনিহিতি) মন তারে—সং ১০। শিখো (শিখিয়ো) ঘরের কাম—সং ১৫৯।

(ঞ) পরিশেষে, ক্রিয়ার সহিত ব্যবহৃত পুরুষ সম্পর্কে একটি কাব্যিক বিশেষত্বের কথা উল্লেখ করিতে পারা যায়। লক্ষ্য করা যায়,—কোনো-কোনো স্থানে বাঙলা ভাষার সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের মিল নাই। এই গরমিল মধ্যমপুরুষেই লক্ষ্য করা গিয়াছে। যেমন, তুই রইছ (রহিয়াছ) ভুলিয়া—সং ২২। আন্ধিকালে যাবে তোরা মথুরায়—সং ২৯। তোরা যদি যাও রে মদিনায়—সং ৬৪। আমার বন্ধু আনি দেও গো তোরা—সং ১০৭।

এখানে সর্বনামের তুচ্ছার্থক রূপগুলির সহিত ক্রিয়ার সাধারণ রূপ-গুলি ব্যবহৃত হইয়াছে। অবশ্য বাঙলা কাব্যে অন্যত্রও এই বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। যেমন, রবীন্দ্রনাথে আছে, 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে॥'

১৯. অব্যয় (Indeclinables) :

আর : আর এপারে সেপারে নদী—সং ১।

আর (তার উপর) : একে রাধা অল্পতরু আর তো অবুলা—সং ৩০৭।

এ : ধীরে লামে এ চন্দ্রবদনী—সং ৩০৬।

ওউ (তবু): ওউ যেন না পাইলাম আমার ছায়ব আল্লারে—সং ২৪৩।

কি : কি সোনার বন্ধুরে—সং ৩০৪।

কিনা (কি, কি যেন) : এখন বন্ধে ছাড়িয়া গেল কিনা দোষ জানিয়া—সং ১২২।

কিবা (হয়, নতুবা) : কিবা মোরে সঙ্গে নেও, কিবা মোরে বাঁশী দেও রে—সং ২৫৭।

কিবার (কি, হয়তো, হয়তো বা) : আর আমারে নি তোমার মনে, রে বন্ধু, আছে কিবার নাই—সং ৩৪২। কালাচান্দের খোঁজ কিবার মিলে—সং ২৭৭।

গো : যদি তুমি মইরে গো যাও—সং ৫৭। ভাইবে রাধারমণ গো বলে—সং ৩৩৪।

চাই (তো) : পার করো চাই দয়ার মুরশিদ—সং ২৯৪। আনো চাই বাবাজীর কিতাব, পড়িয়া দেখি আমি—সং ৩৬২।

তছদ্দুক (দূরে যাউক—ক্ষতি নাই, 'ধুত্তোর,' দূর হউক; ইসলামী শব্দ): আর ছইফা ফকিরে বলে, লনীর তছদ্দুক—সং ২৬০।

তে কারণে: তে কারণে স্বর্গভূমি শূন্যেতে ঘুময়—সং ১৭৪।

তে কেনে (তবে কেন) : তে কেনে দুর্দশা ঘটাইত আমার রে—সং ২৮১। তে কেনে রইত মেঘ কদম্ব হেলিয়া গো—সং ৩২৫।

তে' গি' (তাহা হইলে কি) : তে' গি' পাবায় নিস্তার তুমি হ'—সং ৫৭।

তো : করমহীন দেখিয়া লোকে আমারে তো দোষে—সং ৩১১।

তোর : ওরে না পাইলাম তোর আল্লা-নবী আমার কর্মদোইষে—সং ৫৮।

না : এই না মুখে খেয়েছ কতো মুণ্ডা-মিছরী-চিনি—সং ২৬।

নি (কি) : দয়া নি করিবায় মোরে—সং ৩।

নি (যে) : আমি নি অভাগীর নির্লক্ষ্মী—সং ২৭২।

নু (যে) : সুখে নু যাইবা দিন— সং ২৪৪।

বা' (ও) : আর চরখা দিলাম, চরখী দিলাম, আর বা' দিলাম মাল- সং ২৮৫।

মোর : গহীন বনে আজু মোর কে বাজায় মুররী—সং ৩৫৫।

সে : আমার নাই সে কড়ি—সং ১১।

সেও : সেও জিনিসের ভাও জানি না—সং ২।

হ' রে (হায়রে) : হ'রে, কোন্ নাম জপে রে শ্যাম-বন্ধের বাঁশীয়ে— সং ২২০।

হয়রে, হায়রে : হয়রে, ঘন ঘন রাও ছাড়ইন—সং ১৬। আর হায়রে টাকা, হায় রে পয়সা—সং ১৭।

হেন : আপনার সব হেন ছাড়িলাম আপনি—সং ৩০৪।

যুদি (যদি): যুদি না দেইন বিয়া—সং ৩৭১।

রে : কহে ফকির ভেলা রে শাহে—সং ৩০২। আর দশমাস দশ রে দিন উদরে রাখিয়া—সং ২৬০॥

২০. বাগ্‌ধারা (Idioms) :

উঠা : গাঁথিয়া বনফুলের মালা কতো উঠে (হয়) মনে—সং ৩১৪।

করা : এখন তোমার হুঁশ করো—১৭৬। সুজন কাণ্ডারীর নায়ে শূন্যে করে উড়া (উড়ে)—সং ২৯৩। মোরে করবে (দিবে) জনমের খুঁটা—সং ২৯৯। সাড়ীয়ে পিন্দিয়া কইনায় মাথা বেশ করিলা না রে সই—সং ৩৬৪।

খাওয়া : ভাওয়ালী ফালাইয়া আমার সাধুয়ে খাইলা (দিল) লড়—সং ৪৫। আমার ধনী খাইছে ধরা (ধরা পড়িয়াছে)—সং ১১৮। আকুল গেছি খাইয়া (হইয়া)—সং ১৫৩। কতো লাখের ভরা খাইছে (পড়িয়াছে) মারা—সং ২১৬।

ঘটানো : লাঞ্ছনা ঘটাইল (দিল) সোনা বন্ধে—সং ১১২।

ঘুচানো : দুয়ার না ঘুচাও লাজে—সং ৩১০

চাওয়া : বিদেশী নাগর চাইয়া (দেখিয়া) রে মনা, মোরে দিলা বিয়া— ২৪৪।

ছাড়া : ছাপ কাপড়ে ছাড়ছ (দিয়াছ) দাগ লাগাইয়া—সং ১৫৬।

জানা : এখন মোরে ছাড়িয়া গেলায় কিনা দোষ জানিয়া (পাইয়া, দেখিয়া)—সং ১৩১।

জোগানো : জোগায় (করে) মনে সদায় জপের নাম—সং ২৮৩।

টানা : যার জন্যে মন টানে গো—সং ১২৩। যখনে বন্ধে বাঁশীয়ে দিল টান (ফুঁ)—সং ৩২৯।

ঠেকা : ঠেকছি (বন্দী হইয়াছি) ভবের মায়াজালে—সং ১৯। পতঙ্গের মতো সই গো বিপাকে ঠেকছি (পতিত হইয়াছি)—সং ১০৪।

দেওয়া : রোজা দিয়া দিমু (করিব) ঘরের থুনি—সং ৬১। ওরে পন্থে কেন দাও পরিবাদ (বাধা) রে—সং ৮৯। লজ্জা দিলাম (করিলাম) রে দূর—সং ১০৫। কই দিয়াছ (রাখিয়াছ) লুকি' রে আমার সাধের পোষা পাখি—সং ১৫৪। মাতিয়া বিনষ্ট দিল (করিল) ফাত্‌রামি করিয়া—সং ১৭০। নিদ্রা ভুলান দিল (ভুলিল)—সং ২৭৭। যৌবনে দিলা (হইল, আসিল) ভাটি—সং ২৯০। দীঘি দিলাম (খনন করাইলাম) সাত-পাঁচা—সং ৩৭১। আইজ তোমারে পরাজয় দিব (করিবে) রাই-কিশোরী—সং ৩৭৭।

ধরা : পুনর্জন্ম আর না ধরি (গ্রহণ করি)— সং ১৪। পাড়ি ধরলাম অকুল সায়রে —সং ১৮। দয়া ধরো (করো) মুই অধমরে—সং ৫১। ওরে মন, তুমি নিতাই চান্দের সঙ্গ ধরো (নাও)—সং ১৯৪। কাজলে তো শোভা ধরে—সং ৩৬৩। আবে ধরে (মেলে, করে) ছায়া—সং ৩৬৪।

পড়া : তোর কামে পড়িল (হইল) ভুল—সং ১৪৯। কলঙ্ক রাখিতে মোর ভালা না পড়িব (হইবে) তোর—সং ২৯৯।

পরা : মাথায়ে তো তৈল পইরে (দিয়া)—সং ৩৬৩।

পাওয়া : ধর্ ধরার ভেদ পাইছে (করিয়াছে) যে জন সে হইছে গুরুর চেলা—সং ২০৬। কি দোষ পাইয়া (দেখিয়া) বন্ধু গেলায় মু ছাড়িয়া রে—সং ২৭২।

পাতা : যে জন রসিক হও রে পসার পাতিয়ো (করিয়ো)—সং ৩১৯।

বলা : রে বন্ধুয়া, ও বন্ধু, নিবেদন বলি (করি) তোর হুজুরে—সং ২৯৭।

বানানো : এই গীত বানাইয়া (রচিয়া) দিলা খুর্শিদ বাউলা—সং ২৮১।

বাড়ানো : পিরিতি বাড়াও (করো)—সং ৫২। কালননদী বিবাদী হইয়া বাড়াইলা জঞ্জাল—সং ১৩৮।

বাসা : বন্ধে বাসইন ভিন্ (পরে মনে করেন)—সং ১১৪।

ভাঙা : মারিফতের ভেদ ভাঙিতে (করিতে) মুরশিদ আমার বয়রী রে—সং ১৮৮।

ভাবা : দরশন দেও বন্ধু রে দয়া ভাবি' (করিয়া) মনে—সং ২৯৭।

মানানো : আমার বন্ধু পরশমণি—কতো লোহা মানায় (করে) সোনা —সং ১২৬।

মারা : নায়ে মাইলাম পাড়া (নাও ভাসাইলাম)—সং ১৮৬। পলক না মারি' (ফেলিয়া) পন্থ নিরখিয়া থাকি—সং ২৭১। ঘোড়া মারিয়া (চড়িয়া) যাইন দ' রাজা—সং ৩৬৫।

যাওয়া : কমিন্দর লগে দুস্তি কইলে মুখ পোড়া যায় বিনা'গুইনে —সং ৪৪। বৈরাগী যাইব (হইব)—সং ১৬৫। বাঁশীটি বাজাইয়া রে বন্ধু না যাইয়ো নিন্দে (ঘুমাইয়ো না)—সং ৩০৭।

রহা : পড়তে রহো (থাকো) কলিমা—সং ১৪২।

রাখা : ননদীর বিষম জ্বালা—সদায় রাখে (করে) মুখ কালা—সং ২৮৩। কলঙ্ক রাখিতে (ঘটাইলে) মোর ভালা না পড়িব তোর—সং ২৯৯।

লওয়া : অল্প বয়সের জোড় আমার নিলায় (দিলে) রে ভাঙিয়া—সং ৩৩। ও তুমি দয়া করো, প্রাণে মারো, যা লয় (চায়, হয়) তোমার অন্তরে—সং ৭৮। পোড়া কপাল না লয় (হয়) জোড়া—সং ১৫৪।গেল দিন তো লও (অনুসরণ করো) রে পন্থ—সং ২৯১। তোমার বাঁশীর সুরে লইয়াছে (হইয়াছে) খিয়াতি—সং ৩০৭। মনা না লয় ঘর-বাড়ী—সং ৩১১। সেই পানে লয় সমান (অতুলনীয়)—সং ৩৭৮।

লাগা : মন না লাগিল (চাহিল)—সাড়ী খসাইয়া ফালাইলা—সং ৩৬৪।

হওয়া : আনন্দে প্রবেশ হইয়া (করিয়া) শ্রীকুলার হাটে—সং ২৭৮।

বাগ্‌ধারার প্রসঙ্গে প্রবাদমূলক উক্তির কথাও উল্লেখ করা চলে। নীচে তাহার কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল—

থালিত রইল বাড়া ভাত, মুই রইলাম ফাঁকা—সং ১৮। ভরা কলসীর জল কলসীয়ে শুকায়—মায়ে বলে, ওয়রে পুত, যমে লইয়া যায়—সং ২৭। আর আশার গাছে ভাঙা ডালে বাসা বান্ধলায় কেনে—সং ৩৫। ছাইলার আতে কলা দিলে মাও বলিয়া আসব কোলে—সং ৪৪। এগো, পম্থে যাইতে মধুর লোভে গুড় বলি' খাইয়াছি চিটা—সং ১২৮। কারুর মুখে পাকনা আম,—আমার হাতে শুদা ডেঁটা—সং ১২৮। আগে যে বাড়াইয়া প্রেম শেষে দেয় জ্বালা—সং ১৩৩। প্রথমকু পিরিতে মজা,—দ্বিতীয়ে পিরিতি সাজা গো—সং ১৪০। ভক্তিগুণে শিরের কলসী দিনে-দিনে উনা—সং ১৮৯। জনম-ভরা পায়ে ধরা—তবু সঙ্গে নাই সে নিল—সং ২১৫। লাভে-মূলে হারাইলু সকল—সং ২২৫। লাভের পম্থে মূল হারাইয়া হইল বিড়ম্বন—সং ২৩১। পিরিতি অমূল্যধন, যত্নশূন্য থাকে না—সং ২৩৭। হায়, এক চউখে নি কইতে পারে আর চউখের খবর—সং ২৭৬। আপনা ধনকে যত্ন করি' হাতে লও সোনা বইলে—সং ৩৩৫। পরা নি আপন হইব পিরিতের লাগিয়া—সং ৩৫০॥

২১. অর্থের পরিবর্তন (Semantic change) :

(ক) অর্থের উন্নতি (Elevation of meaning)—

-স্বার্থ- শব্দটি নিন্দার্থেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে, যেহেতু ইহা বিশেষ এক-জনের দৃষ্টিকটু উপায়ে লাভ-লোকসানকে নির্দেশ করে। কিন্তু, "বেঁচে আর স্বার্থ নাই"—সং ১৯৬ : এখানে -স্বার্থ- শব্দটি সাধারণভাবে -লাভ- বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে—নিন্দার্থে হয় নাই। অবশ্য -স্বার্থ- শব্দটির বহু চলিত অর্থ ত্যক্ত হইয়া অপর একটি অর্থ বুঝাইতে প্রযুক্ত হওয়ার মধ্যে অর্থের বিস্তারকেও লক্ষ্য করা যাইতে পারে।

(খ) অর্থের প্রসার (Expansion of meaning)—

"লাগাম করইন নাও"—সং ১৬। ঘোড়াকে রোধ করিবার জন্যই লাগাম ব্যবহৃত হয় ; এখানে নৌকার ক্ষেত্রেও তাহা প্রযুক্ত হইয়াছে। "তুমি আইছ রে গৌরাঙ্গ এই বাসরে"—সং ৮০। 'বাসগৃহ' হইতে জাত -বাসর- কেবল 'বিবাহ-বাসর'-কেই সাধারণ ভাবে বুঝাইয়া থাকে। এখানে -পৃথিবী- অর্থে -বাসর- ব্যবহৃত হইয়াছে। "কইয়ো-কইয়ো ওগো দূতী, শ্রীরাধার

করুণা"—সং ৩১৬। দুঃখময়, করুণ ঘটনা বা দৃশ্য শুনিলে বা দেখিলে শ্রোতা বা দ্রষ্টার মনে 'করুণা' জাগে; কিন্তু, এখানে যাহার দুঃখ তাহারই -ব্যথা-কে বুঝাইবার জন্য -করুণা- প্রযুক্ত হইয়াছে,—পুরাতন অর্থের সহিত আর একটি নতুন অর্থ আসিয়াছে বলিয়া অর্থের বিস্তার ঘটিয়াছে। বস্তুর বা ব্যক্তির নিজস্ব বা প্রয়োজনানুরূপ ওজনের অতিরিক্ত ওজন হইলে তাহাকে 'ভারী' বলা হয়; 'আনন্দ' মানুষকে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করে—এই দুই ধারণা হইতে -বিষাদগ্রস্ত- মনকে -ভারী- বলা হইয়াছে: "কিষ্ণকে দেখিয়া রাধার মন হইল ভারী"—সং ৩৩৯। অবশ্য, "যুবতী, ক্যান্ বা কর মন ভারী"—এ বিষয়ে একটি পরিচিত উদাহরণ হইয়া আছে। দুঃখের জ্বালার মধ্যে সান্ত্বনা শীতলতার স্পর্শ আনে—এই ধারণা হইতে বিরহ-জ্বালার 'সান্ত্বনা'-কে -ঠাণ্ডা- বলা হইয়াছে: "প্রেমের হতাশ ঠাণ্ডা করো—একবার দেখা দিয়া"—সং ১৪৬। এখানে -ঠাণ্ডা- উহার নিজস্ব অর্থ ছাড়াও অন্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(গ) অর্থের সঙ্কোচ (Restriction of meaning)—

'জয়ধ্বনি' করিবার জন্য জিহ্বার দ্বারা যে উল্লাসধ্বনির সৃষ্টি করা হয়, (যাহাকে 'জয়কার' বলে), পূর্ববঙ্গে 'উলুধ্বনি' বুঝাইতে তাহাকে 'জোকার' এবং অঘোষধ্বনি ঘোষধ্বনি হইয়া যাইবার ফলে 'জোগার' দেওয়া বলে। যেহেতু 'উলুধ্বনির' উৎস কণ্ঠ এবং উহার সহিত 'সুরের' খানিকটা যোগ আছে, সেই হেতু -জোগার দেওয়া- -জোগার গাওয়া- অর্থে চলিত হইয়াছে: "সখীগণে মিলিয়া তারা মঙ্গল জোগার গায়"—সং ৩৭৭

(ঘ) অর্থের সংশ্লেষ—

"কোন দিগে পড়িতাম নমাজ চাও না বিচারিয়া"—সং৫৫: সাবধানতার সহিত কোনো কিছু অন্বেষণ করিতে হইলে ইষ্ট বস্তুটি ছাড়া আর সবই -বাছবিচার- করিয়া দেখিতে হয়; এই ভাবে -খোঁজা- বা -অন্বেষণ- অর্থে -বিচার করা- চলিত হইয়াছে। এইরূপ "সন্ধানে তুলো পানি"—সং ২২৭: এখানে -সন্ধানে- অর্থ -সাবধানে-, যেহেতু -সাবধানে- কোনো কাজ করিতে হইলে চতুর্দিগের -সন্ধান- লইয়া চলিতে হয়। "কোথায় প্রিয়সী পাবো এই খেদে রয়"—সং ১৭৪: -খেদ- এখানে -চিন্তা-, যেহেতু প্রেয়সীকে না পাইলে মনে -খেদের- সম্ভাবনা আছে। "টেলি দিয়া খুশির মঙ্গল যদি জানে"—

সং ১৭১ : যেহেতু টেলিগ্রামে প্রাপ্ত সংবাদ অনেক সময় -খুশির কারণ- হইয়া থাকে, সেইজন্য -খুশির সংবাদ- অর্থে -খুশির মঙ্গলময়কারণ- জ্ঞাপন করিতে -মঙ্গল- প্রযুক্ত হইয়াছে।

(ঙ) নতুন অর্থের আগমন—

"আন্ধিকালে যাবে তোরা মথুরায়"—সং ২৯ : পরকাল সম্পর্কে আমাদের ধারণা 'রহস্যাবৃত' বলিয়া এবং রাত্রির -অন্ধকারের- সহিত সেই রহস্যের সাদৃশ্য আছে বলিয়া -পরকাল- বুঝাইতেই -আন্ধিকাল- ব্যবহৃত হইয়াছে। এইরূপ, "গোর আন্ধিহারা"—সং ৪০॥

২২. কাব্য-ভাষা :

কবিতার একটি নিজস্ব ভাষা আছে,—কথ্য ভাষা হইতে যাহা অনেকাংশেই পৃথক। কবিতার এই ভাষা অঞ্চল বিশেষেও পৃথক হইতে পারে। শ্রীহট্ট জেলা হইতে প্রাপ্ত গানগুলির মধ্যেও কবিতার সেই আঞ্চলিক ভাষার বিশেষত্ব প্রতিফলিত হইয়াছে। নীচে তাহার কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে—

(ক) বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনিগত কাব্যিক বিকৃতি ; বিশিষ্ট তদ্ধিত-প্রত্যয়ের ব্যবহার। উদাহরণের জন্য সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদগুলি দ্রষ্টব্য।

(খ) বিশেষণের বিশিষ্ট প্রয়োগ—

ওই নাম এমন মধুর-মিঠা--সং ৯। নিতাইর আতের প্রেমডোরি—সং ১০। কেবল একাশর—সং ১৬। বেভুল—সং ১৮। অমায়া সাগর—সং ১৯। অমূল্যি মাণিক—সং ২২। শালের পাগুড়ি—সং ২৬। গুণের ভাই—সং ২৮। পরার দিনের ভাবনা—সং ২৯। নবীন বাসর—সং ৩৩। লাখের সদাগর—সং ৩৩। দয়ার নাথ—সং ৩৪। শিলুয়া বাতাস—সং ৩৫। ও মন সুজনা—সং ৩৭। রাইত হইল রে আন্ধি—সং ৩৯। পাগেলার মন—সং ৪০। নৈরাশ—সং ৪৫। প্রাণ-প্রিয়া—সং ৫৫। সুচিত্র পালঙ্ক—সং ৭৫। যৈবন ডালি—সং ৭৫। সোনা বন্ধু পিওরায়—সং ৮৬। ননদী নৈরাশী গো—সং ৯৩। নবীন বন্ধুয়া—সং ৯৬। কাঞ্চা বাঁশ—সং ৯৭। আন্ধির পুতুলা—সং ১০২। আদরের গুণমণি—সং ১০৬। যৈবতী—সং ১১০। অবুলা বালা—সং ১১২। অকোধিনী বিরহিণী—সং ১১৩। আমি দুখুনী—সং ১১৫। বাঁকা শ্যামরায়—সং ১১৬। পাষাণ-বান্ধা হিয়া—সং ১২৭। কালার

কাল—সং ৩১২। সুজনের পিরিতি—সং ৩১৩। রসের দয়রদী—সং ৩২২। তাপিত অঙ্গ—সং ৩২৩। বেহুঁশে কান্দিয়া মরি—সং ৩২৪। নিমুন্সিয়ে করাত —সং ৩২৭। নন্দের চিকনকালা—সং ৩২৮। চিত্ত-চোরা—সং ৩২৯। নিলাজ কালা—সং ৩৩২। ভাটিয়ল নদী—সং ৩৩২। দইরদী —সং ৩৩৫। রঙ-যৈবন—সং ৩৩৭। মন-মোহিন্ কালিয়া—সং ৩৪০। নতুন যৈবন— —সং ৩৪০। চান্দ মুখের নিশানি—সং ৩৪২। সুখের বাঁশী—সং ৩৪৪। নতুন ফুল, নতুন গাঁথুনি—সং ৩৪৬। চান্দমণি—সং ৩৫০। সুখ চিন্তামণি— সং ৩৫১। আন্ধিয়ারা ঘর—সং ৩৫১। রসের কামিনী—সং ৩৫১। রসের ভমরা, নয়নের কাজল—সং ৩৫২। তিথিবলা চুল—সং ৩৫২। রঙ্গিলা— —সং ৩৫৩। বাঙ্গইন-বিচি, আঙ্গনি পাট—সং ৩৬৪। আবের কাঙ্কই—সং ৩৬৪। সোনালী আছগন, সোনালী জুতা—সং ৩৬৯। খেড়ির ঝিয়াই— সং ৩৭০। মালীয়া ভাই—সং ৩৭০। রছুলগঞ্জের মউলারাণী—সং ৩৭২। চিকনপাটি, বিনন্দ বাসর—সং ৩৭৬।

(গ) ক্রিয়া ও ক্রিয়া-বিশেষণের বিশিষ্ট প্রয়োগ—

উথুলিছে ঢেউ—সং ১। ভাসিয়া ভাসিয়া ফিরি সমদুরের ফেনা—সং ৩৪। কি ধন সাজ্জিলায় ভাই নিদানের লাগিয়া—সং ৬৩। বাঁশীর সুরে প্রাণ বিদুরে—সং ৯৩। ঘরে বঞ্চিতে না পারি—সং ৯৯। তমাল ডালে আমার গলে গো একাত্র (একত্রিত করিয়া) বান্ধিয়া থই—সং ১০৮। মরিয়া যাইতাম ঝাম্পু দিয়া জলে—সং ১০৯। মধুর লোভে কাল ভমরে করছে আনা-যানা—সং ১৩৯। মিছা আশা বঞ্চনি—সং ১৬৮। আমার অঙ্গের নিলায় আধা—সং ২৫৪। শয়নে ভুঞ্জনে—সং ২৭০। দয়াভাবে দুখিনীরে দেও দরশনে—সং ২৭১। হামেশা গুঞ্জরে খণ্ডরানী—সং ২৮৩। পরানি কাম্পে ডরে—সং ২৯২। চুয়া-চন্দন ফুলের মালা গাঁথিয়া যতনে— সং ৩৩১। আচম্বিত ডাকাতি—সং ৩৪৭।

(ঘ) দ্বিতীয়া বিভক্তির অর্থ বুঝাইতে ষষ্ঠী বিভক্তির এবং ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থ বুঝাইতে দ্বিতীয়া বিভক্তির ব্যবহার; ষষ্ঠী বিভক্তির অনাবশ্যক প্রয়োগ; কয়েকটি বিশিষ্ট অনুসর্গ; সম্বোধনপদ; অব্যয়ের বিচিত্র ব্যবহার; বাগ্ধারার বিশেষত্ব ও অর্থের পরিবর্তনের মধ্যে কাব্য-ভাষার বিশেষত্ব ধরা পড়িয়াছে। উদাহরণের জন্য সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদগুলি দ্রষ্টব্য।

(ঙ) বাক্যের মধ্যে সম্বোধনের ব্যবহার কাব্য-ভাষার অপর এক বৈশিষ্ট্য : ডাইল দিলাম, চাউল দিলাম, সাধু রে,আরো দিলাম ঘি—সং ৪৫। নগরে চলিলাম বা' মুরশিদ, তাল্লাস করিয়া—সং ২৬৭। দুখের দুখিলা যতো ও আল্লা, তারারে ফালাইলাম পক্ষ রে—সং ২৭৫।

(চ) নদী ও স্থানবাচক শব্দের ব্যবহার—

নবীন বাসর—সং ৩৩। অনিল জঙ্গলের মাঝে বানাইয়াছি ঘর—সং ৩৪। নিরলে বসিয়া—সং ৩৯। রূপ সায়রে ডুব দিলাম—সং ১২৮। হৃদয়-পুর—সং ১৪৪। সুপন্থ, কুপন্থ—সং ১৪৫। অতি সুখের বালামখানা—সং ১৪৫। সোনাপুরী—সং ১৪৭। শোকের ঘর—সং ১৪৮। ছিরিকুলা—সং ১৮২। রঙপুরের বাজার—সং ১৮৩। রঙ্গের বাজার—সং ১৮৬। লাহুলিয়া পন্থ—সং ১৮৯। লাহুল দরিয়ার খেওয়া—সং ১৯৮। রাজাপুর—সং ২০০। রঙ-মহল—সং ২০৫। শ্রীপুর—সং ২২৩। নীল সায়র—সং ২২৩। উলাই-নালাই দুইটি নদী—সং ২২৪। ধিয়ানপুর—সং ২২৫। নিলয়—সং ২৩৮। ভবের বাজার—সং ২৪৬। লাল রফং—সং ২৫৩। তিরতিয়া বানারসী—সং ২৫৮। ছিরিপুর—সং ২৬৩। লাহুতের বাজার—সং ২৬৩। নিগুড় বন—সং ২৮০। ইঙ্গুলা-পিঙ্গুলা ঘর—সং ২৮৮। হিংগল মন্দির—সং ৩০৬। কালিন্দ্রীর জল—সং ৩২৬। জারণবীর ঘাট—সং ৩২৭। কদমী মোকাম—সং ৩৫৩। অপূরা বিরিন্দাবন—সং ৩৫৫। লঙ্কার বণিজ—সং ৩৬১। রঙন গোকুল—সং ৩৭৯। নদীয় (নদী)—সং ৩১৯। সরুয়া নদী—সং ৩৫৯।

(ছ) পশু-পাখী, বৃক্ষ-লতাবাচক শব্দের ব্যবহার—

সোনার ময়না—সং ১৪৯। মন-চোরা মনিয়ার পাখী—সং ১৫৬। চিকনী কদম্বের ডাল—সং ২৬০। আজুকুয়ার ধেনু—সং ২৬০। পুষ্করিণীর চারি পাশে চাম্পা-নাগেশ্বর—সং ৩১৩। শিষ ফুল—সং ৩৬৩। বেওনা ফুল—সং ৩৬৪। উড়ফুল, মালন্তী ফুল—৩৬৭। বল-পিরিতের ডাল—সং ৩৭০। সং মালতী— ৩৭৯।

শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীত ঃ সংগ্রহ

॥ প্রার্থনা ও আত্মনিবেদন ॥

। ১ ।

নয়ান ফিরাও, রূপ দেখি— বা'[১] দয়াল বন্ধু,
নয়ান ফিরাও, রূপ দেখি ॥

আর এপারে সেপারে নদী—
না জানি সাঁতার।
হস্তে ধরি' করো পার
আমি অধম গুণাগার[২] ॥

আর এপারে সে পারে নদী—
উথুলিছে ঢেউ।
কাকুতি-মিনতি করি
সঙ্গে নেয় কেউ ॥

অধীন এক্রামে বলে,
মম রাজা ওরে ঃ
খেওয়া ঘাট চিনিয়া কারয়ো পার—
আমার ঠাকুর জগন্নাথ ॥

১ হে ২ পাপী

। ২ ।

আচম্বিতে[১] ডুবল তরী, দয়াল হরি,
তরাও যদি নিজ গুণে—
আর আমার কেও[২] নাই তুমি বিনে ॥

সাধের একখান তরী ছিল
অযতনে বিনাশিল।
বান্ধ তার সব ছুইটে গেল[৩] —
জল চুয়ায় রাত্র-দিনে ॥

জিনিস কিনলাম ষোল্ল আনা
বেপার[৪] করিতাম দুনা।
সেও জিনিসের ভাও[৫] জানি না—
আসল লইয়া পড়িল টানাটানি।

। ৩ ।

কাকুতি-মিনতি করি' ডাকি যে তোমারে—
দয়াল বন্ধু, দয়া নি করিবায় মোরে[৬] ॥

দিনে-রাইতে আছি তোমার দয়ার কাঙাল অইয়া[৭] -
এই দয়া করো মোরে, বাঁচাও দেখা দিয়া ॥

হাছন রাজার মনের আশা— থাকত[৮] চরণতলে—
ছাড়ব না, ছাড়ব না তোমায়, কোলে তুলি' লইলে

---

১ হঠাৎ ২ কেহ ৩ তাহার সব বন্ধন ছুটিয়া গেল ৪ লাভ ৫ বাজার দর
৬ আমাকে কি দয়া করিবে ৭ হইয়া ৮ থাকিবে

বড়ো চৌতাল

এসে দাঁড়াও হে ত্রিভঙ্গ বেশে
ওহে রাধার নাথ ;
ওরে কিশোরী লইয়া বামে—
আরে দাঁড়াও হৃদয়-মূলে ॥

ওরে যুগল-কিশোর রূপ—
রূপ হেরিব নয়নে ;
ওরে, ওহে রাধার নাথ হে,
ওহে রাধার নাথ,
ওরে যুগল-কিশোর রূপ
রূপ হেরিব নয়নে ॥

॥ ঝুমুর—একতালা ॥

। ৫ ।

হরি, সুখে রাখো কিংবা দুখে রাখো—
আমার তাতে মনে কিন্তু ভয় নাই ॥

ওহে কাঙাল করে রাখো—
কিংবা দাও রাজত্ব,
থাকে যেন তোমার চরণে দাসত্ব ।
হরি হে, ওহে দয়াময় হরি,
দিবানিশি আমি থাকি যেন মত্ত—
রসনাতে তব গুণগান ॥

ওহে প্রজ্বলিত হুতাশনে থাকি—
তবু যেন ওই নাম হৃদয়েতে রাখি ;
দিবানিশি আমার ঝুরে দুটি আঁখি—
তোমা ভিন্ন আমার কেহ নাই ॥

॥ ঝুমুর—একতালা ॥

। ৬ ।

মুখে হরেকৃষ্ণ বলো একবার—
এমন বিপদ-ভঞ্জন হরির নাম
ভুলো না মন আমার ॥

আসিলে শমন, করিবে বন্ধন
আপনার বলে টেনে নিবে।
ভাই-বন্ধু যারা—পলাইবে তারা,
কেহ নাই কাছে রবে ॥

॥ ঝুমুর—একতালা ॥

। ৭ ।

বল্ রে বল্, হরি বল্—বদন ভইরে[১]।
ভাইরে, যাবে ক্ষুধা,
নাম-সুধা পান করো রে—
প্রাণ ভইরে ॥

---

১ ভরিয়া

ভবে ভয় না র'বে—
হরির নামের গৌরবে ;
ভাইরে, অনায়াসে যাবে চইলে[১]
ওই ভবার্ণবে।
পারের মূল্য চায়না রে ভাই,
বিনামূল্যে হরি পার করে ॥

'হরি' বল্ রে আরে পাষাণ মন—
একবার 'হরি-হরি' বল্‌রে ;
পাষাণ মন রে ॥

॥ ঝুমুর—একতালা ॥

। ৮ ।

দয়াময় হরি, 'দয়াময়' ব'লে
ডাকরে ও মন-রসনা ;
যারে ডাকলে অঙ্গ শীতল হবে—
দূরে যাবে ভব-যন্ত্রণা ॥

অসার মহিমা দূরে পরিহরি'
দিবানিশি মুখে বলো 'হরি-হরি'।
নামে ভক্তি, নামে মুক্তি—
নামে পূরে মন-বাসনা ॥

১ চলিয়া

আরে দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে
গণার দিন তো যায় রে চ'লে ।
দিন থাকিতে দীননাথকে
ডাকুরে ও মন-রসনা ॥

অজ্ঞান মন,
কেন ভুলে রইলায়[১] রে ।
দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে
গণার দিন তো যায় রে চ'লে

। ৯ ।

হরির নাম লও মন রে,
ওই নাম এমন মধুর মিঠা ।
এমন মধুর মিঠা বা' নাম
এমন মধুর মিঠা ॥

নাম তরুয়া বটে জন্ম—
এক গাছে তিন কোঠা ।
পঞ্চডালে নয় মণ ধরে
বিংশতি ফুল ফোটা ॥

আর রসিক এবার মর্ম জানে
অরসিকের লেখা ।
স্বরূপচান্দে কয়—
ধর্মজ্ঞানী—ভক্তি পথে কাঁটা ॥

---

১ রহিলে

। ১০ ।

হরির নাম বিনে গতি নাই রে—
প্রেমস্বরে ডাইকো[১] মন, তাঁরে ;
ডাইকো মন তাঁরে, ডাইকো মন তাঁরে-
বইসে[২] ডাইকো মন, তাঁরে ॥

আর হরির নামের যে মহিমা
জানে রাই-কিশোরী।
ওরে, তুলসী পাতায় লেইখে[৩] নাম—
নেক্তির উজন করে[৪] রে ॥

আর হরির নামের যে মহিমা
জানে প্রহ্লাদ ভক্তে।
ওরে, অগ্নিকুণ্ডে পইড়ে[৫] প্রহ্লাদ—
'হরি হরি' বলে রে ॥

আর হরির নামের যে মহিমা
জানে নিতাই চান্দে।
ওরে নিতাইর আতের[৬] প্রেম-ডোরি
যে দিগ ফিরাও, ফিরে রে ॥

॥ ঝুমুর—একতালা ॥

। ১১ ।

হরি, দিন তো গেল, সাঞ্জা[৭] হল—
পার করো আমারে।
তুমি পারের কর্তা জেনে বার্তা
ডাকি হে তোমারে ॥

---

১ ডাকিয়ো ২ বসিয়া ৩ লিখিয়া ৪ নিক্তিতে ওজন করে ৫ পড়িয়া ৬ হাতের ৭ সন্ধ্যা

আমি আগে আইসে[১]
হরি, রইলাম বইসে[২] ;
হরি হে, ওহে দয়াময় হরি,
সে যে শেষে আইসে আগে গেল—
আমি রইলাম বসে ॥

হাতে কড়ি আছে যার
হরি তারে করো পার ;
হরি হে, ওহে দয়াময় হরি,
কড়ি আছে যার—তারে করো পার—
আমার নাই সে কড়ি, দীন ভিখারী
দেখ ঝোলা ঝাইড়ে[৩] ॥

॥ ঝুমুর—একতালা ॥

। ১২ ।

মধুর হরির নামের তুল্য ধন
কি জগতে আছে—
ওই নাম জপে হরি-ত্রিপুরারি
শমনকে জয় কইরাছে[৪] ॥

ভাইরে, হরির নাম সত্য—
ওই নাম পরম পদার্থ ;
'হরি' হইতে 'হরিনামে' অধিক মাহাত্ম্য ।
ওই নাম সত্যভামা ব্রত কইরে[৫]
নামের তত্ত্ব জাইনাছে[৬] ॥

১ আসিয়া ২ বসিয়া ৩ ঝাড়িয়া ৪ করিয়াছে ৫ করিয়া ৬ জানিয়াছে

নামের প্রমাণ দেখ না—
হরি-ভক্ত সুধন্বা ;
তপ্ত তৈলে বইসে[১] করে হরি সাধনা
ও তার মুণ্ড হইল শমনজয়ী
শিবের গলে রইয়াছে ॥

ভাইরে, এ ভব-সংসার—
মিছা আইসা-যাওয়া সার ;
ভেবে দেখ্‌রে অবোধ মন,
গতি নাইরে আর ।
অতি যতন কইরে পরম রতন
দয়াল নিতাই আইনাছে[২] ॥

॥ লোভা ॥

। ১৩ ।

হরি-নামের মালা
নিতাই দিল আমার গলে ঃ
হরির নাম মন্ত্র নিব—
স্নান ক'রে আজ গঙ্গাজলে

জাহ্নবীর মৃত্তিকায়—
হরি-নাম লেখব গায় ।
সাধুর পদধূলি মাথে
মাখব গায় কতূহলে ॥

১ বসিয়া ২ আনিয়াছে

॥ মালসী কীর্তন ॥

। ১৪ ।

শুনো গো মা অন্নপূর্ণা,
এ বাসনা মনে করি—
যেন কাশীতে প্রাণ পরিহরি ॥

কাশী বলে যাত্রা কইরে[১] —
কেও যদি যায় পথে মইরে[২] :
শমন তারে ছঁইতে[৩] নারে
রক্ষা করেন ত্রিশূল-ধারী ॥

বরং খাবো ভিক্ষা ক'রে—
কাশী-বাসীর দ্বারে দ্বারে :
যদি যাই কাশীতে মরি
পুনর্জন্ম আর না ধরি ॥

চিকনের ওই মিনতি—
শুনো গো মা ভগবতি :
অন্তিম কালে যুগল চরণ
দিয়ো গো মা বিশ্বেশ্বরি ॥

॥ মালসী কীর্তন ॥

। ১৫ ।

মন, কেন তুই ভাবিস মিছে—
যার মা আনন্দময়ী
নিরানন্দ তার কি আছে ॥

১ করিয়া ২ মরিয়া ৩ ছুঁইতে

পাঁচ-পীরের পূজারী হইয়ে
পড়েছিস তুই বিষম প্যাঁচে।
কেবল 'আমি-আমার'—এ দুটো ছাড়্,
সকল দুঃখ যাব[১] ঘুচে ॥

। ১৬ ।

মিছা দুনিয়াই দেখি ভাই রে, মিছা বাড়ী-ঘর।
দুই আখি মুজিয়া দেখি—
কেবল একাশর[২] রে ॥

আর বড়ো বাড়ী, বড়ো ঘর,
বড়ো কইলাম আশা।
হয়রে, দুই আখি মুজিয়া দেখি—
মাটির তলে বাসা রে ॥

আর ওউ যেন দেখ্‌রায়[৩] তিরি-পুত্রু
কেবল আবের ছায়া[৪]।
হয়রে, দুই আখি মুজিয়া দেখি—
মিছা ভবের মায়া রে ॥

আব ঘাটে আইয়া[৫] চকিদারে
লাগাম করইন নাও[৬]।
হয়রে, ঘন-ঘন রাও ছাড়ইন
জলদি করি' আও রে ॥

আর কইন তো ফকির ফয়জুল্লা শা'য়
দরিয়ার পার বইয়া :
হয়রে, পারইতাম-পারইতাম করি'
দিন তো যায় মোর গইয়া[৭] রে ॥

---

১ যাইবে ২ একাকী ৩ দেখিতেছ ৪ মেঘের ছায়া ৫ আসিয়া ৬ নৌকা ছাড়িবার জন্য প্রস্তুত হন ৭ চলিয়া

। ১৭ ।

পয়সা-শূন্য দেখি' লোকে ঘৃণা করে রে
হায়রে, আমার কর্মদোষে রে।
দারুণ পয়সায় কলঙ্কী কইল সংসারে ॥

আর হাতে নাইরে পয়সা-কড়ি
কিসে কি করি—
পয়সা ছাড়া জী'তে মরা, প্রাণরাখা হয় ভারী।
ওরে, হায়রে টাকা, হায়রে পয়সা,
এ দুর্দশা কইলে মোরে রে ॥

আর হায়রে টাকা, হায়রে পয়সা,
হায়রে জমিদারী—
কে হরিল, কোথায় নিল, পাইনা তালাস করি'।
দিন সুদিন—হইল কুদিন
কি করি আজলের[১] দোষে রে ॥

আর পয়সা ঘোড়া, পয়সা জোড়া,[২]
পয়সা বাবুগিরি—
লোকসমাজে যাইতে নারি, কলঙ্ক হয় ভারী।
ওরে, আত্মীয়-স্বজন নিজ পরিজন—
কেও চাহে না সমাদরে রে ॥

আর শেখ আব্দুল ওয়াহিদ বলে—
লাঞ্ছিত সংসারে :
পয়সার আশায় ভালোবাসা বাসে পরস্পরে।
ওরে, আমোদ-প্রমোদ, মান-কুলমান
সকল পয়সার জোরে রে ॥

১ ভাগ্যের ২ পোষাক

॥ মনঃশিক্ষা ॥

। ১৮ ।

মন-মাঝি ভাই,
হইয়াছ রে বেদিশা,[১] দেওয়ানা[২] ।
বেদারে[৩] চালাইছ নৌকা, দেখ না ॥

ভব-সাগরের নাইরে কূলাকূল ;
শরাব-খোরের মতো হইয়াছ বেভুল ।
ভালা কইলে মন্দ বুঝ—
ওউ নি[৪] তোর জাতের ধারা ॥

পাড়ি ধর্‌লাম অকুল সায়রে ;
ঠিক রাখিয়ো ভাই—
আলির কাঁটা[৫] পড়্‌বায়্‌রে হেইলে[৬] ।
চাকে[৭] ডুবাইব নৌকা, পাতালে কর্‌ব খেলা ॥

তোমার গোপাল বড়ো চোর ;
তির্‌জগতে[৮] দেখছি না সই—
এমন ধান্ধা-খুর ।
সর-লনী-মাখন খাওয়া, পিছ্‌ দুয়ারে সামাইয়া

১ দিশাহীন ২ পাগল ৩ নৌকার পথ ছাড়িয়া বিপথে, বে-ধারে ৪ এই কি
৫ নৌকার হাল ৬ হেলিয়া পড়িবে ৭ ঘূর্ণিচক্রে ৮ ত্রিজগতে

আছিল মোর নছিবের লেখা—
থালিত রইল বাড়া ভাত,
মুই রইলাম ফাক্কা।
গোপাল বলে, মোর কপালে
আছিল বন্দের ছাটা॥

। ১৯ ।

মন, তোরে কেবা পার করে ;
কান্দিয়া বেয়াকুল হইলাম ভব-নদীর পারে আমি
অমায়া[১] সাগরে॥

নাও আছে, কাণ্ডারী নাইরে
মাঝি নাইরে এই পারে।
ও মাঝি, তোর নাম জানি না—
ডাক দিমু কারে॥

অসময়ে দিন কাটায়ে
কুসময়ে আইলাম নদীর ধারে।
ওই নদীতে আছে কুম্ভীর—
ধরিয়া খাইব[২] মোরে॥

মস্তান[৩] ইদং শা'য় বলে—
ঠেকছি ভবের মায়ার জালে।
আশায় আশায় বইসে[৪] থাকি
ভব-নদীর পারে॥

১ মায়াহীন ২ খাইবে ৩ পাগল, ভাবোন্মাদ ৪ বসিয়া

। ২০ ।

ওরে, মন-চাষা, তোর ক্ষেতে দেও রে চাষ।
ওয়রে, নিচিন্তে[১] বসিয়া রইলায়[২] —
ফিরিয়া ঘর না কইলায় তালাস[৩] ॥

আর সুদিন গেল, দুর্দিন আইল, রে পাষাণ মন,
আইল দারুণ আষাঢ় মাস রে।
হায়রে, কাম নদীতে ঢেউ উঠিয়া, রে পাষাণ মন,
আমার কইল সর্বনাশ রে ॥

আর তিন পা' জমি-জোত খাই, রে পাষাণ মন,
প্রেমের না লাগিল বাতাস।
হায়রে, আজি কেন তোর জমিনে, রে পাষাণ মন,
প্রেমাঙ্কুর পরকাশ ॥

আর বারে বারে কই তোরে, রে পাষাণ মন,
আমার কথা না কইলায় বিশ্বাস রে।
হয়রে, আজি কেনে তোর জমিনে, রে পাষাণ মন,
নিলামের নিকাশ রে ॥

১ নিশ্চিন্তে ২ রহিলে ৩ তল্লাস করিলে না

। ২১ ।

সনের খিরাজ[১] রইলে বাকী
উশুল[২] নাই তৌজি-চিঠায়[৩] ।
দেখ মন, পড়িল বাকী জায় ॥

মনরে, জোতিয়া খাইলায়[৪] জমি বাড়ী
জমার করো কি উপায় ।
এই যে দিন পলে ছিন[৫]
তোমার লাটের তারিখ গইয়া[৬] যায় ॥

মনরে, জমির জমা সনে-সনে
আদায় করনা চায়[৭] ।
আবো দেখ—রাখতে হইল
ছাড়িলে না পারা যায় ॥

মনরে, জমিদারের জমিদারী
রাখিতে বিষম দায় ।
জমা উশুল না হইলে
তাল্লুক লিলাম[৮] ডাকায় ॥

মনরে, অধীন হরপানে কয়—
তোমার কি হইব উপায় ।
জমিতে দাইখ্‌লা[৯] নাই মোর
জমা না হইল আদায় ॥

---

১ খাজনা ২ ওয়াশিল ৩ খাজনাব তালিকা, ফর্দ ৪ জোত কবিয়া খাইলে ৫ তোমার সঙ্কটের দিন আসিযা পড়িল ৬ চলিযা ৭ করিতে হইবে, করা চাই ৮ নিলাম ৯ দখল, দাখিলা

। ২২ ।

অজ্ঞান মন রে, তুই রইছ ভুলিয়া,—
রইছ ভুলিয়া, রইছ ভুলিয়া ॥

আর লাভ করিতে আইলাম ভবে
মা'জনের[১] ধন লইয়া।
এগো, লাভে-মূলে সব খোয়াইলাম
কামিনীর সঙ্গ পাইয়া—
যার লাগিয়া ॥

আর অমূল্যি মাণিক আইলায়[২]
সঙ্গেতে লইয়া।
এগো, বেভুলে হারাইলায়[৩] তারে
সংসারে মজিয়া—
যার লাগিয়া ॥

আর ভাইবে রাধারমণ বলে—
নদীর কূলে বইয়া।
এগো, যে ভাইয়ে জানিছে হিসাব
যাইবে পার হইয়া—
যার লাগিয়া ॥

। ২৩ ।

মিছা ধান্দাবাজী—এ সংসার—
মন রে, ভরসা করো কার ॥

১ মহাজনের ২ আসিলে ৩ হারাইলে

মন রে, মইলে নিবায় কি[১] —
মাটির কলসী, আষ্ট গণ্ডা কড়ি রে ;
নিবায় ভাঙা এক চাটি[২] রে—
ভাঙা চাটি হইব[৩] প্রাণের সার ॥

মন রে, ভাই-বন্ধু-জন
কেওই নায়[৪] আপন ;
মরলে করে এই পরামিশ[৫], বাঁটিয়া নিত[৬] ধন-
বাঁটিয়া নিত,—টানিয়া করত ঘরের বার ॥

মনরে, নিয়া নদীর পার
করিবা সংহার।
কোথায় গেলা ভাই বন্দু, কোথায় পরিবার—
শরত[৭] মইলে টানিয়া করব[৮] ঘরের বার ॥

। ২৪ ।

পিঞ্জিরা ছাড়িয়া কোথাও যাও, রে সোনার ময়না,
ও ময়না, পিঞ্জিরা ছাড়িয়া কোথায় যাও ॥

আইব[৯] রে হুজুরী পে'দা,[১০] নিব[১১] রে বান্ধিয়া।
তিরি-পুত্র-ভাই-বেরাদর উঠিবা[১২] কান্দিয়া ॥

এই ভবের জিন্দেগী[১৩] যেমন পৌস মাসের খুয়া[১৪]।
পড়িয়া রইব[১৫] খালি পিঞ্জরা, উড়িয়া যাইব[১৬] সুয়া

১ মরিলে লইবে কি ২ চাটাই ৩ হইবে ৪ কেহই নয় ৫ পরামর্শ ৬ লইবে
৭ শরৎ—পদকর্তা (?) ৮ করিবে ৯ আসিবে ১০ হুজুরের পেয়াদা ১১ লইবে
১২ উঠিবেন ১৩ জীবন ১৪ কুয়াসা ১৫ রহিবে ১৬ যাইবে

জীবন ভরিয়া কান্দ্‌লাম পরার কান্দন।
একবার না কান্দিলাম থাকিতে জীবন॥

নাকিছ[১] ইরপানে বলে,—নদীয়ার কূলে বইয়া[২]।
বেবথা জীবন গাওয়াইলাম—চোরের ছলা বইয়া[৩]॥

। ২৫ ।

তোমার মরণ-কথা স্মরণ হইল না, হাছন রাজা,—
মরণ-কথা স্মরণ হইল না॥

আর মাটির বান্ধা[৪] দালান-কুঠি—
প্রেমের বান্ধা হিয়া।
তুমি যে মরিয়া যাইবায়[৫] —
মোরে কারে দিয়া॥

আর মাটির বান্ধা দালান-কুঠি
রইবে রে পড়িয়া।
এই দম[৬] ছুটিয়া গেলে—
মাটির তলে বাসা॥

আর তিরি-পুত্র-ভাই-বেরাদর
রইবা রে দুনিয়া।
এই দম ছুটিয়া গেলে—
সঙ্গে না যাইবা[৭]॥

---

১ নিকৃষ্ট, অধম ২ বসিয়া ৩ বোঝা বহিয়া ৪ মাটি দিয়া বাঁধানো, বানানো ৫ যাইবে
৬ প্রাণ ৭ যাইবেন

। ২৬

মইলে কেও[1] সঙ্গে যাবে নারে—
রইল তোর সাধের দোকানদারী ;
এই না মুখে খেয়েছ কতো মুণ্ডা[2]-মিছরি-চিনি
তোমার সেই মুখে আজ জ্বেলে দিবে
জলন্ত আগুনি ॥

এই না মাথায় বেঁধেছ কতো
শালের পাগুড়ি।
সেই মাথা আজ শ্মশান-ঘাটে
করবে গড়াগড়ি রে ॥

কেও কাটে ঝাড়ের বাঁশ
কেও পাক্‌কায় দড়ি।
চারি জনে কাঁধে করি'
বলবে 'হরি হরি' রে ॥

। ২৭ ।

কে তোর আপন, রে মনা,
কে তোমারি পর ;
মইলে সমন্দ নাই[3],—ঘরের বহির কর।
মনা, তুই বহিয়া যা রে ॥

মনা নি রে ভাই,
ভরা কলসীর জল কলসীয়ে শুকায়।
মায়ে বলে, ওয়রে পুত যমে লইয়া যায় ॥

১ মরিলে কেহ ২ মণ্ডা ৩ মরিলে সম্বন্ধ নাই

মনা নি রে ভাই,
আড়িয়ে কান্দে, পড়িয়ে কান্দে,[১] —
কান্দে সোদের ভাই ;
আজল বেলওয়ায় কান্দইন,[২] আরাইলাম[৩] গোঁসাই।

মনা নি রে ভাই,
বাদশায় বাদশাই করইন—
সামনে খাড়া উজির ;
রইয়া রইয়া কর বিচার—নছিবের[৪] খাতির ॥

মনা নি রে ভাই,
কইন তো ফকির ইরপান আলী—
বুঝলাম দুনিয়ার ভাও[৫] ;
নিরাই দেখি[৬] ধরিয়ো পাড়ি—সমদুর হইতায় পার[৭]

। ২৮ ।

পাষাণ মন রে, তোর কে আছে,—
ভাব কইরা দেখ্[৮]।
দেহার মাঝে ভাব কইরা দেখ্ ॥

আর ভাই তো আপ্না নয় রে
একই সিন্দুর[৯] কায়া[১০]।
এগো, পরার নারী ঘরে আইন্লে[১১]-
ছাইড়লাম ভাইয়ের মায়া রে ॥

১ পাড়া-পড়শীর লোক কাঁদে ২ প্রিয়তমা পত্নী কাঁদেন ৩ হারাইলাম ৪ নসিবের, ভাগ্যের ৫ গতিক ৬ নিস্তব্ধ দেখিয়া (নৌকা চালনা করিয়ো) ৭ সমুদ্র পার হইতে পারিবে ৮ ভাবনা করিয়া দেখ ৯ (?) ১০ দেহ ১১ আনিলে, আনিয়া

আর স্ত্রী তো আপ্‌না নয়,
পুরুষের কামাই খায়।
ওরে, কটু মুখে কথা কইলে—
রাঁড়ী অইত[১] চায় রে ॥

ঘরের কোণের বাঁ' ঝাড়,[২]
সে তো গুণের ভাই।
ওরে, জী'তে[৩] লাগে ঘরের কাজে—
মইলে[৪] সঙ্গে যায় রে ॥

। ২৯ ।

গুরু ভজ রে, দিন যায়,
বসিয়াছ মন কারি আশায় ॥

মনরে, আপনার আতে[৫] ইচ্ছা করি'
বেড়ি দিলাম দুইয়ো পায়।
এগো, মাকড়ের আউসে[৬] পেঁচ লাগাইয়া
ঠেকিয়াছে মন আউলা[৭] সুতায় ॥

মনরে, পুত্র যে জন হয় রে সুজন
ধন্যি গায় মাতা-পিতায়।
ওরে, শরীল ঝ'রে আসলে[৮]
ডাক দিয়া যমরে বিলায় ॥

১ বিধবা হইতে ২ বাঁশ ঝাড় ৩ জীবন কালে ৪ মরিলে ৫ হাতে ৬ মাকড়সার জালে ৭ এলো ৮ শরীর ঝরিয়া আসিলে

মনরে, শ্রীনাথ বলে,
আন্তিকালে[১] যাবে তোরা মথুরায়।
ওরে, আমার দিন তো যায়রে শোকে
পরার দিনের ভাবনায় ॥

। ৩০ ।

পাইয়া কুমতির সঙ্গ
মন-মাতঙ্গ সদায়[২] ঘুরে।
সদায় থাকে রাগের ঘোরে-
মন-মাতঙ্গ সদায় ঘোরে।

রসিক যারা চইলে[৩] গেল—
আমায় সঙ্গে নিল না রে ॥

। ৩১ ।

শুন মন, তোমারে বলি—
পড়ো গি'[৪] গৌরার ইস্কুলে।
হেলায়-হেলায় দিন গওয়াইলে[৫]
কষ্ট পাবে শেষকালে ॥

আজি রাত্রি পাবে কষ্ট,
লেখা যদি করো নষ্ট।
চিনলে না রে ও পাষাণ-মন,
বুঝলে না রে ও পাষাণ-মন,
মূর্খ বলি' দিবে গালি ॥

---

[১] শেষ দিনে [২] সর্বদাই [৩] চলিয়া [৪] গিয়া [৫] কাটাইলে

ছাত্র ছিল রূপ-সনাতন
সে জানে লেখারি উজন[১]।
একূল-ওকূল সেকূল গেল,
ভবের আশা কয়দিন র'ল,
শুন মন, তোমারে বলি।

ভেবে চন্দ্রদাসে বলে—
মানব-জনম গেল বিফলে।
একূল-ওকূল দুকূল গেল,
মুখে রাধা-কৃষ্ণ বলো,
শুন মন, তোমারে বলি॥

। ৩২ ।

ওরে, আর কেহই নাইরে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ বিনে;
আর শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ বিনে, শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ বিনে
শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ বিনে॥

আর বাপ তো আপনা না হয়
কেবল জন্মদাতা।
ওয়রে[২], গুরুতো আপনা হয় রে
কয় রে মর্মকথা রে॥

আর ভাই তো আপনা না হয়
সম্পত্তির সাথী।
মইলে করইন পরামিশ[৩]
ধন নিতা বাঁটি'[৪] রে॥

১ ওজন ২ ওরে ৩ মরিলে পরামর্শ করেন ৪ ধন বাঁটিয়া লইবেন

আর তিরি[১] তো আপনা না হয়
স্বামীর কামাই খায়।
ওরে, দুই-চাইর কথা টান কহিলে[২]
রাঁড়ী হইত[৩] চায় রে ॥

আর কোটিচান্দ বাউলে বলে—
শুনরে কালিয়া :
হয়রে, কামাই কইলে খাইবার আছইন[৪]
সঙ্গে যাইবার নাইরে ॥

। ৩৩ ।

আল্লা, দরদ নাই নি তোর[৫] —
বানাইয়া ভাঙ্গিতায়[৬] পারো নবীন বাসব

আর মায়ের কোলের যাদু, বা' আল্লা[৭] ,
নিলায়[৮] রে কাড়িয়া।
অল্প বয়সের জোড় আমার
নিলায় রে ভাঙ্গিয়া ॥

আর কেওররে[৯] বানাও বা' আল্লা,
লাখের সদাগর।
মুই অধম রে মাগিয়া[১০] ফিরাও—
পরৃতি[১১] ঘরে ঘর ॥

১ স্ত্রী ২ কড়া করিয়া বলিলে ৩ বিধবা হইতে ৪ রোজগার করিলে খাইবার আছেন ৫ তোর কি দরদ নাই ৬ ভাঙ্গিতে ৭ হে আল্লা ৮ লইলে ৯ কাহাকে ১০ ভিক্ষা করাইয়া ১১ প্রতি

আর কইন নি ফকির আব্দুল হুছন
দিলেতে ভাবিয়া—
না জানি কি হইব[১] আমার
কয়বরের ভিত্তর[২] ॥

। ৩৪ ।

মন, তোরে পাইলাম না রে
বানাইতে রতন।
আল্লা, আমারে ডুবাইতে চাও—
ডুবিমু দুইজন ॥

ভাসিয়া-ভাসিয়া ফিরি
সমদুরের[৩] ফেনা।
কতো দিনে দয়ার নাথে
লওয়াইবা কিনারা ॥

অনিল[৪] জঙ্গলের মাঝে
বানাইয়াছি ঘর।
আমার ভাই নাই, বান্ধব নাই—
কে লইত খবর ॥

মুশরিকে-মুগরিবে[৫] বা' আল্লা
সামাইল জনম।
তার মাঝে প্রবেশিলা—
হুব[৬] আর লোভ ॥

১ হইবে ২ কবরের ভিতরে ৩ সমুদ্রের ৪ নিবিড় ৫ পূর্বে-পশ্চিমে ৬ প্রেম

হুবে কইল বন্দী মোরে—
লোভে কইল তল।
কাতর হইয়া কইন—
অনাথ আবজল ॥

। ৩৫ ।

বুঝাই কতো শতবারে, বুঝ্ মানো না কেনে—
রে ও ভুলা মন, পাইছে নি শয়তানে ॥

আর হইয়াছ শয়তানের ঘোড়া—
বসিয়াছে গর্দানে।
এগো, মারিলে গুরুজের[১] কোড়া[২]
দৌড়াও রাত্রদিনে ॥

আর আশার গাছে ভাঙা ডালে
বাসা বান্ধলায়[৩] কেনে।
এগো, লিলুয়া বাতাসে[৪] কোন্ দিন
ঘিরাইব জমিনে[৫] ॥

আর খাইয়াছ বেহুঁশের গুলি
ধনে আর যৌবনে।
এগো, কিসের তোমার সান-মান[৬]
বের্থা দুই-চাইর দিনে ॥

আর প্রেম-হারা কথা সয় না—
কান্দে ইয়াছিনে :
এগো, আল্লা-রছুল, মাও-ফতেমা
হাছন আর হুছনে ॥

---

১ গুরুজীর (?), গদা (?) ২ চাবুক ৩ বাঁধিলে ৪ মলয় বাতাসে ৫ মাটিতে ফেলিবে
৬ মান-অপমান

। ৩৬ ।

এই কলিতে মিছা কথা
লাগছে কেবল গণ্ডগোল, আল্লাবোল্।
লাগছে না তোরে প্রেমের বাজার,—
দোকান তোল্ ॥

বানিয়া হইতায়[১] চাও যদি রে মন,
নেক্তি ধরা[২] জানো না রে—
পাইছ না তার কল।
ওরে তামা-কাঁসা বর্ত[৩] জানো না
সোনা করি' রাঙ্গের মূল ॥

গোয়ালা হইতে চাও যদি রে মন,
দুধ বেচা জানো না রে—
পাইছ না তার কল।
ও তার, দই-লনী তায় জানো না রে
খাও রে কেবল মাঠা-ঘোল ॥

আর নাইয়া হইতায় চাও যদি রে মন,
হাইল ধরা জানো না রে—
পাইছ না তার কল।
ও তার দাঁড় বসাইতায়[৪] জানো না রে
গুণ লইয়া আকুল ॥

বেপারেতে যাও যদি রে মন,
পাল্লা ধরা জানো না রে—
পাইছ না তার কল।
ও তার উজন-নিজন[৫] ঠিক জানো না
কয় আব্দুল বেয়াকুল ॥

---

১ হইতে ২ নিক্তিধরা ৩ (?) ৪ বসাইতে ৫ ওজন ইত্যাদি।

। ৩৭ ।

ও মন সুজনা,
চিরদিন আর ভবে র'বে না।
কালিব[1] ছাড়ি' যাইতে হইলে
ওই রঙ্গে দিন যাবে না॥

বাদশা' ছিল সিকন্দর—
চান্দ-সুরযের লইল খবর।
সে-ও তো মরিয়া গেল,
সঙ্গে কিছু নিল না॥

রুস্তম ছিল জোরওয়ার[2] —
তার সমান কেউ ছিল না আর।
সে-ও তো চলিয়া গেল,
এক মিলট[3] আর টিকল না॥

মনসুর হল্লাজ ফকির ছিল—
সে ওই জলে ভাসিয়া গেল।
সে ওই জলে ভাসিয়া গেল,
'আইনুল হক[4] ' নাম ছুড়্‌ল[5] না

৩৮

দিনে দিনে দিন ফুরাইল, ভেবে দেখ মন—
কুপক্ষ ত্যজিয়া করো সুপথে গমন॥

---

১ কল্‌ব, আত্মার বাসস্থান ২ শক্তিশালী মিনিট ৪ 'আনাল হক' : আমি-ই ভগবান ৫ ছাড়িল

হেসে-খেলে দিনে দিনে
কাটাও দিন অকারণে।
যাইতে হবে নে কি
তান[১] না রইবে আইলে শমন ॥

প্রাণ-পাখী উড়ে যাবে—
শুধু খাঁচা পড়ে রবে।
কবরেতে শওয়াইবে
একা সেথা রবে তখন ॥

সেই ঘর যে অন্ধকার
সঙ্গী না হইবে কার।
বিপদে পড়িবে তখন—
ফিরিস্তা[২] আইলে দুইজন ॥

তারা তখন জিজ্ঞাসিবে—
রব[৩] কেবা বলতে হবে।
তা না হলে সাজা দিবে
বিপদে কর্‌বে রোদন ॥

। ৩৯ ।

রাইতে হইল রে, ও মনার[৪],
রাইত হইল রে আন্ধি।
একেলা কয়বরের মাঝে
আমার নেকীর[৫] লাগি' কান্দি ॥

---

১ তাঁহার ২ দেবদূত ৩ স্রষ্টা ৪ মন ৫ পুণ্যের

মুগ্‌রিবেরি ওক্তে[১] মনা রে
নাইরে কোনো কাম।
নিরলে বসিয়া লইয়ো—
আমার ছায়ব[২] আল্লাজীর নাম

আর দুই প'র রাত্রি যাইতে
ওয়রে মনা, মইওতের[৩] চিন্ ;—
বুকে করে ধড়ফড—
আমার হুঁশ নিবা গি' কাড়ি' ॥

তিন প'র রাত্রি যাইতে আমার
মই্ওতের খবর।
আমি তো প'ড়িয়া রইলাম—
শয়তানের চর ॥

চারি প'র রাত্রি যাইতে রে
ওয়রে মনা, আসিলা তাজ্জুদ[৪]।
সকল মুমিনে পড়ইন নমাজ
আমি ঘুমেতে মজুদ[৫] ॥

পাঁচ প'র রাত্রি যাইতে রে
ওয়রে মনা, আঁসিলা ফজর[৬]।
সকল মুমিনে পড়ইন নমাজ—
আমি ঘুমেতে কাতর ॥

রাত্রি গেল, বেলা হইল,
আফতাবে[৭] কইলা ভর।
আমি তো প'ড়িয়া রইলাম—
শয়তানের চর ॥

১ সান্ধ্য উপাসনার সময়ে ২ সাহেব ৩ মৃত্যুর ৪ শেষ রাত্রির উপাসনা ৫ ঘুমে আচ্ছন্ন ৬ প্রাতঃকালীন উপাসনা ৭ সূর্যে

অধম তজিরে কইন,
আল্লাজীর দরগায়[১] :
কৃপা করি' দয়ার নাথ
তরাইবা আমায় ॥

। ৪০ ।

ও স্মরণ রাখিয়ো রে, পাগেলার মন,—
গোর আন্ধিহারা।
গোরে পাসরিয়া আমি
জীবন থাকিতে মরা ॥

গোরে একাশর[২] রবে,
ফিরিস্তা[৩] হাজির হবে রে।
ওরে, লোহার গুরুজ[৪] হাতে লিয়া—
ছওয়াল পুছিবা[৫] তারা ॥

জুয়াব[৬] না দিলে তাতে
গুরুজ মারিবা মাথে রে।
ওরে, সেই চোটে সওইরগজ[৭] জমিনের নীচে
যাবে গাড়া ॥

ফুঁ দিয়া তুলিব পরে—
ছওয়াল পুছিবা তোরে রে।
ওরে, জুয়াব না দিলে পরে
মারিবেক সেই ধারা ॥

১ নিকটে ২ একাকী ৩ দেবদূত, স্বর্গদূত ৪ গুর্জ, গদা ৫ সওয়াল বা প্রশ্নজিজ্ঞাসা করিবেন ৬ জবাব ৭ সওয়া গজ

অধীন ইরপানে কয়,
আমার গোর না স্মরণ হয় রে।
ওরে, নবীজীর সফাত[১] বিনে
আর কিছু নাই চারা[২] ॥

। ৪১ ।

হুকুমে আইছ[৩] রে বন্দা, তলবে তালাস—
হায়াতে-মউতে[৪] করে একই ঘরে বাস ॥

দমের উপর বাড়ীঘর—
দম ছাড়িলে সবই পর ;
কে লইবে কার খবর, কবরে নিবাস ॥

জরু-লড়কা[৫]-জমিদারী—
পাইয়া হইলাম বেহুঁশারি[৬] ;
মজা লইলাম[৭] দিন দুই-চারি—গলে লিয়ে ফাঁস।

কেরামিন কাতিবিন[৮] কান্ধে
হর-রুজের হিসাব বান্ধে[৯] ;
মন, তুমি ঠেকিছ ফান্দে—দেখিনা খালাস[১০]

৪২ ।

রে দুনিয়াই সব ধান্ধা—
না বুঝিয়ে রইলাম আমি ভবের মায়ায় বান্ধা॥

১ সুপারিশ ২ গতি ৩ আসিয়াছ ৪ জন্মমৃত্যুতে ৫ স্ত্রী-পুত্র ৬ বেহুঁশ হইলে
৭ লইলে ৮ যে স্বর্গদূত ভালোমন্দ কাজের হিসাব রাখেন ৯ প্রতিদিনের হিসাব রাখে
১০ মুক্তির পথ দেখি না

মনরে, টেকা-পয়সা, জমিদারী—
বানাইছ টিনের ছওয়ারী[১]।
আইজ মরিবে, কাইল মরিবে—কবরের বাসিন্দা ॥

মনরে, ভাই-বন্ধু-তিরি-পুত্র—
কেও তো কেওরের[২] সঙ্গে যায় না।
ও তোমার রঙ্গের তিরি সঙ্গে যায় না
—যার প্রেমেতে বান্ধা

মনরে, মাইজ ভাণ্ডারে বলছে কথা—
ও তুই মরিয়া গেলে কবরেতে
লাগবে গলে ফান্দা[৩] ॥

। ৪৩ ।

মস্তান[৪] ইদং শা'য় বলে—
আল্লা, তামাম হইব[৫] এই জমিন, ও মুমিন,
পুলসিরাত[৬] পার হইবার দিন ॥

এখান[৭] পুল বসাইছে দেখ—দুজখের উপর
লাম্বা তিশ হাজার বচ্ছর ;
তিশ হাজার বছরের মাঝে—

আল্লা, যে দিন হইব একদিন, ও মুমিন,
পুলসিরাত পার হইবার দিন ॥

---

১ 'টিনের ঘর' অর্থে ২ কাহারও ৩ ফাঁসি ৪ ভাবোন্মাদ ৫ শেষ, নষ্ট হইবে
৬ স্বর্গে যাইবার সাঁকো ৭ একখানি

ইরার বর্ণ চাকু হা রে, কেশের বর্ণ ধার
এলাহি[১] কেমনে হইতাম পার ;
ও সব নেকী[২] যাইব পার হইয়া—
বদীর[৩] না রহিব চিন্, ও মুমিন,
পুলসিরাত পার হইবার দিন ॥

। ৪৪ ।

ও আমি সদায় থাকি রিপুর মাঝে—
মন ভালো নায়,[৪] বল্‌মু কারে ।

ইমান[৫] থাক্‌লে আল্লা মিলে—
কাম করিলে পয়সা মিলে ।
এগো, যা কিছু কামাইলাম ধন—
সব খোয়াইলাম ঘাটের কূলে ॥

ভালো মানুষের আত[৬] ধোওয়াইলে
একদিন কাম আয়[৭] নিদান কালে ।
এগো, কমিন্দর লগে দুস্তি কইলে[৮]
মুখ পোড়া যায় বিনা'গুইনে[৯] ॥

ভাইবে রাধারমণ বলে,—
প্রেম ক'রো না ছাইলার সনে ।
এগো, ছাইলার আতে কলা দিলে
মাও বলিয়া আসব কোলে ॥

১ প্রভু ২ পুণ্যবান ৩ পাপীর ৪ নয় ৫ বিশ্বাস ৬ হাত ৭ কাজ হয়, আসে
৮ অসতের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিলে ৯ বিনা আগুনে

। ৪৫ ।

মন ও, ভুলিলায়[১] রে—
সাধন-ভজন মন কারে দিলায় রে ॥

আর আত্তী[২] সাজে, ঘোড়া সাজে,—
মনরে, আরো সাজে লাঠি ।
আমার সাধুরে খেদাইয়া নিলা
শীতালঙ্গের[৩] মাটি ॥

আর কেও[৪] বলে—মারো, মারো, সাধুরে
কেও বলো—ধরো ।
ভাওয়ালী ফালাইয়া[৫] আমার সাধুয়ে
খাইলা লড়[৬] ॥

আর ডাইল দিলাম, চাউল দিলাম, সাধুরে
আরো দিলাম ঘি ।
আমার সাধুর খেদমতে[৭] দিলাম
বদল ছায়বের ঝি ॥

আর কেও গনে[৮] টাকা-কড়ি, সাধুরে
কেও গনে পাই ।
রাতারাতি করিয়া আমার
সাধুরে সমঝাই ॥

আর অধম পাগলে বলইন—
মনরে, হইয়া নৈরাশ ঃ
তিরি-পুত্রুর গোলাম অইয়া[৯]
কাটলাম ঘোড়ার ঘাস ॥

---

১ ভুলিলে ২ হাতী ৩ শীতালঙ্গ ফকির ৪ কেহ ৫ ভাওয়ালী নৌকা ফেলিয়া ৬ দৌড় দিল ৭ আরামের জন্য ৮ গণনা করে ৯ হইয়া

॥ ইসলামী ও সুফী ভক্তি-সঙ্গীত ॥

। ৪৬ ।

ওবা'[১] মাবুদ[২] আল্লাজী,
আমারে ভাসাইলায় আল্লায় ভব-সিন্ধুর নীর

ভবসিন্ধুর চাকে[৩] পড়ি' ঘুরিঘুরি' ফিরি—
উঠিবার সাধ্য নাই, কেমনেতে উঠি ॥

কান্দিয়া মিনতি করে—
হাছন রাজা দাসা[৪]
পার করিয়ে চরণতলে
মোরে দেও বাসা ॥

৪৭ ।

দাঁড়াইয়াছি নদীতীরে হইয়া অস্থির :
ভরসা মোর আছে চিতে—আল্লা-নবীজীর ।
ঠাকুর, পার করবায় নি—
পয়সা-কড়ি নাই, গফুর-রহিম[৫] খেওয়ানি।

---

১ ওহে ২ উপাস্য, আল্লার এক নাম, স্রষ্টা ৩ চক্রে ৪ দাস (ছন্দের অনুরোধে 'দাসা')
৫ ক্ষমাশীল ও দয়ালু

যতো ধন আছিল আমার
সব হইল চুরি।
কেমনে হইতাম পার—
এই তাইসে[১] মরি ॥

খেওয়ানির মুখ দেখিয়া
মনে অইল[২] আশা।
পার করিয়া দিব মোরে—
হইয়াছে ভরসা ॥

কান্দিয়া মিনতি করে
হাছন রাজা দাসা ঃ
পার করিয়া চরণতলে—
মোরে দেও বাসা ॥

। ৪৮ ।

ও ভাই, নাম জপ'রে গুরুরি[৩] ছাড়িয়া
ওই ভবের বাজারে আইলাম—
কিসের লাগিয়া ॥

আর মায়াজালে বন্দী হইয়া
রহিলাম ভুলিয়া।
বাপ-ভাই-তিরি-পুত্র
কেও না যাইবা সঙ্গে ॥

১ ত্রাসে, চিন্তায় ২ হইল ৩ গর্ব

আর সরকাতের[১] মইওতের[২] কালে
ঘটিব নিদান[৩]।
ওরে, শয়তান আসিয়া ভাই
লুটিব ইমান[৪] ॥

আর কলিমার[৫] মাঝে আছে ভাই রে
নমাজ আসল।
এক কলিমার মাঝে
নব্বই হাজার কল ॥

আর ছাবাল[৬] আকবর আলীয়ে বলে-
করি কি উপায় :
না জানি কি অইব[৭] ওরে
কয়বরের ভিতর ॥

। ৪৯ ।

আখেরী জমানার[৮] নবী
রছুল-পেগাম্বর।
আরশের[৯] মাঝারে তোমার
তিন শ' ষাইট মিম্বর[১০] ॥

আশিক[১১] হইয়া খোদা
মোহাম্মদ করিলা পয়দা[১২]।
মহব্বতের[১৩] সাথে রাখো
কন্দিলের[১৪] ভিতর ॥

---

১ সক্‌রাত (আরবী), মৃত্যু যন্ত্রণার ২ মৃত্যুর, মৃত দেহের ৩ বিপদ ৪ ধর্ম বিশ্বাস ৫ পবিত্র বাক্যের ৬ আধ্যাত্মিক জগতে কবি 'শিশু'—এই কথা বলা হইতেছে ৭ হইবে ৮ শেষ কালের ৯ ভগবানের আসনের ১০ বেদী। শ্রীহট্টকে তিন শ ষাট আউলিয়ার দেশ বলা হয় ১১ প্রেমিক ১২ সৃষ্টি ১৩ ভালোবাসার ১৪ আলোর

আখেরী জমানার নবী
হাসরের দিলা[১] খুবী[২]।
নবীজীর কলিমা পড়ো
দিলে রাখো ডর ॥

ছাবাল আকবর আলী বলে—
জনম গইয়া গেল বিফলে।
না জানি কি করিব আল্লায়
কয়বরে হাসর ॥

। ৫০ ।

কারণের জন্যে কাজ করিলা জগতে—
ও তান[৩] কুদরতের ভেদ[৪] কে পারে বুঝিতে ॥

প্রেমেরি কারণ প্রভু-নিরঞ্জন—
আহাদের[৫] মধ্যে কইলা মিমের[৬] মিলন।
এ চৌদ্দ ভুবন পয়দা মিমের বরকতে[৭] ॥

বেহেস্তের কারণ দুজখ[৮] সৃজন—
দুঃখ না পাইলে সুখ ঝুঝিবায় কেমন।
ওরে, বেহেস্তে পাইলা মান দুজখের গুণেতে

রাত্রির কারণ সম্মান পাইলা দিনে—
রাত্রি না হইলে দিন কেবা তারে জানে।
ওরে, আলোয় পাইলা মান আন্ধারি খাইতে[৯]

---

১ হৃদয়বান ২ সৌন্দর্য ৩ তাঁহার, প্রভুর ৪ মহিমার (রহস্য) ভেদ ৫ একমেবাদ্বিতীয়ম যে ভগবান ৬ আরবী বর্ণমালার ২৪ সংখ্যক বর্ণ, 'আহাদে'র সঙ্গে 'মিম' যোগ করিলে 'আহমদ' হয়—ইহা হজরত মোহাম্মদের অন্য নাম ৭ ঈশ্বরের আশীর্বাদে ৮ নরক ৯ বিনাশ করিতে

বিবাদীর কারণ হাকিম ভাবে মনে—
বিবাদী না হইলে হাকিম কেবা তারে গণে।
ওরে, হাকিমে পাইলা মান বিবাদীর গুণেতে ॥

ইয়াছিনে বলে—লজ্জা ভাবি' মনে—
পরকাশ[১] করিতে নারি আদম-খাতিরে[২]।
ওরে, ছোটা মুখে বড়ো কথা বলিতাম[৩] কেমনে

। ৫১ ।

দয়া ধরো মুই অধমরে, দয়াল বন্ধু,
দয়া ধরো মুই অধমরে ॥

দয়াল বলিয়া নাম সংসারে যে কয়—
এমন দয়াল তুমি মোর মনে লয়[৪] ॥

আর দয়া করি' ইব্রাহিম রে
বাঁচাইলে আগ[৫] থাকিয়া।
বাঁচাইলে বাঁচাইলে আগুইন
গুলজার[৬] করিয়া[৭] ॥

ইনুছ নবী বাঁচাইলে
মাছের পেট থাকিয়া[৮]।

১ প্রকাশ ২ মানুষ হইবার জন্য ৩ বলিব ৪ মনে হয় ৫ আগুন ৬ পুষ্পোদ্যান ৭ ইব্রাহিম ছিলেন আজর-এর পুত্র। আজর ছিলেন মূর্তিশিল্পী। ইব্রাহিম মূর্তিবাদী পিতা আজর-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলে বাদশাহ নামরুদ তাহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। আল্লার কুদরতে সেই আগুন ফুল হইয়া যায়। ইব্রাহিমই কাবা-র প্রতিষ্ঠাতা ৮ ইউনুস (ইনুছ) 'নবী' ছিলেন। একদা জলে নিক্ষিপ্ত হইলে তিনি একটি বিরাট মাছের উদরস্থ হন। আল্লাই তখন তাঁহাকে বাঁচাইয়া ছিলেন

কূয়া হইতে ইছুফ নবী
লইলে উঠাইয়া[১] ॥

হাছন রাজায় ভিক্ষা চায়—
ভিক্ষা দাও মোরে :
এই ভিক্ষা চাই ঠাকুর
দেখিতাম তোমারে

। ৫২ ।

খোদা মিলে প্রেমিক হইলে, রে মন,
খোদা মিলে প্রেমিক হইলে ।।

আর যদি খোদা ধরতে চাও—
তার সনে পিরিতি বাড়াও।
হয়রে, মিলিব[২] মিলিব খোদা
প্রেমে তার মজিলে ॥

আর মিলবে না রে প্রাণের খোদা
তছবি জপিলে[৩] ।
হয় রে, মিল্‌বে না, যিলবে না খোদা-
মাথা কুটি' মইলে[৪] ॥

১ ইউসুফ (ইছুক) ইয়াকুবেব পুত্র। তিনি দেখিতে অসাধারণ সুন্দর ছিলেন—এই জন্য পিতা ইয়াকুব তাঁহাকে অত্যধিক ভালোবাসিতেন। কিন্তু, ইউসুফের বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা ইহা সহিতে পারিতেন না। একদা ইঁহারা ষড়যন্ত্র কবিয়া ইউসুফকে একটি কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করেন। দৈবক্রমে একদল বণিক সেই কূপে জলের জন্য আসিয়া ইউসুফকে দেখিতে পায় এবং উদ্ধার করিয়া ইজিপ্টে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রয় করে ২ মিলিবে ৩ মালা জপিলে ৪ মাথা কুটিয়া মরিলে

আর মিলবে না রে প্রাণের খোদা
নমাজ-রোজা কইলে।
হয়রে, মিলবে না, মিলবে না খোদা—
হাছন রাজায় বইলে[১] ॥

। ৫৩ ।

জাহিরা[২] রে, জাহিরা মানুষ ছবি
গুপ্তে নিরঞ্জন—
খোদা তুই গোপনে গোপন ॥

আহাসে আহাদ মিলে[৩] —
হজরতে রছুল[৪] মিলে ॥

আহাসে আহাদ মিলে—
রছুলে ফাতিমা[৫] মিলে ॥

আহাসে আহাদ মিলে—
হজরতে হাছন[৬] মিলে ॥

আহাসে আহাদ মিলে—
হজরতে হুছন[৬] মিলে ॥

---

১ বলে ২ ধর্মের যে পথ পরিচিত, ব্যক্ত, আচার অনুষ্ঠান-জাত, শরীয়তের অনুগামী ৩ ঈশ্বরেব পূর্ণ অবতার মোহাম্মদের অপর নাম 'আহামদ'। আলেফ, হে, মীম ও দাল—এই চাবটি আববী অক্ষর দিয়া 'আহামদ' শব্দ লিখিত হয়। ইহার মধ্য হইতে 'ম' বা 'মীম' বাদ দিলে যাকে 'আহাদ—অর্থাৎ একমেবাদ্বিতীয় ঈশ্বর। 'আহা সে আহাদ মিলে'—ইহার অর্থ হইল, 'আহামদ' হইতে 'মীম'-কে বাদ দিলে ঈশ্ববকে পাওয়া যাইবে; কেননা ঈশ্বর মোহাম্মদের মধ্যেই বিরাজমান, 'মীম' আসিয়া অন্তরাল সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র ৪ রসুল, ভগবানেব দূত। তিনি মানুষেরই মধ্যে লীলা করিতেছেন ৫ মোহাম্মদ, আলি, ফতিমা, হাসান এবং হোসেন—এই পাঁচজনের একজন। মোহাম্মদের কন্যা ৬ হাসান ও হুসেন ফতেমাব পুত্র এবং রসুলের দৌহিত্র

। ৫৪ ।

কোরান মানো, আল্লা চিন,'
শয়তানের প্রেম কইরো না।
মরণ হাসর ত'রে যাবে
শমনের ভয় র'বে না॥

যখন মহরুম[১] আরশ[২] গেল
গায়বী[৩] এক আওয়াজ হইল :
হুকুম রদের[৪] লেখা পাইল—
আরশেতে রব্বানা[৫]॥

তারপরে ভাই আদম হ্ইল :
সেজ্‌দা[৬] করতে হুকুম দিল।
সব ফিরিস্তা[৭] সেজ্‌দা করল
মহরুম খালি করল না॥

আল্লাতালা বল্‌ছিল কথা
শুন্ রে মহরুম, মানো রে কথা :
হুকুম মানো, সেজ্‌দা করো
যাইতে দিব বেস্তখানা॥

সব ফিরিস্তার মাষ্টার ছিল
সে কি আলিম[৮] কম ছিল?
হিংসা কইরে[৯] সব হারাইল
হুকুম রদে বেস্তখানা॥

---

১ ইনি স্বর্গদূতদের শিক্ষক ছিলেন, আদেশ না মানার জন্তে অভিশপ্ত হইয়া শয়তান আখ্যা প্রাপ্ত হন ও স্বর্গ হ্ইতে বিতাড়িত হন ২ ভগবানের আসন ৩ অদৃশ্য ৪ অমান্তের ৫ আমাদের প্রতিপালক প্রভু উপাস্য, ঈশ্বর ৬ সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ৭ দেবদূত ৮ জ্ঞান ৯ করিয়া

জমির আলী বল্‌ছে কথা,
ডাক্‌লে কি আর যায় রে বেরৃথা[১]
ডাকার মতো ডাকতে পারলে
যাইতে দিব বেস্তখানা ॥

। ৫৫ ।

আমি নমাজ পড়তাম[২] কোন্ দিগে চাইয়া—
ওবা'[৩] মছলমান মিঞা,
নমাজ পড়তাম কোন্ দিগে চাইয়া ॥

আর আল্লাজীর বানায়া[৪] ঘর আপনারি তন[৫] —
এই তন ছাড়িয়া নমাজ
পড়ো কি কারণ।
যেই দিকে ফিরিয়া চাই—সেই দিগে প্রাণ-প্রিয়া ॥

আর ইব্রাহিম খলিলের[৬] ঘর মক্কার দিকে থইয়া—
কোন্ দিগে পড়িতাম নমাজ
দেও না বাতাইয়া ॥

হাছন রাজায় বলে, রে মন, পাগেলা থইয়া—
কোন্ দিগে পড়িতাম নমাজ
চাও না বিচারিয়া ॥

১ বৃথা ২ পড়িব ৩ ওগো, হে ৪ বানাইয়া ৫ আপনারি তনু ৬ ইব্রাহিম খলিলউল্লা অর্থাৎ ঈশ্বরের বন্ধু, ইনিই কাবা-র প্রতিষ্ঠাতা। ইসলাম ধর্মে বলা হইয়াছে—পশ্চিমাস্থ হইয়া নমাজ পড়িতে। কিন্তু, যেখানে কাবা রহিয়াছে, সেখানে দিক ভেদ নাই,—যে দিক খুশি সে দিকেই নমাজ পড়া যায়

। ৫৬ ।

দুই রেকাত[১] নমাজ পড়ি'
হজ করো গি'[২] মক্কার ঘর।
হাসর তরাইয়া লইবা রছুল-পেগাম্বর[৩] ॥

পয়লাকু[৪] পড়িয়ো ফজর[৫],
দুছ্‌রা[৬] পড়িয়ো জোহর[৭],—
আছর[৮] দিয়া দিলে রাখিয়ো ডর[৯] ॥

মুগ্‌রিবেরি[১০] নমাজ পড়ি'
আল্লাকে ছজিদা করি'[১১]—
পড়ো নমাজ এশা,[১২] যতো মুমিনগণ ॥

যে জানে গো কইল্‌মা শাহাদত[১৩]—
লাইলাহা ইল্লেল্লাহ[১৪] দম কইল্‌মা শাদত—
আয়মুল্লাহ কয়—পড়ো গো সমাজ
জা'গা পাইবায় বেস্তের ঘর[১৫] ॥

। ৫৭ ।

দমে-দমে[১৬] ডাকি, বান্দা, কোন্ দিন হইবে মরণ
কোন্ দিন পাইবায়[১৭] রে মন,—তারে ॥

১ নমাজের একটি বিভাগ ২ গিয়া ৩ পয়গম্বর, বার্তাবহ ৪ প্রথমত: ৫ প্রাত:কালীন উপাসনা ৬ দ্বিতীয়ত: ৭ দ্বিপ্রাহরিক উপাসনা ৮ বিকালবেলার উপাসনা ৯ মনে ভয় রাখিয়ো ১০ সান্ধ্য উপাসনা ১১ সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া ১২ রাত্রির উপাসনা ১৩ চারটি কলমার একটি সাক্ষ্য বাক্য ১৪ ঈশ্বর নাই, ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বরের নাস্তিত্ব হইতে অস্তিত্বের বিশ্বাস করা হইয়াছে। মানব আত্মা ঈশ্বরেরই লীলা ১৫ বেহেস্তে জায়গা পাইবে ১৬ প্রতি নিশ্বাসে ১৭ পাইবে

ভাবে কলিমা সার, ভাবে একিন[১] হবে যার
সে ভি হবে মছুলমান।
ও তার দিন্‌-দারীতে[২] অবে[৩] ভারী হ'—
চউক মুজিলে ছুইনা আন্ধা॥

সব রে ইসাব[৪] কইরে, ছুইনা[৫] রব[৬] ছুইনার পথে ;
ছোটো-বড়ো সব যাবে, কেও না রবে।
ওরে হাসরের বাজারে, বান্দা হ'—
তোমার ইনছাফ[৭] হবে কোন্ গো বারে॥

যদি তুমি মইরে গো যাও,
আখেরের[৮] বাজার গো পাও ;

কি জওয়াব দিবায়[৯] গো আমায়।
মরে ছুজখের[১০] আগুনে জলবায় হ'—
নবীর কইলমা পাবে গো সাথে॥

দীন ভবানন্দে বলইন,
ছুনিয়ার মায়া সবে ছাড়ো—

জঙ্গলবাসী হও রে মন, আল্লার কারণ রে।
তেগি পাবায়[১১] নিস্তার তুমি হ'—
হাসরের ময়দানের বারে॥

১ আত্মা ২ ধর্মেকর্মে ৩ হইবে ৪ হিসাব ৫ ছুনিয়া ৬ রহিবে ৭ বিচার
৮ পরকালের ৯ জবাব দিবে ১০ নরকের ১১ তাহা হইলে পাইবে

। ৫৮ ।

শুন মনরে মছলমান,
কই রে হ'[১] মন, তোর কোরানে—
ইমান[২] কাদির[৩] গণি[৪] হবে,
তার পানে মন ভুইলা রবে হে।
আখের দুনিয়া[৫] হবে পার কি ধন তোর সঙ্গে ॥

সবি বলো মছলমানি
কোন্ নিশানি বলো তুমি ;
আগে পড়ি কইলমা রছুল—
পাছে যৈবন দান করি।
কই রে শুন, আরে মুমিন-আল্লা-নবী, শুনি ॥

নমাজ পড়ো, রোজা রাখো—
শরার[৬] কাজী নাম হব।
ওরে, মইলে তোমার সঙ্গে যাব,
দম ডুবিলে[৭] কেও না হবে ॥

দীন ভবানন্দে বলইন,[৮]
মা-বাপ ছাড়ি' আইলাম ভবে :
ওরে, না পাইলাম তোর আল্লা-নবী
আমার কর্ম-দোইষে[৯] ॥

---

১ হে ২ ধর্মবিশ্বাস ৩ পারগ, শক্তিমান ৪ ধনী ৫ পরকাল ৬ দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রণালীর বিধান, বাহ্যিক আচার নিয়মাদি ৭ নিশ্বাস ত্যাগ করিলে ৮ বলেন ৯ কর্মদোষে

। ৫৯ ।

খোদ খোদা, আল্লা-রাধা[১],
ছুস্ত্ মোহাম্মদ—
অজুদে[২] মউজুদ[৩] সাঁই,[৪] দমে কিয়ামত[৫] ॥

কোরানে কয়—নমাজ-রোজা
বে'স্তে[৬] যাইবার রাস্তা সোজা।
হজরতে কয়—নাম পূজ', করো এবাদত[৭] ॥

লা শরিকে[৮] লামা পূজা
হাসর মে হয় গো ওফা[৯]।
হজরত কয়—আপ্নে পূজ', করো এবাদত ॥

মনোমোহন কয় পেরেশান[১০]—
পূজে হিন্দু, মুসলমান
তরিকত[১১] মঞ্জিল[১২] কইরে আপনে হজরত ॥

। ৬০ ।

পড়ো আমান তুবিল্লা[১৩],
আল্হাম্‌দু[১৪] বিচারি'[১৫] দেখ-
দুনু[১৬]জা'ন[১৭]লিল্লা[১৮]॥

---

১ আমি স্বয়ং আল্লা, রাধা ২ অস্তিত্ব ৩ অস্তিত্ব আছে যাহার ৪ স্বামী, গুরু, প্রভু ৫ শেষ বিচারের দিন ৬ বেহেস্তে, স্বর্গে ৭ উপাসনা, আরাধনা ৮ যাঁহার কোনো অংশীদার নাই, অর্থাৎ ঈশ্বর ৯ বিশ্বাস, একনিষ্ঠতা ১০ শ্রান্ত, ব্যতিব্যস্ত ১১ বাহ্য-আচার অনুষ্ঠানকে প্রাধান্য না দিয়া প্রেম ও আন্তর অনুভূতির যে সাধনমার্গ ১২ গন্তব্যস্থল ১৩ বিশ্বাসবাক্য, 'আমি বিশ্বাস করি, ভগবান আছেন' ১৪ কোরানের প্রথম 'সুরা' বা পরিচ্ছেদ ১৫ খুঁজিয়া ১৬ উভয় ১৭ জাহান বা লোক ১৮ ভগবানের জন্য

আর লুলা-লেংড়া, আতুর-আন্ধা—
তারে করো হেলা।
লাম্বা-লাম্বা পাউগড়ি[১] দেখি'
তানে[২] দেও লিল্লা ॥

আর জুম্মার দিনে[৩] মুমিনে
ছাফ[৪] কাপড় পরিয়া—
নমাজের নামে নাই দেখা
সিন্নি খাইতে গেলা ॥

আর ছাবাল আলীয়ে বলইন—
দিলে না রাখিয়ো হেলা।
কিয়ামতের দিন[৫] মুমিন
পার হইবায় কিলা[৬] ॥

। ৬১ ।

ও দিল্, তওবা[৭] করহ—
শরিওতের[৮] বাজার ভাঙি' যায়।
শরিওতের বাজার মাঝে
নবী ছায়বের[৯] দোকান আছে—
এগো, চিনিয়া খরিদ করো ধন ॥

মছলমানের ঘর বানাইলে—
তুফান আনলে ডর কি আছে।
এগো, রোজা দিয়া দিমু ঘরের থুনি[১০] ॥

১ পাগড়ি ২ তাঁহাকে ৩ শুক্রবারে ৪ পরিষ্কার ৫ শেষ বিচারের দিন ৬ কি প্রকারে পার হইবে ৭ অনুতপ্ত হওয়া, ক্ষমা চাওয়া, অনুশোচনা করা ৮ নমাজ-রোজা প্রভৃতি বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান প্রতিপালন করিয়া আল্লাহকে লাভ করিবার যে সাধনপন্থা, তাহাকে বলে 'শরিওয়ত' ৯ সাহেবের ১০ খুঁটি

মছলমানের ঘর বানাইলে—
মেঘ আনলে কি ডর আছে।
এগো, নমাজ দিয়া দিমু ঘরের ছানি[১] ॥

মছলমানের 'আল্লা-আল্লা'—
ইন্দুয়ে[২] বলে 'হরি-হরি'।
এগো, যে ঘেলা[৩] পাইয়া আইছে হ' ॥

। ৬২ ।

শরিওতের দলিল মতে[৪] বুঝা যায় গওয়ারী[৫] —
কেনে চোরা করো চুরি।
ওজু[৬]-গোছল-নমাজ-রোজা
ছাড়িয়া কি ফকিরি ॥

আর ছিয়া[৭]-ছিতা[৭] মজুত আছে
শামী[৭] . আলমগিরি[৭] ;
কোরান-মতে বন্দেগী করিলা জোনাবারি[৮]।
উঠ্‌ব মায়া, ছাড়ব দয়া
দেখাব হুর নূরী[৯] ॥

আর আউয়ালে মোহাম্মদীয়া[১০]
কিমিয়া শাদত[১০],
তছ্‌বি আহ্‌মদী[১০] নাম ছিতারা মারফত[১০]—
চাইর কিতাবের হুজরা মতে[১১]
চাহনা বিচারি' ॥

---

১ ছাউনি ২ হিন্দু ৩ যে প্রকার ৪ নিদর্শন বা অনুশাসন অনুযায়ী ৫ সাক্ষ্য (?)
৬ নমাজ অথবা ধর্মগ্রন্থাদি পড়িবার পূর্বে হস্ত-পদাদি প্রক্ষালন করাকে 'ওজু' করা বলে
৭ 'শরা'-র (ধর্ম-বিধানের) অন্তর্ভুক্ত পুস্তক সমূহ ৮ 'জোনাবে আলা', এখানে হজরত মোহাম্মদের পরিবর্তে ব্যবহৃত ৯ জ্যোতির্ময়ী অপ্সরী ১০ 'শরা'-র অন্তর্ভুক্ত পুস্তক সমূহ
১১ বিধান, মীমাংসা অনুযায়ী (?)

আর হজরত আলীর মশকিল কুশা[১]
মারফতের[২] দরজা ;
শরিওতে জাহিরা[৩] না নমাজ কইলা কজা[৪]
হজরত আলীর জোনাব ছাড়া
কে পাবে ফকিরি ॥

মহম্মদ মস্তফা নবী
পাক[৫] জোনাব সার ;
একূল সেকূল আশা শফাত[৬] দিদার[৭] ।
কইন তো ছাবাল আকবর আলী—
কে লইত উধারি'[৮] ॥

। ৬৩ ।

কি ধন সাজিলায়[৯] ভাই নিদানের লাগিয়া[১০]—
বা' মুমিনগণ,
ভাই, তুমি ভজ' নিরঞ্জন ॥

আর শুন ভাই-বেরাদর, ও ভাইরে,
বানাও তুমি রইবার ঘর রে ।
হায়রে, কি দিয়া বানাইতায়[১১] ঘর—
কইয়া যাই তার খবর ॥

১ বিপদনাশী ২ বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান না মানিয়া ভগবানকে লাভ করিবার সাধন পন্থাকে 'মারিফত' বলে ৩ প্রকাশ্যে ৪ ত্যাগ, বিস্মৃত হওয়া ৫ পবিত্র ৬ সুপারিশ ৭ দর্শন ৮ লইবে উদ্ধার করিয়া, বলা হইয়াছে, মোহাম্মদ সমস্ত জ্ঞান এবং আলী সেই জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশের দ্বার। সুফীরা আলীকে খুব প্রাধান্য দিয়াছেন ৯ সাজাইলে ১০ শেষ দিনের জন্যে ১১ বানাইবে

আর ইমান[১] দিয়া দিয়ো থুনি[২] , ও ভাইরে,
আমান[৩] দিয়া দিয়ো ছানি[৪] রে।
হায়রে, রোজা-নমাজ পড়ি' দিয়ো,
রোয়া[৫] আর খাপাসী[৬] ॥

আর শাদত কলিমা[৭] দিয়া ও ভাইরে,
টিক[৮] লাগাইয়ো গিয়া রে।
হায়রে, অবশ্যে ধিনেরই[৯] ঘর আমার—
রইবা খাড়া হইয়া ॥

আর অধম নাছিরে বলে, ও ভাই রে,
ইদ্‌রের[১০] মাঝে অগ্নি জ্বলে রে।
হায়রে, আসিবা ঝড়ির তুফান[১১]—
আমি যাইমু কার বাড়ী ॥

। ৬৪ ।

ছলাতু ছলামু[১২] মেরা, কইয়ো নবীজীর রওজায়[১৩]-
তোরা যদি যাওরে মদিনায় ॥

আবু বক্কর, উম্মর ও উছমান,
আলী, খোদেজায়—
ইমাম হাছন ও হুছন
আর বিবি ফাতিমায়[১৪] ॥

---

১ বিশ্বাস, কেবল মুসলমান বুঝাইতে ২ খুঁটি ৩ সঞ্চিত ধন, এখানে শান্তি ৪ ছাউনি
৫ আড়া ৬ বাখারী ৭ স্বীকৃতি বাক্য ৮ ঠেকা ৯ ধর্মেব, ধ্যানেব ১০ হৃদয়ের ১১ ঝড়-বৃষ্টি
১২ উপাসনা ও শান্তি, প্রণাম অভিনন্দন ১৩ কবরে ১৪ বক্কর, উম্মর, ওসমান ও আলী—
কালানুক্রমিক ভাবে ইঁহারা প্রথম চারজন খলিফা, খাদিজা হইলেন ফতিমাব মা, নবীর
প্রথম স্ত্রী। ইমাম—উপাধি বিশেষ

আমীর আব্বাছ[১] ,
হজরত আবু হুরেরায়[২] —
বিবি উম্মে ছালেমা
কুলছুম[৩] আর বিবি ফাতিমায়[৪] ॥

যার ভাগ্যে আজলে[৫]
যে লিখিয়াছইন বিধারতায়—
অবশ্য খেঁচিয়া[৬] তারে
নিবা নবী মস্তফায় ॥

আমার নছিবে[৭] নাই
মদিনা যাইবার—
মায়া প্রাণে বান্ধা হইয়া
রইয়াছি বাঙ্গালায় ॥

অধীন আবজলে বলে,
কি করিতাম—হায় রে হায়—
পঙ্খ যদি দিত বন্ধু
উড়িয়া যাইতাম মদিনায় ॥

। ৬৫ ।

যে পড়ে পিরিতের ফান্দে, আশা নাই তার বাঁচিবার—
ভবে প্রেম-কলঙ্কিনী সার ॥

১ আব্বাস আলীর একজন পুত্র ২ আবু হুরেরা হইলেন নবীর একজন 'সাহাবী' অর্থাৎ সাথী ৩ সালেমা, কুলসুম—নবীদের স্ত্রী ৪ মোহাম্মদের কন্যা, আলীর স্ত্রী এবং হাসান-হোসেনের জননী ৫ দূর অতীত কালে ৬ টানিয়া ৭ ভাগ্যে, কপালে

মন রে, আগে আগে সোয়াগে সোয়াগে[১]
গলে দিলাম পিরিতের হার।
ও তোরা দেখ আসি'—লাগ্‌ছে ফাঁসি,
শক্তি নাই মোর ছাড়াইবার ॥

মন রে, কুসঙ্গীয়ার[২] সঙ্গ লইয়া, ভবের হাট মোর
গেল গইয়া।
কার দোইষ[৩] দিমু—
আমার মন হইয়াছে দুরাচার ॥

মন রে, অধীন ইরপান বলে, ভবের জালে হইছি
গিরিফদার[৪]।
ওরে, আখেরে[৫] ভরসা রাখি—
নবীজীর[৬] চরণ ধূলার ॥

। ৬৬ ।

দারুণ ঋণের দায়—বল-বুদ্ধি সব হরিল ;
সই গো, কাল ঋণেতে প্রাণি আকুল করিল ॥

মনে বড়ো আশা ছিল সই
উদ্ধারিবা নিরঞ্জনে গো।
করিম রহিম[৭] নামে উদ্ধারিয়া নিবা ল',[৮] সই গো ॥

আর কোরানে পরকাশ আছে—
ও সই ঋণ রাখিয়া যে মরিয়াছে গো
হাসরের বিচারের কালে[৯] খাড়া র'ব[১০] মহাজন, সই গো ॥

---

১ সোহাগে ২ কুসঙ্গীর ৩ দোষ ৪ গ্রেপ্তার ৫ অন্তিমে ৬ গুরুর, হজরত মোহাম্মদের
৭ দয়ালু ৮ লো ৯ শেষ দিনের বিচারের কালে ১০ রহিবে

রোজগারের উছিলা[১] পাইলে—
ও সই, পাঞ্চদিগে[২] মন টানে গো।
ওরে, গেলে কাছে—কেও না পুছে
ওউ বুঝি নছিবে[৩] ল', সই গো ॥

অধীন আবজলে বলে—
ও সই, দেখিয়া আইলাম চিরকালে গো
ওরে ধনীয়ে ধনীরে পুছে, নিধনীর তকদিরে[৪] ল', সই গো

। ৬৭ ।

আমার আল্লা ধান্ধাখুর[৫] —
আদম রে[৬] মাণিক দেখাইয়া বিলাইর চখুত নূর[৭]

আন্ধার কোঠাত থাকো বিলাই
নজর করো দূর।
হাজার টেকার[৮] মাণিক থইয়া[৯]
ধারিয়া খাও উন্দুর[১০] ॥

আল্লা রইছইন আলে[১১] রে ভাই,
রছুল রইছইন কলে।
যেইনামে তরিতায়[১২] তুমি
সেই নাম রইছে তলে ॥

আল্লারে তুকাইতায়[১৩] যদি
যাও তালিম-পুর—
আমার আল্লা ধান্ধাখুর ॥

---

১ অছিলা, উপলক্ষ, উপায় ২ বিভিন্ন দিকে ৩ এই বুঝি ভাগ্যলিপি ৪ ভাগো
৫ ফাঁকিবাজ ধাঁধাবাজ ৬ মানুষকে ৭ বিড়ালের চোখের চোখেব জ্যোতি ৮ টাকাব
৯ থুইয়া ১০ ইঁদুর ১১ আড়ালে রহিয়াছেন ১২ তরিবে ১৩ খুঁজিবে

। ৬৮ ।

গুরুর বচন কইলমা[১] সাধন,
ভুইলো না রে মন।
সাধন করিলে পাইবায়
রূপের দরশন রে ॥

আর 'লাইলাহা ইল্লেল্লাহ[২] '
নবীজীয়ে পড়িল্লা।
এগো, 'মোহাম্মদর্ রছুলুল্লা[৩]
পূর্বে বুঝাইলা রে ॥

আর তরিকত মঞ্জিলে[৪] ভাইরে
জপে নাম কলিমা।
ওরে 'লাইলাহা ইল্লেল্লাহ'
নাই তার সীমা রে ॥

আর হকিকত মঞ্জিলে[৫] বুলে
নাম আল্লার।
ওরে 'ইল্লেল্লা-ইল্লেল্লা' জপ'
এই নাম সার রে ॥

আর মারিফত মঞ্জিলে[৬] বলে
এই নাম সার।
ওরে সেই নামে করিবে বেহার[৭]
ভবের বাজার রে ॥

১ কলেমা, স্বীকৃতি বাক্য, ইসলামেব চাবিটি কলেমার প্রথম কলেমা ২ প্রথম কলেমা-র প্রথম অর্ধ: ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নাই ৩ প্রথম কলেমা-র দ্বিতীয় অর্ধ: মোহাম্মদ ঈশ্বর প্রেবিত ৪ ইসলাম শাস্ত্রানুযায়ী আচাব-অনুষ্ঠান মূলক সাধন-পন্থা ত্যাগ করিয়া প্রেম ও আন্তর অনুভূতি মূলক সাধন-পন্থা, ইহা গুরুবাদ মূলক ৫ ঈশ্বরের সত্তাকে আপনার মধ্যে অনুভব করিয়া আত্মসত্তার লয় ও ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতা, আনন্দের মাধ্যমে ৬ ঈশ্বরের প্রকৃত মর্মের উপলব্ধির স্তর ৭ বিহার, ভ্রমণ

আর সয়াল জুড়িয়া[১] ভাই রে
আল্লা-আল্লা সার।
ওরে, হু আল্লাহু দমের সনে
করো না বেহার রে॥

আর ছিপতী[২] রহমতী[৩] জাতি
নাম যতো আল্লার।
এগো, লাম-আলিফ-মিমরে[৪] মাঝে
মহিমা তোমার রে॥

আর এশ্‌ক্[৫] মিলাইয়া যে
করিবে সাধন—
এগো, দেখিবে সেইজন
চান্দের দরশন রে॥

আর অধীন হক আলীয়ে বলইন[৬]
মুরশিদের ঠাঁই—
ভাব বিনে লাভ নাই
আল্লার দরশনে রে॥

। ৬৯ ।

তোর গৈরবে[৭] আমরা গৈরবিনী
গো ফতিমা মা[৮],
তোর গৈরবে আমরা গৈরবিনী॥

---

১ পৃথিবী ব্যাপী ২ গুণবিশিষ্ট ৩ দয়া বিশিষ্ট ৪ আরবী বর্ণমালার তিনটি বর্ণ আদি কলেমার পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে ৫ প্রেম ৬ বলেন ৭ গৌরবে ৮ মোহাম্মদের কন্যা

আর 'আউজ বিল্লা'[১] পড়িয়া দেখ
তামামি ওজুদ[২]।
বিছমিল্লা[৩] পড়িয়া দেখ
সয়াল[৪] মজবুত ॥

আর নবীর বেটী—দুইনার[৫] খুঁটি—
ফতিমা-জননী।
ছকৃবাতের আজাবের[৬] কালে
তরাই' লইবায় নি[৭] ॥

আর সকলে ডাকিলা মা মোর,
আলীয়ে[৮] ডাকলায় না।
খাকী নূরী[৯] পিরৃথিমীয়ে
জা'গা দিলা না ॥

আর মুরশিদ মজাইদ চান্দে বলইন
কদম রছুল বইয়া—
পারইতাম পারইতাম করি'
দিন তো গেল গইয়া ॥

১ আমি ভগবানেব আশ্রয় গ্রহণ কবি ২ সমস্তই দেহ, অস্তিত্ব ৩ ভগবানের নামে ৪ তরল ৫ দুনিয়ার ৬ মৃত্যু-যন্ত্রণাব ৭ তরাইয়া লইবে কি ৮ ফতিমার স্বামী ৯ আলোকরূপা মাটি

॥ গৌরাঙ্গের প্রতি ॥

॥ ঝুমুর—একতালা ॥

। ৭০ ।

একবার গৌর গৌর গৌর বইলে
ডাকরে রসনা ;
যারে ডাকলে অঙ্গ শীতল হবে—
দূরে যাবে ভব-যন্ত্রণা ॥

রবির সুতে বান্ধ্‌বে[১] রে যখন—
মন রে, কোথায় রবে ঘর-দরজা,
কোথায় রবে ধন ॥

যখন বন্ধু সবে বিদায় দিবে—
সঙ্গের সঙ্গী কেউ হবে না ;
অজ্ঞান মন, মনরে আমার,
সঙ্গের সঙ্গী কেউ হবে না ॥

১ বাঁধিবে

। ৭১ ।

আমি নালিশ করি—ও গৌর চান্দ,
তোমারি কাছে।
জন্মাবধি অপরাধী—
আমার ঘুরছে শমন[১] পাছে পাছে ॥

অপরাধের নাই গো পারাপার ;
শ্রীগুরুর চরণে মতি না হইল আমার।
ইন্দ্রিয় রিপুরাধীন, মন রইল সেইদেশীর দেশে।

মন-বেপারী হইয়াছে কানাই ;
ব্রেজপতি[২] সাধুর কাছে যাইতে দিল নাই।
মায়ামদে বন্দী হইয়ে অকালে সে রাজ্য নাশে।

গৌর সিংহ-রাজে বলে—
তশীলদারী করতে চায় শমন চকিদারে ;
ও গৌর চাওনা কেনে তালাস করি'
কাঙাল রতনদাস কয় বদ্ধবেশে ॥

। ৭২ ।

॥ বড়ো চৌতাল ॥

এসে দেখরে নদীয়াবাসী :
ওরে শ্রীগৌরহরি—
ওরে 'রাধা' বইলে[৩] পড়ে ধরায়
—আমার নদীয়া-বেহারী[৪] ॥

১ যম ২ ব্রজপতি ৩ বলিয়া ৪ বিহারী

ওরে প্রেম-মাখা গৌর তনু—
ওরে হের নয়ন ভরি' ;
ওরে সোনার বরণ রূপে আমার
মন করল চুরি ঃ
—ওরে ওহে নদের চান্দ ॥

। ৭৩ ।

দেখ আসিয়া, নব নাগরী গো,
সুন্দর গৌরাঙ্গ রায় ।
নাগরী গো, সুন্দর কপালে সুন্দর তিলক—
সুন্দর নামাবলী গায় ॥

নাগরী গো, সুন্দর নয়ানে চাহিল যাহারি পানে—
শুধু দেহ থইয়া[১] প্রাণি[২] থইয়া যায় ॥

নাগরী গো, অধরে মধুর হাসি,—
কিবা দিবা, কিবা নিশি
পূর্ণশশী উদয় নদীয়ায় ॥

না জানি কোন্ রসে ভাসে—
গৌরায় কখন্ কান্দে, কখন্ হাসে ;
প্রেমানন্দে রাধার গুণ গায় ॥

নাগরী গো, যখন গৌরায় গান করে—
নদীয়াবাসীর ঘরে ঘরে—
নদীয়াবাসীর তাপিত প্রাণ জুড়ায় ॥

১ দেহ রাখিয়া ২ প্রাণ

ভাইবে[১] সদানন্দে বলে—
দেখ্‌বে যদি আয় সকলে—
হরি, জরমের[২] মতো বিকাই রাঙা পায়

। ৭৪ ।

আমি কি হেরিলাম গো নদীয়াপুরে।
সোনার বরণ গৌরাঙ্গ চান্দ—
দেখলে প্রাণ বিদরে ॥

ওহে নদীয়াবাসী গো,
কেউ চাইয়ো না গৌরার পানে—
কি জানি কি জানে।
পরাণ পড়শীক[৩] বিন্দে কেবল
প্রেমডোরেতে টানে ॥

ওহে নদীয়াবাসী গো,
অরুণ নয়ন গুণে যার বানে[৪] চায়—
সাপিনী দংশিল যেমন
কেবল বিষে তনু ছায় ॥

ওহে নদীয়া বাসী গো,
মন দিলাম রূপপানে, প্রাণ দিলাম পিছনে-
জাতিকুলমান সবই দিলাম
আমি পাই না চরণ কেনে ॥

১ ভাবিয়া ২ জন্মের ৩ পড়শী ৪ পানে

ওহে নদীয়াবাসী গো,
হেম বলে, এমন রূপে নয়ন দিলাম না—
বেরথা[১] গেল মানবজনম
আমি জ্বলিয়া কেনে মইলাম না ॥

। ৭৫ ।

ও জলে দেখ্‌বি যদি আয়—
সোনার বরণ গৌর আমার নদীয়ায় বেড়ায়।
গো জলে দেখবি যদি আয় ॥

আর বউ-বরাঙ্গ হইয়া রূপ[২]
জল আনিতে যায়।
কাঙ্খের কলসী ভাসাই'[৩] জলে
শ্যাম রূপে চায় ॥

আর সুচিত্র[৪] পালঙ্কের মাঝে
শইয়া[৫] নিদ্রা যায়।
মনে লয়[৬] —যৈবন ডালি
দিতাম[৭] রাঙা পায় ॥

তার ভাইবে রাধারমণ বলে,—
শুন্‌গো ধনি রাই :
এই আদরের গুণমণি
কোথায় গেলে পাই ॥

---

১ বৃথা: ২ বহু-বরাঙ্গ রূপ ধরিয়া (?) ৩ ভাসাইয়া ৪ সুচিত্রিত ৫ শুইয়া ৬ মনে হয়, মনে করি ৭ দিব, দিই

। ৭৬ ।

গৌর, রূপে আমায় পাগল করিলে গো—
যন্ত্রণা আর সহে না প্রাণে ॥

আর গৌর পাব, প্রাণ জুড়াব,
এই ভাবনা মনে।
ওরে, পাব নি[১] গো যুগল চরণ—
জীওনে-মরণে[২] ॥

আর কুখণে জল ভরিতে গেলাম
সুরধুনীর তীরে।
ওরে, কি জানি কি যাদু কইল—
গৌরচান্দের রূপে ॥

আর শাশুড়ী-ননদী ঘরে
ভয় বাসি[৩] মনে।
ওরে, কিসের শরম আমার—
যাইতাম গৌরার সনে ॥

রাধারমণ বাউলে বলে
গুরুর চরণে :
ওরে, গুরুপদে প্রাণ সঁপিতাম—
এই বাসনা মনে ॥

। ৭৭ ।

নদীয়ার বাসী গৌর বিনে বাঁচিনা, বাঁচিনা।
ও আমি উন্মাদিনী,
ঘরে রইতে পারি না, পারি না, পারি না ॥

১ পাইব কি   ২ জীবনে-মরণে   ৩ ভয় করি

যদি অইতাম ভক্ত-ডোরী[১] —
রাখতাম প্রেম হৃদয় ভরি' রে।
শিবচরণে অইতাম দাসী,—বাসনা, বাসনা, বাসনা

। ৭৮ ।

আমার শচীর দুলাল গৈয়ুর[২] রে—
আর কতো কান্দাও রে গৈয়ুর আমারে।
আমার সাধন-ভজন-সর্বস্বধন
ছাড় দিয়াছি তোমারে[৩] ॥

দয়া করো প্রাণের বন্ধু, ডাকি বারে বারে—
ও তুমি দয়া করো, প্রাণে মারো
যা লয় তোমার অন্তরে ॥

ভক্তগণ আসিয়া ফিরে তবু প্রেম-সায়রে—
আমারে ভাসাইলায়[৪] গৈয়ুর
সুখছাড়া প্রেম-সায়রে ॥

। ৭৯ ।

গৌর-বিচ্ছেদে প্রেমের এতোই জ্বালা গো—
নিবাও গো জল-চন্দন দিয়া ॥

আর বন জ্বলে সয়ালে[৫] দেখে—
ইদুরের আনল কেও না দেখে[৬]।
এগো, ধাকধাকাইয়া[৭] জ্বলছে আনল—
আনল জল দিলে আর নিবে না ॥

---

১ ডোর বা দড়ির মতো দৃঢ় ভক্ত ২ গৌর ৩ তোমাতে সমর্পণ করিয়াছি ৪ ভাসাইলে
৫ সকলে ৬ হৃদয়ের অনল কেহ দেখে না ৭ ধিকি-ধিকি করিয়া

আর আদরে-আদরে প্রেম
আগে বাড়াইয়া—
এগো, অখন[১] মোরে প্রাণে মাইলায়[২] গো
ও সই, স্বপন দেখাইয়া গো ॥

আর ভাইবে রাধারমণ বলে—
ও সই, মনেতে ভাবিয়া,
এগো, নিবি' ছিল[৩] মনেরি আগুইন,
কে দিল জ্বালাইয়া ॥

। ৮০ ।

ও তুমি আইছ[৪] রে গৌরাঙ্গ চান্দ
এই বাসরে।
আর আইছ আইছ দয়াল গৌর—
হৃদয়ের মাঝারে ॥

এগো, কণ্ঠেতে বসিয়া নাম
জপ' মধুর স্বরে।
রে গৌরাঙ্গ চান্দ, এই বাসরে ॥

আর কিবা দিবা, কিবা নিশি,
চিন্তা যার মনে—
এগো, বাউল মনের এই বাসনা
জীবনে-মরণে ॥

১ এখন ২ মারিলে ৩ নিভিয়া ছিল ৪ আসিয়াছ

। ৮১ ।

তোরা কে যাবে গো—আয়, আয়—
গৌর-প্রেমের বাজারে।
ওরে মন, সাধের দোকান খুইলে[১] নিতাই ডাকে ॥

আর বসাইছি নতুন বাজার—
বিকি-কিনি চমৎকার—নতুন বাজার।
ওরে, মাইয়া হইলে যাইতে পারে
পুরুষ নেয় না রে[২] ॥

আর মাল কিনিলাম শতে-শতে—
উজন[৩] রসিকের হাতে—শ্রীগৌরার মতে।
ওরে, মহাজনের ভাও[৪] জানি না
আমার মাল বিকায় না রে ॥

আর পাক্কা না দালানে বসি'
শুন ওগো প্রাণ-পিওসী[৫]—ওগো প্রাণ-সখি :
আমার মনরে বুঝাইলাম কতো
অবোধ মনে নিষেধ মানে না রে ॥

। ৮২ ।

॥ কাহারবা ॥

মুখে 'হরিবল হরিবল হরিবল' বইলে[৬]
কে রে এমন নাচে-গায়—
ধ্বনি কি মধুর শোনা যায় ॥

---

১ খুলিয়া ২ সাধককে নারী হইতে হইবে ৩ ওজন ৪ বাজার দর ৫ প্রাণ-প্রেয়সী
৬ বলিয়া

আর কাল গিয়েছে যারা মাধাই
এসেছে কি তারা দু'ভাই ;
আজ কেন নাম মন্ত্রের মতো—
অন্তরে পশিল, মাধাই ॥

আর হরি-নামে দিয়ে সাড়া
ঘুরে আয় ভাই কাঙাল-পাড়া।
ভব-পারের বাঞ্ছা করে যারা—
তারার[১] নাকি সময় যায় ॥

আর শুনেছি ভাই—কাঙাল পাইলে
গৌর-নিতাই যায় রে গ'লে।
চল্—মোরা দু'ভাই মিলে—
ধরি গি'[২] দু' ভাইয়ার পায় ॥

আর পাপের বোঝা দূরে ফেলে
দু' ভাই নিব দু' ভাইর কোলে।
নাচব গাব, 'হরিবল' বইলে
ঘুচাব শমনের দায় ॥

। ৮৩ ।

॥ ঝুমুর ॥

গৌর হইতে দয়াল হয় নিতাই ;
নিতাইকে মারিস না মাধাই—
ওয়ার দেইখে বদন জুড়ায়
জীবন এমন জনকে মারতে নাই।
মাধাই রে, অবোধ মাধাই,
এমন জনকে মারতে নাই ॥

১ তাহাদের ২ গিয়া

অঙ্গে বহে রুধির ধার—
দেইখে দয়া না হয় কার ;
পাষাণ হৃদয় মাধাই রে তোর
এ কি চমৎকার ।
ওই দেখ্, মাইর খাইয়ে আমায় চাইয়ে—
'হরি বলো' বলে সদায় ॥

সত্য-ত্রেতা গিয়াছে—
দ্বাপর গত হইয়াছে ;
মাইর খাইয়ে কে বা কারে
দয়া কইরাছে ।
আমি আর ঘরে যাবো না ফিরে—
বইলো যাইয়ে মায়ের ঠাঁই ॥

মাধাই রে, অবোধ মাধাই,
আমি এই যে ঘরের বাহির হইলাম রে—
আর ঘরে যাবো না ফিরে ।
মাধাই, বইলো যেয়ে মায়ের কাছে—
জগাই গিয়াছে নিতাইর কাছে ;
তোদের সঙ্গ ছাইড়ে জগাই গিয়াছে

। ৮৪ ।

॥ ঝুমুর ॥

মাধাই তোর লাগি' নাম এনেছি রে—
একবার 'হরি' বল্ ;
মাধাই, জানিয়ে আয় রে
ও তোর মায়ের কাছে—
হরির নাম নিতে কি বাধা আছে ॥

মাধাই, স্নান করে আয়
অমৃত গঙ্গাজলে।
স্নান করে আয়—
হরির নামের মালা দিব গলে

। ৮৫ ।

॥ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ॥

বলো বন্ধু, তুমি নি আমার রে,
শুনরে হৃদয়-রতন ;—
শ্রীচরণে অইতাম[১] দাসী আমি, ও মৃত কালেতে-
ভমর বাসনা করো রে পূরণ ॥

ঘরে বয়রী[২] কাল ননদী, আমায় যন্ত্রণা দেয় নিরবধি,
সরল ভাবে গরল খাইয়াছি।
ও আমার মনের আশা পূরল না রে—
হায় রে হৃদয়-রতন,
ও যাঁর নাম লইলে দুখ হয় নিবারণ ॥

। ৮৬ ।

সোনাবন্ধু পিওরায়,[৩] তুমি বিনে প্রাণ রাখা দায়।
এগো, পড়িয়াছি সঙ্কট-সায়রে[৪] —
না দেখি গো উপায় ॥

১ হইব ২ বৈরী ৩ প্রিয় ৪ বিপদসাগরে

আর তোমার রূপ-ঝলক দেখি'
আমার মন হইয়াছে উদাসিনী।
এগো, একবার আসি' দেখাও রূপ—
নইলে প্রাণি[১] জ্বলিয়া যায়॥

আর মনে বড়ো আশা ছিল—
ও সই, দেখ্‌মু বলে চান্দমুখ।
ওরে আইজ দেখমু, কাইল দেখমু বলে
দিনের পথে দিন যায়॥

আর পাগল নজব বলে—
আমি ঠেকিয়াছি পিরিতের ফান্দে।
এগো, পিরিত করি' ঠেক্‌ছি ফান্দে
ছাড়াইয়া যাইতে বিষম দায়॥

।৮৭।

কালা চান্দ, তুমি বলো বলো বলো না,
পূরাইবায় নি[২] মন-বাসনা।
এগো, জীবনেরি নাই গো আশা—
কালাচান্দের দেখা বিনা॥

আর জীবনদান করিলাম বন্ধু রে
জানিয়া আপনা।
এগো, তুমি বিনে দুঃখীয়ার
কে করিব যতনা[৩]॥

১ প্রাণ ২ পূরণ করিবে কি ৩ কে যত্ন করিবে

আর প্রেম-ছাটা[১] বড়ো লেঠা
লাগ্‌লে ছুটে না।
এগো, তুমি বিন্যে অন্য জনে
মন আমারি মজে না॥

আর অধম রইছে বলইন[২]
যে করিয়াছে দেওয়ানা[৩] —
এগো, জীবন থাকিতে মোরে
দেখা আসি' দিলায় না[৪]॥

। ৮৮ ।

হায়রে বন্ধু নিদারুণ কানাই,—
তোমার লাগিয়ারে আমি যমুনাতে যাই

আর দুঃখের উপর দুঃখরে বন্ধু,
দুঃখের সীমা নাই।
আরে, কা' ঠাঁই[৫] কহিতাম[৬] দুখ
কহিবার জা'গা[৭] নাই।

আর ধন দিলাম, প্রাণ দিলাম,
আর তো কিছু নাই।
ওরে, কি ধন আছে, কি ধন দিমু,
কলঙ্কিনী রাই॥

আর আমি তোমার, তুমি আমার,
আর কিছু নাই।
ওরে, জনমের মতো যেন
দাঁড়াইবার জা'গা পাই॥

১ প্রেমের দীপ্তি, স্পর্শ ২ বলেন ৩ উন্মনা ৪ দিলে না ৫ কাহার নিকট ৬ কহিব ৭ জায়গা

। ৮৯ ।

॥ জল আনা ॥

পন্থ ছুড়,[১] যমুনাতে যাই রে, নন্দের গোপাল রে,
পন্থ ছুড়, যমুনাতে যাই ॥

গোপাল রে, জল নাই মোর কলসীতে—
চলিলাম যমুনায় যাইতে রে।
ওরে, পন্থে কেন দেও পরিবাদ রে ॥

গোপাল রে, কোন্ দুয়ারে আইলায়[২] ঘরে—
চিনিতে না পাইলাম তোরে।
ওরে, নিদ্রা গেলে লনী করো চুরি রে ॥

গোপাল রে, তুমি খাইলায়[৩] লনী খালি—
রাধা হইলা কলঙ্কিনী রে।
লোকে বলে, আমি অপরাধী রে ॥

গোপাল রে, ননদী মোর আগ দুয়ারে[৫]
সদায় বিবাদ করে।
ওরে, আমি নারী কেমনে হইমু বা'র[৪] রে ॥

গোপাল রে, যদি সে সন্ধান করো—
ননদী মারিতায়[৫] পারো রে।
ওরে, সুখে করি প্রেম-আলাপন রে ॥

গোপাল রে, যদি তোর ছিল মনে
কান্দাইতে রাত্র-দিনে রে—
ওরে, তবে কেন বাড়াইলায়[৬] পিরিতি রে ॥

১ ছাড়ো ২ আসিলে ৩ খাইলে ৪ বাহির ৫ মারিতে ৬ বাড়াইলে

গোপাল রে, পাগল আরকুমে বলে—
ননদীরে দূর কইলে[১] রে—
ওরে, বন্ধের সনে হইব মিলন রে

। ৯০ ।

ঢেউ দিয়ো না, ঢেউ দিয়ো না, ঢেউ দিয়ো না জলে—
গো সই, ঢেউ দিয়ো না জলে ॥

আর ঘুম তনে[২] উঠিয়া রাধে
কলসী পানে চায়।
কলসীতে নাইরে জল,
যমুনায় চলে থিরে[৩] ॥

আর কলসী ভরিয়া রাধে
থইল[৪] কদমতলে ;—
কদমফুল ঝরিয়া পড়ে কলসীর মাঝারে ॥

আর শাশুড়ী বলে, গো বধূ,
এতো দিরং[৫] কেনে ?
ওরে জলে গেলে পাড়ার লোকে
পথ দেয় না মোরে ॥

ভাইবে রাধারমণ বলে,
শুনো গো সকলে :
পঙ্খ নয়[৬] উড়িয়া যাইতাম[৭]
ফিরিয়া জলের ঘাটে ॥

---

১ করিলে ২ ঘুম হইতে ৩ ধীর স্থিরভাবে ৪ রাখিল ৫ দেরি ৬ পাখী নই ৭ যাইব

। ৯১ ।

॥ বাঁশীর প্রতি ॥

কঠিন শ্যামের বাঁশী রে, ও বাঁশী,
ঘরের বা'র কইলে[১] বাঁশী আমারে

সঙ্গে করি' নেও রে বাঁশী
দাসী বানাই'[২] আমারে।
সহেনা, বিচ্ছেদের জ্বালা আর দিয়ো না আমারে ॥

এমন দইরদী[৩] নাইরে
বুক চিরি' দেখাব কারে।
তোর যন্ত্রণায় ঘর ছাড়িয়া
হইলাম জঙ্গলবাসী রে ॥

কোথায় গেলে পাবো তারে
ভাবি বসে নিরলে[৪]।
একবার যদি পাইতাম শ্যাম—
মজিয়া রইতাম চরণে ॥

ভাইবে রাধারমণ বলে—
শুন্ গো তোরা সকলে ঃ
ওরে, পাইতাম যদি শ্যামের বাঁশী—
মজিয়া যাইতাম তাঁর চরণে ॥

। ৯২ ।

ওরে সঙ্কেট[৫] বাঁশী বাজায় গো শ্রীকান্তে ;
এগো, রাধা রাধা রাধা নাম ধরি'
শুনতে পাইলাম বাঁশী বাজায় গো শ্রীকান্তে ॥

১ করিলে ২ বানাইয়া ৩ দরদী ৪ নিরালায় ৫ সঙ্কেত

আর একে তো বাঁশীর গো জ্বালা—
আর জ্বালায় বসন্তে।
আর মন হইয়াছে উন্মাদিনী
ভাবিতে চিন্তিতে॥

আর শ্যাম-কলঙ্কিনী নাম গো আমার
বাকী নাই কেউ জান্‌তে।
ওগো, বলউক[১] বলউক লোকে মন্দ-
ছাড়ব না প্রাণান্তে॥

আর ভাইবে রাধারমণ বলে—
ভাবিয়া মনেতে।
ওরে, জী'তে[২] না পূরিলে আশা
পূরে যেন অন্তে॥

। ৯৩।

আমার মন কইল[৩] উদাসী গো—
কই বাজে গো কালাচান্দের বাঁশী।
হায় গো, বাঁশীর স্বরে প্রাণ বিহ্বরে,[৪]
আমি কান্দি দিবা-নিশি গো॥

সখি গো, মনে লয়— তার সঙ্গে যাইতাম
হইয়া তার দাসের দাসী।
হায় গো, যাইতে নাহি দিল আমায়-
ননদী নৈরাশী[৫] গো॥

---

১ বলুক ২ জীবিত কালে ৩ করিল ৪ বিদারিত হয় ৫ যে অপরকে নিরাশ করে

সখি গো, পিরিতের ছেল[১] বুকে মারি'
কোথায় রইলায়[২] বসি'।
পাইলে চরণ—দিব যৌবন
জাতি-কুল বিনাশি'॥

কইন[৩] ছাবাল আকবর আলী—
আমি পিরিতের সন্ন্যাসী।
পাইলে করিতাম আমি
চিরদিনের খুশি গো॥

। ৯৪ ।

ওরে, মইলাম[৪] রে তোর পিরিতে আসিয়া[৫],—
রে শ্যাম-কালিয়া,
মইলাম রে তোর পিরিতে আসিয়া॥

শ্যাম-কালিয়া হ'[৬], তুমি তো শ্যাম-কালিয়া,
তুমি বাঁশী বাজাও ভালা হ'।
ও তোর বাঁশীর সুরে গিরে[৭] না দেয় রইতে—
রে শ্যাম-কালিয়া॥

শ্যাম কালিয়া হ', একদিন দুইদিন দুই প'র বেলা
আমারে ডুবাইয়া মাইলায়[৮] হ'॥

১ শেল ২ রহিলে ৩ কহেন ৪ মরিলাম ৫ করিয়া ৬ হে ৭ গৃহে ৮ মারিলে

। ৯৫ ।

ওরে, কি কাজ কইলাম চাইয়া[১] গো সই,
কি কাজ কইলাম চাইয়া।
মন চলে না, গৃহে যাইতাম, প্রাণ-বন্ধুরে থইয়া ॥

আর সোনার বান্ধাইল বাঁশী[২] —
রূপার বান্ধা কেনে হিয়া।
এগো, কোন্ বনে বাজায় বাঁশী
প্রাণ নিল হরিয়া গো ॥

আর মনোসাধে প্রেম করিয়া
মরিলাম ঝুরিয়া।
এগো, এমন নিঠুর বন্ধু—
না চাইল ফিরিয়া গো ॥

আর আগে যদি জানতাম বন্ধু
যাইবায়[৩] রে ছাড়িয়া ;—
এগো, তবে কেনে করতাম পিরিত
বিনা দড়াইয়া[৪] গো ॥

আর ভাইবে রাধারমণ বলে—
সই গো, মনেতে ভাবিয়া :
এগো, মনে লয়, তার সঙ্গে যাইতাম—
কুলমান ত্যজিয়া গো ॥

---

১ চাহিয়া ২ সোনা দিয়া বাঁধানো বাঁশী ৩ যাইবে ৪ শক্ত করিয়া

। ৯৬ ।

সুখ চাইতে বুক বিদুরে[১] গো—
বন্ধে প্রাণ নিল কাড়িয়া গো।
আমি রইলাম গো সই
নবীন বন্ধুয়ার বানে[২] চাইয়া ॥

আর চাইতে-চাইতে কমলিনীর
নয়ান হইল ভারী।
হাঁটিয়া যাইতে ঢলিয়া পড়ে গো
ও রাই সখি গো ॥

আর মুই গেলু যবুনার জলে
আখি দিয়া ঠারে।
ঠারে-ঠুরে বাঁশীর গানে
বন্ধে প্রাণ নিল কাড়িয়া গো।

আর রতনমণি বলে, গো ধনি,
যৌবন হইল মোর শেষ।
কি পিরিত বাড়াইয়া বন্ধু রে—
বন্ধু, যাও নিজ দেশ ॥

। ৯৭ ।

কে বাজাইয়া যায় গো সখি,
কে বাজাইয়া যায়।
এগো, ডাক দিয়া জিঙ্গাসা[৩] করো-
কি ধন নিত[৪] চায় গো ॥

১ বিদারিত হয়   ২ পানে   ৩ জিজ্ঞাসা   ৪ লইতে

আর কাঞ্চা বাঁশের বাঁশীগুলি[১]
তলোয়ার বাঁশের[২] আগা।
এগো, নাম ধরিয়া ডাকে বাঁশীয়ে-
কলঙ্কিনী রাধা গো॥

আর যেই না ঝাড়ের বাঁশীগুলি
ও তোর ঝাড়ের লাগাল পাই—
এগো, জড়ে-পেড়ে উগাড়িয়া[৩]
সাগরে ভাসাই গো॥

ভাইবে রাধারমণ বলে—
বাঁশী কে বাজায়ঃ
এগো, বাঁশীর রব শুনি
বাজায় চিকন কালায়॥

। ৯৮ ।

পাও যদি শ্যাম বন্ধের লাগাল,—
বাঁশী আনো কাড়ি'।
ওরে, ধরি' আনো প্রাণবন্ধুরে,—
পাও যার বাড়ী॥

বাঁশী বাজাইয়া বন্ধে
ফিরইন[৪] বাড়ী-বাড়ী।
হয় রে, তোমারে ধরিবার লাগি'
হইলাম উদাসিনী গো॥

১ বাঁশীটি ২ সরু বাঁশ বিশেষ ৩ ডালে-মূলে উপাড়িয়া ৪ ফিরেন

আর যথায়-তথায় যাওরে বন্ধু
আমায় রাখিয়ো মনে।
হয় রে, দুখিনী ভিখারীর নাম
লেখিয়ো চরণে গো ॥

আর রাধার নাম লেখ্‌তে বুঝি
কিছুই দুখ পাইন।
ওয় রে, ধূলায় লেখিয়া নাম
চরণে মিশাইন[১] গো ॥

আর কইন তো ফকির কানু শা'য়
সনদের[২] পারে বইয়া—
পারইমু-পারইমু করি'
দিন তো যায় গইয়া[৩]॥

। ৯৯ ।

যার লাগি' কান্দিয়া মরি—
দুই নয়ানে বইছে বারি[৪] ॥

আর ফুলের মালা পরাইছি গলে—
চিকন কালায় বাজায় বাঁশী কদম্বের তলে।
ওরে, মনে লয়,[৫] তার সঙ্গে যাইতাম[৬] —
কুলমান ত্যজ্য করি' ॥

আর শরম হনে[৭] মরণ গো ভালো—
প্রাণ-বন্ধুর পিরিতে আমার জাতিকুল গেল।
ওয়গো, তোষের আনল জ্বলছে দেহায়[৮] —
ঘরে বঞ্চিতে না পারি[৯] ॥

---

১ মিশান ২ একটি বিলের নাম ৩ কাটিয়া ৪ ধারা বহিতেছে ৫ মনে হয় ৭ যাই, যাইব ৬ হইতে ৮ দেহে তুষের অনল জ্বলিতেছে ৯ ঘরে থাকিতে পারি না

আর মুজমিল নাগরে গো বলে—
লাগাইছি পিরিতের ছাটা[১] কদম্বের তলে।
ওয়গো, কদমতলায় জলের ঘাটে—
বস্ত্রহরা বংশীধারী ॥

। ১০০ ।

অউত যারায় গিয়া[২] —
বন্ধুরে, আমায় পরাণে বধিয়া।
আরে সত্যি করি' কও রে বন্ধু,
আইবায় নি[৩] ফিরিয়া রে ॥

আর চূড়া-ধড়া-মোহন বাঁশীরে,
বাঁশী, যাও নিকুঞ্জে থইয়া।
ওরে, অবশ্য আসিবায় তুমি—
ওই বাঁশীর লাগিয়া রে ॥

আর ভাইবে রাধারমণ বলে রে—
বন্ধু, শুনো মন দিয়া।
ওরে, নারী যদি হইতায়[৪] তুমি—
জানতায়[৫] প্রেম-জ্বালা রে ॥

। ১০১ ।

॥ সখীর প্রতি ॥

কি বলমু[৬] কালিয়া রূপের কথা, গো সজনি,
কি বলমু কালিয়া রূপের কথা।
আমি এথা মরি লাজে, কি যন্ত্রণা পথের মাঝে—
ও আমি জানি না—সে পন্থে চিকনকালা ॥

ছটা, দীপ্তি ২ এই যে তুমি চলিয়া যাইতেছ ; ৩ আসিবে কি ৪ হইতে ৫ জানিতে ৬ বলিব

সব না[১] সখীর সঙ্গে যমুনাতে গেলাম রঙ্গে—
ও আমার ভাসিয়া তনু হইল উলের[২] সুতা।
গো সজনি, কি বলমু কালিয়া রূপের কথা॥

ভাইবে রাধারমণ বলে, ভাবিয়ো না রাই নিরানন্দে—
ও আমার সব দুখ হৃদয়েতে গাঁথা।
গো সজনি, কি বলমু কালিয়া রূপের কথা॥

। ১০২ ।

বলিয়ো না গো সজনি আমার সনে[৩] —
সদায় জ্বালাই' মাইল[৪] কালায় মোরে।
—তোমরা বলিয়ো না॥

আর আড়ি[৫] কালা, পাতিল কালা
তাতে রান্ধি' খাই।
ও যমুনার জল কালা—
তাতে সিনান করই[৬]॥

আর আছমান[৭] কালা, জমিন কালা,
কালা মাথার কেশ।
আঙ্খির পুতুলা[৮] কালা—
ধরে নানান বেশ॥

---

১ অর্থহীন অব্যয় পদ ২ এলোমেলো ৩ আমার কাছে ৪ জ্বালাইয়া মারিল ৫ হাঁড়ী
৬ করি ৭ আশমান ৮ পুত্তলি, নয়নের মণি

। ১০৩ ।

কদমতলে বংশীধারী,
ও নাগরী, জলের ছইলে[১] দেখবে তায়—
চল্ সজনি, যাবায় নি[২] গো যমুনায় ॥

প্রাণসই, সখি গো, আমার বন্ধুয়া বিনে
দরদ না মানে প্রাণে গো।
হৃদ্-কমলে জ্বলছে আনল—
আনলে জল দিলে আর নিভে না গো ॥

প্রাণসই, সখি গো, আমারে পরতিঙ্গি করি[৩]
ধরিয়া রাখছে বন্ধের হাতে গো।
যখন টানে তখন প্রাণে মানে না গো ॥

প্রাণসই, সখি গো, ভাইবে রাধারমণ বলে—
প্রেম জানো না তোমরা সবে গো।
মনের দুখ আর বলমু কারে,
আমার বন্ধু বিনে কেও[৪] জানে না গো ॥

। ১০৪ ।

দারুণ পিরিতের ফাঁসি, আপন খেদে[৫] লাগাইছি—
বলো সই, উপায় কি করি ॥

যখন বন্ধের রূপটি দেখছি—
পতঙ্গের মতো সই গো বিপাকে ঠেকছি[৬]।
হাত-পাও-পর[৭] জ্বলে গো
উড়িয়া যাইতে না পারি ॥

[১] ছলে [২] যাইবে কি [৩] পতঙ্গ করিয়া [৪] কেহই [৫] ইচ্ছায় [৬] পড়িয়াছি [৭] ডানা

বন্ধের রূপ খেদঙ্গ হইয়ে[১]
অন্তরে লাগিয়াছে সই গো, বাঁচি কেমনে।
বিষে অঙ্গ জর্জ্জর গো।
খুলিতে প্রাণে মরি ॥

নগরিয়া লোকে মোরে কয়—
যার মনে যা লয়, সই গো, কহে আমারে
হইছি দোষী-অপরাধী গো,
পাসরিতে না পারি ॥

অপরাধী হক আলীয়ে বলে—
যার মনে যা লয়, সই গো, কহে আমারে।
যাহা করো, রাজী আছি গো[২]
ফাঁসি লাগাইছি,—কি করি ॥

। ১০৫ ।

ওরে, একলা কুঞ্জে শুইয়া থাকি—
পাইনা রাধার মনোচোর।
সইগো, রজনী হইল ভোর ॥

সই গো সই, ভাবি যারে, পাই না তারে
সে বড়ো নিষ্ঠুর।
এগো, আমায় ছাড়ি' প্রাণ-বন্ধু
রইয়াছেন মথুরাপুর ॥

১ প্রাণঘাতী তীর হইয়া ২ যাহা বলো তাহাতেই রাজী আছি

সই গো সই, ফুলের শয্যা-বিছানায়
লজ্জা দিলাম রে দূর[১]।
কোকিলার কুহু রবে নিশির বুঝি
নাই গো জোর॥

সই গো সই, ভাইবে রাধারমণ বলে
হইয়া বেভোর ঃ
এগো, ঘুমের ঘোরে রইলাম পড়ি'
ধরব মনোচোর॥

। ১০৬।

আমার কৃষ্ণ কোথায় পাই গো—
বল্ গো সখি, কোন্ দেশেতে যাই।
কৃষ্ণপ্রেম-কাঙালী অইয়া[২] আমি নগরে বেড়াই গো

আর আপনা জানি' প্রাণ-বন্ধুরে
ইদ্‌রে[৩] দিলাম ঠাঁই।
এগো, ভাঙল আশা, দিল দাগা—
আর প্রেমের কার্য নাই॥

আর সুচিত্র পালঙ্কের মাঝে
শইয়া[৪] নিদ্রা যাই।
এগো, ঘুমাইলে স্বপন দেখি—
শ্যাম লইয়া বেড়াই গো॥

১ লজ্জা দূর করিলাম ২ হইয়া ৩ হৃদয়ে ৪ শুইয়া

আর ভাইবে রাধারমণ বলে—
শুন্ গো ধনি রাই ঃ
এগো, এই আদরের গুণমণি
কোথায় গেলে পাই গো ॥

। ১০৭ ।

আমার বন্ধু আনি'[১] দেও গো তোরা
আমার কালা আনি' দেও গো তোরা—
কই[২] ও শ্যাম-মনোহরা ॥

পোড়া অঙ্গ জুড়াইতে আইলাম গো
তোদেরি পাড়া।
ওরে, মারিয়ো না, মারিয়ো না দূতী,
আমি তোদেরি পিরিতের মারা[৩] ॥

ভাবিয়ে রাধারমণ বলে,
ভাবিয়া তনু হইল গো সারা।
ওরে, মারিয়ো না, মারিয়ো না বন্ধু,
শ্যাম আছে গোপনের ফাড়া ॥

। ১০৮ ।

শ্যাম বিনে চাতকী হই—
আমি নাম শুনে পাগলী হই।
বন্ধের নাম শুনাও গো প্রাণ-সই

১ আনিয়া ২ কোথায় ৩ প্রেমাহত

চাতক রইল মেঘের আশে—
তেমনি মতো রইলাম গো শ্যামবন্ধের আশে।
ও আমার দুঃখ কার ঠাঁই কই,
আমি হৃদয়ের দুঃখ কার ঠাঁই কই॥

তমালডালে বাজাও হে বেণু—
তমালডালে লাগছে গো রাধা-শ্যামের পদের রেণু।
ওরে, তমালডালে আমার গলে গো
আমি একাত্র বান্ধিয়া থই[১]॥

আর ভাইবে রাধারমণ গো বলে—
পড়িয়া রইলাম শ্যাম যুগল চরণ-তলে
ওরে, শ্যামের দেখা পাবো বলে—
আশা পথ চাইয়া রই॥

। ১০৯ ।

ওরে, প্রেম-সরোবরে সই গো, প্রেম-সরোবরে,
প্রেম-সরোবরে নামলে—
ধরবব[২] নিদয়া কুম্ভীরে॥

আর এমন নির্মল জল—ঝলমল করে।
এগো, মনে লয়, মরিয়া যাইতাম—
ঝাম্পু দিয়া জলে॥

আর বন্ধের লাগি' ভাবতে ভাবতে
বস্‌না[৩] ভিজল জলে।
এগো, মনে লয়, মজিয়া গো রইতাম—
চরণ-কমলে॥

১ একত্রে বাঁধিয়া রাখি ২ ধরিবে ৩ বসন

আর ভাইবে রাধারমণ বলে—
সই গো, আশা ছিল মনে।
এগো, জী'তে[১] না পূরিলে আশা-
মরিলে কি পূরে ॥

। ১১০ ।

পিরিতে মোর কুল নিলায়,[২] গো ধনি,
না জানি' ডুব দিলাম গো ॥

ধনি গো, এগেনা-বেগেনা[৩] ধনী—
পর কি আপন।
আপনা জানি' কইলাম পিরিত গো
ও ধনি, ডুবিবার কারণ[৪] গো ॥

ধনি গো, আমি নারী এ যৈবতী[৫]
যৈবন রাখা দায়।
কেমনে সঁপিতাম যৈবন গো
ও ধনি, শ্যামের রাঙা পায় গো ॥

ধনি গো, ভাইবে রাধারমণ বলে—
হইয়া পাগল :
স্ত্রীর কাছে বান্ধিয়া রাখছে[৬] গো
ও ধনি, গৃহস্থের ছাগল ॥

। ১১১ ।

সই গো, বলিয়া দে আমায়—
দিবা-নিশি ঝুরিয়া মরি কালিয়া সোনার দায়

১ জীবিতকালে ২ লইলে ৩ আপন-পর ৪ ডুবিবার জন্য ৫ যুবতী ৬ রাখিয়াছে

কলসী লইয়া গো রাধে
যেই দিগেতে চায়—
আটিয়া[১] যাইতে ঢলিয়া পড়ে
সোনা-বন্ধের গায় ॥

কদমডালে বইয়া[২] গো বন্ধে
বাঁশীটি বাজায়—
কদমফুল ঝরিয়া পড়ে
সোনা-বন্ধের গায় ॥

ভাইবে[৩] রাধারমণ গো বলে—
মইলাম পরার দায়।
এগো, পর কি আপনা হয়
ছাল্লাত[৪] বুঝা যায় ॥

। ১১২ ।

পিরিতি করি' শ্যাম-কালাচান্দে
ঠেকাই'[৫] গেল ফান্দে ;
লাঞ্ছনা ঘটাইল সোনা-বন্ধে ॥

সই গো, এ ঘরে শাশুড়ী বয়রী[৬]
ফুকারিতে নাই পারি ;
প্রাণি কান্দে 'জয় হৃদয়' বলি'।
এগো, ঘরে জ্বালা, বাইরে জ্বালা-
আর জ্বালা দেয় নন্দে[৭] ॥

১ হাঁটিয়া ২ বসিয়া ৩ ভাবিয়া ৪ পরামর্শে ৫ ঠেকাইয়া ৬ বৈরী ৭ ননদে

সই গো, একে তো অবুলা[১] বালা,
মাথে কলঙ্কের ডালা—
বুক ভিজইয়া[২] যায় দুই নয়ানের জলে।
ভাইবে রাধারমণ বলে, কাজ নাই কুলমানে

। ১১৩ ।

বিনয় করি' বলি, কোকিল রে কোকিল,
রাধার উকিল অইয়ো[৩]।
এগো, শ্যাম-বিচ্ছেদে রাই-দুখিনীর সংবাদ জানাইয়ো রে॥

আর যেই পন্থে কৃষ্ণ গেছইন,[৪]
রে কোকিল, সেই পন্থে যাইয়ো।
এগো, অকোধিনী[৫] বিরহিণীর দুখের কথা কইয়ো রে॥

আর মুক্ত বনে থাকো কোকিল,
রে কোকিল, মুক্ত কথা কইয়ো।
এগো, বৃক্ষডালে ভর করিয়া রাধার গুণ গাইয়ো রে॥

আর হীন জ্ঞানচান্দে বলে—
রে কোকিল, শুনো মন দিয়া।
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে শ্যাম রইয়াছইন[৬] ভুলিয়া রে॥

১ অবলা ২ ভিজিয়া ৩ হইয়ো ৪ গিয়াছেন ৫ অক্রোধিনী ৬ রহিয়াছেন

। ১১৪ ।

॥ বাসক-সজ্জিকা ও বিপ্রলব্ধা ॥

মুই নারীয়ে কি দোষ কইলু[১], রে পাগল,—
হায়রে নাগর, মুই নারীয়ে কি দোষ কইলু ॥

শয্যা না করি' অভাগী নারী
রইলাম পন্থে চাইয়া।
আসিবায়-আসিবায় করি'[২]
আমার রাত্রি গেল গইয়া ॥

যারে বলি বন্ধু, রে বন্ধু,
বন্ধে বাসইন ভিন্[৩]।
জনম ভরি' রইল দুখ মোর
না পাইলাম গোবিন্[৪] ॥

ঠাকুর পিয়াশা'য় কইনি
হইয়া বেভুল—
হির্‌ছ ভাবি'[৫] ভুলিয়া রইলাম
না পাইলাম তোর কূল ॥

। ১১৫ ।

আমি দুখুনী[৬] জানিয়া রে
প্রাণ-বন্ধু রে, তোমার মনে নাই।
প্রেমানলে অঙ্গ জলে—
আমি জলিয়া-পুড়িয়া হইলাম ছাই ॥

---

১ করিলাম ২ আসিবে-আসিবে করিয়া ৩ পর মনে করেন ৪ গোবিন্দ ৫ লোভ করিয়া ৬ দুখিনী

আর চাওনা কেনে নয়ন তুইলে[১] ,
কোন্ কামিনীর সনে, রে বন্ধু, রইয়াছ ভুইলে[২] ।
ওরে, তুমি যদি ভিন্ন বাসো,[৩] —
আমি দুখুনীর আর কেহই নাই ॥

আর ভাইবে রাধারমণ বলে,
ভ্রমর বয় না[৪] শুকনা গো ডালে—
মধু না পাইলে ।
ও দীন মদন বলে,—
ও মৃতকালে আমি চরণ যুগল দর্শন চাই ॥

। ১১৬ ।

বন্ধু, বাঁকা শ্যামরায়,
অভাগীর অন্তরে প্রাণনাথে কি জ্বালা দিলায়[৫] ॥

আইলায়[৬] না রে সোনাবন্ধু,
রইলায়[৭] কোথায় ।
মিছামিছি প্রেম বাড়াইয়া
আমারে মাইলায়[৮] ॥

ধেনুর সনে গোচারণে
কদম্ব তলায় ।
বাঁশীটি বাজাইয়া বন্ধে
দ্বিগুণ জ্বালায় ॥

১ তুলিয়া ২ ভুলিয়া ৩ ভালো না বাসো ৪ বসে না ৫ দিলে ৬ আসিলে ৭ রহিলে
৮ মারিলে

আর ভাইবে রাধারমণ বলে—
পিরিতি বিষম দায়।
পর কি আপনা হইব[১]
থুড়াত[২] বুঝা যায়॥

। ১১৭।

বলো এগো প্রাণ-সজনি,
বন্ধু কোথায় রইল, বলো বলো॥

কুলমান আপন জাইনে[৩],
প্রাণ সঁপিলাম তাঁর চরণে গো—
অখন[৪] আমায় পরাণে বধিল।
ও পিরিত কর্‌ছে না জন[৫] আছে ভালো—
করিয়া জ্বালা হইল, বলো বলো॥

গগনে আর নাই যামিনী.
আইল না শ্যাম গুণমণি—
দিনমণি উদিত হইল।
এগো, কোন্ রমণীয়ে পাইয়া শ্যামরে—
ও শ্যাম ভুলাইয়া রাখিল, বলো বলো॥

। ১১৮।

ও সজনি, রসের গুণমণি গো,
আইজ[৬] কার বাসরে।
হায় হায়, প্রাণি[৭] যায়, না দেখিলে তারে

১ হইবে ২ অগ্রেই ৩ জানিয়া ৪ এখন ৫ যে জন পিরিত করে নাই ৫ আজি ৬ প্রাণ

এগো, লাগাইয়া পিরিতের ফান্দে
ঠেকাইলা আমারে গো।
এগো, আমার ধনী খাইছে ধরা[১]
রাই-রঙ্গিণীর ঘরে গো॥

আতে ধরি'[২] বিনয় করি'
পাইলাম না গো তারে।
একবার আনি' দেখাও রূপ—
প্রাণ কান্দে মোর, ঝুরে গো॥

কুটিচান্দ বাউলে বলে,
পাইলাম না গো তারে।
একবার আনি' দেখাও রূপ—
প্রাণ কান্দে মোর, ঝুরে গো।

। ১১৯ ।

রে ভমর, কইয়ো গিয়া—
শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদে আমার অঙ্গ যায় জ্বলিয়া॥

ভমর রে, কইয়ো কইয়ো, হায় রে ভমর,
প্রাণ-বন্ধের লাগ পাইলে,[৩] —
আমি রাধা মইরে[৪] যাব কৃষ্ণহারা হইয়া॥

ভমর রে, সারা নিশি পোসাইলাম[৫]
ফুলের শয্যা লইয়া—
সেই শয্যা হইল বাসি,—দেও জলে ভাসাইয়া

---

১ খইয়া পড়িয়াছে ২ হাতে ধরিয়া ৩ দেখা পাইলে ৪ মরিয়া ৫ কাটাইলাম

ভমর রে, না খায় অন্ন, না খায় জল,
নাহি বান্ধে কেশ ;
তোমার পিরিতের লাগি' রাধার পাগলিনীর বেশ ॥

ভমর রে, ভাইবে[১] রাধারমণ বলে
কান্দিয়া কান্দিয়া—
নিবি' ছিল[২] মনেরি আগুইন[৩]—আগুইন কে দিল জ্বালাইয়া

। ১২০ ।

ও তুমি কার কুঞ্জে লুকাইলায়[৪]
রে প্রাণবন্ধু, কালিয়া ॥

আর ফুলের মালা দ্বিগুণ জ্বালা
বন্ধের গলে না দিয়া ;—
এগো, আর সহে না এ যাতনা
সময় যায় রে গইয়া ॥

আর যার জন্য তার জন্য গো
আইলাম কুলমান ত্যজিয়া।
এগো, সে মোরে বঞ্চিত কইল[৫]
কালার প্রেমে মজিয়া ॥

আর কোটিচান্দ বাউলে গো বলে—
সোনাবন্ধু কালিয়া :
এগো, আশা দিয়া গেলায়[৬] মোরে
না আসিলায়[৭] ফিরিয়া ॥

১ ভাবিয়া ২ নিভিয়া ছিল ৩ আগুন ৪ লুকাইলে ৫ করিল ৬ গেলে ৭ আসিলে

। ১২১ ।

ছুঁইয়ো[১] না, ছুঁইয়ো না কালা,
ছুঁইয়ো না, ছুঁইয়ো না মোরে ॥

আর খাইতে বসি' ছায়া দিয়ো না,
তোর অঙ্গে দেখি রে শ্যাম অপরূপ নমুনা।
এগো, তোর গায়ে কিরণের দাগ
কোন্ রমণীয়ে দিয়াছে তোরে ॥

আর অত রাত্রি ছিলায়[২] কার ঘর :
গলে আছিল সোনার মালা
ছিঁড়া একছি[৩] ল'র[৪]।
ও তোরে বারে বারে করি মানা
যাইয়ো না পরারি ঘরে ॥

আর মুজমিল নাগরে গো বলে—
সিনান করি' আও গো ত্বরা যমুনার জলে।
এগো, বইবার দিমু ছাপর খাট[৫]
যৈবন দান করিমু তোরে ॥

। ১২২ ।

॥ আক্ষেপ ও প্রেমের স্বরূপ ॥

ও বন্ধু, কঠিন-হৃদয় কালিয়া,
প্রেম কইলাম তার মর্ম না জানিয়া।
এগো, এখন বন্ধে প্রাণে মাইল[৬] —
বিসখা প্রেম[৭] শিখাইয়া ॥

২ ছুঁইয়ো ২ ছিলে ৩ এক গাছি ৪ লহর, নরী ৫ অলঙ্কৃত খাট বিশেষ ৬ মারিল
৭ সখা বিহীনের প্রেম, অ-বন্ধুর প্রেমের মতো

আর আগে যদি জানতাম গো এমন—
ও সই, পিরিতে মন দিতাম না কখন
এগো, এখন বন্ধে ছাড়িয়া গেল—
কিনা দোষ জানিয়া ॥

আর নতুন প্রেমে নতুন গো কালা—
ও সই, নতুন প্রেমে দিল গো জ্বালা।
ও জ্বালা সইতে গেলে—
উঠে দ্বিগুণ হইয়া ॥

আর ভাইবে রাধারমণ বলে—
বন্ধের পূবের কথা[১] নাই তার মনে।
এগো, পূবের কথা মনে হইলে—
আমায় না যায় ছাড়িয়া ॥

। ১২৩ ।

আমার মনে চায় সর্বদায় যৈবনদান প্রেম খেলায়-
কিন্তু, প্রেমিক পাওয়া দায় ॥

আর প্রেমিক রসিক তালাস[২] করি গো
ও সই, ফিরিতেছি বাঙ্গালায়।
এগো, বলছি যারে পাইনা তারে গো—
প্রাণ জলে প্রেম-জ্বালায় ॥

আমি মরছি প্রাণে, সবে জানে গো—
কালিয়ার পিরিতের দায়।
ধাক্‌ধাকাইয়া[৩] জলছে আনল
নিবাইতে আর শক্তি নাই ॥

১ পূর্বের কথা ২ তল্লাস ৩ ধিকি ধিকি করিয়া

আর যার জন্যে মন টানে গো—
ও সই, সেই নাহি ফিরিয়া চায়।
আকুল কইল, প্রাণে মাইল—
জী'তে[১] মইলাম, হায় রে হায় ॥

দুই নয়ানে বহে বারি গো—
ও সই, বুক ভাইসে[২] পাতালে যায়।
এগো, নয়নজলে গঙ্গানদী—
কোম্পানীয়ে জা'জ[৩] চালায় ॥

আর ইয়াকুল আব্দুল ওয়াহিদ গো বলে—
ও সই, বৃথা কেনে আইলাম দুনিয়ায়।
এগো, রইলাম কেনে, মইলাম না সই
বাঁচিয়া কোন্[৪] স্বার্থ নাই ॥

। ১২৪ ।

প্রেম করো সই মানুষ চাইয়ে[৫] —
মইলে[৬] যারে মিলে।
এগো, মইলে যে জিয়াইতে পারে-
রসিক বলি তাঁরে গো ॥

আর এক পিরিতে মহাজনে
শ্মশান বাস করে।
এগো, কোন্ পিরিতে দশরাত্রে[৭]
পোয়ায়[৮] বনাচারে[৯] গো ॥

---

১ জীবিত অবস্থাতে ২ ভাসিয়া ৩ জাহাজ ৪ কোনো ৫ মানুষ দেখিয়া ৬ মরিলে
৭ দশরথে ৮ পুত্রকে ৯ বনবাসে

আর চান্দীদাসের[১] রজকিনী
প্রেম করিয়াছে ঠারে।
এগো, আপনার আতের[২] কালি
লাগিয়াছে কপালে গো॥

। ১২৫ ।

কি হইল, কি হইল প্রেমজ্বালা—
গো সজনি-সই,
কি হইল, কি হইল প্রেমজ্বালা॥

নিশিতে প্রাণের নাথ লইয়াছিল একই সাথ—
ওরে শিওরে[৩] গাঁথিয়া ফুলের মালা,
গো সই,
সে কথাটি মনে ওঠে, সই গো পরানি ফাটে—
জাগিয়া না পাইলাম রসের খেলা, গো সজনি-সই॥

দেহা ছাড়ি' প্রাণি যাইতে, বান্ধিয়ো তমাল ডালে—
গলে দিয়ো কদম্বের মালা;
গো সজনি-সই,
কি হইল, কি হইল প্রেমজ্বালা॥

আমি নারী অবুলা, আন্ধিয়ে কুল মজাইয়া[৪] —
নিয়াছিল কদম্বের তলা;
গো সজনি-সই,
কি হইল, কি হইল প্রেমজ্বালা॥

---

১ চণ্ডীদাসের ২ হাতের ৩ শিয়রে ৪ আঁধিয়ারা কুল মজাইয়া

আমার দুঃখের ভার, পিরথিমীয়ে[১] না সয় আর—
আনো সখি, মাথায় মারি ছিলা[২] ;
গো সজনি-সই,
কি হইল, কি হইল প্রেমজ্বালা ॥

ঠাকুর কাজি শা'য় কইন—কি আচম্বিত[৩] হইল—
কে বুঝিতে পারে আমার
ঠাকুর চান্দের লীলা :
গো সজনি-সই,
কি হইল, কি হইল প্রেমজ্বালা ॥

। ১২৬ ।

ও প্রেম না করছে কোন্ জনা গো,
কার লাগি' গো এতো যন্ত্রণা।
আর আমার বন্ধু পরশমণি—
কতো লোহা মানায়[৪] সোনা গো ॥

আর সকলের জ্বালা যেমন-তেমন—
আমার বন্ধের জ্বালা দুনা[৫] গো ॥

আর বন্ধের লাগি ভাবতে-ভাবতে—
আমার শরীর কইলাম কালা গো ॥

আর ভাইবে রাধারমণ বলে,—
শুনরে কালিয়া :
প্রেম কইলাম—তার মর্ম না জানিয়া গো।

১ পৃথিবী ২ ধনুকের গুণ, ধনুক (?) ৩ আশ্চর্য ব্যাপার ৪ বানায়, তৈরি করে ৫ দ্বিগুণ

। ১২৭ ।

আমার সদায় জ্বলে হিয়া গো, যার লাগিয়া—
আর বন্ধের লাগি' যতোই গো কইলাম
পরানে মরিয়া ঃ
এগো, মনে লয়, মরিয়া যাইতাম—
জলে ঝাম্পু[১] দিয়া ॥

আর কিবা দিবা, কিবা নিশি,
মনটি উঠে কান্দিয়া ঃ
মনে লয়,[২] প্রাণ ত্যজিতাম, গরল খাইয়া

আর পুরুষ ভমরা জাতি
কঠিন তার হিয়া।
এগো, না জানে নারীর বেদন—
পাষাণ-বান্ধা হিয়া ॥

আর দিবানিশি জ্বলছে হিয়া
যাহার লাগিয়া ঃ
এগো, মনে লয়, উড়িয়া যাইতাম—
প্রাণটি তারে ত্যজিয়া ॥

আর গোঁসাই রমণচান্দে বলে
মনেতে ভাবিয়া ঃ
এগো, দুখিনীর জন্ম যাবে—
কান্দিয়া কান্দিয়া ॥

---

১ ঝাঁপ ২ মনে হয়

। ১২৮ ।

লোকে মোরে দেয় গো খুটা[১], কালার পিরিতে ছাটা[২]
এগো, পন্থে যাইতে মধুর লোভে
গুড় বলি' খাইয়াছি চিটা ॥

আর ননদী বিবাদী হইয়া
দুধেতে মিশাইল মাটি।
এগো, আমি যারে ভালোবাসি
সে আমারে বলে নাটা[৩] ॥

আর কারুর মুখে পাক্‌না আম[৪] —
আমার হাতে শুদা ডেঁটা[৫]।
এগো, রূপসায়রে ডুব দিলাম
না পাইলাম পের্‌মের খুঁটা[৬] ॥

গোঁসাই গোলোক চান্দে কয়—
জান্‌লায়[৭] সই
কালার প্রেমের তিতামিঠা।
লোকে মোরে দেয় গো খোঁটা ॥

। ১২৯ ।

আমার দরদী নাই জগতে—
আমি একা ভাবি এ ভব-সংসারে

আর আত্মীয়-বন্ধু যতোই ছিলা
সব রহিলা দূরে।
এগো, সকলে মন্ত্রণা কইরে
ডুবাইতে আমারে ॥

---

১ খোঁটা ২ দীপ্তি, জ্বালা ৩ খারাপ ৪ পাকা আম ৫ শুধু ডাঁটা ৬ প্রেমের মূল
৭ জানিলে

আর দেশ-খেল[১] যতোই ছিলা
সবে ভিন্ন বাসে[২]।
এমন দরদী নাই,—থাকি কার আশে

আর রাধারমণ বাউলে বলে
ঝুরি' দুই নয়ানে—
এগো, যথায় বন্ধু—তথায় যাইমু
ছাই কুলমানে ॥

। ১৩০ ।

মনের দুখ রইল গো মনে—
এই দেশে দরদী গো নাই ;
সই গো, বন্ধুরে যদি পাই ॥

সই গো সই,
সুদেশী বিদেশীর সনে
বিদেশে পড়িয়া গো রই।
সই গো, মনে লয়,[৩] দেশান্তরী হই ॥

সই গো সই,
তোর পিরিতির জন্য গো আমি
জ্বলি' পুড়ি' হইলাম গো ছাই।
এগো, আনো তো কাটারি-ছুরী,—
বুক চিরি' তোমায় দেখাই

১ আপনার জন ২ পর মনে করে ৩ মনে হয়

সই গো সই,
তোর পিরিতির জন্য গো আমি
হইলাম ঘরের বার।
এগো, আনো তো কটরা ভরি'[১]
আমি জ'র খাইয়ে[২] মরে যাই

। ১৩১ ।

নিভাইলে না নিভে আনল[৩] জ্বলছে দ্বিগুণ হইয়া গো-
ও শ্যাম-বন্ধে মাইল[৪] বিচ্ছেদানল দিয়া ॥

সখি গো, কি দাগ লাগাইলে গো সখি,
প্রেম-কালি দিয়া।
লোকে মোরে মন্দ বুলে[৫] —
না চাইলায়[৬] ফিরিয়া গো ॥

সখি গো, প্রথম পিরিতি কইলাম
চুয়া-চন্দন দিয়া।
এখন মোরে ছাড়িয়া গেলায়[৭] —
কি না দোষ জানিয়া গো ॥

সখি গো, দীনহীনে বলে গো সখি,
মনেতে ভাবিয়া :
দুই-চাইর দিনের থান পাইলাম না[৮] —
ওই জগৎ ভরমিয়া গো ॥

---

১ বাটি ভরিয়া ২ জহর বা বিষ খাইয়া ৩ অনল ৪ মারিল ৫ বলে ৬ চাহিলে
৭ গেলে ৮ দুই-চারি দিনের জন্যও স্থান পাইলাম না

। ১৩২ ।

নিশিতে স্বপন দেখলাম—চান্দ আসিয়া ;
আর স্বপনে দেখিয়া যারে উঠিলাম জাগিয়া—
এগো, জাগিয়া না পাইলাম তারে
আমার নিদ্রা গেল ছুটিয়া—
—শ্যাম-চান্দ আসিয়া ॥

আর ভাবি যারে—হয় না দেখা,
সে বন্ধু মোর রইল একা গো।
এগো, কমলচরণ ইদ্‌রের[১] মাঝে
ও সই, গেল আনল[২] জ্বালাইয়া—
—শ্যাম-চান্দ আসিয়া ॥

আর ভাইবে রাধারমণ বলে,
শুনো গো সখি—তোমরা সবে ঃ
এগো, ধাকধাকাইয়া[৩] জ্বলছে আনল
আমার শ্যামবন্ধু লাগিয়া—
—শ্যাম চান্দ আসিয়া ॥

। ১৩৩ ।

বন্ধে পিরিত করি' আইল না—
প্রাণ-বন্ধুরে চউখে[৪] দেখলাম না ॥

আর দুধের মাঝে সর-লনী[৫]
মাথার বিষে মইলাম আমি—
পাড়ার লোকে বিশ্বাস কইল না

১ হৃদয়ের ২ অনল ৩ ধিকি ধিকি করিয়া ৪ চোখে ৫ সর-ননী

আর বাড়ীর কাছায়[1] ডাক্তার থইয়া
ব' দাদা,[2]
বন্ধে ঔষধ লইয়া আইল না ॥

আর পিরিতের কতোই জ্বালা—
আগে যে বাড়াইয়া প্রেম
শেষে দেয় জ্বালা ॥

আর ভাইবে রাধারমণ বলে—
পিরিত করি' যে জন মরে
দুধের মাঝে ছাই মিশাইছে ॥

। ১৩৪ ।

তুই দেখি' আমায় ঠেকাইলে[3] —
রে নয়ন, তুই কি দেখ্‌লে রে ;
আপন-আপন বলি যারে
সেও তো আপন হইল না রে।
এগো, সে যদি আপন হইত
রাখিতাম হৃদয়ের মাঝারে ॥

সর্পমুণ্ড তেয়াগিয়া সর্পের লেঞ্জে[4]
হাত দিলায় রে।
ওরে, হুঁশে-বোধে রহিয়ো[5] রে—
প্রাণ দংশিলে পরানে মরবে ॥

১ কাছের ২ ওগো দাদা ৩ বিপদ ঘটাইলে ৪ লেজে ৫ সাবধানে রহিয়ো

মুই অনাথের ফাড়া জাল[১]
ফালাইলাম দখিনাইল চরে[২] ;—
ওরে, কলে যদি বাইতাম জাল[৩]
ঠেকতাম কেনে বাপে-পুতে ॥

ধোপার কুলে জরম লইয়া
নাম রাখিলাম কান শা'রে।
ওরে, পঞ্চাশ বরছ গেল আমার
বরাক নদীর[৪] পারে-পারে ॥

। ১৩৫ ।

শুন গো সখি ললিতে,
বুঝি কিস্ক প্রেমের লাঞ্ছনা—
পিরিতে আমারে চাইল না ॥

সখি গো, আমি যারে ভালো গো বাসি—
ভিন্ন বাসে[৫] সে জন।
বুঝি আমার কর্ম্মদোষে বন্ধের দয়া হইল না।

সখি গো, কাষ্ঠের সনে লোহার গো পিরিত
জলে ভাসে দুই জনা।
ওরে, জলের সনে মীনের গো পিরিত—
জল ছাড়া মীন বাঁচে না ॥

১ ছেঁড়া জাল ২ দক্ষিণের চরে ফেলিলাম ৩ ঠিক মতো যদি জাল ফেলিতাম ৪ কাছাড় অঞ্চলের একটি নদীর ৫ পর মনে করে

সখি গো, গোঁসাই গোলোক চান্দে গো বলে
পিরিত করি' ছাড়িয়ো না।
এগো, পিরিতি পিঞ্জিরার পাখী
ছুট্‌লে ধরা যাব না[১] ॥

। ১৩৬ ।

ও জাতি-কুল-মান হারাইলাম রে—
যার লাগিয়া রে ॥

আর বন্ধের পিরিত আগের[২] ছন[৩] —
দেয় কতো জ্বালাতন, সখি রে।
ও আমার বন্ধু নি হইব[৪] দোষের ভাগী রে।

আর বাঁশীয়ে নিল মন—
রূপে নিল নয়ন, সখি রে।
ও আমি তাপিনীয়ার[৫]
কেমনে যায় জীবন রে ॥

আর গোঁসাই গোলোকচান্দে কয়—
পিরিত কেওরের[৬] জুলা নয়[৭], সখিরে।
আর যোগিনী বানাইয়া নেও
আমারে রে ॥

১ যাইবে না ২ আগুনের ৩ শন, খড় ৪ বন্ধু কি হইবে ৫ সন্তপ্তার ৬ কাহারও
৭ একচেটিয়া নয়

। ১৩৭ ।

ওরে, যে সুখে রাখিয়াছ প্রাণ-নাথে গো,
সে দুঃখ আর বলব কি ॥

আর যারে কইলাম যৌবন দান—
তার কিসের কুলমান।
ওরে, দেখি তারে, পাই কি না পাই গো ॥

আর কান্দি আমি দিবা নিশি—
এই মনে অভিলাষী।
ওরে, দেখি তারে, পাই কি না পাই গো ॥

আর আমি যারে ভালোবাসি,
সে তো জ্বালায় দিবানিশি—
বুঝি পাষাণের হিয়া গো সখি।
সে দুঃখ আর বলব কি ॥

আর মনের দুঃখ রইল মনে,
এই শেল রহিল মনে।
ওরে, এই শেল খসিব[১] —
রমণ মইলে,[২] গো সখি ॥

১৩৮।

মনে মনে রইল গো, আমার মনে মনে রইল-
এগো, লোকের জ্বালায় সুখের পিরিত
ছাড়িয়া দিতে হইল গো ॥

শেষ হইবে ২ মরিলে

আর কাল-ননদী বিবাদী হইয়া
বাড়াইলা জঞ্জাল।
লোকে হইলাম কলঙ্কিনী
প্রেমে-বান্ধা ছইল[১] গো॥

আর পিরিতে বন্ধ রে
আমার প্রাণপাত হইয়াছে ;—
পিরিতে পরান-বন্ধু জীওন আর মরণে গো॥

আর আমি মইলে ক্ষেতি নাই—
তোমার ধর্ম কোথায় রইল।
মুরশিদ মজাইদ চান্দে বলইন,
আশা মনে রইল গো॥

। ১৩৯ ।

সজনি, আমি ভাবের মরা মইলাম না,-
স'জ[২] পিরিতি হইল না।
সহজ পিরিতি হইতে পারে—
দুইজন হইলে একমনা॥

মধুর লোভে কাল ভমরে
করছে আনা-যানা[৩]।
শুকাইলে কমলার মধু
ফিরে ভমর আস্‌বে না॥

আর ভাইবে রাধারমণ বলে—
মনের ওই বাসনা।
সহজ পিরিত সিংহের দুধ
মাটির বাস্‌নে[৪] টিকে না॥

---

১ মুশকিল ২ সহজ ৩ আসা-যাওয়া ৪ বাসনে

। ১৪০ ।

পিরিতের ছেল[১] বুকে যার, কলঙ্ক তার অলঙ্কার—
কুল-মানের ভয় নাইরে তার ॥

পিরিতের জয়-নিশানি[২] সদায় থাকে উদাসিনী গো—
এগো, চে'রা[৩] মলিন থাকে তার
দিবা-নিশি বেকরার[৪] ॥

ক্ষুধা-নিদ্রা নাই রে তার মনে, জল-ধারা দুই নয়নে গো—
এগো, ছির[৫] ঘুরে প্রেম-ধুন্ধে[৬]
দিবা-নিশি ইন্তিজার[৭] ॥

হাসি-খুশি নাই তার মনে, সদায় থাকে ঘোর নয়নে গো-
এগো, লাজ-ভয় নাই তার
কলঙ্ক তার অলঙ্কার ॥

যার গলে পিরিতের ফাঁসি, সে হয় সকলের দাসী গো—
এগো, লোকের নিন্দন পুষ্প-চন্দন
অলঙ্কার পইরাছে[৮] গায় ॥

প্রথমকু[৯] পিরিতে মজা, দ্বিতীয়ে পিরিতে সাজা গো—
এগো, তৃতীয়ে পিরিতি রাজা
রঙ্গ-খুশি বেশমার[১০] ॥

শীতালং ফকিরে বলে, প্রেমের মালা যার গলে গো—
এগো, তারা কেওরের[১১] কথা নাহি শুনে
কেবল বন্ধু বন্ধু বন্ধু সার ॥

১ শেল ২ জয়পতাকা ৩ চেহারা ৪ অস্থির ৫ শিব ৬ প্রেমের ধাঁধায় ৭ প্রতীক্ষারত ৮ পরিয়াছে ৯ প্রথমকার, প্রথমটায় ১০ বেশুমার, অগণিত, অসংখ্য, অপরিমেয় ১১ কাহারও

। ১৪১ ।

॥ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি ॥

আমি ভাসলাম রে সুবল-সখা
রাধার পিরিতে।
রাধা অইল[১] গঙ্গার মতো—
আমি ভাসলাম রে শেওলার স্রোতে ॥

মাইয়ার মন পাষাণে বান্ধা
দয়া নাই অন্তরে।
রাধা রাধা রাধা বইলে[২] —
ভাই, অন্য কথা নাই মুখেতে ॥

যাও রে সুবল, চলে যাও—
রাই পাবে যেখানে।
ভাইবে[৩] গোলোক চান্দে বলে—
আর দেখা হব নি[৪] কুঞ্জেতে ॥

১ হইল ২ বলিয়া ৩ ভাবিয়া ৪ হইবে কি

॥ বাউল ॥

। ১৪২ ।

॥ মনের মানুষ ॥

মনের দুঃখ রইল মনে, কিছু কইয়া গেলাম না।
মনের মানুষ পাইলাম না ॥

সখি গো, আড়ি-পড়ী[1] ইষ্ট-কুটুম—
কেও[2] তো ভালোবাসে না।
এগো, ভবে আসি' হইলাম দোষী
জন্মিয়া কেনে মইলাম না ॥

সখি গো, আপনার কর্মদোষে—
সবে দেয় লাঞ্ছনা।
এগো, দেশে দেশে ঘুইরে[3] ফিরি
রইতে না পাই ঠিকানা ॥

সখি গো, মন-বাসনা রইল মনে—
পূর্ণ করতে পাইলাম না।
এগো, যদি বন্ধে কইরে[4] দয়া
ঘুচায় মনের বেদনা ॥

পাড়াপড়শী ২ কেহ ৩ ঘুরিয়া ৪ করিয়া

সখি গো, সেখ আব্দুল ওয়াহিদ বলে—
মন্বুরা,[১] হও সান্ত্বনা।
এগো, 'লা তাক্‌নাতু,'[২] স্মরণ কইরে
পড়তে রহো কলিমা[৩] ॥

১৪৩

কোন্ তারে তার[৪] চিঠি চলে—
পাই না রে তার অন্বেষণ।
তারের খবর জানো নি রে মন ॥

আর আচানক[৫] এক কারিগর আইল—
রোমের শ'রের[৬] নক্সা বুঝি ঢাকায় আনিল
ওরে, ঢাকায় রইল ঢাকার কল
কইলকাত্তায় তার জলের কল ॥

আর তারের খবর পাইয়াছে জীবে—
কবিরাজে পাইয়া তারে ঔষধ বানাইছে।
ওরে, আর পাইয়াছে ফেরেঙ্গীয়ে
রেলের গাড়ীর মন-পবন ॥

আর মুরশিদ মজাইদ চান্দ বলে—
সই, আছে একটা কল
তারে জানে না সকল।
ওরে, তারে-তারে মিল করিলে
পাইবায়[৭] তারের[৮] দরশন ॥

১ মন রে ২ কোরানের বাণী। অর্থ—নিরাশ হইয়ো না ৩ কলেমা ৪ তাহার ৫ আশ্চর্য-জনক ৬ শহরের ৭ পাইবে ৮ তাহার

। ১৪৪ ।

তুই বড়ো বিষম ধান্ধাখোর[১]—
রে ভাই, মনোচোর ॥

ধান্ধা ছাড়ো, ধান্ধা ছাড়ো, ধান্ধা করো দূর—
করছ ধান্ধা, পাবে রান্ধা[২]
মুনিবের হুজুর[৩] ॥

আর তন ঠগিলে,[৪] মন ঠগিলে—
লাগাইলে প্রেম-ডোর।
শিশু হইয়া গুরু ঠগিলে আমার হৃদয়-পুর

। ১৪৫ ।

আমার মন ভালা[৫] হইল না—
মাইল[৬] আমারে ঘুরাইয়া।
সুপন্থে মন হয় না গমন,
কুপন্থে মন যায় ধাইয়া ॥

আর কতো সাধুর সঙ্গ লইলাম
রঙ্গেতে মজিয়া।
অতি সুখের বালামখানা[৭] —
সুখের নিশি যায় শইয়া[৮] ॥

১ ধান্ধাবাজ ২ শান্তি ৩ মনিবের নিকট ৪ ঠকাইলে ৫ ভালো ৬ মারিল ৭ প্রাসাদ
৮ শুইয়া-শুইয়া, অকাজে

আর মন-রাজা বসি' আছইন[১]
ছত্তর[২] ধরিয়া।
মন-গাড়ী সওয়ার হইয়া
আইলাম ঢাকার শ'র[৩] বেড়াইয়া।

আর মুরশিদ মজাইদ চান্দে কইন
কদম-রছুল বইয়া[৪] :
ভাবিয়া দেখ্ তোর দেহার মাঝে—
ধরতে গেলে না যায় ধরা॥

। ১৪৬।

ও মন, যাইবায়[৫] রে ছাড়িয়া—
কেও না পাইব[৬] তোমায়—সংসারে ধুড়িয়া[৭]

আর কিসের আশা, কিসের বাসা
কিসের সংসার।
মইলে পরে[৮] ভাবিয়া দেখ—
কিছু নাই তোমার॥

আর কান্দে-কান্দে হাছন রাজায়
প্রেমের হতাশ হইয়া।
প্রেমের হতাশ ঠাণ্ডা করো—
একবার দেখা দিয়া॥

১ আছেন ২ ছত্র ৩ শহর ৪ বসিয়া ৫ যাইবে ৬ কেহ না পাইবে ৭ খুঁজিয়া
৮ মরিলে পরে

। ১৪৭ ।

কই রইলায়[১] পাক[২] জোনাব-বারি[৩]
সময় কতো হইল গত
করতে আছি ইন্তেজারী[৪] ॥

সোনাপুরী আন্ধাইর করি'
কোথায় রইলায় প্রেম-পিয়ারী।
পিরিতে মোর মন মজিল—
নেও না মোরে সঙ্গে করি' ॥

তোর পিরিতে অঙ্গ জ্বলে
বাইরে করি ঘুরাঘুরি।
লইলু কাটারি-ছুরী—
দেখাইমু কলিজা চিরি' ॥

পাই যদি প্রাণ-বন্ধুরে
রাখিতাম চরণে ধরি'।
যৌবন লুটাইয়া দিতাম—
তার সনে পিরিতি করি' ॥

দুই নয়নের জল দিয়া
বানাইলাম ছিয়াই কালি[৫]।
পত্র লেখি' আরজি দিতাম—
শাহা ডুমন আউলিয়ার বাড়ী

১ রহিলে ২ পবিত্র ৩ ভগবান ৪ প্রতীক্ষা ৫ চাউল পোড়াইয়া তৈরি করা কালিকে 'ছিয়াই কালি' বলে

কইন ছাবাল আকবর আলী ঃ
আমি পাইলাম না অন্বেষণ করি'
দেখা দিয়া কোথায় গেল—
আমারে পরানে মারি' ॥

। ১৪৮ ।

আইজ আমার শোকের ঘরে
মনের আনল[১] কেওং[২] তো নিবাইল না রে
আর সিং কাটি' চোর সামাইল ঘরে—
ঘরের মানুষ পালায় ডরে ॥

এগো, অঞ্চলের ধন কাঞ্চা সোনা—
পড়িয়া রইছে অন্ধকারে ॥

আর সোনার পিঞ্জিরার মাঝে
পাখী পাল্‌লাম যত্ন কইরে।
এগো, যাইবার কালে নিষ্ঠুর পাখীর
সুবুইলি[৩] আর শুনলাম না রে ॥

আর হীরাচান্দ বাউলে বলে—
ঠেকিয়া রইলাম ভব-সায়রে।
এগো, নেক্তির[৪] কাঁটা ঝুঁক্কি অইলে[৫]
মা'জনে[৬] মাল গছ্‌ব না[৭] রে ॥

১ আগুন ২ কেউ ৩ সুন্দর বুলি ৪ নিক্তির ৫ ঝুঁকিয়া পড়িলে ৬ মহাজনে ৭ লেন-দেন করিবে না

। ১৪৯ ।

আরে, আমারে ছাড়িয়া কোথায় যাওরে সোনার ময়না-
ও ময়না, পিরিতি লাগাইয়া গণ্ডগোল ॥

পিরিতি লাগাইয়া গণ্ডগোল
নিলায় জাতিকুল ।
এক প্রেমে তিনজন বান্ধা—
যেমন সন্ধ্যামালী ফুল ॥

মন রে, না কইলায় ইসাবের[১] কাম—
তোর কামে পড়িল ভুল ।
হাসরের ময়দানে[২] হইবায়[৩]
কান্দিয়া আকুল ॥

মন রে, সায়রে ভাসিয়া রে মনা,
তোমায় দিলাম কুল ।
এখন কেনে যাওরে ছাড়ি'
পিরিতের ভাঙি' মূল ॥

মন রে, অধীন শেখ বানু বলে—
দুরুদে[৪] হইয়ো মশ্‌গুল ।
হাসরে উম্মতের[৫] জন্য
কান্দিবা রছুল ॥

। ১৫০ ।

আমারে ছাড়িলায়[৬] কোন্ দোষে, রে সোনার ময়না,
ও ময়না, আমারে ছাড়িলায় কোন্ দোষে ॥

১ হিসাবের ২ শেষ বিচারের মাঠে ৩ হইবে ৪ মোহাম্মদের উদ্দেশে যে প্রশস্তিবাণী পাঠ হয় ৫ শিষ্যের ৬ ছাড়িলে

আর কাছে বসি' ডাকি আমি—
আমার মাথা খাও।
আখেরি দিদার[১] একবার
নয়ন মেলি' চাও॥

আর আদরে স্বামীর সামনে
সদায় রইতায়[২] খাড়া।
মনের মতো যত্ন করি'
দিতায়[৩] পানের বিডা[৪]॥

আর জলে-ভাসা ছাবন[৫] তোমার
লাগিত গোছলে[৬]।
সুগন্ধি নারিকেল তৈল তোমার
রহিল বোতলে॥

আর বিছানা-বালিশ তোমার
মক্কার মছরি[৭]।
এই সব ছাড়িয়া তুমি
হইলায় দেশান্তরী॥

আর বানারসী সাড়ী
আর বেলফুলের চাদ্দর।
তাম্বুল-বিহার রইল তোমার
সিন্দুকের ভিতর॥

আর উম্মর পাগলে বলে—
শুনো রে ময়না-পাখি :
কোন্ বনে লুকাইলায় তুমি
নয়ানে না দেখি॥

১ শেষ দর্শন ২ রহিতে ৩ দিতে ৪ খিলি ৫ সাবান ৬ স্নানে ৭ মশারি

। ১৫১ ।

আমারে ছাড়িয়া তুমি কেমন সুখে আছ
রে শ্যাম-শুকপাখি,—
আর হৃদ্‌পিঞ্জিরা শূন্য করি'
দিয়া গেলা ফাঁকি ॥

এগো, জনম ভরি' পায়ে ধরি—
না করিলায়[১] সঙ্গী :
আর ধন দিলাম, প্রাণ দিলাম,
কুল দিলাম তোর লাগি'।
এগো, তেব[২] বন্ধের মন পাইলাম না
হইলাম সর্বনাশী ॥

আর ভাইবে রাধারমণ বলে—
শুনো গো প্রাণ-সখি :
ওরে, আইনা[৩] দে মোর প্রাণ-বন্ধুরে
মরণকালে দেখি ॥

। ১৫২ ।

ও দম গেলে আইবার[৪] নাইরে আশা—
ওই দম লইয়া কি ভরসা ॥

আর ইদ্‌রের[৫] মাঝে থাকো পাখি,
তনের[৬] মাঝে বাসা ;
ও আমি বুঝিতে না পাইলাম তার[৭] রে
ওয়রে পাষাণ মন,
ও আমি চিনলাম না তার রইবার বাসা ॥

করিলে ২ তবু ৩ আনিয়া ৪ আসিবার ৫ হৃদয়ের ৬ তনুর ৭ তাহাকে, তাহার

আর হৃদ্‌পিঞ্জিরায় থাকো পাখি
মোহন ডালে বাসা ;
ওরে, তিনডালে তার পালা পালিছ—
হায়রে পাষাণ মন,
তারে ধরতে গেলে না দেয় ধরা ॥

আর ভাইবে রাধারমণ বলে--
শুনোরে কালিয়া ঃ
পাখী পিঞ্জিরা ছাড়িয়া যাইতে রে
হায়রে পাষাণ মন,
তোরে আইল রাখি, অসারের ধন ॥

। ১৫৩ ।

আমার দিন বড়ো বেকলা[১] দেখি—
আকুল গেছি খাইয়া[২] গো
ও সই, মাতি না[৩] ডরাইয়া ॥

আর সার-শুয়া দুইটি পঙ্খী
রাখিয়াছি ধরিয়া ।
ওরে, দু-দিলা হইলে[৪] পাখী
যাইব[৫] রে উড়িয়া গো ॥

আর এমন যতনের পাখী
কে দিব[৬] ধরিয়া ।
এগো, বিনা দর্‌মায়[৭] করমু চাকরি—
এই জনম ভরিয়া গো ॥

১ খারাপ, বেগতিক ২ আকুল হইয়া গিয়াছি ৩ কথা বলি না ৪ দুই মন হইলে
৫ যাইবে ৬ দিবে ৭ দর-মাহিনার, মাস-মাহিনার

আর ভাইবে রাধারমণ বলে—
শুন্‌রে কালিয়া ঃ
এগো, নিবি' ছিল[১] মনেরি আনল[২]
কে দিল জ্বালিয়া গো ॥

। ১৫৪ ।

কই দিয়াছ লুকি'[৩] রে আমার সাধের পোষা পাখী
এমন সুন্দর পাখীয়ে আমার—
দিয়াছে লুকি' রে ॥

আর জল ফালাইয়া[৪] জলে গেলাম—
গো আমার পাখী দেইখবার লাগি'[৫]।
ওয় গো, আমারে দেখিয়া পাখীয়ে
করে লুকালুকি গো ॥

আর ঈশ্বর বলে, ওই কপালে—
রে আমার আর কী আছে বাকী।
ওয় গো, পোড়া কপাল না লয় জোড়া[৬]
জলে রাত্রি-দিন গো ॥

। ১৫৫ ।

আও বা' নাথ,[৭] করো শান্ত,
মুই অভাগীয়ে ডাকি ;—
বা' নয়ন তুলো দেখি,
নয়ন তুলো দেখি, বা' সোনার বরণ পাখি ॥

১ নিভিয়া ছিল ২ অনল ৩ কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছ ৪ ফেলিয়া ৫ দেখিবার জন্য
৬ পোড়া কপাল জোড়া লাগে না ৭ এসো হে নাথ

আর হৃদ্‌পিঞ্জিরায় থাকো পাখি
মোহন ডালে বাসা ;
ওরে, তিনডালে তার পালা পালিছ—
হায়রে পাষাণ মন,
তারে ধরতে গেলে না দেয় ধরা ॥

আর ভাইবে রাধারমণ বলে—
শুনোরে কালিয়া ঃ
পাখী পিঞ্জিরা ছাড়িয়া যাইতে রে
হায়রে পাষাণ মন,
তোরে আইল রাখি, অসারের ধন ॥

। ১৫৩ ।

আমার দিন বড়ো বেকলা[১] দেখি—
আকুল গেছি খাইয়া[২] গো
ও সই, মাতি না[৩] ডরাইয়া ॥

আর সার-শুয়া দুইটি পঙ্খী
রাখিয়াছি ধরিয়া।
ওরে, দু-দিলা হইলে[৪] পাখী
যাইব[৫] রে উডিয়া গো ॥

আর এমন যতনের পাখী
কে দিব[৬] ধরিয়া।
এগো, বিনা দর্‌মায়[৭] করমু চাকরি—
এই জলম ভরিয়া গো ॥

১ খারাপ, বেগতিক ২ আকুল হইয়া গিয়াছি ৩ কথা বলি না ৪ দুই মন হইলে
৫ যাইবে ৬ দিবে ৭ দর-মাহিনায়, মাস-মাহিনায়

আর ভাইবে রাধারমণ বলে—
শুন্‌রে কালিয়া ঃ
এগো, নিবি' ছিল[১] মনেরি আনল[২]
কে দিল জ্বালিয়া গো ॥

। ১৫৪ ।

কই দিয়াছ লুকি'[৩] রে আমার সাধের পোষা পাখী
এমন সুন্দর পাখীয়ে আমার—
দিয়াছে লুকি' রে ॥

আর জল ফালাইয়া[৪] জলে গেলাম—
গো আমার পাখী দেইখবার লাগি'[৫]।
ওয় গো, আমারে দেখিয়া পাখীয়ে
করে লুকালুকি গো ॥

আর ঈশ্বর বলে, ওই কপালে—
রে আমার আর কী আছে বাকী।
ওয় গো, পোড়া কপাল না লয় জোড়া[৬]
জ্বলে রাত্রি-দিন গো ॥

। ১৫৫ ।

আও বা' নাথ,[৭] করো শান্ত,
মুই অভাগীয়ে ডাকি ;—
বা' নয়ন তুলো দেখি,
নয়ন তুলো দেখি, বা' সোনার বরণ পাখি ॥

১ নিভিয়া ছিল ২ অনল ৩ কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছ ৪ ফেলিয়া ৫ দেখিবার জন্য
৬ পোড়া কপাল জোড়া লাগে না ৭ এসো হে নাথ

আর সাধ ক'রে
হৃদয়েতে রাখি'।
মাইল নেশ[১] আয়ু শেল,
বাঁচি কি না বাঁচি ॥

আর উঝা-চিতে মন্ত্র ঝুড়ে[২]
ধর্ম ক'রে সাক্ষী।
ওরে, ঔষধে না কইল কারী[৩]
কেবল ঝিকিমিকি ॥

আর আবজল বলে, মোর কপালে
কি লেখিয়াছইন বিধি।
কেবল ভরসা রাখি—
জল বিনে চাতকী ॥

। ১৫৬ ।

মন-চোরা মনিয়ার পাখি[৪] রে,
পাখী কে নিল ধরিয়া।
এগো, কুখণে[৫] হেরিয়া আইলাম
জলের ঘাটে গিয়া গো ॥

আর আগে যদি জানতাম পাখি রে,
পাখি যাইবায়[৬] রে ছাড়িয়া।
এগো, মাথার কেশ দু' ফাঁক করি'
রাখিতাম বান্ধিয়া গো ॥

১ ছোবল মারিল ২ চিত্ত রূপী ওঝা মন্ত্র ঝাড়ে ৩ ঔষধ কার্যকরী হইল না ৪ মুনিয়া পাখী, ময়না পাখী ৫ কুক্ষণে ৬ যাইবে

আর ভাইবে রাধারমণ বলে,
শুনোরে কালিয়া ঃ
এগো জয়মণি কয়—
ছাফ কাপড়ে[১] ছাডছ দাগ লাগাইয়া[২]

। ১৫৭ ।

খাকের পিঞ্জিরার[৩] মাঝে সুয়া বন্দী করছে-
কান্দে হাছন রাজর মন-মইনায়[৪] রে ॥

হাছন রাজায় জানত যদি
বাঁচব কতক দিন[৫]—
দালান-কোঠা বানাইত
করিয়া রঙীন রে ॥

হাছন রাজা মরিয়া গেলে
মাটির তলে বাসা—
কোথায় রইবা[৬] লখণ-ছিরি[৭]
রঙ্গের রামপাশা[৭] ॥

। ১৫৮ ।

এমন সুজন পাগল—আপন-পর বুঝে না ।
নিষেধ পাগলে মানে না ॥

---

১ ফর্সা কাপড়ে ২ দাগ লাগাইয়া দিয়াছ ৩ মাটির পিঞ্জরের ৪ মন-ময়না ৫ বাঁচিবে কতো দিন ৬ রহিবে ৭ হাছন রাজার জমিদারীর অন্তর্গত দুইটি পরগণা

শইতে[১] ঘরে দিলাম পাগল রে—
ও পাগল, তোশক আর বিছানা।
এগো, সকালে উঠিয়া পাগল
না পাই তোমার ঠিকানা॥

আর ক্ষণে করো আমিরানা[২] রে—
ও পাগল, ক্ষণে হও মন দেওয়ানা[৩]।
ক্ষণে হও রে শরার কাজী[৪]
ক্ষণে হওরে মৌলানা॥

আর করিম-রহিম[৫] আল্লা—
ও মুরশিদ মজাইদ চান্দ মৌলানা।
ও তান[৬] সঙ্গে তোপের গুল্লি
কেও তো তানে চিনে না॥

।১৫৯।

দিলাল রে,[৭] তোরে বুঝাইতে না পারি
রাইতে-দিনে থাকো দিলাল
চঞ্চল মোর বাড়ী॥

আল্লার বানায়া দিলাল
মন তার জিন্।
পবনে চড়িয়া ঘোড়া
দৌড়াও রাত্রদিন॥

১ শুইতে ২ আমিরিয়ানা ৩ পাগল ৫ মুসলমান আইনের বিচারক ৫ দয়ালু ৬ তাঁহার
৭ হে দিল মন

পরার বাড়ী থাকো দিলাল,
নাইনি রে[১] তোর ঘর।
হায়রে, নবলাখের বাত্তি[২] জ্বলে
দেখিতে সুন্দর ॥

ঘরখিনি[৩] ভাঙারুঙ্গা
দুয়ার কেনে বান্দ।
আপনি মরিয়া যাইবায়[৪]
পরার লাগি' কান্দ ॥

কইন তো ফকির আখতর সায়েব—
লও রে আল্লার নাম ঃ
পীর-মুরশিদ ভজিয়া ভাই
শিখো ঘরের কাম ॥

। ১৬০ ।

তুই আমারে পাগল করিলায়[৫] রে
অনাথের নাথ গৌর রে ;
আর পাগল করিলায় গৌর,
ও গৌর, দেওয়ানা বানাইলে।
ওরে, অকূলীরে কূল দিয়া আমারে ভাসাইলায়[৬] রে

আর সর্প হইয়া কামড় মারে রে—
ও গৌর, উঝা[৭] হইয়া ঝাড়ে।
ওরে, ঝাড়িতে না লামে[৮] বিষ
বিষে উজান ধরে রে ॥

১ নাই কি রে ২ বাতি ৩ ঘরখানি ৪ যাইবে ৫ করিলে ৬ ভাসাইলে ৭ ওঝা
৮ নামে

আর কোন্ সাপে মাইল কামড়[1] রে
ও গৌর, সর্বঅঙ্গ জারে[2]।
আরে, ওই বিষ ঝাড়িতা পারইন[3]
ঠাকুর মজাইদ চান্দে রে ॥

। ১৬১ ।

দুখ তো[4] ঠাঁই বিনে কা[5] ঠাঁই কই—
শ্যামকে লাগাল পাইলাম না গো সই

শ্যাম যদি হইত মাথার চুল—
উচ্চা করি'[6] বান্ধতু[7] খোঁপা
বেড়াইতাম গোকুল ॥

এগো, কাঙ্খের কলস ভূমিত থইয়া—
তোমার বানে[8] চাইয়া রই।
কালা, তোমার বানে চাইয়া রই ॥

আর মুরশিদ মজাইদ চান্দে বলইন—
সই, শ্যাম বান্ধা রাই-প্রেমের মাঝে
আর যাইবায়[9] কই ॥

এগো, এক সঙ্গে দুই অঙ্গ হইয়ে—
রাই-রূপে লুকাইয়া রই।
কালা, রাই-রূপে লুকাইয়া রই ॥

১ কোন সাপে কামড় মারিল ২ জর্জরিত করে ৩ ঝাড়িতে পারেন ৪ তোর ৫ কাহার
৬ উঁচু করিয়া ৭ বাঁধিতাম ৮ পানে ৯ যাইবে

। ১৬২ ।

সই সই, বন্ধুরে যদি পাই—
কাজল-বরণ আঙ্খি[১] দিয়া
আদরে বসাই ॥

বন্ধু আমার প্রাণের ধন,
শিরের মাণিক-রতন।
হায় হায়, কতোদিনে পাইমু আমার
প্রাণনাথ গোসাঁই ॥

পাগল জহির আলি বলে,
বন্ধু রইলা বিদেশেতে ;
আমি কেমনে রইমু[২] ঘুমের ঘোরেতে ॥

। ১৬৩ ।

আমার জ্বলিয়াছে বিচ্ছেদের আনল[৩]
হারাইয়াছি বুদ্ধি বল।
বল্ বল্, বন্ধু কোথায় বল্ ॥

আর প্রাণের বন্ধু বলি যারে—
সে আমারে প্রাণে মারে গো।
এগো, তবু তারে না দেখিলে
আঙ্খির জলে টলমল্ ॥

আর কি করিব কোন্ লাজে—
যাবো আমি কাহার দেশে।
এগো, যথা গেলে বন্ধু মিলে
তথা আজি যাই বল্ ॥

১ আঁখি ২ রহিব ৩ অনল

আর গোঁসাই গোলোক চান্দে বলে—
স্বয়ামী[১] বিনে হইয়াছি রাঁড়ী[২]।
এগো, বুকে নাই তার দয়ামায়া
মুখে শুধু হাসি খল্‌॥

। ১৬৪ ।

নিদাগেতে দাগ লাগাইল—প্রাণ-বন্ধু কালিয়ায়-
প্রেম-জ্বালায় প্রাণি যায়॥

আটিয়া[৩] যাইতে পাড়ার লোকে
কতোই মন্দ গাইয়া যায়।
এগো, লোকের নিন্দন পুষ্পের চন্দন
অলঙ্কার পইরাছি[৪] গায়॥

কদমডালে বসিয়া বন্ধু
বাঁশীটি বাজাইয়া চায়।
এগো, বাঁশীর সুরে প্রাণি হরে
গৃহে থাকা হইল দায়॥

জল ভরিতা[৫] গেলা রাধে
সোনার নেপুর রাঙা পায়।
এগো, সর্প হইয়া কালিয়ার বাঁশী
দংশিল রাধারি গায়॥

সর্পের বিষ ঝাড়িতে লামে[৬]
প্রেমের বিষে উজান বায়।
এগো, উঝা[৭] -বৈদ্যের নাই গো সাধ্য
ঝাড়িয়া বিষ লামাইতে পায়॥

---

১ সোয়ামী, স্বামী ২ বিধবা ৩ হাঁটিয়া ৪ পরিয়াছি ৫ ভরিতে ৬ নামে ৭ ওঝা

জল ভরিয়া যতো সখী
ব্রজপুরে তারা যায়।
এগো, গুনগুনাগুন শব্দ শুনে
ত্রিপুণ্যিতে বাঁশী বায়॥

ভাইবে রাধারমণ বলে—
করি এখন কি উপায়।
এগো, মনে লয়[১] ভমরা হইয়ে
উড়িয়া বসি বন্ধের গায়॥

। ১৬৫ ।

মনে লয়,[২] বৈরাগী হয়ে বিদেশেতে যাই।
ওয়রে, কালার নামটি কণ্ঠে দিয়া
ভিক্ষা মাগি' খাই॥

আর পাঞ্চ ছিয়ায়[৩] চিঁড়া কুটে—
তীর্থে লইয়া যাইত।
ওয়রে, বৈরাগীয়ে করে ফালাফালি[৪]
বৈষ্টবনী থইয়া[৫] যাইত।

আর যাও যাও প্রাণের বৈরাগী
ও তুমি তীর্থে চলিয়া যাও।
ওয়রে, আর নি আসিয়া তুমি
বৈষ্টবনীর লাগাল পাও রে॥

১ মনে হয় ২ মনে করি ৩ ঢেঁকির মুষল ৪ লাফালাফি ৫

আর 'বৈরাগী বৈরাগী' বইলে
বৈষ্টবনীয়ে ডাকে।
ওয়রে, আমারে ছাড়িয়া যারায়[১]
তোমার বিধরতার[২] ফাঁকে রে ॥

আর আখ্‌ড়া ভাঙ্‌ব, বৈরাগী যাইব
বৈষ্টবনী রইবা চাইয়া।
ওয়রে, আর নি খাইতায় পসাদ
বৈরাগীরে লইয়া ॥

আর সৈয়দ শা' বাউল কইনি
ভুটাঙ্গী টিলায়[৩] বইয়া—
ওযরে, এই গীতি রুচিলাম[৪] আমি
আন্ধাইর ঘরে[৫] বইয়া ॥

। ১৬৬ ।

ও আর পাসর[৬] না যায় গো তারে
পাসর না যায়—
একদিন দেখ্‌ইয়াছি যারে ॥

আর কেওরের পিন্দন[৭] লালনীলা
কেওরের পিন্দন শাড়ী।
আমার শ্রীমতী রাধিকার পিন্দন-
কিষ্ণ-পীতাম্বরী গো ॥

১ যাইতেছ ২ বিধাতার ৩ করিমগঞ্জের নিকটবর্তী একটি টিলা ৪ বচনা করিলাম
৫ অন্ধকার ঘরে ৬ ভোলা ৭ কাহারও পরিধানে

আর ভাইবে রাধারমণ বলে—
শুনো গো সকলে ;—
এগো, মইলাম মইলাম, আমি মইলাম,
বন্ধু থাকউক[১] সুখেতে ॥

। ১৬৭ ।

চৌদিগে দি' চৌকি-পা'রা[২] , যাইরে আমি কি পরকারে[৩]
কেমনে আমি যাইরে রাধার মন্দিরে ॥

বুঝাইলে না বুঝে চিতে
রাইতে-দিনে ঝুরে ;
পাগলিনীর মতো যেমন
আউলা-বেশ ধরে ।
এগো, বিরহিণীর মতো ঘুরে—
দেশ-দেশান্তরে রে ॥

কোকিল পাখী বসন্তেতে
কুহু-কুহু গায় ;
মন আমার আশিক-রতন[৪] -
-পন্থ-পানে চায় ।
এগো, সেই মতো হৃদয় আমার
প্রেম-দরিয়ায় উথলে ॥

পাগল ইছাকে বলে
না পূরিল আশ ;
কেমনে আমি যাইরে
প্রাণ-বন্ধের পাশ ।
মনে লয়—হইতাম আমি
সেই বন্ধের দাস রে ॥

১ থাকুক ২ চারিদিক দিয়া চৌকি ও পাহারা ৩ প্রকারে ৪ প্রেমিকরতন

। ১৬৮ ।

দিয়া প্রাণ, কুলমান,—
মন পাইলাম না, সজনি।
আমি হইলাম গো সই, কুলকলঙ্কিনী ॥

আঙ্খি দিলাম রূপ-দর্শনে,
কর্ণ দিলাম নাম শুনি'।
এগো, রূপ দিলাম তার অঙ্গের বদল—
প্রাণ দিলাম তার নিশানি[১] ॥

আর তন ছুড়[২] , মন ছুড়,
ছুড় ঘর-বাসনি[৩]।
এগো, ফুটিব কমল-পুষ্প—
সুগন্ধিত মোহিনী ॥

আর শুনিয়াছি গুরুর মুখে
এ সব কাহিনী।
এগো, নারীলোকের না হয় দেখা—
মিছা আশা বঞ্চনি[৪] ॥

আর জিজ্ঞাসিতে নগরেতে
বন্ধু আমার আসব নি[৫] —
এগো, একালে না হইলে দেখা
পরকালে হইব নি ॥

ও ভাই, চাতকীর মতো
দিবানিশি-রজনী—
এগো, পরেতে পরার বেদন
বুঝব নি, প্রাণ-সজনি—

২ তনু ছাড়ো ৩ গৃহবাস ৪ বঞ্চনাময় মিথ্যা আশা ৫ আসিবে কি

প্রেম-তাপিত যে জন
তার হৃদয়ে আগুনি।
এগো, আলিঙ্গন দিয়া প্রভু—
শীতল করো পরানি॥

আর শীতালং ফকিরে কইন—
শুনো ওগো বিরহিণি :
এগো, তোমার পিরিতের কাজে-
জান করতাম কোরবানী[১]॥

। ১৬১ ।

যে দাগ লাগিয়াছে চিতে
সে দাগ আর যাইবায়[২] গো নয়।
পিরিতে বাবুলের কাঁটা[৩] বিন্ধিয়াছে হৃদয়

সখি গো, প্রথমে করছিল পিরিত
হইয়া সদয়।
যাইবার কালে যায় গো ছাড়ি',—
ফিরিয়া না কথা গো কয়॥

সখি গো, ঘড়ি-ঘড়ি[৪] উঠে মনে
কমি-বেশী নয়।
প্রাণ থাকিতে হইছি মড়া
কুলমানের আর কি গো ভয়॥

---

১ প্রাণ উৎসর্গ করিব ২ যাইবাব ৩ ব,বলার কাঁটা ৪ ক্ষণেক্ষণে

সখি গো, কাপড়েতে দাগ লাগিলে
সাবন-সোডায় ধয়[১]।
লাগিলে পিরিতের দাগ
দর্শন বিনা যাইবার গো নয়

সখি গো, অধীন প্রেমিক বলে—
আশিক[২] যে জন হয় :
ছাড়ব না মাশুকের[৩] চরণ
যদি পন্থে মরণ হয় ॥

। ১৭০ ।

কৌতূহলে কল-কৌশলে করতেছিলাম প্রেমখেলা—
নষ্ট কইল হায়রে তোদের মাথা পাগেলা ॥

আর আমোদ প্রেম-তরঙ্গে উঠছিল—
এগো মাতিয়া[৪] বিনষ্ঠ দিল[৫] ফাত্‌রামি করিয়া[৬]।
আর ফাত্‌রার কথায় প্রাণের ব্যথায়
বারণ হইল প্রেমখেলা ॥

ভালা কইলে মন্দ বুঝে, দিলে ভাবে গালি[৭] —
করলে মানা করে দুনা,[৮] হাতে দেয় তালি।
এগো, শরম-ভরম মান-কুলমান
তাদের কোনো নাই নিশানা ॥

---

১ সাবান-সোড়া দিয়া ধোয়   ২ প্রেমিক   ৩ প্রেমাস্পদ   ৪ কথা কহিয়া   ৫ নষ্ট করিল
৬ ফাজলামি করিয়া   ৭ গালি মনে করে   ৮ দ্বিগুণ

আর গৃহে পাগল, বাইরে পাগল, পাগল সর্বথায়—
লোকসমাজে কলঙ্কিনী কইল কামিনায়[১]।
এগো, হাতে-পায়ে বান্ধিয়া রাখো
নইলে দেও জেলখানা ॥

আর বাকী পাগলের কথা বলিতে না পারি—
এগো, আপনার জ্বালায় প্রাণ বাঁচে না, দিবানিশি ঝুরি।
এগো, ইয়াকুল আব্দুল ওয়াহিদ বলে—
পড়তে রহো 'লা হাওলা'[২] ॥

। ১৭১ ।

চাইর চিজে[৩] পিঞ্জিরা বানাই'[৪] মোরে কইলায়[৫] বন্ধ।
রে বন্ধু নির্ধনীয়ার ধন,
কেমনে পাইমু রে কালা, তোর দরশন ॥

সমুদ্রের জল উঠে বাতাসের জোরে
আবর[৬] হইয়া ঘুরে পবনের ভরে।
জমিনে পড়িয়া শেষে সমুদ্রেতে যায়
জাতেতে মিশিয়া জাতে তরঙ্গ খেলায় ॥

তুমি আমি, আমি তুমি, জানিয়াছি মনে—
বীচিতে জন্মিয়া গাছ বীচি ধরে কেনে।
এক হইতে দুই হইল প্রেমেরি কারণ,
সে অবধি আশিকের দিলে[৭] করে উচাটন ॥

---

১ সামান্য ব্যক্তি ২ পূর্ণ আববী শ্লোকটিব অর্থ : সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সাহায্য ব্যতীত ভালোমন্দ কোনো কাজ কবিবাব ক্ষমতা কাহারও নাই। কোনো অমঙ্গলসূচক কথা শুনিলে অথবা কোনো অমঙ্গলজনক কাজ হইতেছে দেখিলে এই শ্লোকটি আবৃত্তি করা হয়
৩ বস্তুতে ৪ বানাইয়া ৫ করিলে ৬ মেঘ ৭ প্রেমিকের মনে

পরিন্দা জানোয়ার[১] যদি কোনো এক কলে
জ্ঞাতি ছাড়া বন্ধ হয় শিকারীয়ার জালে :
কি হালে জিন্দেগী কাটে বন্ধখানায় তার—
মাশুক[২] হইয়া করো আশিকের বিচার ॥

আশিক-মাশুক যদি থাকে দুইস্থানে—
টেলি দিয়া খুশির মঙ্গল[৩] যদি জানে :
বিনা দরশনে কিলা বাঁচিব জীবন[৪]
শুন প্রভু প্রাণ দিয়া মোর নিবেদন ॥

পাগল আরকুমে কয়, মাশুক-বানিয়া[৫],
দুয়াঙ্গ পাতিয়া থইছইন উলুরে গাঁথিয়া[৬]।
আহার করিতে যদি না যাইত মন—
না লাগিত প্রেম-লাঠা[৭], না হইত মরণ ॥

। ১৭২ ।

চাইনা রে বন্ধু আমি বেহেস্ত[৮] রে তোর।
আশিকের[৯] দপ্তরে নাম
লেখিয়া দেও মোর ॥

আর আহাদ[১০] -আহ্‌মদের[১১] ভেদ রাখিলে গোপন-
সে ভেদে করিলায়[১২] তুমি সৃষ্টি পতন।
হায়রে, তুমি যে মাশুক[১৩] আমার—
ডাকি যে আদরে ॥

১ যে প্রাণী উড়িতে জানে ২ প্রেমাস্পদ ৩ টেলিগ্রাম করিয়া খুশির খবর ৪ কি প্রকারে জীবন বাঁচিবে ৫ বেনে ৬ উইপোকা রাখিয়া (পাখী ধরিবার) ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছেন ৭ প্রেমের লেঠা ৮ স্বর্গ ৯ প্রেমিকের ১০ একমেবাদ্বিতীয়ম্ যে ভগবান, আল্লা ১১ মোহাম্মদ ১২ করিলে ১৩ প্রেমাস্পদ

আর এস্কের শরাব বন্ধু পিলাই' দেও আমারে[১]
পাগল হইয়া ফিরি যেন নগরে-বাজারে।
হায়রে, তুমি যে মাশুক আমার—
রহিত[২] অন্তরে ॥

আর আশিক বলিয়া বন্ধু ডাকো যদি মোরে—
দুজখের[৩] হুকুম দিলে মানিয়া নিমু তারে।
হায়রে, আশিকের দিল খুশি—
মাশুকের দিদারে ॥

আর আশিকের ছিতম[৪] নাই মাশুকের দরবার
মাশুকের হুকুমের জিঞ্জিরা[৫] আশিকের ফুলের হার।
ও আমি দিমু গলে প্রেম-কৌশলে—
রত্ন জানি' তারে ॥

আর প্রেম না করিলু, গেল জিন্দেগী[৬] বিফলে—
সোনার যৌবন গেল হায়ানের মিছালে[৭]।
পাগল আরকুমে বলে—
দয়া হইলে পাইতাম তোমারে ॥

। ১৭৩ ।

প্রেমের আগুন জ্বলছে দ্বিগুণ
বলব দুঃখ কার কাছে—
—আমার কপালে যা আছে ॥

আপ্‌না জানি' কইলাম পিরিত, বন্ধে ভিন্ন বাসে—
কি করি আজলের লেখা[৮]
বিধাতায় যা লেখিয়াছে ॥

---

১ আমাকে প্রেমের মদ পান করাইয়া দাও ২ রহিবে ৩ নরকের ৪ কষ্ট ৫ শিকল
৬ জ।বন ৭ পশুর মতো ৮ অদৃষ্টের লেখা

হৃদয়েতে প্রেমাগুন ধাক্‌ধাকাইয়া[১] জ্বলতেছে—
দুই ধারে দুই আঁখির জল
ঝড়-বরিষণ হইতেছে ॥

না জানি কি প্রেম-শেল হৃদয়েতে বিন্ধিয়াছে—
এস্কের[২] কার্তুশ[৩] ছুঁড়িয়া বন্ধে
কোথায় গিয়া ছাপিয়াছে[৪] ॥

কি করিব, কোথায় যাবো, প্রাণবন্ধের উদ্দেশে—
কোন্ রসিকে পাইয়া বন্ধের
মন ভুলাইয়া রাখিয়াছে ॥

ঘরে-ঘরে কানাকানি, শুন্‌তেছে দেশ-বিদেশে—
প্রেম-কলঙ্কী হইছে[৫] ব'লে
নিন্দা ঘোষণ হইতেছে ॥

পাই যদি প্রাণ-বন্ধুরে মালিকুল মউতের[৬] কাছে—
ওয়াহিদের প্রেম-যাতনা
তখনি যাবে ঘুইচে[৭] ॥

। ১৭৪ ।

প্রেম করিলে প্রেমানলে সর্বথা জ্বলিতে হয়—
প্রেম করা মুখের কথা নয় ॥

প্রেম করিছে যারা, জী'তে[৮] সেই মরা ;
সুখ-ভোগ-ক্ষিদা-নিদ্রা তেয়াগিছে তারা।
কোথায় প্রিয়সী[৯] পাব, এই খেদে রয় ॥

১ ধিকি ধিকি করিয়া ২ প্রেমের ৩ কার্তুজ, গুলি ৪ লুকাইয়া রহিয়াছে ৫ হইয়াছি
৬ মৃত্যুর অধিষ্ঠাতা, যমের ৭ ঘুচিয়া ৮ জীবিত অবস্থায় ৯ প্রেয়সী

কায়েস[১] নামেতে ছিল এ জগতে ;
মজনু আশিক হইলা লায়লীর উপরেতে[২] ।
লোহার শিকল পরে রাজার তনয় ॥

জোলেখা সুন্দরী ইছুফের পিয়ারী—
ধনমান সব দিলা ইছুফের প্রেমে ।
হারে, রাজার কুমারী হইয়া সন্ন্যাসিনী হয় ।

রাধিকা সুন্দরী কিষ্ণের পিয়ারী—
রাধার প্রেমেতে কিষ্ণ হইলা দণ্ডধারী ।
রাজার কুমার হইয়া কুঞ্জবনে রয় ॥

ইয়াছিনে বলে, দেখ ভাই সকলে,
এ চৌদ্দ ভুবন পয়দা প্রেমেরি কারণে ;
তেকারণে স্বর্গভূমি শূন্যেতে ঘুময়[৩] ॥

। ১৭৫ ।

আমরা প্রেম-বাজারে থাকি—
আশিক ছাড়া[৪] পুরুষ-নারী হাবিয়া দুজখী[৫]

আর এস্কে[৬] আল্লা, এস্কে রছুল[৭]
এস্কে আদম খাকি[৮] ;
আদম হইতে হাওয়া[৯] পয়দা
প্রেম-খেলার লাগি' ।
—দয়াল, প্রেম-বাজারে থাকি ॥

---

১ 'মজনু'র প্রকৃত নাম ২ মজনু লায়লীর প্রেমে পড়িল ৩ ঘুরে ৪ প্রেমিক ছাড়া
৫ 'হাবিয়া' নামক নরকের অধিবাসী ৬ প্রেমে ৭ ভগবান প্রেরিত পুরুষ, মোহাম্মদ
৮ মাটি নির্মিত নরদেহ ৯ ইভ (?)

আর হৃদ্‌পিঞ্জিরায় থাকো পাখি
মোহন ডালে বাসা ;
ওরে, তিনডালে তার পালা পালিছ—
হায়রে পাষাণ মন,
তারে ধরতে গেলে না দেয় ধরা ॥

আর ভাইবে রাধারমণ বলে--
শুনোরে কালিয়া ঃ
পাখী পিঞ্জিরা ছাড়িয়া যাইতে রে
হায়রে পাষাণ মন,
তোরে আইল রাখি, অসারের ধন ॥

। ১৫৩ ।

আমার দিন বড়ো বেকলা[1] দেখি—
আকুল গেছি খাইয়া[2] গো
ও সই, মাতি না[3] ডরাইয়া ॥

আর সার-শুয়া তুইটি পক্ষী
রাখিয়াছি ধরিয়া ।
ওরে, দু-দিলা হইলে[4] পাখী
যাইব[5] রে উড়িয়া গো ॥

আর এমন যতনের পাখী
কে দিব[6] ধরিয়া ।
এগো, বিনা দর্‌মায়[7] করমু চাকরি—
এই জলম ভরিয়া গো ॥

১ খারাপ, বেগতিক ২ আকুল হইয়া গিয়াছি ৩ কথা বলি না ৪ দুই মন হইলে
৫ যাইবে ৬ দিবে ৭ দর-মাহিনায়, মাস-মাহিনায়

আর ভাইবে রাধারমণ বলে—
শুন্‌রে কালিয়া ঃ
এগো, নিবি' ছিল[১] মনেরি আনল[২]
কে দিল জ্বালিয়া গো ॥

। ১৫৪ ।

কই দিয়াছ লুকি'[৩] রে আমার সাধের পোষা পাখী
এমন সুন্দর পাখীয়ে আমার—
দিয়াছে লুকি' রে ॥

আর জল ফালাইয়া[৪] জলে গেলাম—
গো আমার পাখী দেইখবার লাগি'[৫] ।
ওয় গো, আমারে দেখিয়া পাখীয়ে
করে লুকালুকি গো ॥

আর ঈশ্বর বলে, ওই কপালে—
রে আমার আর কী আছে বাকী ।
ওয় গো, পোড়া কপাল না লয় জোড়া[৬]
জ্বলে রাত্রি-দিন গো ॥

। ১৫৫ ।

আও বা' নাথ,[৭] করো শান্ত,
মুই অভাগীয়ে ডাকি ;—
বা' নয়ন তুলো দেখি,
নয়ন তুলো দেখি, বা' সোনার বরণ পাখি ॥

১ নিভিয়া ছিল ২ অনল ৩ কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছ ৪ ফেলিয়া ৫ দেখিবার জন্য
৬ পোড়া কপাল জোড়া লাগে না ৭ এসো হে নাথ

আর সাধ ক'রে পালিলাম সর্প
হৃদয়েতে রাখি'।
মাইল নেশ[১] আয়ু শেষ,
বাঁচি কি না বাঁচি ॥

আর উঝা-চিতে মন্ত্র ঝুড়ে[২]
ধর্ম ক'রে সাক্ষী।
ওরে, ঔষধে না কইল কারী[৩]
কেবল ঝিকিমিকি ॥

আর আবজল বলে, মোর কপালে
কি লেখিয়াছইন বিধি।
কেবল ভরসা রাখি—
জল বিনে চাতকী ॥

। ১৫৬ ।

মন-চোরা মনিয়ার পাখি[৪] রে,
পাখী কে নিল ধরিয়া।
এগো, কুখণে[৫] হেরিয়া আইলাম
জলের ঘাটে গিয়া গো ॥

আর আগে যদি জানতাম পাখি রে,
পাখি যাইবায়[৬] রে ছাড়িয়া।
এগো, মাথার কেশ দু' ফাঁক করি'
রাখিতাম বান্ধিয়া গো ॥

১ ছোবল মারিল ২ চিত্ত রূপী ওঝা মন্ত্র ঝাড়ে ৩ ঔষধ কার্যকরী হইল না ৪ মুনিয়া পাখী, ময়না পাখী ৫ কুক্ষণে ৬ যাইবে

আর ভাইবে রাধারমণ বলে,
শুনোরে কালিয়া ঃ
এগো জয়মণি কয়—
ছাফ কাপড়ে[১] ছাডছ দাগ লাগাইয়া[২]

। ১৫৭ ।

খাকের পিঞ্জিরার[৩] মাঝে সুয়া বন্দী করছে-
কান্দে হাছন রাজর মন-মইনায়[৪] রে ॥

হাছন রাজায় জানত যদি
বাঁচব কতক দিন[৫]—
দালান-কোঠা বানাইত
করিয়া রঙীন রে ॥

হাছন রাজা মরিয়া গেলে
মাটির তলে বাসা—
কোথায় রইবা[৬] লখণ-ছিরি[৭]
রঙ্গের রামপাশা[৭] ॥

। ১৫৮ ।

এমন সুজন পাগল—আপন-পর বুঝে না ।
নিষেধ পাগলে মানে না ॥

---

১ ফর্সা কাপড়ে ২ দাগ লাগাইয়া দিয়াছ ৩ মাটির পিঞ্জরের ৪ মন-ময়না ৫ বাঁচিবে কতো দিন ৬ রহিবে ৭ হাছন রাজার জমিদারীর অন্তর্গত দুইটি পরগণা

শইতে[১] ঘরে দিলাম পাগল রে—
ও পাগল, তোশক আর বিছানা।
এগো, সকালে উঠিয়া পাগল
না পাই তোমার ঠিকানা॥

আর ক্ষণে করো আমিরানা[২] রে—
ও পাগল, ক্ষণে হও মন দেওয়ানা[৩]
ক্ষণে হও রে শরার কাজী[৪]
ক্ষণে হওরে মৌলানা॥

আর করিম-রহিম[৫] আল্লা—
ও মুরশিদ মজাইদ চান্দ মৌলানা।
ও তান[৬] সঙ্গে তোপের গুল্লি
কেও তো তানে চিনে না॥

। ১৫৯।

দিলাল রে,[৭] তোরে বুঝাইতে না পারি।
রাইতে-দিনে থাকো দিলাল
চঞ্চল মোর বাড়ী॥

আল্লার বানায়া দিলাল
মন তার জিন্।
পবনে চড়িয়া ঘোড়া
দৌড়াও রাত্রদিন॥

১ শুইতে ২ আমিরিয়ানা ৩ পাগল ৫ মুসলমান আইনের বিচারক ৫ দয়ালু ৬ তাঁহার
৭ হে দিল মন

পরার বাড়ী থাকো দিলাল,
নাইনি রে[১] তোর ঘর।
হায়রে, নবলাখের বাত্তি[২] জ্বলে
দেখিতে সুন্দর ॥

ঘরখিনি[৩] ভাঙারুঙ্গা
দুয়ার কেনে বান্দ।
আপনি মরিয়া যাইবায়[৪]
পরার লাগি' কান্দ ॥

কইন তো ফকির আখতর সায়েব—
লও রে আল্লার নাম :
পীর-মুরশিদ ভজিয়া ভাই
শিখো ঘরের কাম ॥

। ১৬০ ।

তুই আমারে পাগল করিলায়[৫] রে
অনাথের নাথ গৌর রে ;
আর পাগল করিলায় গৌর,
ও গৌর, দেওয়ানা বানাইলে।
ওরে, অকুলীরে কূল দিয়া আমারে ভাসাইলায়[৬] রে

আর সর্প হইয়া কামড় মারে রে—
ও গৌর, উঝা[৭] হইয়া ঝাড়ে।
ওরে, ঝাড়িতে না লামে[৮] বিষ
বিষে উজান ধরে রে ॥

১ নাই কি রে ২ বাতি ৩ ঘরখানি ৪ যাইবে ৫ করিলে ৬ ভাসাইলে ৭ ওঝা
৮ নামে

আর কোনু সাপে মাইল কামড়[১] রে
ও গৌর, সর্বঅঙ্গ জারে[২] ।
আরে, ওই বিষ ঝাড়িতা পারইন[৩]
ঠাকুর মজাইদ চান্দে রে ॥

। ১৬১ ।

দুখ তো[৪] ঠাঁই বিনে কা[৫] ঠাঁই কই—
শ্যামকে লাগাল পাইলাম না গো সই

শ্যাম যদি হইত মাথার চুল—
উচ্চা করি'[৬] বান্ধতু[৭] খোঁপা
বেড়াইতাম গোকুল ॥

এগো, কান্ধের কলস ভূমিত থইয়া—
তোমার বানে[৮] চাইয়া রই ।
কালা, তোমার বানে চাইয়া রই ॥

আর মুরশিদ মজাইদ চান্দে বলইন—
সই, শ্যাম বান্ধা রাই-প্রেমের মাঝে
আর যাইবায়[৯] কই ॥

এগো, এক সঙ্গে দুই অঙ্গ হইয়ে—
রাই-রূপে লুকাইয়া রই ।
কালা, রাই-রূপে লুকাইয়া রই ॥

১ কোন সাপে কামড় মারিল ২ জর্জরিত করে ৩ ঝাড়িতে পারেন ৪ তোর ৫ কাহার
৬ উঁচু করিয়া ৭ বাঁধিতাম ৮ পানে ৯ যাইবে

। ১৬২ ।

সই সই, বন্ধুরে যদি পাই—
কাজল-বরণ আঞ্ঝি[১] দিয়া
আদরে বসাই ॥

বন্ধু আমার প্রাণের ধন,
শিরের মাণিক-রতন।
হায় হায়, কতোদিনে পাইমু আমার
প্রাণনাথ গোসাঁই ॥

পাগল জহির আলি বলে,
বন্ধু রইলা বিদেশেতে ;
আমি কেমনে রইমু[২] ঘুমের ঘোরেতে

। ১৬৩ ।

আমার জ্বলিয়াছে বিচ্ছেদের আনল[৩]
হারাইয়াছি বুদ্ধি বল।
বল্ বল্, বন্ধু কোথায় বল্ ॥

আর প্রাণের বন্ধু বলি যারে—
সে আমারে প্রাণে মারে গো।
এগো, তবু তারে না দেখিলে
আঞ্ঝির জলে টলমল্ ॥

আর কি করিব কোন্ লাজে—
যাবো আমি কাহার দেশে।
এগো, যথা গেলে বন্ধু মিলে
তথা আজি যাই বল্ ॥

---

১ আঁখি ২ রহিব ৩ অনল

আর 'বৈরাগী বৈরাগী' বইলে
বৈষ্টবনীয়ে ডাকে।
ওয়রে, আমারে ছাড়িয়া যারায়[১]
তোমার বিধরতার[২] ফাঁকে রে ॥

আর আখ্ড়া ভাঙ্ব, বৈরাগী যাইব
বৈষ্টবনী রইবা চাইয়া।
ওয়রে, আর নি খাইতায় পসাদ
বৈরাগীরে লইয়া ॥

আর সৈয়দ শা' বাউল কইনি
ভুটাঙ্গী টিলায়[৩] বইয়া—
ওযরে, এই গীতি রুচিলাম[৪] আমি
আন্ধইর ঘরে[৫] বইয়া ॥

। ১৬৬ ।

ও আর পাসর[৬] না যায় গো তারে
পাসর না যায়—
একদিন দেখ্ইয়াছি যারে ॥

আর কেওরের পিন্দন[৭] লালনীলা
কেওরের পিন্দন শাড়ী।
আমার শ্রীমতী রাধিকার পিন্দন-
কিষ্ণ-পীতাম্বরী গো ॥

১ যাইতেছ ২ বিধাতার ৩ করিমগঞ্জের নিকটবর্তী একটি টিলা ৪ রচনা করিলাম
৫ অন্ধকার ঘরে ৬ ভোলা ৭ কাহারও পরিধানে

আর ভাইবে রাধারমণ বলে—
শুনো গো সকলে ;—
এগো, মইলাম মইলাম, আমি মইলাম,
বন্ধু থাকউক[১] সুখেতে ॥

। ১৬৭ ।

চৌদিগে দি' চৌকি-পা'রা[২] , যাইরে আমি কি পরকারে[৩]
কেমনে আমি যাইরে রাধার মন্দিরে ॥

বুঝাইলে না বুঝে চিতে
রাইতে-দিনে ঝুরে ;
পাগলিনীর মতো যেমন
আউলা-বেশ ধরে ।
এগো, বিরহিণীর মতো ঘুরে—
দেশ-দেশান্তরে রে ॥

কোকিল পাখী বসন্তেতে
কুহু-কুহু গায় ;
মন আমার আশিক-রতন[৪] -
-পন্থ-পানে চায় ।
এগো, সেই মতো হৃদয় আমার
প্রেম-দরিয়ায় উথলে ॥

পাগল ইছাকে বলে
না পূরিল আশ ;
কেমনে আমি যাইরে
প্রাণ-বন্ধের পাশ ।
মনে লয়—হইতাম আমি
সেই বন্ধের দাস রে ॥

---

১ থাকুক   ২ চারিদিক দিয়া চৌকি ও পাহারা   ৩ প্রকারে   ৪ প্রেমিকরতন

। ১৬৮ ।

দিয়া প্রাণ, কুলমান,—
মন পাইলাম না, সজনি।
আমি হইলাম গো সই, কুলকলঙ্কিনী ॥

আখি দিলাম রূপ-দর্শনে,
কর্ণ দিলাম নাম শুনি'।
এগো, রূপ দিলাম তার অঙ্গের বদল—
প্রাণ দিলাম তার নিশানি[১] ॥

আর তন ছুড়[২], মন ছুড়,
ছুড় ঘর-বাসনি[৩]।
এগো, ফুটিব কমল-পুষ্প—
সুগন্ধিত মোহিনী ॥

আর শুনিয়াছি গুরুর মুখে
এ সব কাহিনী।
এগো, নারীলোকের না হয় দেখা—
মিছা আশা বঞ্চনি[৪] ॥

আর জিজ্ঞাসিতে নগরেতে
বন্ধু আমার আসব নি[৫] —
এগো, একালে না হইলে দেখা
পরকালে হইব নি ॥

ও ভাই, চাতকীর মতো
দিবানিশি-রজনী—
এগো, পরেতে পরার বেদন
বুঝব নি, প্রাণ-সজনি—

১ চিহ্ন ২ তনু ছাড়ো ৩ গৃহবাস ৪ বঞ্চনাময় মিথ্যা আশা ৫ আসিবে কি

প্রেম-তাপিত যে জন
তার হৃদয়ে আগুনি ।
এগো, আলিঙ্গন দিয়া প্রভু—
শীতল করো পরানি ॥

আর শীতালং ফকিরে কইন—
শুনো ওগো বিরহিণি ঃ
এগো, তোমার পিরিতের কাজে-
জান করতাম কোরবানী[১] ॥

। ১৬১ ।

যে দাগ লাগিয়াছে চিতে
সে দাগ আর যাইবায়[২] গো নয় ।
পিরিতে বাবুলের কাঁটা[৩] বিন্ধিয়াছে হৃদয়

সখি গো, প্রথমে করছিল পিরিত
হইয়া সদয় ।
যাইবার কালে যায় গো ছাড়ি',—
ফিরিয়া না কথা গো কয় ॥

সখি গো, ঘড়ি-ঘড়ি[৪] উঠে মনে
কমি-বেশী নয় ।
প্রাণ থাকিতে হইছি মড়া
কুলমানের আর কি গো ভয় ॥

১ প্রাণ উৎসর্গ করিব ২ যাইবার ৩ ব.বলার কাঁটা ৪ ক্ষণেক্ষণে

পরিন্দা জানোয়ার[১] যদি কোনো এক কলে
জ্ঞাতি ছাড়া বন্ধ হয় শিকারীয়ার জালে :
কি হালে জিন্দেগী কাটে বন্ধখানায় তার—
মাশুক[২] হইয়া করো আশিকের বিচার ॥

আশিক-মাশুক যদি থাকে দুইস্থানে—
টেলি দিয়া খুশির মঙ্গল[৩] যদি জানে :
বিনা দরশনে কিলা বাঁচিব জীবন[৪]
শুন প্রভু প্রাণ দিয়া মোর নিবেদন ॥

পাগল আরকুমে কয়, মাশুক-বানিয়া[৫],
দুয়াঙ্গ পাতিয়া থইছইন উলুরে গাঁথিয়া[৬]।
আহার করিতে যদি না যাইত মন—
না লাগিত প্রেম-লাঠা[৭], না হইত মরণ ॥

। ১৭২ ।

চাইনা রে বন্ধু আমি বেহেস্ত[৮] রে তোর।
আশিকের[৯] দপ্তরে নাম
লেখিয়া দেও মোর ॥

আর আহাদ[১০] -আহ্‌মদের[১১] ভেদ রাখিলে গোপন-
সে ভেদে করিলায়[১২] তুমি সৃষ্টি পতন।
হায়রে, তুমি যে মাশুক[১৩] আমার—
ডাকি যে আদরে ॥

---

১ যে প্রাণী উড়িতে জানে ২ প্রেমাস্পদ ৩ টেলিগ্রাম করিয়া খুশির খবর ৪ কি প্রকারে জীবন বাঁচিবে ৫ বেনে ৬ উইপোকা বাঁধিয়া (পাখী ধরিবার) ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছেন ৭ প্রেমের লেঠা ৮ স্বর্গ ৯ প্রেমিকের ১০ একমেবাদ্বিতীয়ম্ যে ভগবান, আল্লা ১১ মোহাম্মদ ১২ করিলে ১৩ প্রেমাস্পদ

আর এস্কের শরাব বন্ধু পিলাই' দেও আমারে[১]
পাগল হইয়া ফিরি যেন নগরে-বাজারে।
হায়রে, তুমি যে মাশুক আমার—
রহিত[২] অন্তরে ॥

আর আশিক বলিয়া বন্ধু ডাকো যদি মোরে—
দুজখের[৩] হুকুম দিলে মানিয়া নিমু তারে।
হায়রে, আশিকের দিল খুশি—
মাশুকের দিদারে ॥

আর আশিকের ছিতম[৪] নাই মাশুকের দরবার
মাশুকের হুকুমের জিঞ্জিরা[৫] আশিকের ফুলের হার।
ও আমি দিমু গলে প্রেম-কৌশলে—
রত্ন জানি' তারে ॥

আর প্রেম না করিলু, গেল জিন্দেগী[৬] বিফলে—
সোনার যৌবন গেল হায়ানের মিছালে[৭]।
পাগল আরকুমে বলে—
দয়া হইলে পাইতাম তোমারে ॥

। ১৭৩ ।

প্রেমের আগুন জ্বলছে দ্বিগুণ
বলব দুঃখ কার কাছে—
—আমার কপালে যা আছে ॥

আপ্‌না জানি' কইলাম পিরিত, বন্ধে ভিন্ন বাসে—
কি করি আজলের লেখা[৮]
বিধাতায় যা লেখিয়াছে ॥

১ আমাকে প্রেমের মদ পান করাইয়া দাও ২ রহিবে ৩ নরকের ৪ কষ্ট ৫ শিকল
৬ জ।বন ৭ পশুর মতো ৮ অদৃষ্টের লেখা

হৃদয়েতে প্রেমাগুন ধাক্‌ধাকাইয়া[১] জ্বলতেছে—
দুই ধারে দুই আঁখির জল
ঝড়-বরিষণ হইতেছে ॥

না জানি কি প্রেম-শেল হৃদয়েতে বিন্ধিয়াছে—
এস্কের[২] কার্তুশ[৩] ছুঁড়িয়া বন্ধে
কোথায় গিয়া ছাপিয়াছে[৪] ॥

কি করিব, কোথায় যাবো, প্রাণবন্ধের উদ্দেশে-
কোন্ রসিকে পাইয়া বন্ধের
মন ভুলাইয়া রাখিয়াছে ॥

ঘরে-ঘরে কানাকানি, শুন্‌তেছে দেশ-বিদেশে—
প্রেম-কলঙ্কী হইছে[৫] ব'লে
নিন্দা ঘোষণ হইতেছে ॥

পাই যদি প্রাণ-বন্ধুরে মালিকুল মউতের[৬] কাছে-
ওয়াহিদের প্রেম-যাতনা
তখনি যাবে ঘুইচে[৭] ॥

। ১৭৪ ।

প্রেম করিলে প্রেমানলে সর্বথা জ্বলিতে হয়—
প্রেম করা মুখের কথা নয় ॥

প্রেম করিছে যারা, জী'তে[৮] সেই মরা ;
সুখ-ভোগ-ক্ষিদা-নিদ্রা তেয়াগিছে তারা ।
কোথায় প্রিয়সী[৯] পাব, এই খেদে রয় ॥

১ ধিকি ধিকি করিয়া ২ প্রেমের ৩ কার্তুজ, গুলি ৪ লুকাইয়া রহিয়াছে ৫ হইয়াছি
৬ মৃত্যুর অধিষ্ঠাতা, যমের ৭ ঘুচিয়া ৮ জীবিত অবস্থায় ৯ প্রেয়সী

কায়েস[১] নামেতে ছিল এ জগতে ;
মজনু আশিক হইলা লায়লীর উপরেতে[২] ।
লোহার শিকল পরে রাজার তনয় ॥

জোলেখা সুন্দরী ইছুফের পিয়ারী—
ধনমান সব দিলা ইছুফের প্রেমে।
হারে, রাজার কুমারী হইয়া সন্ন্যাসিনী হয়।

রাধিকা সুন্দরী কিষ্ণের পিয়ারী—
রাধার প্রেমেতে কিষ্ণ হইলা দণ্ডধারী।
রাজার কুমার হইয়া কুঞ্জবনে রয় ॥

ইয়াছিনে বলে, দেখ ভাই সকলে,
এ চৌদ্দ ভুবন পয়দা প্রেমেরি কারণে ;
তেকারণে স্বর্গভূমি শূন্যেতে ঘুময়[৩] ॥

। ১৭৫ ।

আমরা প্রেম-বাজারে থাকি—
আশিক ছাড়া[৪] পুরুষ-নারী হাবিয়া দুজখী[৫]

আর এস্কে[৬] আল্লা, এস্কে রছুল[৭]
এস্কে আদম খাকি[৮] ;
আদম হইতে হাওয়া[৯] পয়দা
প্রেম-খেলার লাগি'।
—দয়াল, প্রেম-বাজারে থাকি ॥

---

১ 'মজনু'র প্রকৃত নাম ২ মজনু লায়লীব প্রেমে পড়িল ৩ ঘুরে ৪ প্রেমিক ছাড়া
৫ 'হাবিয়া' নামক নরকের অধিবাসী ৬ প্রেমে ৭ ভগবান প্রেরিত পুরুষ, মোহাম্মদ
৮ মাটি নির্মিত নরদেহ ৯ ইভ (?)

আর জলিখা এস্কেতে পাগল
ইউছুফের লাগি' ;
শিরির জন্য ফরহাদ মইল
খসরু হইল পাতকী।
—দয়াল, প্রেম-বাজারে থাকি ॥

আর কুমারে দেখিয়া পাগল
কন্যা চন্দ্রমুখী ;
সুড়ঙ্গ পথে বাহির হইয়া
বেশ ধরিল যোগী[১]।
—দয়াল, প্রেম-বাজারে থাকি ॥

লায়লী আর মজনু পাগল
এক দোঁহার লাগি' ;
জহুরা কান্দিয়া বেড়ায়
বারাম না দেখি'[২]
—দয়াল, প্রেম-বাজারে থাকি ॥

আর গাজী শা' কান্দিয়া ফানা[৩]
চম্পাবতীর লাগি' ;
বাঘ-কুম্ভীর কতো মইল[৪]
পউদ্মা[৫] -গঙ্গা সাক্ষী।
—দয়াল প্রেম-বাজারে থাকি ॥

পাগল আরকুমে বলে,
আশিক জ্বলে, মাশুক পাইলে সুখী ;
মনস্থর শূলিতে চড়ে[৬]
'আনাল-হক্' নাম ডাকি'।
—দয়াল, প্রেম-বাজারে থাকি ॥

---

১ শ্রীহট্ট অঞ্চলের 'চন্দ্রমুখী'র গীতি-কাহিনীর কথা বলা হইতেছে ২ শ্রীহট্ট অঞ্চলে প্রচলিত একটি প্রেমমূলক গীতি-কাহিনীর কথা বলা হইতেছে ৩ ভাবোন্মাদ ৪ মরিল ৫ পদ্মা নদী ৬ শূলে চড়ে

। ১৭৬ ।

সোনার বউ গো,
তোর লাগিয়া হাছন দেওয়ানা[১]

বউ আমার রঙ্গী-চঙ্গী[২]
মজাইল হুঙ্গীর হুঙ্গী[৩] ।
বউর লাগি' হাছন রাজায়
ফিরে কান্দি' কান্দি' ॥

হাছন রাজা, কুমুদ ছাড়ো—
এখন তোমার হুঁশ করো ।
পরকে ছাড়ি' আপন ধরো
নিজ গুণ গাও ॥

। ১৭৭ ।

এগো, সুন্দরী দিদি,
কথা শুনিয়া যাও মোর ॥

সুন্দরী গো,
তোর লাগিয়া মন-প্রাণ জলে ।
তোমার বাড়ী হাছন রাজা
আইসা-যাওয়া[৪] করে ॥

হাছন রাজায় বলে,—দিদি,
মনত[৫] আমার কতো সাধি ;
মন হইয়া যায় বিবাদী—
কেওররে[৬] না মানে ॥

---

১ পাগল ২ সাজ-সজ্জা করিয়া সুন্দর ৩ গালি বিশেষ ৪ আসা-যাওয়া ৫ মনে মনে
৬ কাহাকেও

। ১৭৮ ।

॥ পীর-মুরশিদা ও গুরুর প্রতি ॥

কলিতে ভাব্‌না কিরে মন—
ও মুরশিদের নাম যার হৃদয় গাঁথা[১] ,
ও আল্লার নাম যার হৃদয় গাঁথা ॥

ও আশা-বির্‌ক[২] রোপণ কইলাম গো
ও বির্‌কে ফল যুদি[৩] ধরে, বির্‌কে ফল :
পেম-ফল[৪] ধরিত যুদি গো—
ও তার দিনে বাড়ে[৫] রোপণ-লতা ।

ও দয়াল গুরুচ'ণের[৬] পদে
মোড়াও মাথা ।
ও মুরশিদের নাম যার হৃদয় গাঁথা ॥

। ১৭৯ ।

ও বা' হাদি[৭] আল্লাজী,
ও বা' মুরশিদ আল্লাজী,
আমারে ভাসাইলায় আল্লা ভবসিন্ধুর নীর

ভবসিন্ধুর চাকে পড়ি[৮]'
ঘুরি' ঘুরি' ফিরি ।
উঠিবার সাধ্য নাই
কেমনেতে উঠি ॥

১ হৃদয়ে গাঁথা ২ আশা-বৃক্ষ ৩ যদি ৪ প্রেম-ফল ৫ দিনে দিনে বাড়ে ৬ গুরুচরণের
৭ পথপ্রদর্শক ৮ চক্রে পড়িয়া

হাছন রাজায় বলে—
মুরশিদ, করো তার উপায়
ভবসিন্ধু উদ্ধারিয়া
রাখো রাঙা পায় ॥

। ১৮০ ।

ও আমার জীবন গেল শুদা কারণ[১] —
ভবের জঞ্জালে।
দারুণ বিধি কি লেইখাছে[২] আমার কপালে ॥

কপাল দোষী, দোষমু কারে ;
ও আমি মিছা দোষী কই পরারে[৩] :
আমি দোষী জগত-মাঝারে।
বিধাতায় কইরাছে হীন,—দুখে যায় মোর চিরদিন ॥

ও মিছা ফেরে পড়ি'
দুলভ জনম যায় গো বিফলে।
দারুণ বিধি কি লেইখাছে আমার কপালে ॥

আমি দোষী-অপরাধী,—
জানিয়া কি জানো না বিধি :
পদছায়া দেও গো আমারে।
তুমি দেও পদছায়া, ঘুইচে যাব[৪] মহামায়া
ও আমি আপন সাধে ঠেকছি ফান্দে,—দোষ দিমু কারে ॥

১ অকারণে ২ লিখিয়াছে ৩ পরকে ৪ ঘুচিয়া যাইবে

আউলা পীরের বাউলা দশা—
ও আমার না পূরিল মনের আশা :
আশার আশায় দিন গেল হেলে[1]।
অধম আবজলে বলে,—মুরশিদের চরণতলে—
ও আমি আপন হস্তে মায়ার রছি[2] লাগাইছি গলে॥

। ১৮১ ।

আমি হইয়াছি আসামী গিরিফদার[3] ;
করিলাম কি অপরাধই, সঙ্গে আছইন[4] ছয় বিবাদী,-
আমার খাড়াখাড়।
ও মুরশিদ, বিপদ-সঙ্কটের কালে
আর কারে ডাকিমু খবরদার[5] ॥

উজির-নাজির সঙ্গে লইয়ে,
হৃদয়ের কাছারি গিয়ে,
আমায় রাখিয়ো খাড়াখাড়।
ও মুরশিদ, বিপদ-সঙ্কটের কালে
বাঁচাও মোরে একবার ॥

যা ইচ্ছা তাই করো,
চাই না বিচার অন্যখানে, চরণে তোমার।
সৈয়দ আকিলে বলে—
হাসরের বিচারের কালে[6]
দুহাই[7] নবী মুস্তাফার[8] ॥

১ হেলিয়া, চলিয়া ২ রশি ৩ গ্রেপ্তার ৪ আছেন ৫ খবর রাখে যে ৬ শেষ বিচারের দিনে
৭ দোহাই ৮ হজরত মোহাম্মদের অপর নাম

। ১৮২ ।

রে আপ্‌না রঙ্গ দেখ—
নিজের রঙ্গ বা'র করিয়া নয়ান ভরিয়া দেখ ॥

মনরে, ছিরিকুলায় ফুটছে ফুল
বাইরে আগা, ভিতরে মূল।
তারে চিন' মুরশিদ ভজিয়া ॥

মনরে, যেই দিগেতে উৎপতি
সেই দিগে বাঘের বসতি।
নাচুক[১] লইয়া করো উলা-মেলা[২] ॥

লাইলাহা[৩] পাল্লা[৪] দিয়া, বিছ্‌মিল্লা তার ডাণ্ডা[৫] দিয়া
মুরশিদ পদে করো দোকানদারী।
মনরে, সেই পাল্লাতে উজন[৬] দিয়া
আওনা বেপারী[৭] ॥

হীন আব্দুল আলীয়ে বলে—মুরশিদের চরণতলে
নূর-নবী[৮] গগনের চান্দ।
মনরে, হুকুম না মানিয়া
আবিদ[৯] হইল শয়তান ॥

। ১৮৩ ।

মুরশিদ ধরিয়ো কাণ্ডার—
অবুঝ বালকের নৌকা ডুবিব[১০] তোমার ॥

আর আমার নৌকায় তোমার বেসাত—
ধরছি পাড়ি আমি।
এগো, নৌকা ডুবি' বেসাত গেলে
কলঙ্কিনী তুমি ॥

---

১ ভজুর ২ নাচানাচি ৩ ভগবান ছাড়া অন্য উপাস্য নাই ৪ দাঁড়িপাল্লা ৫ ওজনদণ্ড
৬ ওজন ৭ এখন ব্যবসাদার ৮ আলোকময় ধর্মোপদেষ্টা ৯ ধার্মিক ১০ ডুবিবে

আর আমার নৌকা ভব-সাগরে
তুমি নিজঘর ;
দিল-দুরবীণের আয়না ধরি'
রাখিয়ো নজর ॥

আর ধন্য বাপের বেট যেই
শতগুণ তার।
এগো, বাপের ধনে বেটা মা'জন[১]
রঙপুরের বাজার ॥

আর স্বামীর মাঝে নারীর বেসাত,
নারীর মাঝে স্বামী।
তোমার মাঝে আমি মুরশিদ,
আমার মাঝে তুমি ॥

আর চন্দ্রচড়ির মধুর ভাণ্ডার
ভরিয়া থইছু[২] ঘরে।
এগো, বেপারী দেখিয়া বাঁট নাম
রউক সংসারে ॥

হজরত শাহা আব্দুল লতিফ
নিজের বেসাতি দিয়া—
পাগল আরকুমের নৌকা
দিয়াছইন[৩] ভাসাইয়া ॥

। ১৮৪ ।

এই নদীর শতধার,—
নাও ধরি মুই কি পরকারে।
প্রাণ-নাথ, আমি কিলা[৪] যাই প্রেমের বাজারে ॥

১ মহাজন ২ থুইয়াছ ৩ দিয়াছেন ৪ কি প্রকারে

আর কেহই যায় রে বাদাম তুলে[১]
কেহ যায় রে গুণে ;
কেহই যায় রে লগি ভরে
কেহ দাঁড় টানে।
কেহই যায় রে সার ভাঁটাতে—
কেহ যায় জোয়ারের জোরে ॥

আর কেহই নেয় রে লবণ-মরিচ,
কেহই তামা-সীসা ;
কেহই নেয় রে মুগ-মুসুরি,
কেহই পিতল-কাঁসা।
সকল বেপারী যাইতা[২]
একই আড়াদ্দারের ঘরে ॥

আর কেহই করে নমাজ-রোজা
কেহই গায় রে গান ;
কেহই বাজায় লাউয়া-ডপ্‌কি[৩]
সকল মছলমান।
কার ঠাঁই জিঙ্গাসি[৪] আমি—
তুমি তো সবার অন্তরে ॥

আর যে পাইয়াছে
লীলাখেলা, ভেদ বৃত্তান্ত তোর—
ছাড়িয়া দিছে পউম্মপুরাণ,
হদিছের খবর।
দেওয়ানা হইয়া ফিরে—
মাশুকের ইন্তেজার[৫] ॥

---

১ পাল তুলিয়া ২ যাইতেছে ৩ লাউ দিয়া তৈরি করা গোপীযন্ত্র ৪ জিজ্ঞাসা করি
৫ প্রতীক্ষা

আর পাগল আরকুমে কয়
মুরশিদের ঠাঁই—
ভাঙা নাও, পাসুয়া বৈঠা
কেমনে বাইয়া যাই।
হায়রে, মাশুক ভরসা—
নৌকা ভাসাইয়াছি প্রেম- সায়রে

। ১৮৬ ।

ও মন-মাঝি রে, হাইল[১] রাখিয়ো সাবধানে-
বড়ো ভয় দেখি রে॥

আর ভয় দেখি, তরাস দেখি
নায়ে মাইলাম পাড়া।
আলা-ঢিলা করে নায়[২] —
নায়ে রাইখো[৩] পাড়া॥

আর অকূল সাগরের মাঝে
ভাসিয়া ফিরে ফেনা।
দয়া করি' দীনের নাথে
লওয়াইব কিনারা॥

আর অনিল[৪] পাহাড়ের মাঝে
বানাইয়াছি ঘর।
ভাই নাই, বান্ধব নাই—
কে লইত[৫] খবর॥

১ হাল ২ নৌকা হেলিতেছে, দুলিতেছে ৩ রাখিয়ো ৪ নিরন্ধ্র ৫ লইবে

আর প্রেম-কলে চালাইয়ো নৌকা
দমকলে দাঁড় বাইয়ো।
আগ চরাটে বাদাম দিয়া[১]
রঙ্গের বাজার যাইয়ো ॥

আর রঙ-বাজারের বিকিকিনি
সাবধানে চালাইয়ো।
রঙ্গেতে বেভুল হইয়া
মূল হারাইবায় চাইয়ো ॥

আর কইন তো ফকির পিয়ারা শা'য়
রফি নগর বইয়া—
তন্তর-মন্তর সব ছাড়ো
মুরশিদের দিগে চাইয়া ॥

। ১৮১ ।

সুজন নাইয়া বলি তোরে।
অথির সমদুর[২] নাইয়া পার করি' লও মোরে।

আর গুণারীয়ে[৩] গুণ টানে
গাঙের পারে-পারে ;—
আইতে-যাইতে[৪] দয়াল মুরশিদ
চাইয়া যাইয়ো মোরে ॥

আর গুণারীয়ে গুণ টানে
গায়ে নাই তার বল ;—
মাঝি ভাই ঠেকিয়া রইছইন[৫]
শুকনা বালুচরে ॥

১ নৌকায় সম্মুখভাগে পাল তুলিয়া ২ অস্থির সমুদ্র ৩ যে গুণ টানে ৪ আসিতে-যাইতে
৫ রহিয়াছেন

আর আওরেতে[১] নাইরে পানি
বিল কেনে ঢেউ ;—
পুষ্কণ্ডিতে[২] নাইরে মাছ
কুয়াত কেনে রউ[৩] ॥

আর কইন তো অধম জংলা শা'য়
বসিয়া জৈন্তা পুর—
সকল রইলা মুরশিদ বাড়ী
আমি রইলাম দূরে ॥

। ১৮৮ ।

হারে, কাম-নদীতে ভাসিয়া ফিরি—
বাঁচি আমি কি পর্‌কারে[৪]।
নিল নিল নিলরে যৌবন-জোয়ারে ॥

ডাইনে-বাঁউয়ে[৫] দাঁড় টানিয়া
উজান না যায়।
যৌবন-জোয়ারে তরী ভাসিয়া বেড়ায় ॥

মাঝি আমার হাইল[৬] ধরে না—
নৌকা ঘুরে বিপাকে।
নিল নিল নিলরে যৌবন-জোয়ারে ॥

জলের প্রেমিক মীন হইল—
ভাসিয়া বেড়ায়।
স্থলের প্রেমিক মজ্‌নু[৭] হইল, কান্দিয়া ভর্‌মায় ॥

১ হাওরে, সাগরে ২ পুকুরে ৩ কুয়াতে কেন রুইমাছ ৪ প্রকারে ৫ ডানে বামে ৬ হাল
৭ পারস্য সাহিত্যের বিখ্যাত প্রেমিক। 'মজনু'র আভিধানিক অর্থ হইল—পাগল

কাম-স্বপনে মজিয়া আমার
সেই স্বপন ভাঙিল রে।
নিল নিল নিলরে যৌবন-জোয়ারে ॥

কাম-নদীর জল খাইয়া
হইলাম বড়ো ভোর।
নিশার চোটে[১] হর্দমেতে আঁখি করে ঘোর

এগো, জনম-ভরা জল খাইয়া
না গেল মোর পিয়াস রে।
নিল নিলরে যৌবন-জোয়ারে ॥

পাগল ইছাকে কান্দে—
না পূরিল আশ।
কাম-নদীর জলে আমার না মিটিল পিয়াস ॥

এগো, মারিফতের ভেদ ভাঙিতে[২]
মুরশিদ আমার বয়রী[৩] রে।
নিল নিল নিলরে যৌবন-জোয়ারে ॥

। ১৮৯ ।

আমার বন্ধু তো কঠিন নয় রে—
কঠিন বন্ধের থানা ;
বন্ধু রে, আশমানে উঠে রে চন্দ্র
দেখে সর্বজনা।
তিলেকমাত্র না দেখিলে অভাগী দেওয়ানা[৪] ॥

১ নেশার চোটে ২ ঐশ্বরিক তত্ত্বের সমস্যা সমাধান করিতে ৩ বৈরী ৪ পাগল

বন্ধুরে, পিঞ্জিরার সুয়া পাখী
পাললে পোষ মানে না।
ছয় জনে ছয় দিগে টানে—
কেও তো নয় আপনা ॥

বন্ধু রে, লাহুলিয়া[১] পন্থের মাঝে
বন্ধের নিশানা।
সকলে পাইলা মন্ত্র—
আমি তো পাইলাম না।

বন্ধু রে, গুরু যারে দয়া করে
একে হয় দুনা[২]।
ভক্তিগুণে শিরের কলসী
দিনে দিনে উনা[৩] ॥

। ১৯০ ।

শ্যামের মন জোগাবো কি ধন দিয়া—
গো প্রাণ-সজনি, মন জোগাবো কি ধন দিয়া ॥

আর যে ধনের ধনী ছিলাম—
কাম পানেতে[৪] সব খোয়াইলাম ;
রইলাম কেবল রিপুর বশী হইয়া।
এগো, যে ধন দিলে বন্ধু মিলে
গো সজনি, সে ধন দিলাম না যাচিয়া ॥

১ অনির্দিষ্ট ২ দ্বিগুণ ৩ শূন্য ৪ কামের বশীভূত হইয়

মুরশিদ-পদে দিয়া মন—
শিখ রে সাধন-ভজন ;
লও সার মুরশিদ ভজিয়া ।
এগো, বন্ধু-হারা জী'তে মরা
গো সজনি, তারে পাইমু কি দিয়া ॥

। ১৯১ ।

আমার দিন যায় বেভুলে মজিয়া,—
সই, আমার দিন যায় বেভুলে মজিয়া

আর আন্‌ভুলা[১] রাধা রে মোর,
মনভুলা[২] কানু ঃ
রাধার কোলে রইছইন[৩] কানু—
দিয়া দুই জানু ॥

আর রাধার ঘরে থাকো রে কানু
রাধার কামাই খাইয়া ।
মইওত সঙ্কটের কালে[৪]
রাধারে যাইয়ো চাইয়া ॥

আর রাধার ঘরে থাকো রে কানু
রাধারে বাসো ভিন্[৫] ।
মইওত সঙ্কটের কালে—
রাধারে দিয়ো চিন্ ॥

---

১ মান করিয়া ভুলিয়াছে যে ২ মন ভুলায় যে ৩ রাধার নিকটে রহিয়াছেন ৪ মৃত্যুরূপ সঙ্কটের কালে ৫ পর মনে করো

আর গণাই শা' ফকিয়ে কইন—
দুনিয়াত রইব কিয়া[১]।
ফুল যদি ফুটাইতায় চাও[২]
মুরশিদ ভজ গিয়া ॥

। ১৯২ ।

বন্ধু, আমার নয়নের ধার[৩] গো
কালা, আমার নয়নের ধার ॥

আর পূর্বে দিয়া উঠে চান্দ
ঘর বইয়া[৪] দেখি।
বেহুঁশ হইয়া ঘুমাই'[৫] রইলে
নয়ানে না দেখি গো ॥

আর আগে যদি জানতাম বন্ধুরে
যাইবায় রে ছাড়িয়া—
অভাগিনী না যাইতাম নিন্দে[৬] গো ॥

আর কইন মুরশিদ মজাইদ চান্দে
ধিয়ানে ধিয়ান—
ধিয়ানে আছইন[৭] মুরশিদ
পবনে মিলান ॥

। ১৯৩ ।

দেখা দিয়া কইলায়[৮] মোরে প্রেমের দেওয়ানা[৯]।
হায়রে, রইল দেহার কল্পনা—
দরশন দেও নাথ,—প্রাণ বাঁচে না ॥

১ ক্রিয়া, কাজ ২ ফুটাইতে চাও ৩ অশ্রুধারা ৪ বসিয়া ৫ ঘুমাইয়া ৬ নিদ্রা ৭ আছেন
৮ করিলে ৯ প্রেমের পাগল

আর একদিন গেছিলাম রে বন্ধু,
যমুনার জলে ;
শ্যাম-রূপ দেখিলাম আমি কদম্বের তলে।
ওরে, সে অবধি দুই আঙ্খির জল
বারণ হইল না :
হায়রে, আমার কালিয়ার সোনা ॥

আর বন্ধুয়ার রূপখানি
দিলে থইলাম লেখি'[১] :
মনে হইলে দুই আঙ্খি মুজিয়া রূপ দেখি।
হায়রে, চন্দ্র-সূর্য না হয় তার
রূপের তুলনা :
হায়রে, ও রূপ পাইয়া পাইলাম না ॥

আর রূপ হইতে বাহির হইয়া
রূপে রূপ ধরিত[২] চায় ;
গোকুল নগরে ও রূপ ধুড়িয়া[৩] না পায়।
ওরে, বাতাইয়া দেও মুরশিদ
রূপের নিশানা :
হায়রে, ও রূপের কিরূপ নমুনা ॥

পাগল আরকুমে কয়—
প্রেমেতে মধুর
নাইরে ও তার কুল-কিনারা কাম-সমদুর[৫]।
ওরে, যে পড়িয়াছে—ভাসিয়া গেছে
হইছে দেওয়ানা :
নাইরে ও তার জাতের ঠিকানা ॥

১ লিখিয়া রাখিলাম ২ ধরিতে ৩ খুঁজিয়া ৪ কামসমুদ্র

। ১৯৪ ।

ওরে মন, তুমি নিতাই চান্দের সঙ্গ ধরো
যদি প্রেমের বাজার করো[১] ॥

আর প্রেমের বাজারের প্রেমের জিনিস
যদি খরিদ করো ।
ভক্ত-সনে ভক্তি ক'রে
মুরশিদের চরণ ধরো ॥

আর সোনাপুরে রূপ-কলসী
ত্বরাত্বরি[২] ভরো ।
ওরে, যৈবন তোর গইয়া গেলে—
মিছা ভবের আশা করো ॥

আর দারুণ কোকিলার রবে
তনু জরো-জরো ।
ওরে, রঙ্গে-রসে দিরমীণ ধরি'[৩]
তিপুর্ণ্যিতে ধিয়ান করো ॥

অধম আফজলে বলে
কালিয়া বাঁশীর সুরে :
ওরে, জ্বালা দিল মোরে কালিয়া—
ভাবিয়া হইলাম বেকরার[৪] ॥

। ১৯৫ ।

ও তোমার গুরু বর্তমান,
জানো না ভক্তির সন্ধান ।
তাই তুমি কর অনু[৫] উপায় ॥

---

১ করিবে ২ তাড়াতাড়ি ৩ দুরবীণ ধরিয়া ৪ অস্থির ৫ অন্ত

আর গুরু-গোঁসাই ক্ষেতে নি যাইতে
দিলা একখান ছেনি[১] হাতে।
আমি গেলাম ধান নিদাইতে[২]
নিড়াইলাম ঘাস।

এম্‌নি লোকে ডাক দি'[৩] বলে—
ওয়রে[৪] মূর্খ, কি কাম কইলে ;
ধান থইয়া[৫] তুই ঘাস নিড়াইলে—
ঘাস খাইয়া কি বাঁচবে রে প্রাণ ?

আর ইল্‌শা মাছ বিলে থাকে ?
কাঁঠাল কি কিলাইলে পাকে ?
মধু হয় না বোলার[৬] চাকে।
জানো না সন্ধান ॥

আর অধম বিপিনে বলে,
ওয়রে মূর্খ, কি কাম কইলে ?
আমন ক্ষেতে আউশ মুড়াইলে[৭]
পাবে নি রে ধান ?

যুদি ক্ষেত টাঙ্গাইয়া পলে[৮]
লাভে-মূলে সব আরাইলে[৯] ;
আর নি রে তুই বীচ[১০] পাইবে—
ভাঙলে মাথা দিয়ে পাষাণ ?

। ১৯৬ ।

মনের দুঃখ রইল মনে—
এই দেশে দইরদী[১১] নাই।
সই সই, বন্ধু রে যদি পাই ॥

---

১ কাস্তে ২ নিড়াইতে ৩ দিয়া ৪ ওরে ৫ থুইয়া ৬ বোলতার ৭ রোপণ করিলে
৮ ফসল না হয় ৯ হারাইলে ১০ বীজ ১১ দরদী

সই গো সই, তোমার পিরিতের জন্যে
জইলে[১] হইলাম ভস্ম-ছাই।
আনরে কাটারি-ছুরী—
বুক চিরি' তোমায় দেখাই ॥

সই গো সই, জন্মিয়া কেনে মইলাম না রে
বেঁচে আর স্বার্থ নাই।
ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাই অন্তরে—
চক্ষে আর নিদ্রা নাই ॥

সই গো সই, তোমার পিরিতের জন্যে
ছাড়িলাম রে বাপ-মাই[২]।
আমি ডাকি প্রাণ-বন্ধু—
বন্ধের বুঝি দয়া নাই ॥

সই গো সই, ভাইবে রাধারমণ বলে—
এই দেশে দইরদী নাই।
অন্তিমকালে দয়ার গুরু
চরণ-তলে দিয়ো ঠাঁই ॥

। ১৯৭ ।

চল্ রে মন সাধুর বাজারে—
সাধুর সঙ্গ করলে পাবে অমূল্য বন্ধুরে ॥

হেলায় জনম গেল, গনার দিন ফুরাইল—
বেলা তোর ডুবিয়ে এল,
বসি' এ ভবের ঘোরে ॥

১ জ্বলিয়া ২ বাপ-মা

সাধু সবে আশকদার[১], গুরুর পদে মতি তার—
সাধু কৃপা হলে পরে
গুরু সদয় হবে মোরে ॥

চিন' রে মুরশিদ-ধন, দিন গেল রে আকারণ—
গুরু বিনা নিদান কালে
কে শুধাবে মোরে ॥

অধীন পাঞ্জ কেঁদে বলে, দিন গেল রে হায়রে চলে—
গুরুর পদে মতি আমার
কবে হবে হায় রে ॥

। ১৯৮ ।

পন্থ চিন' নি রে, হায় রে মনা,
ভবের জনম বেরথা গেলে
মনা, আর আসব[২] না ॥

আর সাধুর সনে পন্থ লইয়া
পন্থের করো দিশা।
হারিলে[৩] পুণ্যির পন্থ—পাইবার নাই তোর আশা

পন্থীর সনে পন্থ লইয়া
পন্থের করো মেলা[৪]।
ডাকাতির সনে পন্থ লইলে ডুবায় দুই প'র বেলা ॥

কালা-লীলা দুই রে পন্থ
লাগিয়াছে ঘাটা[৫]।
বুঝিয়া চলিয়ো পন্থ—উপরে বিজুলিয়ার ছাটা[৬] ॥

---

১ প্রেমিক ২ আসিবে ৩ হারাইলে ৪ যাত্রা ৫ বিমূঢ় অবস্থা ৬ বিদ্যুতের ছটা

সুজন সুমতি ভাইরে
পাগ্‌লা নদীর খেওয়া।
দড় মুইটে[১] ধরিয়ো কাণ্ডার—চালাইয়ো হাওয়া ॥

আর লাহুল[২] দরিয়ার খেওয়া
না পাইলাম তার কূল—
কয় ফকির ভেলা শা'য়—ডুবাইলাম লাভ-মূল ॥

। ১৯৯ ।

॥ দেহতত্ত্ব ॥

দেখ্‌ চাইয়া তোর দেহার মাঝে—
লাগ্‌ছে রসের চিকি[৩]।
পিঞ্জিরা তুই খরিদ কর, পাখি ॥

পিঞ্জিরা বানাইছে যারা—
পাখী খরিদ করছে তারা;
দাম কিছু না রাখছে বাকী ॥

আব-আতস-খাক-বাদে[৪] —
পিঞ্জিরা বানাইছে সাধে;
সেই পিঞ্জিরায় সুয়া করছে বন্দী

সেই সুয়ার বুলিখিনি[৫] —
শুনতে হয়—মধুর বাণী;
শুনলে হবে জনমের সুখী ॥

---

১ দৃঢ় মুষ্টিতে ২ অলীক, অসীম ৩ আভাস, চকমকি ৪ জল, আগুন, মাটি ও বাতাস দিয়া। মুসলমান মতে এই চারি ভূতেই মনুষ্যদেহ গঠিত ৫ বুলিখানি

পাগল আরকুমে কয়—
পাখী খরিদ করতে হয় ;
দাম কিছু না রাখিয়ো বাকী ॥

দাম তার জান-মাল[১] —
পালিয়ো পাখী চিরকাল ;
আশিকের[২] হাত্তে পাখী আসব ডাকি' ডাকি' ॥

। ২০০ ।

ওরে, মন-পাখীরে পড়াও ধইরে—
ছুট্‌লে না আসিব ঘরে,
ছুট্‌লে না আসিব ঘরে ॥

আর গুরুর মন্ত্র শিখ্‌ছে যারা—
পাখী ধরা জানে তারা।
আয় গো, মন্ত্রহারা যায় না ধরা—
ডাকলে ময়না চায়না ফিরে ॥

একতনে পাঞ্জতন কইরে[৩]
চৌদ্দ ইলিম[৪] পড়ে ভাইরে।
আয়গো ইল্‌মির কোঠায় তালা মাইরে—
কুঞ্জি[৫] দিছে মন-পাখীরে ॥

---

১ প্রাণ ও ধন ২ প্রেমিকের ৩ মহম্মদ, আলি, ফতিমা, হাসান ও হোসেনকে এক দেহে অনুভব করিয়া ৪ বিদ্যা। স্বর্গ ও মর্তের সাতটি করিয়া চৌদ্দটি স্তরের জ্ঞান। অথবা, ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্গলোক, জনলোক, তপোলোক, ব্রহ্মলোক, সত্যলোক, অতল, বিতল, সুতল, তল, তলাতল, রসাতল, পাতাল—এই চৌদ্দলোক ৫ চাবি

আর বে-জিকিরে[১] পাখী চরে
ইব্লিছে[২] তালিম করে।
আয় গো, তেকারণে নক্সা ধরে
দাল, ওয়াও, ঝে, খে[৩] ললাট 'পরে ॥

ময়মনসিংহ ত্যজ্য করে—
সিলট শ'রে রাজাপুরে—
চন্দ রোজ এক ঠিকানায় কাছিম শা'য় ধরে ॥

। ২০১ ।

কাম করো রে ভাই, কাম রহিল বাকী—
কোন্‌দিন উড়িয়া যাইবা পিঞ্জিরার পাখী ॥

আর কার কাজে আইছ[৪] রে ভাই,
কার বায় রইলায় চাইয়া[৫]।
হিসাব করি' চাইয়া দেখ—
দিন তো যায় গইয়া ॥

পিঞ্জিরার মাঝে পাখী রইয়াছে বসিয়া—
দড়ি-পাগা[৬] নাই পাখী রাখিতায় বান্ধিয়া[৭] ॥

। ২০২ ।

সোনার ময়না ঘরে থইয়া[৮]
বাইরে তালা লাগাইছে।
রসিক আমার মন-বানিয়ায়[৯]
পিঞ্জরা বানাইছে ॥

১ ভগবানের নাম না লইয়া ২ শয়তানিতে। ইবলীস শয়তানের নাম ৩ নরক ৪ আসিয়াছ
৫ কাহার দিকে চাহিয়া রহিলে ৬ রশি ৭ দড়ি নাই যে পাখীকে বাঁধিয়া রাখিবে
৮ থুইয়া ৯ মনরূপ বানিয়া

পিঞ্জরার তিন রকমের কল[১] :
তার মাঝে ভরিয়া থইছে মিঠা পানির জল।
সেই জল খাইয়া ময়না 'রাধাকৃষ্ণ' বল্‌তেছে॥

মনার[২] ষোল্ল পাটের নাও[৩] :
আগে-করে[৪] ছয় জন মাঝি, জলদি বাইয়া যাও।
মাঝে বইয়া হরিদাসে হারি কইয়া চল্‌তেছে[৫]॥

। ২০৩ ।

ও ভাই, মুরশিদ ভজো রে,
ঠিক হবে তোর ঘর—
আল্লা, ঠিক হবে তোর ঘর।
ওরে, নয় দরজা বন্ধ করিয়া দম সাধন কর॥

ভাই রে ভাই,
হাওয়ায় পাতা, হাওয়ায় গাছ,
হাওয়ায় ফুটে ফুল।
ওরে, সেই ফুল চিনিতে পারইন[৬]
মোহাম্মদ-রছুল॥

ভাইরে ভাই,
কি আচানক[৭] আজব লীলা
পাতিয়াছইন[৮] মাবুদ[৯]।
হায়রে, পানি দিয়া গড়িয়াছইন[১০]
সুন্দর অজুদ[১১]॥

১ ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না। প্রবর্ত, সাধক, সিদ্ধ। আলিফ, লাম, মিম। স্বর, ব্যঞ্জন, যুক্তবর্ণ, —বিভিন্ন ভাবে ইহার অর্থ করা যায় ২ মনের ৩ পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় এবং ছয়টি রিপু মিলিয়া ষোলো ৪ আগে-পিছে ৫ 'সারি' গান গাহিয়া চলিতেছে ৬ পারেন ৭ আশ্চর্যজনক ৮ পাতিয়াছেন ৯ উপাস্য, ভগবান ১০ গড়িয়াছেন ১১ দেহ, অস্তিত্ব

ভাই রে ভাই,
অধীন চৈতন্যে কইন[১]
ঘাটের কূলে বইয়া :
হায়রে, পারইতাম-পারইতাম করি'
দিন তো গেল গইয়া ॥

।২০৪।

একটি ফুলের তিনটি রসে আদম-শহর[২]
সিং দরজা খুলিয়া রাখলে লুছ্‌কা[৩] কি সুন্দর

দশটি জিল্লা[৪] নয়টি থানা[৫]
আরো চৌদ্দ জেলখানা[৬]—
চাইর কাচারি[৭] আটনম্বরে[৮] রাখনি খবর

১ কহেন ২ মনুষ্যরূপী শহব। ঈশ্বব (আল্লা) তাঁহাব জ্যোতি বা 'নূব' দিয়া তাঁহাব প্রতিষ্ঠা-ভূমি দেহরূপ মক্কা নির্মাণ কবিয়াছেন। সেই মহাজ্যোতির্ময় সত্তাব চাবিদিকে চারিজন 'ইমাম' বসিয়া আছেন : ইমাম আবু হানিফা, ইমাম সাফী, ইমাম মালিক, ইমাম ইবনে হাম্বল। এই চাবিজন ইমামেব জ্যোতিঃসত্তা চারিটি রঙ বা ফুলের ন্যায় : ছিয়া (কালো) সফেদ (সাদা), লাল এবং জবদ (হলুদ)। কাজেই এখানে 'তিনটি' রস কেন বলা হইল তাহা বোঝা যাইতেছে না। 'তিনে'র ব্যাখ্যা অন্য রূপ ৩ (?) দেহ-মক্কাব সাতটি স্তর বহিয়াছে যাহার উপর হইতে নীচ পর্যন্ত একটি অলৌকিক শব্দ হইতেছে। এই দেহেবই সিংহদুয়াবে একজন বিনিদ্র প্রহরী আছেন—জেব্রিল। জেব্রিল মোহাম্মদের নিকট আল্লার বাণী বহন করিয়া আনিতেন। মনে হয়, এখানে সেই জেব্রিলের কথা বলা হইতেছে ৪ দশটি জিলা। মনে হয়,—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয ; এবং হস্ত, পদ, গুহ্য, লিঙ্গ ও বাক্য—এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের সমাহার। 'মণিপুব চক্রে'র 'দশম দলেব' সহিত ইহাব যোগাযোগ নাই বলিয়াই মনে হয় ৫ বহু গানে দেহের নয়টি দ্বারেব কথা উল্লিখিত হইয়াছে। হিন্দু যোগশাস্ত্রে পাই দেহের একাদশটি দ্বাব : দুই চোখ, দুই কান, দুই নাক, মুখ, নাভি, মূত্র ও মলদ্বার এবং ব্রহ্মরন্ধ্র। মনে হয়, এখানে এবং অন্যত্র নাভি ও ব্রহ্মবন্ধ্রকে বাদ দিয়া, 'নয়' করা হইয়াছে। হিন্দু যোগশাস্ত্রে দেহের মধ্যে নয়টি গ্রহকে কল্পনা করা হইয়াছে : নাদচক্রে সূর্য, বিন্দু চক্রে চন্দ্র, চক্ষুতে মঙ্গল, হৃদয়ে বুধ, উদরে বৃহস্পতি, শুক্রে শুক্র, নাভি চক্রে শনি, মুখে রাহু এবং পদ ও নাভিতে কেতু। নবগ্রহের সহিত এই নয়ের যোগ না থাকাই সম্ভব। হয়তো ইহা শ্রীহট্টের বাউল-ফকিরদের নিজস্ব বা আঞ্চলিক একটি ধারণা মাত্র ৬ সপ্তপাতাল ও সপ্তলোকের সমাহার। দেহের মধ্যস্থিত চতুর্দশ স্থানে চতুর্দশমঞ্জরীব প্রসঙ্গ এখানে আনা হয় নাই বলিয়াই মনে হয় ৭ চারি মকাম : আলম-ই-লাহুত, আলম-ই-জবরুত, আলম-ই-মলকুত, আলম-ই-নাছুত। আলম-ই-হাউত-কে বাদ দেওয়া হইয়াছে

ষোল্ল জনে[1] দেয় পাহারা,
চারিজনে[2] শহর বেড়া—
সদরেতে এক সিরিস্তা[3] , মুরশিদের শহর ॥

দুনিয়া স্বপনের ঘোর,
ভাই-বন্ধু সকলি পর—
মন-কানাইয়ে বাজায় বাঁশী জঙ্গলের ভিত্তর।

কোরান-হদিছ পড়ো ভাই,
আপন ঘরের খবর নাই—
তত্ত্ব জাইনে মত্ত হইয়ে মরার আগে মরো

আব্দুল্লা ও দীনহীন,
আপন খোদা, আপ্‌নে চিন—
না চিনিলে নবীর দিন উপায় কিরে তোর।

। ২০৫ ।

ওরে, আজবলীলা রঙমহলে হয় কলেব গান
মনরে, আহা আহা, মরি মরি—
কি আচানক[4] ইন্দ্রপুরী ॥

৮ অপর একটি গানে মিলিয়াছে "আষ্ট আঙ্গুলা মানুষ"। আর একটি গানে আছে "মায়ের চারি বাপের চারি···"। চারে চারে আট। আব, আতস, খাক ও বাদে মানুষ তৈরী। মানুষ বলিতে নর ও নারী (বা আল্লা-রসুল বা মুরীদ-মুরশিদ) হইলে চারে চারে আট হয়। নতুবা, অষ্টম ইন্দু, অষ্টদল পদ্ম, অষ্টসিদ্ধি, অষ্ট পাশ—ইহাদের সহিত ইহার কোনো যোগ নাই।

১ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং ছয় রিপু ২ আব, আতস, খাক, বাদ। অথবা, চারি ইমাম ৩ মুরশিদ, আল্লা ৪ আশ্চর্যজনক

ইন্দ্রপুরের বালামখানা[১]—খিড়কিকাটা নয় নিশানা[২]।
হাওয়ার ভরে তিনটি ঘরে[৩]—
ছিরিকুলায়[৪] বাজে ঢোল॥

কি আচানক ইন্দ্রপুরে—বাঁশী বাজায় নানান সুরে।
নানান সুরে বাজায় বাঁশী—
কে করেছে এ সন্ধান॥

মনরে, সাধু-সন্ত মহাজনে—আনন্দে বসিয়া শুনে।
আনন্দে বসিয়া শুনে—
করতে আছে রূপ ধিয়ান॥

শুন, সেই বাগানের কথা বলি—ইন্দ্রপুরে ছয়জন মালী[৫]।
লক্ষ লক্ষ পুষ্পকলি—
ভ্রমর করে মধুপান॥

ছয় ভাই চৈতন্যে হাটে—ঢোল বাজে, নাগেড়া বাজে[৬]।
পাঞ্চরকম বাজনা বাজে[৭]—
চতুর্দিগে ফুল বাগান[৮]॥

১ প্রাসাদ ২ দ্রঃ ২০৪-সংখ্যক গান। উহাব পাদটীকায এ বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে ৩ অন্যত্র পাইতেছি "এক প্রেমে তিন জন বান্ধা"। "তিন রকমের কল"। "তিন ঠাকুরের মেল"। "তিন অক্ষরে মিল করিয়া"। এই 'তিন' বিভিন্ন পরিবেশের হইতে পারে: আলিফ, লাম, মিম। অন্তুতত্ত্ব, পরতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব। ইড়া, পিঙ্গলা সুষুম্না। প্রবর্ত্ত, সাধক ও সিদ্ধি—সাধকের এই তিনটি স্তর ৪ শ্রীকূলায়। শ্রীকুলা, আচানক ইন্দ্রপুরী কিংবা 'আজবলীলা রঙমহল' প্রভৃতি বলিতে পরমতত্ত্বের দেহস্থিত আবাসস্থলকে নির্দেশ করা হইতেছে ৫ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য এই ছয় রিপু ৬ নাকাড়া বাজে ৭ পাঁচ এখানে কথার কথা বলিয়াই মনে হয়। এখানে পঞ্চরস, পঞ্চ ইন্দ্রিয, পঞ্চ বিধা মুক্তি, কিংবা মোহাম্মদ, আলি, ফতিমা, হাসান ও হোসেন—এই পাঁচ জনের প্রসঙ্গ নাই ৮ এই চারি দিকের ফুল-ও চারি ইমামের প্রতিরূপ চারি বর্ণের ফুল নয়। দ্রঃ ২০৪-সংখ্যক গান

। ২০৬ ।

দেখ্ চাইয়া তোর দেহার মাঝে
বাজেকরের[১] খেলা।
দমের কল নবী কুঞ্জে গেলা ॥

সই গো সই, দম-সুয়ারী[২] রূপের ঘরে
দুই ধারে দুই খেলা করে—
দিবানিশি আইসা-যাওয়া করে।
ধর্‌ধরার ভেদ[৩] পাইছে যে জন—
সে হইছে গুরুর চেলা ॥

কোন্ রূপেতে হয় কোরান
কোন্ রূপেতে হয় মুমিন—
কোন্ রূপেতে কাফির[৪] —শয়তান।
কোন্ রূপেতে আশিক-মাশুক[৫] —
বসিয়া করে খেলা ॥

হকির[৬] কাছিমের বাণী
আল্লা-রছুল এক জানি—
এক না হইলে কেমনে দুনিয়া রয়।
এক-দুইয়ে মিলন করি', ভবনদী যাবে তরি'—
চাইয়া দেখ্,—তোর এই দেহাতে রইছে দুইয়ের মেলা ॥

। ২০৭ ।

বারই[৭], কই লুকাইলায়[৮] রে—
ঘরখিনি[৯] বানাইয়া বারই, কই লুকাইলায় রে ॥

---

১ বাজীকরের ২ পরমতত্ত্ব ৩ রহস্যের চাবিকাঠি ৪ অবিশ্বাসী ৫ প্রেমিক-প্রেমিকা
৬ ফকির ৭ প্রিয়বর ৮ কোথায় লুকাইলে ৯ ঘরখানি

আর বরুয়া বাঁশের[১] ঘরখিনি
মাকাল বাঁশের[১] আড়া।
এগো, তলু বাঁশ[১] দি' দিয়াছ
চতুর্দিকে বেড়া ॥

আর উলুছন[২] দি' দিয়াছ
ওই ঘরে ছানি[৩]।
এগো, মেঘ আনিলে চুয়াই' চুয়াই'[৪]
পড়ে ঘরে পানি ॥

সকল ঘর বিচারি' দেখি—
টুল্লিয়ে[৫] দুয়ার।
সেইখানে বসিয়া আছইন[৬]
বন্ধুয়া আমার ॥

আর বন্ধুরে দেখিয়া আমার
চিত্ত বেয়াকুল।
হাছন রাজায় গান গায়—
বাজাইয়া ঢুল[৭] ॥

। ২০৮ ।

ভাবিয়া দেখ্ তোর মনে—
মাটির সারিন্দা[৮] রে তোর বাজায় কোন্ জনে

আর আষ্ট আঙ্গুলা মানুষ রে,
তার ষোল্ল আঙ্গুলা বুঝ[৯]।
হাওয়ার ইঞ্জিল[১০] ঠাট করিয়া
দৌড়ায় পর্তি রোজ[১১] রে ॥

১ বাঁশ বিশেষ ২ উলুখড় ৩ ছাউনি ৪ চুয়াইয়া চুয়াইয়া ৫ ঘরের চালে ; মটকায়
৬ আছেন ৭ ঢোল ৮ বাদ্যযন্ত্র বিশেষ ৯ বুদ্ধি ১০ ইঞ্জিন ১১ প্রতিদিন

আর বেঙে নি অভিষ করে[১]
মাটির তলে বইয়া।
আদমে[২] তাড়না করইন[৩] —
ওই দুনিয়ার লাগিয়া রে

। ২০৯ ।

আমার মন খেলিয়াছে কি খেলা
ভবের খেলা সাঙ্গ হল ;
ওই দেখ বেলা ডুইবে গেল—
নয়-বারো-আঠারো-ষোলো[৪]।
যুগে যুগে মিছা লো ভাব,
ভবের খেলা সাঙ্গ হল ॥

---

১ হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করে ২ মানুষ ৩ করেন
৪ 'নয়' এবং 'ষোলো' সংখ্যাব ব্যাখ্যাব জন্য ২০৪-সংখ্যক গান দ্রষ্টব্য। শ্রীহট্টেব বাউল-ফকিরগণ দেহের মধ্যে আঠাবোটি মোকামেব কল্পনা কবিয়াছেন এবং উহাব ব্যাখ্যাতে বলিয়াছেন, "মায়ের চাবি, বাপেব চাবি, আল্লার দেওয়া দশ"—সং ২১০। মানুষ বলিতে যদি নর-নাবীর মিলিত সত্তা বুঝাইয়া থাকে, তবে আব, আতস, খাক ও বাদ—এই চাবটি উপাদানের সমাহাবে নব-নাবীব মিলিত সত্তায় চাব-চাব করিয়া আটটি উপাদান পাই। এই আটটিব সহিত আল্লাব নিকট হইতে পাওয়া দশটি গুণ বা সত্তা মিলিয়া আঠাবো হয়। এই 'দশ' হইল ইন্দ্রিয়,—পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় (তুলনীয় "দশ ইন্দ্রিয় ছয়জন মাঝি"—সং ২১৯)। এ প্রসঙ্গে নীচের স্তবকটি পঠিতব্য :

পরুষ-রমণীর খেলায় দুইয়েব আটখানি
তাতে বন্ধে দশ মিশাইয়া
ঘব কইল রুশনি ॥—সং ২৩২

ডাক্তার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁহার "বাঙলার বাউল ও বাউল গান" (১৩৬৪) নামক গ্রন্থে 'আঠাবো'-র ব্যাখ্যা অন্য প্রকাব করিয়াছেন : "সপ্তস্বর্গ, সপ্তপাতাল এবং নাছুত, মালকুত (মলকুত), জবরুত ও লাহুত—এই চারি মোকামকে ধরিয়া বোধ হয় মুসলমান বাউলরা আঠারো মোকাম বলিয়াছে।"—দ্বিতীয়খণ্ড, পৃঃ ৪৭৬। 'বারো' সংখ্যাটির তাৎপর্য বোঝা যাইতেছে না। ইহার সহিত বারো মাসের বারোটি 'অমাবস্যা' এবং সেই অমাবস্যায় করণীয় কাজের যোগ থাকিতে পাবে। অথবা, ইহার আব একটি ব্যাখ্যা এই হইতে পারে : একটি গানে পাইতেছি "চাইরি পাতা কালা-ধলা—বারো ডাল তার দেখতে ভালা"—সং ২৮৭। এই চারি পাতা নিশ্চয়ই চারি ইমামের প্রতিরূপ সাদা-কালো-লাল-জরদ চারটী বর্ণ। হিন্দুতন্ত্রে দেহের মধ্যে ছয়টী চক্রকে কল্পনা করা হইয়াছে, চক্রগুলি পদ্ম-রূপ। শ্রীহট্টের বাউলেরা কেবল পরমতত্ত্বের স্থানেই একটী ফুলের কল্পনা করিয়াছেন।

যখন পেকে ঘরে এলো
ফস্ করি' প্রাণ জুড়ি' প'ল ;
খেল্‌তে এলাম ভবে খেলায়—
দাঁত পড়েছে কর্মদশায়।
কার সাথে মন করবি গুসা[১] ,
আজগুবি তার কাছে বলো।

। ২১০ ।

মায়া-নদী কার জোরে তরি'[২]
বা' দয়াল নবীজী ॥

মাই-বাপে[৩] বাতাইয়া দিলা
উস্তাদ[৪] প্রাণের ধন।
উস্তাদে বাতাইয়া দিলা—
মুরশিদ প্রাণের ধন ॥

এই পুষ্প-বৃক্ষের বারোটি ডাল রহিয়াছে। "একটী ফুলের তিনটী রসে আদম শহর"—সং ২০৪। এই 'ফুল' যদি 'আল্লা' হয় তাহা হইলে 'চাবি' ইমামেব 'তিনটী রসে' বাবো হয়। মনে হয়, বারো বলিতে চারি ইমামের মিলিত সত্তাকে বোঝানো হইয়াছে। আবার, শিয়াগণের মতে—বারোজন 'ইমাম'-ও হইতে পারেন। জাতকের জন্যে ইসলাম শাস্ত্রে বারোটি বুরুজ (অর্থাৎ রাশি-র)-এর কল্পনা করা হইয়াছে। যথা, ১ হামল্ বুরুজ—মেষ রাশি, বৈশাখমাস ২ সুর্ বুরুজ—বৃষ রাশি, জ্যৈষ্ঠমাস ৩ জোযা্যা বুরুজ—মিথুন রাশি, আষাঢ় মাস ৪ সারতান্ বুরুজ—কর্কট রাশি, শ্রাবণমাস ৫ আসাদ্ বুরুজ—সিংহ রাশি, ভাদ্রমাস ৬ সাম্বল বুরুজ—কন্যারাশি, আশ্বিনমাস ৭ মিজান বুরুজ—তুলা রাশি, কার্তিক মাস ৮ আকবর বুরুজ—বৃশ্চিকরাশি, অগ্রহায়ণ মাস ৯ কত্তস্ বুরুজ—ধনু রাশি, পৌষ-মাস ১০ জাদ্দি বুরুজ—মকর রাশি, মাঘ মাস ১১ দেল্‌ব বুরুজ—কুম্ভরাশি, ফাল্গুন মাস ১২ হুত্ বুরুজ—মীন রাশি, চৈত্র মাস। এই বারো বুরুজের কথাও বর্ত্তমান সঙ্কলনের একটী গানে উল্লিখিত হইয়াছে।

১ গোসা ২ পার হই ৩ মা-বাপে ৪ শিক্ষক

মায়ের চারি, বাপের চারি,
আল্লার দেওয়া দশ।
আঠারো মুকামের[১] মাঝে
ফিরে মায়া-রস ॥

হাছন হইলা মক্কার খদিম[২] —
হুছন বড়ো পীর।
জহুদের[৩] লাগিয়া তাইন[৪]
আগে দিলা ছির[৫] ॥

। ২১১ ।

ও দুখ রহিল অন্তরে—
ফিরিতি[৬] বাড়াইয়া বন্ধে[৭] ছাড়িয়া গেল মোরে।

আর এস্কের[৮] বেমারি যার
ঘোর থাকে তার দিলে[৯]।
এগো, ফুকারিয়া কয়না ওযে
কয়না লোকের ডরে ॥

আর প্রেমের বেমারি যার
ধরিয়াছে মনে—
শরমভরম ত্যজ্য করে
মাশুক[১০] রাখে উরে[১১] ॥

দেহার মাঝে ছয়টি রিপু
থাকে আমার সঙ্গে।
ননদিনী কালসাপিনী—
ধর্ম নষ্ট করে ॥

১ কোঠার ২ সেবক ৩ পাষণ্ডের ৪ তিনি ৫ শির ৬ পিরিতি ৭ বন্ধু ৮ প্রেমের
৯ মনে ১০ প্রেমাস্পদ ১১ বুকে

ছাবাল[১] আকবর আলীয়ে বলে—
যার লাগিয়ে ঝুরে[২] —
পাগল-মস্তান[৩] হইয়া
দেশে দেশে ফিরে ॥

। ২১২ ।

আমি দাসী, হইছি দোষী,
ধরিয়া নৌকা প্রেম-নদীতে—
অধীন জানি' তরাও নাথ, কৃপাগুণেতে ॥

আর হীরালাল-মাণিকের ভরা
তুলিয়া আমার নায়—
ভাসাইয়া দিলায় রে বন্ধু, বিছ-দরিয়ায়[৪] ।
ওরে, বাদামে বাতাস ধরে না[৫]
হাইল মানে না ছুকানেতে[৬] ॥

আর মধ্যে মধ্যে চরা
নদীর নাহি চিনি ধার—
ডুব্‌লে ভরা, যাইব মারা—বেসাত আমার।
ওরে, কলঙ্কিনী নামটি আমার
রইব রে তোর এ জগতে ॥

আর দাঁড়ী-মাঝি-লোক-জন
চলিয়া যাইবা ঘরে—
চাইর তক্তার নাওখান আমার পড়ব বালুচরে।
ওরে, পেরাগ-পাতাম-বাকা-গুছা[৭]
ঝরিয়া যাইব সেখানেতে ॥

১ শিশু। আধ্যাত্মিক জগতে পদকর্তা নিতান্ত বালক—ইহা ব্যক্ত করা হইয়াছে ২ কাঁদে
৩ উন্মাদ ৪ মাঝ সমুদ্রে ৫ পালে বাতাস লাগে না ৬ হালের কাঁটায় হাল মানে না
৭ নৌকার ভিন্ন-ভিন্ন অংশের নাম; আব, অতাস, থাক ও বাদ

আর খাক[১] যাইব খাকে মিশি'
আব[২] যাইব তার সনে—
আতস[৩] যাইব বাজের[৪] সঙ্গে উড়িয়া গগনে।
হায়রে, আমাব যে চালান-চৌথা
রইব রে মা'জনের[৫] হাতে ॥

পাগল আরকুমে বলে,
দেশে গেলে ফিরিয়া আইমু না—
আমি আইলাম, আমি রইলাম, আমি চিনলাম না।
হায়রে, আমি যদি চিনতাম আমি
মিশিয়া যাইতাম জাতের সাথে ॥

। ২১৩ ।

প্রেম-নদীতে ঢেউ ছুটিল,—
রে পাষাণ মন, 'হরি' বলো ॥

মহাজনের রত্ন-ভরা ঘাটে
নৌকা বান্ধা ছিল।
নদীর পার ভাঙিল, ঢেউ ছুটিল,—
মিছ্‌রি-দানা ভাসিয়া গেল ॥

একই ঘরে নয় দরজা
উন্দুরে[৬] আসি' পরবাস কইল।
হায়রে, কোন্ দেশের বিলাই আসি'—
মায়ার উন্দুরা ধরিয়া খাইল ॥

---

১ মাটি ২ মেঘ ৩ আগুন ৪ বাতাসের ৫ মহাজনের ৬ ইঁদুরে। পরমতত্ত্ব এখানে ইঁদুর এবং ছয়রিপু বিড়াল

বাড়ীর পিছে চাইর কিয়ার জমিন[1]
বন্ধে আসি' খরিদ কইল।
জমিন আবাদ হইল, পতিত রইল—
ছয় বলদে চরিয়া খাইল ॥

। ২১৪ ।

ছাড়িয়া দে তোর ভবের আশা
তিন ঠাকুরের মেল[2]।
এগো, গাউনি দিতে-দিতে
ভবের বাজার ভাঙ্গি' গেল রে ॥

আর মন-পবন কাষ্ঠের নৌকা
বারো লগির বান্ধ।
এগো, তাতে ছাপি' রইছইন[3] —
আমার ঠাকুর কালাচান্দ ॥

আর আগ-পাতালে নাওখিনি[4]
ময়ূরায় ছওয়ারী।
এগো, ডাইনা-বাঁউয়া[5] ছয়জন মাঝি—
বলরাম গুণারী[6] রে ॥

আর মাঝ-গাঙে না বাইয়ো নৌকা
রাখিয়ো কিনারায়।
এগো, আফালে[7] ডুবাইব সাউদের[8] —
মাণিকের ভরা রে ॥

---

১ শ্রীহট্ট জেলায় সওয়া এক বিঘা পরিমাণ জমিকে এক 'কেদার' বলে। 'কিয়ার' 'কেদার' হইতে আসিয়াছে। আব, আতস, খাক ও বাদ দিয়া প্রস্তুত এই মানব জমিনে ষড় রিপু-রূপী ছয়টি বলদ চরিতেছে ২ মিলন ৩ লুকাইয়া রহিয়াছেন ৪ নাওখানি ৫ ডাহিনে-বামে। বাউলের সাধনার সঙ্গে এই অংশ খাপ খাইতেছে না। ছয়টি রিপু তো সাধনার পথে বাধাস্বরূপ। যাহারা বাধাস্বরূপ, সাধনার নৌকা বাহিবার জন্য তাহারাই মাঝি হয় কিরূপে? আর, ডানে-বামে তো ইড়া-পিঙ্গলার থাকার কথা, ষড় রিপুর নয় ৬ যে গুণ টানে ৭ ঝড়ে ৮ সাধুর

আর একি অপরূপ কথা
দাঁড়ী-মাঝির হাল।
এগো, কেও শুনে না কেওরের কথা-
সদায় কেরেঙ্কাল[১] ॥

আর অধীন ইরপান বলে,
আর কতো দিন বাকী ;
এগো, নবীজীর শফাতের[২] আশা
দিলে[৩] জানি' রাখি রে ॥

। ২১৫ ।

আমার উপায় বলো এগো সই,
প্রেম ক'রে প্রাণ গেল।
এগো, আমি ভাবি রাত্রদিনে—
সে বা' কোথায় রইল ॥

আর দেহা[৪] হইতে রসরাজ
সিং[৫] কেটে প্রাণ নিল।
এগো, জনমভরা পায়ে ধরা—
তবু সঙ্গে নাই সে নিল ॥

আর আমার মতো কতো সখি,
তারা বন্ধের দাসী হইল।
এগো, সুখের নৌকায় তুলিয়া বন্ধে-
সাগরে ভাসাইল ॥

১ সর্বদাই ঝগড়া ২ সুপারিশের ৩ অন্তরে ৪ দেহ ৫ সিঁদ

আর জীওন হইতে মরণ ভালো
মরণ মঙ্গল।
জনম ভরি' রাধার কলঙ্ক নাম
জগতে রহিল ॥

আর ভাইবে রমণচান্দে বলে—
প্রেম করা কি ভালো।
এগো, জনমের মতো বন্ধে
ছাড়িয়া আমায় গেল ॥

। ২১৬ ।

কি সন্ধানে যাই সেখানে রে—
প্রাণের বন্ধু যেখানে, হায় রে ॥

হাঁটিয়া যাইতে তিপুর্ণিয়াতে
পাড়ি ধরলাম বিপিনেতে।
কতো লাখের ভরা খাইছে মারা[1]
পড়িয়া নদীর ঘোর তুফানে রে ॥

চমক-লোহা[2] দেখলে পরে
লাল-লোহা তার বান্দা মানে[3]।
হায় রে, খসিয়া পড়ে লাল-লোহা
ঘৃত জলে আগুইনিতে রে ॥

আর সেই নদীতে বড়ো জোর
তুফান চলে রইতে-দিনে রে।
হায় রে, কাগজের জা'জ[4] দিয়া
যাইবায় তোমরা কি সন্ধানে রে ॥

১ মারা পড়িয়াছে ২ চুম্বক ৩ দাসত্ব স্বীকার করে ৪ জাহাজ

নিয়াজ নদীর[১] সাগরেতে
বাইয়ো নৌকা সাবধানেতে।
কতো ধনীর ভরা খাইছে মারা
পড়িয়া নদীর ঘোর তুফানে রে॥

ডাইনে-বাঁউয়ে[২] দুকুছা[৩] নালা
যাইয়ো না মন কখনেতে।
ও তার মধ্যের নালায় বেপার-তিজার[৪]
জানইন[৫] সাধু আলিমগণে[৬] রে॥

আর আছ্য ছড়ার[৭] মধ্যে
বান্ধ আল্লা দিছে যেই জনে—
ও নদী বাইছে যারা, পাইছে তারা
তারা নদীর দার[৮] চিনে রে॥

।২১৭।

ও তোরে করি গো মানা—
শ্যামরূপ নিরখি গো, জলে ঢেউ দিয়ো না।

আর জলের ঘাটে শ্যামরূপ—
নিরখিয়া চাইয়ো গো সই,
নিরখিয়া চাইয়ো।
যদি রূপ ধরিতে চাও গো পরান-সজনি,
ও তোর সাধু-ভাই বেপারী॥

---

১ অথই নদীর ২ ড়াহিন-বামে ৩ দুইটি ৪ ব্যবসাবাণিজ্য ৫ জানেন ৬ জ্ঞানীরা
৭ ছোটো খালের ৮ ধার

আর এক নায়ে তিনজন,
দুই জন গুণারী[১] —
গো নায়ের একজন কাণ্ডারী।
মস্তুলেতে[২] গুণ চড়াইয়া গো পরান-সজনি,
ও তোর সাধু-ভাই বেপারী ॥

আয় সদাই শা' ফকিরে কয়—
মন আউলা-ঝাউলা[৩]।
আমি আরাইছি[৪] রান্ধনের জুইত[৫] গো সজনি,
আমার ভাত ফুটি' চাউলা[৬] ॥

। ২১৮ ।

॥ ঝুমুর ॥

মনরে, চল্‌ছে হরিনামের গাড়ী—
যাবো বৃন্দাবন।
ওরে, শিক্ষা-দীক্ষা-মহাবলী
তিনটি তত্ত্বের ষ্টেশন[৭] ॥

১ যাহাবা নৌকার গুণ টানে। 'তিনজন 'বুঝাইতে এখানে আল্লা, মোহাম্মদ ও মানুষও বুঝাইতে পাবে। নিম্নের স্তবকটি এ প্রসঙ্গে পঠিতব্য :

আমি ডুব দিয়া রূপ দেখিলাম প্রেম নদীতে।
আল্লা, মোহাম্মদ, আদম, তিন জনা এক নূরেতে নুরেতে ॥
—হাবামণি (বৈশাখ ১৩৩৭), পৃঃ ১৪

২ মাস্তুলেতে ৩ বিশৃঙ্খল ৪ হারাইয়াছি ৫ রন্ধন-কৌশল ৬ ভাত না ফুটিয়া চাউল বহিয়া গেল

৭ শিক্ষা, দীক্ষা ও মহাবলীকে তিনটি তত্ত্বের রূপ বলা হইয়াছে। এই তথ্য অন্যত্র মিলে নাই। প্রসঙ্গতঃ ইসলাম ধর্মের আধ্যাত্মিক জগতের তিনটি স্তরের কথা উল্লেখ করিতে পারা যায়। প্রথমতঃ 'ফানা ফি শেখ'; এই স্তরে আপন পীরের সহিত লয় প্রাপ্তি। দ্বিতীয়তঃ 'ফানা ফির রসুল'; এই স্তরে রসুলাল্লার ধ্যান করিতে হয়। তৃতীয়তঃ 'ফানাফিল্লা'; এই স্তরে আল্লার সহিত মিশিয়া যাওয়া

আর গাড়ীতে চৌরাশী কোঠা[১]
যোল্লো কোঠায় মাল কোঠা ;
প্রেম-রসের জিনিস মিঠা—
বেচা-কিনা করে সাধু জন ॥

গাড়ী পলকে গোলোকে চলে—
'হরি' বল বল রে, ও মন,
পলকে গোলোকে চলে :
কলের কোঠায় রূপ-সনাতন

। ২১৯ ।

॥ লোভা ॥

অকূল ভব-সাগর-পারে—
পার হবে কে আয় রে আয়,
আয় রে আয় ॥

অন্ধ-আতুর-অনাথ-নিরাশ্রয়
আছো কে কোথায় :
ভব-তারণ বিনে পার নাই হইবে—
সময় কাটালে অবহেলায় ॥

দশ ইন্দ্রিয়, ছয় জন মাঝি—
তারা কর্মসূত্রে গুণ চালায়।
উচ্চ আশায় পাল তুলে দিয়েছি—
হরি-কৃপায় পবন বেগে ধায় ॥

১ চৌরাশী-র তাৎপর্য বোঝা গেল না। মনে হয়, ইহা দেহস্থিত শিরা বা নাড়ীর সংখ্যাকে নির্দেশ করিতেছে

। ২২ ।

হরে[১] কোন্থু[২] নাম জপে রে শ্যাম-বন্ধের বাঁশীয়ে-
তোমরা জানো নি রে প্রাণ-সজনি ॥

আর যেই নাম বাঁশীয়ে জপে
সেই নামের ভেদ[৩] পাইলে গো—
নাইকো তার লাজ-ভয়
হইবে রাধা কলঙ্কিনী, প্রাণ-সজনি ॥

আর দমে নাম মিল করি', আল্লা,
বাঁশী উপর ধিয়ান করি' গো—
দেখ্ চাইয়া তোর দেহার মাঝে
বিরাজ করে লীলমণি[৪], প্রাণ-সজনি ॥

আর যেই নাম বাঁশীয়ে জপে
সেই নামের ভেদ পাইলে
মারা যাইবায় দুই কূলে গো—
বাঁশীর মাঝে যন্থর বাঁশী
কইল মোরে উদাসিনী, প্রাণ-সজনি।

আর রহিমুদ্দীন ফকিরে বলে, আল্লা,
প্রাণ থাকিতে প্রাণ না নিলে গো—
জী'তে[৫] না পূরিলে আশা
মইলে[৬] তারে আর পাবেনি, প্রাণ-সজনি।

১ হায়রে, ওরে ২ কোন্ ৩ মর্ম ৪ নীলমণি ৫ জীবিত কালে ৬ মরিলে

। ২২১ ।

॥ সাধন-কথা ॥

ও আমি পাইলাম না গো
আমার বন্ধুরে মানাইতে[১] ।
তোমরা নি যারায়[২] গো সখি,
কদমতলায় ফুল পাড়িতে ॥

আর দারুণ চাম্পানাগেশ্বর ফুল
ফুটে গো ডালে-ডালে ;
বা' আল্লা, ফুটে গো ডালে-ডালে ।
ওরে, রাইত অইলে[৩] হায়রে ফুল—
লুকায় পাতে-পাতে ॥

আর দারুণ বলওয়া ফুল[৪]
ফুটে গো নিশা কালে ;
বা' আল্লা ফুটে গো নিশা কালে ।
আর তার লাগি' কতেক রইছইন[৫] ফুল-
গাছের তলে ॥

আর সৈয়দ আকিলে কইন[৬] —
ফুলের তলে বইয়া ;
বা' আল্লা ফুলের তলে বইয়া[৭] ।
সারা নিশি প'র গো দিলাম
ফুলের লাগিয়া ॥

১ বাজী করিতে ২ তোমবা কি যাইতেছ ৩ রাত্রি হইলে ৪ ফুল বিশেষ ৪ রহিয়াছেন
৬ কহেন ৭ বসিয়া

। ২২২ ।

ও মনরে, তুমি দমের বাঁশী বাইয়ো[১] ।
হইতায় যমুনা পার—
হরদমে[২] আল্লাজীর নাম লইয়ো

ও মনরে, উপরে গাছের জড[৩]
জমিনে ডাল-পাল ।
দম হইতে আদম পয়দা[৪] —
ফুল ফুটিয়াছে জড় ॥

ও মনরে, দমে আয়[৫] , পলকে যায়—
দমের নাই থিতি[৬] ।
দম হইতে আদম পয়দা
কি লয়ে বসতি ॥

ও মনরে, তিল পরিমাণ জা'গাখিনি
আঠারো ছইজ্জা[৭] পড়ে ।
আল্লার দুস্ত[৮] মোহাম্মদ-নবীয়ে
কোন্ জা'গায় ছইজ্জা করে ॥

শাহা নূর ছৈয়দে বলে—
বাঁশীর নাম বড়ো ।
এই দম ডুবিয়া গেলে
সকাল নিয়া গাড়ো ॥

১ বাজাইয়ো ২ প্রতিনিঃশ্বাসে ৩ শিকড় ৪ মনুষ্য সৃষ্টি ৫ আসে ৬ স্থিতি, স্থিরতা
৭ সজিদা, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ৮ বন্ধু

। ২২৩ ।

তুমি আল্লার নামে বাইর হইয়া যাও—
পাষাণ রে হায়,
ও তুমি আল্লার নামে বাইর হইয়া যাও ॥

আর ছাড়ো আশা, ছাড়ো বাসা,
ছাড়ো অঙ্গের আশ।
এগো, কুলপতির কোল ছাড়ি'
লও জঙ্গল বাস ॥

আর তিন অক্ষরে[১] মিল করিয়া
দমের বাঁশী বাইয়ো।
উর্ধ্বমুখে দম খেঁচিয়া[২]
বন্ধুয়ার দিকে চাইয়ো ॥

আর ভবেরি যন্ত্রণা আমার
না আসিল কাম।
অঙ্গে করি' দান করো
মাবুদ[৩] আল্লার নাম ॥

আর আলিফেতে[৪] ভর করিয়া
লামে নৈরাকার।
তবে দেখা অইত[৫] ওরে
শ্রীপুরের ছৈলাব ॥

আর প্রাণ-বন্ধে বিরাজ করইন[৬]
নীল সায়রের মাঝে।
ছৈয়দ হাছনে কইন[৭] —
জনম গওয়াইলাম[৮] বিফলে ॥

---

১ স্বর, ব্যঞ্জন ও যুক্ত। অথবা, আলিফ, লাম ও মিম। আত্মতত্ত্ব, পবতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব। আল্লা, মোহাম্মদ, আদম ২ করিয়া ৩ প্রভু, উপাস্য ৪ আরবী বর্ণমালাব প্রথম বর্ণ ৬ করেন ৭ কহেন ৮ কাটাইলাম

। ২২৪ ।

যে জন আলিফ্[১] ধইরাছে—
আলিফের কাছে মিম্[২] বান্ধা রইয়াছে ॥

আর ছোটো কালের পিরিত রে ভাই—
মিঠা যেমন পানি।
আঢ় মাস[৩] গইয়া গেলে
কিসের এবাদতি[৪] ॥

আর আলিফেতে আল্লা জানো
লামে[২] লা-শারিক[৫]।
আলিফের নূর[৬] দিয়া মোহাম্মদ ঠিক ॥

আর উলাই-নালাই দুই নদী[৭]
শ'রের[৮] ভিতর।
কোন্ নালায় কোন্ জল করিছে বসতি ॥

আর বিচার করি' কয় ছাবালে—
কেন আইলাম ভবে :
না লইলাম আল্লাজীর নাম ওই তনের গুমানে[৯]

। ২২৫ ।

বন্ধুয়ারে, যার লাগি' হইয়াছি পাগল
না পাইলাম তারে।
ও কি বন্ধুয়া রে ॥

১ আরবী বর্ণমালাব প্রথম বর্ণ ২ আরবী বর্ণমালার অপর দুই হরফ ৩ (?) ৪ ধর্ম-কর্ম ৫ যাঁহার কোনো অংশীদাব নাই, অপ্রতিদ্বন্দ্বী অর্থাৎ ঈশ্বর ৬ জ্যোতি ৭ ইড়া-পিঙ্গলা (?) ৮ শহবের, শরীবের ৯ তনুর গৌরবে

বন্ধুয়া রে, লাম-আলিফ[১] চালাইয়ো আগে,
হে হরম[২] পাতালে লাগে—
আকাশে টানিয়া তুল গুণ।
নাভি হইতে তুলিয়া, লতিফায় জরফ[৩] দিয়া
গুর্দায়[৪] লাগাইয়া দিয়ো তালি ॥

বন্ধুয়া রে, ডাইনে ছাট, বামে ছাট,
মধ্যে তিপুর্ণিয়ার ঘাট[৫]—
ডুব দিলে মিলে এক মুতি[৬]।
সেই মুতি বিকাও রে, রসের বাজারে রে
হইবায় তুমি ধনী মালদার ॥

বন্ধুয়া রে, নফি[৭] দরিয়ায় ডুব দিয়া,
লাহুল দরিয়ায় খেলা করিয়া—
ধিয়ান পুরে লাগাইয়ো নাও।
দিলালপুরে গেলাম রে, তাজ্জুব[৮] দেখিলাম রে
দৌড়ে ঘোড়া, নাহি তার পাও ॥

বন্ধুয়া রে, আর এক তাজ্জুব দেখি ঘাটের কূলে-
দুই সখী বিন্-কলসীয়ে
ভরে গঙ্গার জল।
বিন্-আকাশের চান্দরে নয়নে না দেখি রে
অন্ধকারে করে ঝলমল ॥

---

১ কলেমার প্রথম দুইটি বর্ণ ২ কাবা ৩ সুফীরা দেহের মধ্যে ছয়টি 'লতিফা' (অর্থাৎ আলোক-কেন্দ্র)-র কল্পনা করিয়াছেন। এই ছয়টি 'লতিফা' হইল: কলব, রুহ্, ছের, খফি, আখফা ও নফস। সুফীদের ছয় 'লতিফা' অপরিহার্য ভাবে হিন্দুতন্ত্রের 'ষট্‌চক্র' এবং বৌদ্ধতন্ত্রের চারটি 'কায়'-এর কথা মনে করাইয়া দেয়। 'জরফ' কথাটির অর্থ 'পাত্র', যাহা ধারণ করিয়া রাখে ৪ Kidney-তে ৫ ত্রিবেণীর ঘাট ৬ মোতি ৭ Negation; অস্বীকাব করিবার পর নির্ভীক ভাবে স্বীকৃতি-পথে যাওয়া ৮ তাজ্জব, আশ্চর্য জনক

বন্ধুয়ারে, ডাইনে ফুল, বামে ফুল,
আকাশে-পাতালে মূল—
মাঝের ফুলে ধরিয়াছে কলি[১]।
মুরশিদ ভজিয়া রে, সেই ফুল চিনিয়ো রে
হইবায় তুমি[২] লাখের সদাগর ॥

বন্ধুয়া রে, সোনাপুর কদম্বতলে
বিনা তেলে বাত্তি জ্বলে—
লাল ফুলে ধরিয়াছে কাজল[৩]।
সোনাপুর থাকিয়া রে, ফরমুজ ভাগিল রে
লাভে-মূলে হারাইলু সকল ॥

। ২২৬ ।

আল্লা, কি করিব[৪] বাপ-মায়।
কুলমান সপিলাম[৫] রে মুরশিদের পায়

১ কলি, কুঁড়ি ২ তুমি হইবে ৩ ফুলের কল্পনা অন্যত্রও লক্ষিত হয়। যেমন, "লাল নীল সিয়া সফেদ চারফুল দুনিয়ার মাঝারে"—অধ্যাপক মুহম্মদ মনস্থর উদ্দীন-সম্পাদিত 'হারামণি' (প্রথম খণ্ড) পৃঃ ৫০। আবও—

লাল ফুলে হয় জগত মা-খাকী, জরদ ফুলে হয় মহম্মদ রসূল—বলিব কত কি!
ছিয়া ফুলে আদম ছবি, ছফেদ ফুলে হয় সাঁইজী,
চারি ফুলে হয় দুনিয়ার দুর্লভ, আমি কানা দেখতে পাইনা।
—হারামণি (১৯৪২), সং ৬২, পৃঃ ৪০

কিংবা,

ফুটেছে ফুল শ্বেত-পদ্ম প্রেম-সরোবরে,
ফুল ফুটেছে আপন জোরে—শ্বেত পদ্ম যারে বলে।
নীল-পদ্ম নীহারে রেখে, লাল পদ্ম মনোহরে,
কোন ফুলে হয় আল্লার আলী, কোন ফুলে ফতেমা বিবি,
কোন্ ফুলেতে বিবি হাম্বু, চক্ষু দান দিয়েছে!
—ঐ, সং ৬৫, পৃঃ ৪১

৪ করিবে ৫ সঁপিলাম

আল্লা, প্রথমকু[১] মুরশিদের জিকির[২] দিলা,-
জিকির লতিফায়[৩]।
এগো, এক মোকামে[৪] ছয় নিশানি—
'আল্লা হু' নাম শুনা যায় ॥

আল্লা, মুরশিদের আইজ্ঞা[৫] জানো
ছিনাবছিনায়[৬]।
এগো, তিপুর্ণ্যিতে ধিয়ান কইলে[৭]
'আল্লা হু' নাম শুনা যায় ॥

আল্লা, নয় দরজা বন্ধ করিয়া
হরদমে[৮] বসায়।
এগো, আল্লা নবীর নূর মবারক[৯]
চাইরজন দেখি এক জা'গায়[১০] ॥

। ২২৭ ।

তোরা হও যদি কেও ধনী—
প্রেম-সুতে বান্ধিয়া রাখো রসের কামিনী ॥

আতসী[১১]রমণী ফুল
পুরুষ ভমর ননী[১২];
ফুল পাইলে ভ্রমর গলে ঘৃতের নিশানি[১৩]

---

১ প্রথমতঃ ২ জপ ৩ দেহস্থিত চক্রে ৪ গৃহে, এখানে লতিফার বাসস্থানে ৫ আজ্ঞা ৬ বক্ষে, হৃদয়ে-হৃদয়ে ৭ ধ্যান করিলে ৮ প্রতি নিশ্বাসে ৯ পবিত্র জ্যোতি ১০ চারজন ইমাম। দ্রঃ ২০৪-সংখ্যক গানের পাদটীকা। হজরত আবুবকর (রাঃ), হজরত আলী (কেঃ), হজরত ওসমান (রাঃ), হজরত ওমর (রাঃ) ১১ অগ্নিময় ১২ ননী ১৩ নিশান, দৃষ্টান্ত, ঘিয়ের মতো

আর মাইয়া-নদীর কূলে বসি'
স্নান করিলে গুণী ;
কলসীর মুখে চাপ্‌নি দি'[১]
সন্ধানে তুল' পানি ॥

চন্দ্র-ভেদ পাসরিয়া
কতো হইলা ধনী ।
ফিরিস্তাগণে[২] মানে চন্দ্র
চিনিবে রোহিণী ॥

তিরির সঙ্গ করো ভঙ্গ
থাকিতে জওয়ানি[৩] ।
ভিন্ন তিরির সঙ্গ নিল যে
তারে বলে জ্ঞানী ॥

শাহা কাছিম আলীয়ে কইন—
ওই জলে মূল আমদানী ।
জল উত্তম সৃষ্টি পত্তন
চালায় মহাজনী ॥

। ২২৮ ।

হইলাম কলঙ্কের উদাসিনী গো,
মাইয়ার দেশে গো ;
হইলাম কলঙ্কের উদাসিনী গো।

১ ঢাকনি দিয়া ২ দেবদূতগণ ৩ যৌবন

আর পুরুষের ধন লইয়া
মাইয়ায় বেপার করে।
মিছামিছি পুরুষ লোকে
বেগার খাটি' মরে গো ॥

আর পুষ্করিণীতে[1] নাইরে জল
কি করব তার সোতে[2]।
যে মাইয়ার পুরুষ নাই
কি করব তার রূপে গো।

আর আশমানেতে উঠে চান্দ
সঙ্গে লইয়া তেরা[3]।
এক চান্দ-সুরুয বিহনে
দুনিয়া আন্ধেরা গো ॥

আর উড়িয়া যায় রে সুয়া পক্ষী
গাইয়া যায় রে গান।
সেই গান রুচিয়া দিছইন[4] –
হাছন রাজা বইয়া[5] গো।

। ২২৯ ।

পুরুষ-নারী সমান করি'
কামানিতে তুলুনি[6];
সজনি, প্রেমের ভাণ্ডার কারে দিল বরগনি[7] ॥

১ পুকুরে ২ স্রোতে ৩ তারা ৪ রচিয়া দিয়াছেন ৫ বসিয়া ৬ নিক্তিতে তুলনীয়
৭ স্রষ্টা

নারী যদি না হইত পিরিতের ভাণ্ডার—
পুরুষ না হইত বেগার[১], হায় হায় ;
সই সই, হায়রে,
বিনা পয়সায় তুলিয়া মাথায় দিছে বোঝা রমণী ॥

নারীর যৌবনের ঢেউ দেখিয়া
পুরুষ হয় মাতোয়ালা বেহুঁশ, হায় হায় ;
সই সই, হায়রে,
জিন্দেগী[২] সাঁতারি' ফিরে, কিনারা না পায় ধনী ॥

নারী হইছে ডিগ্‌রা রছি[৩] —
পুরুষ ছাগল লাগ্‌ছে বাজীগরী[৪] কল, হায় হায় ;
সই সই, হায়রে,
যে লাগাইছে প্রেমলীলা, তার ভেদ কেও চেন নি[৫]

পাগল আরকুমে কয়—
পুরুষ হইছে যারা, তারা নারীর প্রেমের মরা, হায় হায় ;
সই সই, হায়রে,
মাশুকের সঙ্গে খেলে' সুখে যায় তার রজনী ॥

। ২৩০ ।

নারীর দেহায় কি ধন-রতন যদি চিনলায়[৬] না—
বা' খালি দেখিয়া দেওয়ানা[৭] ;
পানি-লাগামেতে ঘোড়ায় বাগ মানে না ॥

---

১ বিনা পয়সার মজুর ২ জীবন ৩ যে রশি দিয়া পশ্বাদি বাঁধিয়া রাখা হয় ৪ বাজীকরী, ঐন্দ্রজালিক ৫ চেন নাকি ৬ চিনিলে ৭ পাগল

আর সোনারী[১] না জানে চাইল[২]
বানাইতে জেওর[৩] ;
সুয়াগা[৪] ঢালিয়া দিল পিতলের উপর।
সোনা-পিতল-তামা তিন একই নমুনা—
কোন্ চিজের কোন্ পুট—তাতো জানে না॥

আর ছঙ্গ[৫] আর ফেরুজা[৫]-মুতি[৬]
জওয়াহির অকিক[৫] ;
জহুরী কিম্মত[৭] জানে পাথর মাফিক[৮]।
অবুলা[৯] না জানে তার মুল্যের ঠিকানা—
আনা-ফানা বেচিয়া খায়—খই-সাডু-চানা॥

আর পাগল আরকুমে কয়
মুরশিদের ঠাঁই—
পাগলা ঘোড়ার জিন-গাদি[১০] কি দিয়া লাগাই
দয়া যদি করইন[১১] মুরশিদ জানিয়া কমিনা[১২]—
এস্কের[১৩] লাগাম বিনে ছওয়ার[১৪] মানে না॥

। ২৩১ ।

নারীর সাথে সাধনেতে মইলা[১৫] কতো জন—
যৌবন নয় রে আপন।
লাভের পন্থে মূল হারাইয়া হইল বিড়ম্বন।

১ স্বর্ণকার ২ চাল, ধরণ ৩ অলঙ্কার ৪ সোহাগা ৫ মূল্যবান পাথর বিশেষ ৬ মোতি, মুক্তা ৭ মূল্য ৮ অনুযায়ী ৯ অবলা ১০ গদি ১১ করেন ১২ ক্ষুদ্র, হীন, তুচ্ছ ১৩ প্রেমের ১৪ সওয়ার ১৫ মরিল

মাখন জানি' ঘোল-পানি খাইলা কতো জনে—
হকিকী[১] হারিয়া দিল[২] মজাজি কারণে[৩]।
বিনা আজরাইলে[৪] তার হইল মরণ :
না হইল জনজা[৫] -গোছল[৬] না হইল কাফন[৭]

আর দুইটি নদীর একটি নালা, তাতে বহে জল—
সে নদী বান্ধিত[৮] পারে—যে হয় পাগল।
পাগল ছাড়া কইল যারা নদীর দরশন :
তন্ত্র-মন্ত্র, জ্ঞান-বুদ্ধি হারিল[৯] তখন ॥

আর পাগল আরকুমে বলে,
ঠেকছি কলে খাইয়া নদীর জল—
লাগ্‌ছে নিশা[১০] যায় না খসা, উল্টা বড়ির[১১] কল।
ছাড়তে গেলে ধরে কলে করি' অন্বেষণ :
পাতনি[১২] দেখি ফান্দা বাজী হইল মরণ ॥

। ২৩২ ।

তোরা দেখ্‌ল'[১৩] সজনি, তোরা দেখ্‌ল' সজনি-
কোন্ কলে বানাইছে বন্ধে
আজব ঘরখানি ॥

পুরুষ-রমণীর খেলায় দুইয়ের আট আনি।
তাতে বন্ধে দশ মিশাইয়া
ঘর কইল রুশ্‌নি[১৪] ॥

১ ঈশ্বর প্রেম ২ হারাইয়া ফেলিল ৩ ঐহিক প্রেমের কারণে ৪ যমে ৫ মৃত্যুর পর কবর দিবার সময়ে মৃতের পারলৌকিক মঙ্গলার্থ প্রার্থনা ৬ স্নান ৭ শব আচ্ছাদক বস্ত্র ৮ বাঁধিতে ৯ হারাইল ১০ নেশা ১১ বড়শীর ১২ পাতানো ১৩ লো ১৪ আলোকিত করিল

আর আওরের পত্তন ঘর[১] ফটিকের থুনি[২] ।
ওই থুনিতে লট্‌কাইছে
আছমান-জমিন-পানি[৩] ॥

আর উলটকলে[৪] ঘর বানাইছে, আতসের ছানি[৫]
ছেঁছিতে[৬] বৃষ্টির জল
টুল্পিয়ে নিগ্‌রাউনি[৭] ॥

ঘরের মাঝে শ্রীকুলার হাটের রব শুনি ।
বিনা কড়িয়ে অমূল্য ধন
করে বেচাকিনি ॥

শাহা কাছিম আলীয়ে কয়,—মুরশিদ আমার
ভবেতে আসিয়া আমি
হইছি কলঙ্কিনী ॥

। ২৩৩ ।

নফ্‌ছের উলটে[৮] নাও বাইয়ো রে মনুরা[৯]
তুমি নফ্‌ছের উলটে নাও বাইয়ো ।
নাছুত[১০] জমরুত[১১] দাঁড় টানিয়া
মালকুতে[১২] হাইল[১৩] ধরিয়ো ॥

ফুলের মাঝে মজিয়া থাকিয়ো তুমি—
ফুল তুড়িয়া মধু খাইয়ো ।
এগো, ঝাকে-ঝাকে[১৪] ভমরা অইয়া[১৫]
মধু লইয়া উড়িয়ো ॥

---

১ যে ঘরের ভিত্তি সাগরে ২ খুঁটি ৩ আকাশ-মাটি-জল ৪ উল্টাকলে ৫ আগুনের ছাউনি ৬ ছেঁচতলাতে ৭ দুই চালের সন্ধিস্থল (মটকা) হইতে জল চুয়াইয়া পড়ে ৮ নিশ্বাসের উল্টা দিকে, নফস্‌-এর উল্টা দিকে। দ্রঃ ২২৫-সংখ্যক গান ৯ মন ১০ সুফী সাধনার সর্বনিম্নস্তর, স্থূল রক্ত-মাংসের জীব ও জড় প্রকৃতির স্তর আলম-ই-নাছুত ১১ এইখানে আলম-ই-মলকুতের নামকরা উচিত ছিল ; জবরুত সাধনার দ্বিতীয় স্তব ১২ ইহা দেবদূতগণের স্তর, সূক্ষ্ম দেহধারীদের স্থান, এই স্তরে সাধকের মনে পবিত্রতা আসে ১৩ হাল ১৪ ঝাঁকে-ঝাঁকে ১৫ হইয়া

প্রেম-নদীতে সাতার[১] দিয়ো তুমি—
প্রেম করা শিখিয়া লইয়ো।
পলকেতে ঝাপ[২] দিয়ো না
গহীনে না ডুবিয়ো[৩] ॥

পাগল ইছাকে বলে, প্রেম করা শিখতে গেলে
দরিয়ার মাণিক কেমনে পাবো—
মুরশিদকে ভজিয়ো ॥

। ২৩৪ ।

আমি কই যে কথা, বুঝরে,
যা লাভ করো সকালে ;
হায়, ঘুরাঘুর্ ঘুর্ঘুরাঘুর্, ঘুর্তে আছে রঙ্গে রে।
হায়, তুলাতুল্ তুল্তুলাতুল্
উল্টা রঙ্গে নাচে রে ;
হায়, ঠগাঠগ্ ঠগ্মহাঠগ, তুড়ি মারি' ঠগে রে ॥

হুকুমের কাজে নিষেধ আছে
মুরশিদাবাদ যাইতে ;
ও আল্লা, কেমনে যাই দিল্ জামিন[৪] , চাই তোমারে।
ভালোমন্দ সকল তোমার আর জামিন চাই
আমলে[৫] ॥

কুসঙ্গীয়ার সঙ্গ লইলে
গলায় ঢঙ-ঢঙ বাজে রে ;
বিনা পয়সায় বদের বস্তা খরিদ করলাম দোকানে।
পুরানা দুশমনে দেখি' খল্খলাইয়া হাসে রে ॥

১ সাঁতার ২ ঝাঁপ ৩ অর্থাৎ কিনারায় থাকিয়ো, মাঝগাঙে যাইয়ো না ৪ মনের প্রতিভূ ৫ কাজে

অধীন পাগলে বলে—কলের ইঞ্জিল চাপিলে
আঠারো মোকামের তার[১]
জাগিয়া উঠে এক দমে।
আমরা পাইনা আমল দোষে, তোমরা পাইবায়[২]
গোপনে ॥

। ২৩৫ ।

উঠলে উঠমু, শইলে শইমু[৩] —
কেওরের[৪] কোনো ধার ধারিনা ;
বউ গো, তুই উঠবে কিনা ॥

বান্ধাইল[৫] হুকায় তামাক ভরি'
বউরে করি যাচন[৬]।
খাইলে খাইমু, থইলে থুইমু—
কেওরের কোনো ধার ধারি না

দুই প'র বেলা সিনান করি'
বউ গো, তুমি পাক করো না।
সিনান করি' আইছি আমি—
মন তো আমার লাগের না ॥

শীতালং ফকিরে কইন,
বউ গো, পাইছি বাবুয়ানা।
সমুখ দুয়ার বন্ধ করিয়া
পিছ-দুয়ারে[৭] বৈঠক খানা[৮] ॥

---

১ দ্রষ্টব্য ২০৯-সংখ্যক গানের পাদটীকা ২ পাইবে ৩ শুইলে শুইব ৪ কাহারো ৫ বাঁধানো
৬ বউকে সাধি ৭ পিছনের দুয়ারে ৮ বাউলদের উল্টা সাধনাব কথা বলা হইতেছে

। ২৩৬ ।

স'জ[১] পিরিত হয় না গো সই মানুষেতে।
ও মানুষ হইতে পারে অনায়াসে গো—
কেবল দেয় না দেহা স্বভাবেতে॥

আর ধর্ম কতো আছে শত কলির কালেতে।
ও কতো কামের কামাল[২] বেহাল হইয়া[৩]
গো সজনি,
মানুষ মরতে আছে[৪] শতে শতে॥

আর মনের মানুষ দাঁড়াই'[৫] আছে গো রসের কোঠাতে-
ও তার মালের কোঠায় তালা দিয়া।
গো সজনি,
ও তার ছড়ানি[৬] মুরশিদের হাতে॥

আর মনের মানুষ দাঁড়াই' আছে গো রসের কোঠাতে।
ও তার উল্টা তালা, না যায় খোলা,
গো সজনি,
ও তার ছুড়ানি শ্রীগুরুর গো হাতে॥

আর মনের মানুষ পাই না আমি তির্জগতে[৭]।
ও ফকির রহিমুদ্দীনে বলইন—
গো সজনি,
ও তার দণ্ড হইয়াছে পিরিতে॥

১ সহজ ২ কাজের কাজী ৩ হিমসিম খাইয়া ৪ মরিতেছে ৫ দাঁড়াইয়া ৬ ছোড়ানি, চাবি ৭ ত্রিভুবনে

। ২৩৭ ।

সজনি, পিরিত কি ধন, চিনলায়[1] না—
পাতলা স্বভাব[2] গেল না ;
রূপ দেখিয়া নয়ন পাগল, গুণের পাগল ময়না।
এগো, হৃদয়ে পিঞ্জিরার পাখী
সয়াল[3] বেড়ায় দেখ না ॥

আর পিরিতি অমূল্য ধন, যত্নশূন্য থাকে না—
এগো, কালনদীতে সাঁতার দিলে
সাধনের বল থাকে না ॥

আর একটি নদীর তিনটি নালা[4]
বাইতে আমি পাইলাম না।
এগো, সেই নদীতে ডুব দিলে
তন্ত্র-মন্ত্র লাগে না ॥

আর ভাইবে রাধারমণ বলে—
সাধন-ভজন হইল না।
এগো, পড়িয়া রইলাম ঘুমের ঘোরে
গুরু কি ধন চিনলাম না ॥

। ২৩৮ ।

কোন পন্থে যাইরে মুই
নিলয়[5] না পাই,—
রে মুই কোন্ পন্থে যাই

---

১ চিনিলে ২ লঘু স্বভাব ৩ সকল সংসার ৪ ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না ৫ ঠিকানা

ডাইনে দেখি গোয়াইন নদী
বাঁউয়ে[১] দেখি জলু[২] ।
উঁচা না টিকরের[৩] মাঝে
ওউ[৪] গাউ[৪] নাকি হেমু[৪] ॥

নমাজ পড়ো, রোজা রাখো,
কোরান পড়ো শুনি ।
তরিক[৫] মঞ্জিল[৬] ঠিক নাই তার
খাইয়া জৈন্তার পানি ॥

কেবা আজি[৭] কেবা মুল্লা[৮]
কারে কইতাম বুরা[৯] ।
সকলের একই তরিক
তহবন[১০] ছাড়া ॥

ঘাটিয়ল মাঝি শিকদার
চিনন না যায় :—
সকলের কান্ধে এক-এক জাম্‌লি[১১]
চিনন না যায় ॥

ভালা শহর জৈন্তাপুর
ঘরে ঘরে আডা[১২] ;—
কহে ফকির বেলা শা'য়—
জঞ্জালে দিলাম পাড়া ॥

১ বামে ২ জলাভূমি ৩ টিলাব ৪ গ্রাম বিশেষ ৫ পথ। সুফীসাধনার অনুগত পথ ৬ গন্তব্য স্থল ৭ হাজী ৮ মোল্লা ৯ খারাপ ১০ লুঙ্গি ১১ ঝুলি ১২ বিবাদ

। ২৩৯ ।

ও তিপুর্ণিয়ার ঘাটে রে—হুঁশিয়ার হইয়া যাইয়ো ;
তিপুর্ণিয়ার ঘাটে গেলে
পাও নি ভিজাও, চাইয়ো।
রে হুঁশিয়ার হইয়া যাইয়ো ॥

এগো, উঠিতে পিছল মাটি
আছাড় নি খাও, চাইয়ো—
রে হুঁশিয়ার হইয়া যাইয়ো ॥

আর আমা কলা আনা চাউলে
নবদি সাজাইয়ো[১]।
মনেরি আনল[২] দিয়া
দুই বাত্তি জ্বালাইয়ো[৩] ॥

আর মন-মানুষের কথা রে ভাই
মরমে পূজিয়ো।
নিরলে[৪] বসিয়া নাম
চুপে-চাপে লইয়ো ॥

১ বিনা কলা, বিনা চাউলে নৈবেদ্য সাজাইয়ো ২ অনল ৩ বহুগানে 'বাতি' এবং দুই বাতি'র উল্লেখ পাওয়া যায়। অন্যত্র পাইতেছি "দুই জন গুণাবী"—সং ২১৭। কিংবা "বসিছে দ্বিতীয়ার চান্দ"—সং ৩১০। ইহা প্রকৃতি-পুরুষেব দুই সত্তাব মিলিত সত্তা। 'দ্বিতীয়াব চাঁদ' অবশ্য অমাবস্যা (বজো আবির্ভাবেব কাল) প্রতিপদেব পব দ্বিতীয়াকে বোঝাইতে পাবে। কিংবা, অপর এক দিকে দিয়াও ইহাব ব্যাখ্যা কবা যায়। এইখানে 'দুই' বলিতে প্রকৃতি-পুরুষ না বুঝাইযা আল্লা ও রসুলকেই বুঝাইতেছে, মনে হয়। একটি গানে পাইতেছি :

হকির কাছিমের বাণী
আল্লা-রছুল এক জানি—
এক না হইলে কেমনে দুনিয়া রয়।

এক-দুইয়ে মিলন করি ভবনদী যাবে তবি'—চাইযা দেখ—তোব এই দেহাতে রইছে দুইয়েব খেলা ॥ —সং ২০৬

৪ নিরালায়

। ২৪০ ।

কলঙ্কিনী হইমু আমি মহাজনের ঘরে—
ভরা ডুবলে সায়রে।
বার দরিয়া ছাড়িয়া নৌকা
যায় না কিনারে ॥

পালে নাহি ধরে আমার, দাঁড় নাহি চলে ;
ছাড়িয়া লাগামের ঘাট[১]
ঠেকছি বিকলে।
আকাশে মেঘের ঘোর, প্রাণি কাঁপে ডরে—
বিষম যমুনার ঢেউয়ে আগা-পিছা মারে ॥

নাইয়া যারা—গেছে তারা, উড়াইয়া বাদাম[২] ;
পাইলে কিনারা
নৌকা করিব লাগাম।
মহাজনের কৃপাগুণে ডাকিয়া লইল তারে—
লেখিল বেপারী নাম খাতার ভিতরে ॥

পাগল আরকুমের নায়ের মরিল যাকন[৩] ;
পুঞ্জিপাতা[৪] বিনাশিয়া
হইল বিড়ম্বন।
দয়া যদি করে নিজে আপে[৫] পরওয়ারে[৬] —
নবীজীর ইজ্জতে[৭] কেবল হাসরের বিচারে[৮]।

১ যে ঘাটে নৌকা বাঁধা থাকে ২ পাল ৩ নৌকার পাটাতন (?) ৪ পুঁজিপাটা ৫ আপনি, নিজে ৬ পালনকর্তা, খোদা ৭ নবীজীর খাতিরে ৮ শেষ দিনের বিচারে

॥ ভাটিয়াল ॥

। ২৪১ ।

॥ মনের প্রতি ॥

মনরে, ওয়রে[১] বলওয়া গাছের ফুল,[২]
পাইলে সে রাজা অয়—
পাওয়া গণ্ডগোল।
রে বলওয়া গাছের ফুল ॥

মনরে, একপাতা একফুল
তারে কয় সর ফুল—
গাছের নামটি রদ ইয়াছিন,[৩]
ফুলের নাম রছুল[৪] ॥

মনরে, কত কত রাজা-বাদশায়
রাজপাট ছাড়িয়া—
গাছের তলে বইয়া কান্দে
ফুলের লাগিয়া ॥

---

১ ওরে ২ এক প্রকার গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। এই গাছে ফু ল হয় না। কিন্তু, জনসাধারণের বিশ্বাস—এই গাছে খুব সুগন্ধ ফুল হয়। গভির রাত্রিতে পরীরা আসিয়া সে ফুল লইয়া যায় বলিয়া কেহ তাহা পায় না। প্রবাদ আছে, এই ফুল কেহ পাইলে সে অশেষ ধনের অধিকারী হয় ৩ কোরানের একটি সুরা (পরিচ্ছেদ) ৪ রসুল, আল্লার প্রতিনিধি

মনরে, অধম বাউলা[১] শা'য় কয়
কান্দিয়া বেয়াকুল।
চিনিলে নি[২] ধর্‌তে পারে
ফুল সহিতে মূল ॥

। ২৪২ ।

সামাল, ও সামাল তরী ল,'[৩]
ডুবিল রে মনা[৪] ভাই ;
মহাজনের জিনিস লইয়ে,
লাভ করিতে আইলাম ভবে—
পড়িয়াছি ঠগের হাতে, বিকি-কিনি নাই ॥

ও আমি কি ধন লইয়া যামু দেশেরে,
কি দিয়া মহাজন বুঝাই—
ও মনা ভাই ॥

সে পারেতে[৫] যাওয়া হইল,—
কুম্ভীরেতে চাইয়া রইল ;
দাঁড়ী-মাঝি সবাই গেল,
আমার উপায় নাই ॥

ও আমি চাইয়া দেখি, সব বিদেশী রে ;
ও আমার দেশের একজনও নাই—
ও মনা ভাই ॥

১ 'পাগল' অর্থে ব্যবহৃত ২ চিনিলে তো ৩ সম্বোধন পদ বিশেষ ৪ মন ৫ অপর পারে

। ২৪৩ ।

আমার সঙ্গের সঙ্গীলা[১] কেও নাই রে,
পাগল মনা, ও মনা,—
সঙ্গের সঙ্গীলা কেও নাই ॥

মন হে, তুই চোখ মুজিলে মনা,
হায়রে মনা, দুনিয়া আন্ধিরা[২] :
ওরে, কিমতে রহিতাম[৩] আমি
কয়বরের ভিত্তরে।
আইজ আমার সঙ্গের সঙ্গীলা নাই রে

মন হে, তোমার লাগিয়া আমি
মন ঝুরি আমি দিবানিশি রে ;
ওরে, কি দিয়া রইতাম হায় রে,
অহু[৪] আমার বাসরে রে ॥

মন হে, গুরুর বাজারে আইয়া মনা,
হস্তে চাও নজর করিয়া ;
ওরে, সেই হিসাব কর্‌বা[৫] আল্লায়
হাসরের ময়দান[৬] রে ॥

মনা ভাই, শীতালং ফকিরে কইন,—
হায় রে, গাছের তলে দিলাম মন রে ;
ওউ যেন না পাইলাম
আমার ছায়ব আল্লারে[৭] ॥

---

১ সঙ্গী ২ অন্ধকার ৩ রহিব ৪ ওযে ৫ করিবে ৬ শেষ বিচার যে ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় ৭ প্রভু আল্লাকে

। ২৪৪ ।

মনা[১] নি[২] রে ভাই,
চউখ মেলি'[৩] দেখ রে মনা,
দুইনা তোমার যাব[৪] রে।
আরে চল্ মনা রে॥

মনা নি রে ভাই,
দুনিয়াই কে বা দিল মনা,
আশমান-জমিন পয়দা হইল—
ও মনা, আমার কোনদিন হইব[৫] মরণ রে॥

মনা নি রে ভাই,
অল্পকালে করছ্‌লাম[৬] পিরিত
হায় রে, সুখে সু যাইবা দিন[৭] রে—
হায় রে, নিদয়া হইলা বন্ধু, আমার কারণে রে।

মনা নি রে ভাই,
আটে[৮] যাও, বাজারে যাও—
আঙ্খির পানি ঝরে, চাও রে,
হায়রে, কান্দি' মরি তোমার লাগিয়া রে॥

মনা নি রে ভাই,
বাপ নাই, মাও নাই, নাই সোদের ভাই[৯]।
হায় রে, কলঙ্কী রইলাম মনা,
দুনিয়ার বাজারে রে॥

---

১ মন ২ অব্যয় পদ। অর্থহীন ৩ চক্ষু মেলিয়া ৪ তোমার দুনিয়া চলিয়া যাইবে ৫ হইবে
৬ করিয়াছিলাম ৭ সুখেই যে দিন যাইবে ৮ হাটে ৯ সহোদর ভাই

মনা নি রে ভাই,
বিদেশী নাগর চাইয়া রে মনা,
মোরে দিলা বিয়া।
নতুন যৈবনের কালে রে মনা
যাইত রানু[১] ছাড়িয়া রে॥

মনা নি রে ভাই,
গাঙ্গে আইল নয়া গোলা[২]
কইলাম তোর আগে[৩] —
বাড়ীর সঙ্গ কেও নাই মনা,
কি করি উপায় রে॥

মনা নি রে ভাই,
শীতালং ফকিরে কইনি রে মনা
গাছের ডালে বইয়া[৪] —
দুলভ জনম যাইত্রা[৫] রে মনা,
আল্লার লাগিয়া রে।
চল্ মনা রে॥

।২৪৫।

চিনিয়া মনিষের[৬] সঙ্গ লইয়ো ভাই, সাধু রে,
চিনিয়া মনিষের সঙ্গ লইয়ো॥

আর যদি পাও কুজন—
আর কাছে না যাইয়ো, মন রে;
আগে তোমার দেহার মূর্তি চাইয়ো,[৭] ভাই সাধু রে।

১ যাইতেছেন যে ২ নদীতে নতুন বান আসিল ৩ সম্মুখে ৪ বসিয়া ৫ যাইতেছে
৬ মানুষের ৭ দেহের দিকে চাহিয়ো

আর বেচিয়ো, কিনিয়ো ধন,—
জা'গা কিনি' থইয়ো,[১] মন রে ;
হায়রে, রসিক পাইলে রসের কথা কইয়ো, ভাই সাধু রে ॥

আর ঠাকুর মজাইদ চান্দে কয়ে—
ঠিক রাখিয়ো মহাজনের ধন রে ;
হায়রে, লাভের সনে মূল হারাইবায়, চাইয়ো ভাই সাধু রে

। ২৪৬ ।

সাধু, কি করিলাম রে ভবের বাজার[২] ;
লাভের পসার থইয়া[৩]
খালি হাতে যাইয়ার[৪] ।
—সাধু, কি করিলাম রে ॥

সাধু রে, নবীজী-র তরিকে[৫] যদি
করিতাম বেপার ;
আইজ আমি সুখী হইতাম—
কয়বরের মাঝার[৬] ।
—সাধু, কি করিলাম রে ॥

পরে আপনে ভরাদারী[৭]
ভরা কইলাম অধিক ভারী ;
হায়রে, মাঝগাঙে ডুবিব[৮] নাও—
আমি দোষ নইব কাণ্ডারীর[৯] ।
—সাধু, কি করিলাম রে ॥

১ জায়গা কিনিয়া রাখিয়ো ২ এ ভবে আসিয়া ৩ থুইয়া ৪ যাইতেছি ৫ সাধনার অনুগত পথে ৬ কবরের মধ্যে ৭ বাণিজ্যের ভরা বহন করা ৮ ডুবিবে ৯ কাণ্ডারীর কাছে আমি দোষী হইব

কইন[১] তো ফকির ফরমান আলী,—
বাড়ী সাহাবাদ ;
বাইরে গেলে রদির জ্বালা[২] —
ঘরে বিষম তিরি[৩] ।
—সাধু, কি করিলাম রে ॥

। ২৪৭ ।

অসারের জীবন[৪] রে ও সাধু ভাই,
পলকে মরণ—
কেবল অকারণ জীবন রে ।
সাধু ভাই, আপনে মরিয়া যাইতরায়[৫] সাধু ভাই,
পরার লাগি[৬] কান্দ রে ॥

সাধু ভাই, ঘরখানি ভাঙ্গারুঙ্গা[৭]
দুয়ারখানি বান্ধ ।
আপনে মরিয়া যাইতরায়
পরার লাগি' কান্দ রে ॥

ও সাধু ভাই, ভাই তো আপনা জানলাম রে,
একই ঘরে বাস ।
ভইন[৮] তো আপনা জানলাম রে
পরার গৃহ বাস ॥

---

১ কহেন ২ রৌদ্রের জ্বালা ৩ স্ত্রী ৪ অসার জীবন ৫ আপনি মরিয়া যাইতেছ
৬ পরের জন্য ৭ ভাঙাচোরা ৮ বোন

ও সাধু ভাই, তিরি[১] তো আপনা জানলাম রে,
মরদের কামাই খায়।
টান করিয়া কথা কইলে[২]
রাঁড়ী অইত চায়[৩] ॥

ও সাধু ভাই, তিরি তো আপনা জানলাম রে,
একই ঘরে বাস।
ঘরতনে বারইয়া গেলে[৪]
খাওয়ায় বাটার পান[৫] ॥

সাধু ভাই, পেক্ অনে পানি ভালা[৬] রে,
কি কইমু তোরে।
এড়ী[৭] হনে[৮] রাঁড়ী ভালা
অকারণ জীবন রে ॥

সাধু ভাই, উঁচ-কপালী চিরল-দাঁতী রে,
পিঙ্গলা মাথার কেশ।
নিজর স্বামী লইয়া ফিরের[৯] দেখ,
ভরমে নানান দেশ ॥

সাধু ভাই, কইন[১০] তো ফকির উমেদ আলী,
হায় রে, নদীয়ার কূলে বইয়া[১১]।
তিরির লাগি' পাগল অইয়া[১২]
পাই না মর্ম্ম-কথা ॥

১ স্ত্রী ২ কটু কথা বলিলে ৩ হইতে চায় ৪ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলে ৫ (উপপতিকে) বাটার পান খাওয়ায় ৬ পাঁক হইতে জল ভালো ৭ যে স্ত্রীলোক স্বামীকে ছাড়িয়া বাপের বাড়ীতে অবস্থান করে ৮ হইতে ৯ ফিরে ১০ কহেন ১১ বসিয়া ১২ হইয়া

।২৪৮।

॥ বৈষ্ণব প্রতিবেশে ॥

মোরে লও সঙ্কট উদ্ধারি', বন্ধু, প্রেমিকের কাণ্ডারী
চাইনা রে তোর দালান-কোঠা—
চাই না ঘর-বাড়ী।
হায় রে, প্রেমভিক্ষা দেও প্রাণ-নাথ :
আমি দুই চরণে ধরি ;
রে বন্ধু, প্রেমিকের কাণ্ডারী ॥

জল ভরি' সারি সারি গেলা সব পরী :
আয় রে,[১] খালি কুম্ভ কান্ধে লইয়ে
আমি যমুনাতে ফিরি।
রে বন্ধু, প্রেমিকের কাণ্ডারী ॥

আর যদি না দেও কলসী ভরি'
দেও রে হীরার ছুরি :
আয় রে, শরম হনে[২] মরণ ভালো
আমি জলের ঘাটে মরি।
রে বন্ধু, প্রেমিকের কাণ্ডারী ॥

অখির জলে পাষাণ গলে, দিবা-নিশি ঝুরি ;
পাগল আরকুম বলে, দুখ নাই[৩] দিলে যদি
কলসী ভরি' মরি।
রে বন্ধু, প্রেমিকের কাণ্ডারী ॥

১ হায় রে ২ হইতে ৩ না হয়

। ২৪৯ ।

জলধারা পড়ে দুই নয়ানে গো,
আদরের বন্ধু, আও রে[১] ॥

আর আদরের আদরিণী বন্ধু আমার,
গুণমণি রে—
আইজ আমার বন্ধু বিনে
কে ডাকব[২] আদরে গো ॥

আর বন্ধু আমার গুণধাম,
কার কুঞ্জেতে রইলায়[৩] শ্যাম রে—
ও আজি কার কুঞ্জেতে পোসাইলায়[৪] রজনী গো ॥

আর কহে হীন চন্দ্রনাথে
শুনো এগো প্রাণ-ললিতে—
ও আমার আশা বন্ধ রইল শিব-চরণে গো ॥

। ২৫০ ।

পথপানে চাইয়া রইলাম,
মনের অভিলাষ গো—
দেখি, বন্ধু আসে কি না আসে;
সখি গো, দিবারাত্র এই ভাবনা মন-সায়রে ভাসে।
আইল না মোর প্রাণবন্ধু
রইল কার মন্দিরে গো :
দেখি, বন্ধু আসে কি না আসে ॥

১ এসো গো ২ ডাকিবে ৩ রহিলে ৪ পোহাইলে, কাটাইলে

সখি গো, আইত[১] যদি কালাচান্দ
বসাইতাম সামনে ;
এগো কইতাম মনের দুখ মুই
ধরিয়া চরণে গো।
দেখি, বন্ধু আসে কি না আসে ॥

সখি গো, বন্ধের[২] জ্বালায় মন উতলা
রইতে নারি ঘরে ;
এগো, লোকসমাজে যাইতে নারি
কলঙ্কেরি ডরে গো।
দেখি, বন্ধু আসে কি না আসে ॥

সখি গো, সাজাইয়া ফুলেরি শয্যা
বইসে[৩] আছি পাশে ;
এগো, ধৈর্য তো না মানে চিত্তে
বিনা দরিশনে গো।
দেখি, বন্ধু আসে কি না আসে ॥

সখি গো, জ্বালাইয়া মোমেরি বাতি
পোসাইলাম[৪] রজনী
এগো, আশার দ্বার বন্ধ করি'
লইয়া গেল ছুড়ানি[৫] গো।
দেখি, বন্ধু আসে কি না আসে ॥

সখি গো, শেখ আব্দুল ওয়াহিদ কইন[৬]
আশা রইল মনে ;
এগো, আশা দি'[৭] নিরাশা করি'
শেষে মাইল[৮] প্রাণে গো।
দেখি, বন্ধু আসে কি না আসে ॥

---

১ আসিত ২ বন্ধুর ৩ বসিয়া ৪ পোহাইলাম, কাটাইলাম ৫ চাবি ৬ কহেন ৭ দিয়া
৮ মারিল

। ২৫১ ।

নিশাকালে নিদ্রা ভঙ্গ রে বন্ধু,
ও আমি জাগিয়া না পাইলাম
বা শ্যামকালিয়া—
ও তুমি একবার আস দেখি
বা শ্যামকালিয়া ॥

বানাইয়া সোনার রে বাঁশী—
বাঁশী একবার বাজাও শুনি ;
এগো, আকাশে উড়াইয়া নিলায়[১] রে বন্ধু,
ও আমার শ্রীরাধিকার প্রাণি[২] ।
বা শ্যামকালিয়া—
ও তুমি একবার আস দেখি
বা শ্যামকালিয়া ॥

আর আউলাইয়া[৩] মাথারি রে কেশ
খোঁপা নাই সে বান্ধে ;
এগো, হায় কিষ্ণ, হায় কিষ্ণ বলি' রে বন্ধু,
ও আমার গোপীগণে কান্দে ।
বা শ্যামকালিয়া—
ও তুমি একবার আস দেখি
বা শ্যামকালিয়া ॥

জ্বালাইয়া মোমেরি রে বাত্তি
পোসায়[৪] সারা নিশি :
এগো, আইছে[৫] না শ্যাম চিকনকালা রে বন্ধু,
ও আমার নিশি গেল পোসাইয়া ।
বা শ্যামকালিয়া—
ও তুমি একবার আস দেখি
বা শ্যামকালিয়া ॥

---

১ নিলে, লইলে ২ প্রাণ ৩ আলুলায়িত করিয়া ৪ পোহায়, কাটায় ৫ আসিয়া

তোষের আনলে[১] রে বন্ধু,
ঘইয়া-ঘইয়া[২] জ্বলে ;
এগো, তোমার লাগিয়া রে বন্ধু,
ও আমার চিত্ত জ্বলে।
বা শ্যামকালিয়া—
ও তুমি একবার আস দেখি
বা শ্যামকালিয়া ॥

। ২৫২ ।

সজনী-সই গো,
আমি রইলাম কার আশায় :
চুয়া-চন্দন-ফুলের মালা—
আমি থইছি কটরায়[৩]।
—সজনী-সই গো ॥

গাঁথিয়া বনফুলের মালা
আমি দিতাম কার গলায় :
একেলা মন্দিরে ঝুরি—
না আইল শ্যামরায়।
—সজনী-সই গো ॥

নিশি অলন[৪] শেষকালে বন্ধু
ডাক্‌ছে কোকিলায় :
দারুণ কোকিলার সুরে—
আমার বন্ধে[৫] আমায় ছাড়িয়া যায়।
—সজনী-সই গো ॥

১ তুষের অনলে ২ থাকিয়া-থাকিয়া, অনুক্ষণ ৩ কৌটায় ভরিয়া থুইয়াছি ৪ নিশি শেষ হইল (?) ৫ বন্ধু

ভাইবে[১] রাধারমণ বলে,
আমি ঠেকিয়াছি প্রেমদায় :
দারুণ আঞ্চির জলে—
আমার ঝিল-মিল করিয়া যায়[২]
—সজনী-সই গো ॥

। ২৫৩ ।

রসিক, তুমি আইলায় না[৩] রে, হয় রে নাথ,
ও রাধার এ দুঃখ সময়ের কালেতে ;
কাঙালিনীর মতো হায় বা নাথ,
বসিয়া রাজপন্থ—সারা নিশি গত।
রে বন্ধু, না আসিলায় নাথ—
ও রাধার এ দুঃখ সময়ের কালেতে ॥

তুই বন্ধের পিরিতি হায় বা নাথ,
তুই প'রিয়া[৪] ডাকাতি ;
হয় রে, গেলে নি আসিবায় রে বন্ধু,
শ্যাম-চিকন কালা।
ও রাধার এ দুঃখ সময়ের কালেতে ॥

তুই বন্ধের পিরিতি হায় বা নাথ,
কুমারের পইন্নি[৫] ;
ওয়রে[৬] বাহিরে মাটির লেপা বন্ধু,
ভিতরে আগুইন্নি[৭]।
ও রাধার এ দুঃখ সময়ের কালেতে ॥

১ ভাবিয়া ২ মন আকুল হইয়া যায় ৩ আসিলে না ৪ দুই পহরিয়া, দুপুরের ৫ কুমারের পুঁইশালা ৬ উহার ৭ আগুন

ঘোড়া জোড়া লইয়া হায় বা নাথ,
লালরফং[1] গেলায় ধাইয়া ;
হয় রে, কোন্[2] না কামিনীয়ে পাইয়া তোরে
রাখিয়াছে ভুলাইয়া ।
ও রাধার এ দুঃখ সময়ের কালেতে ॥

তোমার দিগে চাইয়া হায় বা নাথ,
দিন তো গেল গইয়া ;
হয় রে, না পাইলাম তোমারে রে বন্ধু,
অভাগিনী হইয়া ।
ও রাধার এ দুঃখ সময়ের কালেতে ॥

। ২৫৪ ।

প্রাণের বন্ধু[3] আনিয়া দেখাও গো ।
প্রাণনাথ-বিচ্ছেদে আমার
প্রাণ জ্বলে গো ॥

আর প্রাণ নিলায়,[4] প্রাণটি গো নিলায়,
আমার অঙ্গের নিলায় আধা ;
এগো, আশা দিয়া প্রাণের বন্ধে
দেখ, মাঝগাঙে ডুবাইল গো ।
প্রাণনাথ-বিচ্ছেদে আমার
প্রাণ জ্বলে গো ॥

১ কাল্পনিক জগৎ বিশেষ ২ যেন কোন্ ৩ প্রাণের বন্ধুকে ৪ লইলে

আর হস্ত দিয়া চাও,[১] ওগো সখি,
আমার অঙ্গ জ্বলিয়া যায় ;
তেবু তো নিঠুর শ্যামে
দেখ, ফিরিয়া না চায় গো ।
প্রাণনাথ-বিচ্ছেদে আমার
প্রাণ জ্বলে গো ॥

আর প্রাণ জ্বলে, প্রাণটি গো জ্বলে
আমার অঙ্গের জ্বলে আধা ;
এগো তেবু তো নিঠুর শ্যামে বলে--
শ্যাম-কলঙ্কী রাধা গো ।
প্রাণনাথ-বিচ্ছেদে আমার
প্রাণ জ্বলে গো ॥

আর বাণেশ্বরে বলে. গো রাধে,
না ভাবিয়ো মনে :
তোমার লাগি' শ্যামচান্দে
দেখ, রাইতে-দিনে[২] ঝুরে[৩] গো
প্রাণনাথ-বিচ্ছেদে আমার
প্রাণ জ্বলে গো ॥

। ২৫৫ ।

হায় রে বন্ধু, বন্ধু তুমি রসিয়ার নাগর—
তোমার পিরিতে তনু মোর হইল জরজর

১ হাত দিয়া অনুভব করিয়া দেখ ২ দিনরাত্রিতে ৩ কাঁদে

তোমার পিরিতে রে বন্ধু,
তনু হইল মোর ক্ষীণ ;
মিছা আশা দিয়ে বন্ধু
ভাঁড়[১] কতোদিন।
রে বন্ধু, রসিয়ার নাগর,
তোমার পিরিতে তনু মোর হইল জরজর ॥

শোভা নাই, ছুরত[২] নাই,
কেমনে পাইমু তোরে ;
বেনিশানের[৩] নিশান আমি
পাইমু কোথা গেলে।
রে বন্ধু, রসিয়ার নাগর,
তোমার পিরিতে তনু মোর হইল জরজর ॥

বেনিশানের নিশান আমি
যেই হেনে[৪] পাইমু ;
চরণের ধুলা হইয়া তাঁর
চরণে লাগিমু।
রে বন্ধু, রসিয়ার নাগর,
তোমার পিরিতে তনু মোর হইল জরজর ॥

কদমতলে বসি' বন্ধু
বাজাও মোহন বাঁশী ;
বাঁশীর সুরে চিত্ত মোর
কইল[৫] উদাসিনী।
রে বন্ধু, রসিয়ার নাগর,
তোমার পিরিতে তনু মোর হইল জরজর ॥

---

১ ছলনা কর, ভুলাইয়া রাখো ২ রূপ ৩ চিহ্নহীনের, অরূপ মানুষের ৪ যেই স্থান হইতে ৫ করিল

যমুনার ঘাটে বাঁশী
বাজে নিরবধি ;
কলসী লইয়া যাইতু[১] জলে
ননদিনী ।
রে বন্ধু, রসিয়ার নাগর,
তোমার পিরিতে তনু মোর হইল জরজর ॥

ঘরে বৈরী ননদিনী,
পন্থে বৈরী লোভা[২]
বাদলের মতো হইল আমার
চান্দের শোভা[৩] ।
রে বন্ধু, রসিয়ার নাগর,
তোমার পিরিতে তনু মোর হইল জরজর ॥

ফকির ওহাবে কয়,
ব্যাকুল আমার মন ;
বিনি দীরূপে[৪] চরণ উজ্জল
হইব কেমন ।
বন্ধু রে, রসিয়ার নাগর,
তোমার পিরিতে তনু মোর হইল জরজর ॥

।২৫৬।

ওরে, তোমার মনে কান্দাইবার বাসনা,
রে প্রাণনাথ—
দুখিনীরে তোমার মনে কান্দাইবার বাসনা

১ যাইবে ২ লোভ ৩ মেঘে ঢাকা চাঁদের শোভা, হাসি-কান্নায় মিশ্রিত (?) ৪ বিনা দীপে

আর প্রথম মিলনের কালে, ও বন্ধু,
গগনের চান্দ হস্তে দিলায়[১] রে।
ওরে এখন কেনে ছাড়িয়া যাও আমারে॥

আর তুমি গেলায়[২] পরবাসে—
আমি রইলাম তোমার আশে রে।
ওরে, আমি রইলাম গোকুল নগরে॥

আর তুমি বন্ধু সখা যার—
কিবা দুঃখ সুখ তার রে।
ওরে, কিবা আর জীবন আর মরণে॥

আর বাজাইয়া মোহন বাঁশী
মনোপ্রাণে কইলায়[৩] উদাসী রে।
ওরে, বাঁশীর সুরে ভুলাইলায়[৪] রাধারে॥

আর তোমার বাঁশীর সুরে—
ভাটিয়াল নদীয়ে উজান ধরে রে।
ওরে, বুক ভেসে যায় দুই নয়নের জলে॥

আর ভাইবে[৫] রাধারমণে বলে—
ঠেকিয়াছি পিরিতের জালে রে।
ওরে, দাসী বানাই'[৬] সঙ্গে নেও আমারে॥

।২৫৭।

তোমার বাঁশীর সুরে
উদাসী বানাইলায়[৭] মোরে রে;
এগো, বাঁশীর সুরে করিয়াছে পাগল রে—
আরে ও প্রাণনাথ,
তোমার বদল দিয়া যাও বাঁশী॥

১ দিলে ২ গেলে ৩ করিলে ৪ ভুলাইলে ৫ ভাবিয়া ৬ বানাইয়া ৭ বানাইলে

আর তোমার বাঁশীর সুরে
উদাসী করিলা মোরে রে ;
এগো, বন্ধের[১] জ্বালায় আইলাম[২] পাগলিনী রে—
আরে ও প্রাণনাথ,
তোমার বদল দিয়া যাও বাঁশী ॥

আর শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাইতে
বিদায় মাঙ্গইন[৩] রাইয়ার কাছে রে ;
এগো নারী অইয়া[৪] কেমনে দেই বিদায় রে—
আরে ও প্রাণনাথ,
তোমার বদল দিয়া যাও বাঁশী ॥

আর তোমার বাঁশীর সুরে
ভাটিয়ল নদী উজান ধরে[৫] রে ;
ও আমি যৌবত নারী,[৬] কেমনে রই পাসরি' রে—
আরে ও প্রাণনাথ,
তোমার বদল দিয়া যাও বাঁশী ॥

আর আমি তো অভাগীর নারী,
বন্ধের জ্বালায় কলঙ্কিনী রে ;
এগো, বন্ধের জ্বালায় অইলাম অভাগিনী ও—
আরে ও প্রাণনাথ,
তোমার বদল দিয়া যাও বাঁশী ॥

কিবা[৭] মোরে সঙ্গে নেও,
কিবা মোরে বাঁশী দেও রে ;
এগো, বাঁশীর সুরে কইল[৮] যে পাগল রে—
আরে ও প্রাণনাথ,
তোমার বদল দিয়া যাও বাঁশী ॥

১ বন্ধুর ২ আসিলাম ৩ মাগেন ৪ হইয়া ৫ ভাটির স্রোত উজান বহে ৬ যুবতী নারী
৭ হয়, কিম্বা ৮ করিল

কিবা মোরে সঙ্গে নেও,
কিবা মোরে বাঁশী দেও রে :
ওরে, তোমার সঙ্গে বানাই' নিবায় দাসী[১] রে—
আরে ও প্রাণনাথ,
তোমার বদল দিয়া যাও বাঁশী ॥

অরে ভাইবে রাধারমণ বলে,
বাঁশী না অয় লইছে মনে রে ;
এগো, বাঁশীর স্বর দি'[২] কত পাগল বানাও রে—
আরে ও প্রাণনাথ,
তোমার বদল দিয়া যাও বাঁশী ॥

। ২৫৮ ।

নিদারুণ পরানের বন্ধুরে, বড়ো নিদারুণ,—
হয় রে, ইদ্‌রেতে[৩] জ্বালাইয়া দিলায়[৪]
পিরিতের আগুইন[৫] রে ।
ও আমার বন্ধু বড়ো নিদারুণ রে ॥

বাঁশীটি বাজাও বন্ধুরে, আমারে শিখাও ;
ওয়রে,[৬] আমি বাজাই মোহন বাঁশী—
বন্ধু, তুমি ভুলিলাও[৭] রে ।
ও আমার বন্ধু বড়ো নিদারুণ রে ॥

১ তোমার সঙ্গের দাসী করিয়া লইবে ২ দিয়া ৩ হৃদয়েতে ৪ দিলে ৫ আগুন ৬ হায়রে ;- অব্যয় পদ ৭ ভুলিয়া যাও

আর কদম্বেরি ডালে বসি' বন্ধু রে,
বাঁশীটি বাজাও ;
হয় রে, নাম ধরিয়া ডাকে বাঁশীয়ে
প্রাণি[১] নিতে চায়রে।
ও আমার বন্ধু বড়ো নিদারুণ রে ॥

আর গয়া-কাশী বিচারিলু[২] বন্ধু,
তিরতিয়া বানারসী[৩] ;
কাল নিদ্রাতে গিয়া দেখি—
দমে ফুঁকে মোহন বাঁশী রে।
ও আমার বন্ধু বড়ো নিদারুণ রে ॥

আর শা হুছন আলমে কয়—
বন্ধুরে, আছি একাশরী[৪] ;
বন্ধুরে বিচার্‌তে[৫] আমারে
কাল ননদী বয়রী[৬]।
ও আমার বন্ধু বড়ো নিদারুণ রে ॥

। ২৫৯ ।

চিকন গোয়ালিনি গো, রসের ময়লানি[৭]
এইরূপ যৌবন গো তোমার
জোয়ারের পানি।
গো চিকন গোয়ালিনি ॥

---

১ প্রাণ ২ ভ্রমণ করিলাম খুঁজিয়া বেড়াইলাম ৩ বেনারস। 'তিরতিয়া'র অর্থ বোঝা গেল না ৪ একেশ্বর, একাকী ৫ খুঁজিতে ৬ বৈরী ৭ পসারিণী, ময়রানী

হায় বা' গোয়াল রে,
আড়ি কোণা[১] ঘোর করিয়া
মেঘে দিল ডাক ;
ভাঙ্গিল কাঁড়ারীর[২] বৈঠা, নৌকায় লইল পাক[৩]।
ভাগিনা কানাই হইল—দুই পরিয়া[৪] ডাকাইত
ল' চিকন গোয়ালিনি ॥

হায় বা' গোয়াল রে,
দই বেচ', দুধ বেচ,'
আর যে বেচ' লনী[৫] ;
দই বেচ' আনা-আনা, দুধু বেচ' পণ।
ভাগিনা কানাইরে যাচ' ওই লাখের যৌবন।
ল' চিকন গোয়ালিনি ॥

হায় বা' গোয়াল রে,
কয় তো সাধু মদন শায়
লঙ্গাইর[৬] পার বইয়া :
এই লাখের যৌবন গেল—
আমি না পাইলাম খুড়িয়া[৭]।
গো চিকন গোয়ালিনি ॥

। ২৬০ ।

ও ধন যাদুরে, ও ধন বাছা,—
ও তোর মায়ে তোরে ডাকে, রে ধন যাদু রে

১ অগ্নি কোণ ২ কাণ্ডারীর ৩ নৌকা পাক খাইতে লাগিল ৪ দুই পহরিয়া, দ্বিপ্রহরেও যে ডাকাতি করে ৫ ননী ৬ শ্রীহট্ট জেলার করিমগঞ্জ মহকুমার একটি নদীর নাম ৭ খুঁজিয়া

আর ছিকা কেনে লড়ে[১] রে বাছা,
লনী খাইল কুনে[২]।
হায় রে, আমি তো না খাইছি মাও গো,
খাইছে তোর বিলাইয়ে ॥

আর এত বয়সের যাদু, রে মণি,
মিছা শিখলে কই।
হায় রে, সর-লনী খাইয়া বল—
না খাইয়াছ দই ॥

আর এক্ত-ব্যক্ত[৩] মনরে,
ত্যক্ত যাদু রইল রে বসিয়া।
হায় রে, হস্তে বাড়ি[৪] লইয়া গো
মায়ে নিল খেদাড়িয়া[৫] ॥

আর হস্তে বাড়ি লইয়া রে
মায়ে নিল খেদাইয়া।
হায় রে, লফ্ফি মারি'[৬] উঠে রে যাদু
কদম ডাল বাইয়া ॥

আর ফালাইলাম হস্তেরি বাড়ি
যাদব, ধীরে লাম আইয়া[৭]।
ওয়রে, চিকনি[৮] কদম্বের ডাল
পড়িবায় ভাঙ্গিয়া[৯] ॥

আর দারুণেরই দারুণ হস্ত
মুখের কাল-স্থর।
হয় রে, এককুয়া[১০] লনীর লাগিয়া
যাদব গেল দূর ॥

---

১ শিকা কেন নড়ে ২ কে ননী খাইল ৩ তিক্ত-বিরক্ত ৪ ছড়ি ৫ তাড়াইয়া ৬ লাফ মারিয়া ৭ ধীরে নামিয়া আইস ৮ সরু ৯ ভাঙ্গিয়া পড়িবে ১০ এতটুকু

আর রাখালেরই গোরু গো রাখা
অনে আর বনে[১]।
ওয়রে, আজুকুয়ার[২] ধেনু গো মায়ি
রউকা[৩] যে বান্ধনে ॥

আর কান্ধে কলসী লইয়া গো মায়ে
যমুনাতে যায় ;—
হয় রে, সুবর্ণের কলসীয়ে
মায়ের গড়াগড়ি খায় ॥

আর কি না বুলি বুল্‌লে[৪], রে বাছা,
কি না লইল মনে।
হয় রে, আজুকুয়ার ধেনু আমার
রইতা যে বান্ধনে ॥

আর দশমাস দশ রে দিন
উদরে রাখিয়া—
হয় রে, হেন কথা কইল যাদু
কার পানে চাইয়া ॥

আর ছইফা ফকিরে বলে—
লনীর তছদ্দুক[৫]।
হয় রে, হারাইয়া চান্দমণি
বুকে রইল দুখ ॥

১ এখানে-সেখানে ২ আজিকার ৩ রহুক ৪ বলিলে ৫ ননী যাউক, তাহাতে দুঃখ নাই

। ২৬১ ।

॥ সূফী প্রতিবেশে ॥

তুইন[১] বড়ো দয়াল রে বন্ধু,
তুইন বড়ো দয়াল বন্ধুয়া রে—
তুইন বড়ো দয়াল বন্ধু রে ॥

আপনার নূর[২] দিয়া
মোহাম্মদ করিলায়[৩] পয়দা,—
সেই নূরে সয়াল সংসার[৪] ॥

কোরানে শুইনাছি[৫] আমি
এই দেহাতে আছ তুমি,—
তোমার নাম করিম[৬] গফ্ফার[৭]

তোমার অধীন জানি'
নয়ান ফিরাও ল' ধনি রে—
তোমার নাম রহিম[৮] রহমান[৯] ॥

কইন তো সৈয়দ সৈদ আলি ছাব[১০]
ঘুমের ঘোরে শইয়া[১১] থাকি রে,—
ঘুমের ঘোরে শইয়া থাকি
সোনাপুরে নাচে বন্ধুয়া রে ॥

। ২৬২ ।

আমি দেখতে চাইলে না দেখি তোমারে হ'[১২]—
কেন দয়াল, ভিন্ন বাসো[১৩] মোরে ॥

---

১. তুই ২ জ্যোতি ৩ করিলে ৪ সকল সংসার (পরিপূর্ণ) ৫ শুনিয়াছি ৬ দয়াকারী ৭ ক্ষমাকারী ৮ দয়াকারী ৯ দয়াকারী ১০ সাহেব ১১ শুইয়া ১২ হে ১৩ পর ভাবো

আল্লাহুম্মা ছল্লিআলা[১]
বলো চান্দ বদনে ;
মোহাম্মদে হবিব[২] নাম
রাখছইন[৩] নিরঞ্জনে হ’ ।
কেন দয়াল, ভিন্ন বাসো মোরে ॥

তোমার ইছিমে পয়দা
আজিজুল কোরান[৪] ;
আকাশে পাতালে তোমার
আদম[৫] আর ইনছান[৬] হ’ ।
কেন দয়াল, ভিন্ন বাসো মোরে ॥

শাহ হুছন আলীয়ে কয়
নয়ন মেলিয়া—
মরা কাষ্ঠের জীন্ন[৭] তনু
অঙ্গ পরশিয়া হ’ ।
কেন দয়াল, ভিন্ন বাসো মোরে ॥

। ২৬৩

ধুড়িলে বন্ধুরে পাইবায়[৮] ’—
আছইন[৯] বন্ধু ছিরিপুর ।
আগে চিন’ মোহাম্মদী নূর[১০] ॥

১ একটি দরুদ । “আমি মোহাম্মদকে (প্রশস্তি জানাই) প্রণতি জানাই” ২ বন্ধু (আল্লার) ৩ রাখিয়াছেন ৪ তোমার নামে শ্রেষ্ঠ কোরান রচিত ৫ প্রথম মানুষ ৬ মানুষ ৭ জীর্ণ ৮ খুঁজিলে বন্ধুকে পাইবে ৯ আছেন ১০ জ্যোতি

আর ছিরিপুর দেশের মাঝে—
লাহুতের বাজার আছে গো।
এগো, দিবানিশি সেই বাজারে —
হু-হু শব্দে উঠে সুর ॥

আর অপরূপ সে বাজারে—
সোনার মউরে[১] পেখম ধরে গো।
হস্তী-বাঘে খেলা করে—
শব্দ উড়ে আদমপুর[২] ॥

লাহুতের বাজারের মাঝে—
রূপের ঘরে ঘণ্টা বাজে গো।
এগো, ঘুর্-ঘুর্ সুরে ডম্কা[৩] বাজে—
বাঁশী বাজে সুলতানপুর ॥

রূপের ঘরে আজবলীলা—
চান্দের মাঝে বন্ধের খেলা গো।
এগো, যে দেখিছে রাজা হইছে—
মৃত্যু নাই তার জগৎপুর ॥

লাহুতে ব্যাপারী যারা—
সই গো, চারিপুরে থাকে তারা গো।
এগো, অমূল্য রতন কিনে—
বান্ধিছে কাম-সমন্দুর[৪] ॥

আর লাহুতের বিকিকিনি—
হীরালাল পরশমণি গো।
এগো, খরিদ করে যেই জনে—
থাকে সেই আদমপুর ॥

১ ময়ূরে ২ পৃথিবীতে ৩ ডঙ্কা ৪ কামসমুদ্র

শীতালং ফকিরে বলে
শাশুড়ী-ননদীর জ্বালে[১] গো—
এগো, ডুবাইত[২] চায় আমার
ভরা সাগরে কাল-সমদ্দুর ॥

। ২৬৪ ।

ও নাড়া দরবেশ,[৩] ভুইলে[৪] রইলাম রে,
দির্‌বের[৫] হুকুম হইল না ;—
যার ছায়ায় বে'স্তে যাইতায়[৬] তারে চিনলায়[৭] না।
নাড়া দরবেশ, ভুইলে রইলাম রে,
দির্‌বের হুকুম হইল না ॥

মা বাপের খেজমত[৮] কইলাম রে—
মুরশিদের খেজমত।
দিনে-রাস্তে বাত্তি জলের
কয়বরের ভিতর ॥

আল্লায় দিলা ডাইল-চাউল
মুরশিদে দিলা কড়ি।
সমদ্দুরের[৯] পারে নিয়া
বসাইলা খিঁচুড়ি ॥

সেই নাড়ায় রুচিলা[১০] গীত
জঙ্গলে বসিয়া।
আল্লায় যদি দয়া করইন
দিবা যে রাখিয়া ॥

---

১ জ্বালায় ২ ডুবাইতে ৩ পদকর্তার নাম ৪ ভুলিয়া ৫ দৈবের ৬ বেহেস্তে যাইতে
৭ চিনিলে ৮ সেবা ৯ সমুদ্রের ১০ রচিল

। ২৬৫ ।

॥ মনের মানুষ ॥

মনিয়া, তোর লাগিয়া রে
ভর্‌মি নানান দেশ ;
হায় রে, ভর্‌মিতে-ভর্‌মিতে রে—
মনিয়ার না পাইলাম উদ্দেশ।
রে মনিয়া, তোর লাগিয়া রে ॥

আর ছোটমুট[১] মনিয়া পাখী
বারিকদানা[২] খায়।
হায় রে, পানির পিয়াসে মনিয়ার
কলিঞ্জা[৩] শুকায় ॥

আর সোনার পিঞ্জিরা মনিয়ার
রূপার টাঙ্গুনি[৪]।
হায়রে, কাঁসার রুমালে রে
মনিয়ার পিঞ্জিরা ঢাকুনি ॥

আর অতদিন[৫] পালিছ্‌লাম[৬] রে মনিয়া,
দুধ-কলা দিয়া।
হায় রে, যাইবার কাল নিঠুর মনিয়ায়
না চাইল ফিরিয়া ॥

আর সোনার খাটে রইছ[৭] রে মনিয়া,
রূপার খাটে পাও।
হায় রে, অনাথ বালকে ডাকি'
ফিরিয়া না চাও।

---

১ ছোটোখাটো ২ ক্ষুদ্রশস্যকণা ৩ কলিজা ৪ খাঁচা টানাইবার দড়ি ৫ এতদিন
৬ পালিয়াছিলাম ৭ বসিয়াছ

আর শূন্য ভরে উড়' রে মনিয়া,
গাছের বৃক্ষের ডালে।
হায় রে, এমন দইরদী[১] নাইরে আমার-
মনিয়া ধরিয়া দিতে॥

আর কইন তো ফকির রমজান শায়ে—
আবাতির টিলায়[২] বইয়া।
হায় রে, পাইমু পাইমু করি'।
আমার দিন তো যাইত্রা গইয়া॥

। ২৬৬।

পাইলাম না, পাইলাম না বন্ধুরে,
পাইলাম না তোমারে ;
হায়রে, জন্ম ভরি' রইল দুখ, বন্ধু,
না দেখিলাম তোমারে।
রে বন্ধু, আমি পাইলাম না রে॥

আর তোমার বাড়ী সোনার মন্দির—
রে বন্ধু, আমার ভাঙ্গা ঘর।
হায়রে, কি সুখে শইয়া[৩] আছ—
না লও খবর॥

আর তুমি তুষ্ট, আমি উদাস,
রে বন্ধু, তোমারি কারণ।
হায় রে, কান্দিয়া পোসাইলাম[৪] নিশি
রে বন্ধু, না হইল দরশন॥

---

১ দরদী ২ একটি টিলা বিশেষ ৩ শুইয়া ৪ কাটাইলাম

আর তুমি হাস, আমি কান্দি,
রে বন্ধু, নাই তোর রে মায়া।
হায় রে, কতো মুছিবত[১] গেল
রে বন্ধু, না করিলায়[২] দয়া ॥

আর রঙ্গ গেলা, রূপ গেলা,
রে বন্ধু, তোমারি কারণ।
হায় রে, জাতি-কুল-যৈবন দিয়া
রে বন্ধু, না পাইলাম তোর মন ॥

আর হায় আল্লা, দীনবন্ধু রে,
দয়া নাই রে তোর।
হায় রে, কলিঞ্জা[৩] জ্বলিয়া যায়
রে বন্ধু, সারারাত্রি উজাগরি[৪] ॥

আর কত সইমু দুখ, রে বন্ধু,
প্রাণে নাহি সহে।
হায় রে, আর কে মোরে করিব ভালা[৫]
রে বন্ধু, প্রেমের বেমার[৬] ॥

আর উঠিতে বসিতে না পারি
রে বন্ধু ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়ি।
হায় রে, প্রেমের দুঃখের বেমার লইয়া
যাইমু কার বাড়ী ॥

আর চলিতে না চলে পাও,
রে বন্ধু, গায়ে নাইরে বল।
হায় রে, তোমার লাগি' উদাস হইয়া
রে বন্ধু, হারিলু[৭] সকল ॥

---

১ বিপদ ২ করিলে ৩ কলিজা ৪ জাগরণ ৫ ভালো করিবে ৬ ব্যাধি ৭ হারাইলাম

আর নাদান[১] ফরমুজে কহে—
বন্ধু রে, না দেখি উপায়।
হায় রে, প্রেমের বেমার হইয়া
রে বন্ধু, এই ভিক্ষা মাগি ॥

। ২৬৭ ।

ও আমি পাইলাম না গো
আমার জীবন থাকিতে।
হায় হায়, আমি পাইলাম না গো ॥

সই গো সই,
পাইতাম যারে, পাইনা না গো তারে
সদায়[২] থাকে মনে।
হায় রে, গহীনেতে[৩] আইসে যায়-
না দেখি নয়নে ॥

সই গো সই,
নগরে চলিলাম বা' মুরশিদ
তাল্লাস করিয়া।
হায় রে, দারুণ হইছে কাল ননদী-
ফিরইন[৪] সাথে সাথে ॥

সই গো সই,
খালি দেখি গোয়াল পাড়া
দুয়ারেতে তালা।
হায় রে, নিশিগত হইয়া যায়—
না আসিলা কালা ॥

১ বুদ্ধিহীন ২ সদাই ৩ মনের গহনে, অজ্ঞাতে ৪ ফিরেন

সই গো সই,
অধম আবজলে বলে
মন দুরাচার।
হায় রে, আর নি[১] করিতায়[২] সওদা—
ভাঙ্গিলে বাজার ॥

। ২৬৮ ।

আমি কই যাইরে, আমার দু:খের সীমা নাই :
যার কাছে কইতাম দু:খ, তার দুঃখের সীমা নাই
আমি কই যাই রে ॥

ভাই রে ভাই, সুখী জনায়[৩] নাহি জানে
দুখী জনার মন ;
অধমে অধম চিনে,—উত্তমে উত্তম।
আমি কই যাই রে ॥

ভাই রে ভাই, আড়[৪] খাইল আড়ুয়া পোকে[৫]
মাড়ইল[৬] খাইল ঘুণে :
এমন সুন্দর জিভাই চুয়ায় রাত্রদিনে[৭]।
আমি কই যাই রে ॥

ভাই রে ভাই, অনিল জঙ্গলের[৮] মাঝে
বানাইয়াছি ঘর ;
ভাই নাই, বান্ধব নাই, কে লইব[৯] খবর।
আমি কই যাই রে ॥

১ আর কি ২ করিবে ৩ জনে ৪ হাড় ৫ হাড়ুয়া পোকা, যে পোকা হাড় খাইয়াছে
৬ মজ্জা ৭ (?) ৮ নিবিড় জঙ্গলের ৯ লইবে

ভাই রে ভাই, অমায়া সাগরের[১] মাঝে
ভাসিয়া ফিরি ফেনা ;
হায় রে, কতোদিনে দয়ার নাথে লওয়াইবা ঠিকানা
আমি কই যাই রে ॥

ভাই রে ভাই, কাছাড় গিয়া আছাড় খাইলাম—
গেলাম লক্ষীপুর ;
কতোদিনে চৈতন বাউলে পাইব দরিয়ার মুড়[২] ।
আমি কই যাই রে ॥

ভাই রে ভাই, অধীন চৈতন্যে বলে,
মিছা ভবের খেলা ;
এই গীত রচিয়া চৈতন হইয়াছে পাগেলা[৩] ।
আমি কই যাই রে ॥

। ২৬৯ ।

আশিকে[৪] না ভুলিয়ো মাশুক,[৫]
পাইবায় বন্ধের ঠিকানা ।
লাইলাহা ইল্লেল্লাহু[৬] জপ' না ॥

পন্থীয়ার[৭] সনে পন্থ লইলে গো সই,
পন্থের মিলে ঠিকানা ।
হায় রে, মুরশিদ ভজিয়া
তোমার দমের[৮] সনে মিল' না

১ মায়াহীন সাগরের ২ নদীর মোহনার হদিশ ৩ পাগল ৪ প্রেমিককে ৫ প্রেমাস্পদা
৬ ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নাই। "ঈশ্বর নাই কিন্তু ঈশ্বর আছেন" ৭ পথিকের
৮ নিঃশ্বাসের

যদি চাও পিয়ারা হইতায়[১] ও সই,
এস্কের[২] শরবত পিয়ো না।
হায় রে, দড় ভাবে[৩] প্রেম কইলে[৪]
হবে বন্ধের দেওয়ানা[৫] ॥

রুশন-বদন[৬] হইলে ও সই,
দিল হয়ে যায় আয়না।
ওরে, তবে সে পাইবায় মৌলা[৭]
নয়ান খুলি' দেখ না ॥

সারা রাইত জাগিয়া রইলাম ও সই,
বন্ধু কেনে আইল না।
এগো, দেখিলে পিয়ারা মহ্‌বুব[৮]
যাইব[৯] দুখের ভাবনা ॥

বেলক্ষ্যি[১০] নূরে[১১] কহে গো সই,
দেখ বন্ধের কারখানা।
এগো, যে দেখিয়াছে, পাগল হইছে-
সদায়[১২] থাকে দেওয়ানা ॥

। ২৭০ ।

দয়া যদি থাকে রে বন্ধু,
বুইদ্ধি[১৩]দেও মোরে ;—
নিরলে[১৪] বসিয়া আমি কেম্‌নে পাই তোমারে।
রে বন্ধু, তুমি বুইদ্ধি দেও মোরে ॥

১ হইতে ২ প্রেমের ৩ দৃঢ়ভাবে ৪ করিলে ৫ বন্ধুর জন্যে পাগল হইবে ৬ জ্যোতিঃ মণ্ডিত মুখমণ্ডল ৭ প্রভু, ভগবান ৮ প্রেমাস্পদ ৯ যাইবে ১০ লক্ষ্য নাই যাহার ১১ পদকর্তার নাম ১২ সদাই ১৩ বুদ্ধি ১৪ নিরালায়

বন্ধু রে, তোমারি কারণে[১] ফিরি বনে বনে
এস্কেতে মন দেওয়ানা হইয়া[২] ;
শয়নে-ভুঞ্জনে[৩] নিদ্রা নাই নয়নে—
মনে লয়[৪], মরিয়া যাইতাম[৫] গিয়া।
রে বন্ধু, তুমি বুইদ্ধি দেও মোরে ॥

তোমার প্রেমে মজিয়া, কুলমান তেয়াগিয়া
দিনে দিনে উদাসী হইলু[৬] ;
তোমার দিগে চাইয়া, দিন তো গেল গইয়া[৭] —
তুমি কেন এত নিদারুণ।
রে বন্ধু, তুমি বুইদ্ধি দেও মোরে ॥

বন্ধু রে, তুমি আমার, আমি তোর—
একবার দয়া ধরো[৮], নৈরাশ্য[৯] না করিয়ো মোরে ;
যদি মরি তোর লাগি', তুমি হইবায় বদের ভাগী[১০]—
কলঙ্ক রইব তিরূজগতে[১১]।
রে বন্ধু, তুমি বুইদ্ধি দেও মোরে ॥

বন্ধুরে, বেদরদ বন্ধুয়া[১২], নাই তোর মায়া-দয়া—
নাই দেখি আমার দিলের তাপ[১৩] ;
দাগা দাও কি কারণে, কিবা ভাব তোমার মনে,—
দেখা দিয়া লইয়া যাও পরাণ।
রে বন্ধু, তুমি বুইদ্ধি দেও মোরে ॥

বন্ধু রে, থাকউক[১৪] তোমার সান-মান[১৫] ;—
ত্যজিমু আমারি প্রাণ, যাইমু আমি যোগুনী হইয়া[১৬] ;
তিপুর্ণিয়ার ঘাটে গিয়া, রইমু তোমার দিগে চাইয়া,—
পাইলে ধরিমু তোমার গলে।
রে বন্ধু, তুমি বুইদ্ধি দেও মোরে ॥

---

১ তোমারি জন্যে ২ প্রেমে পাগল হইয়া ৩ ভোজনে ৪ মনে হয় ৫ মরিয়া যাইব ৬ হইলাম ৭ চলিয়া ৮ দয়া করো ৯ নিরাশ ১০ তুমি বধের ভাগী হইবে ১১ ত্রিলোকে কলঙ্ক রহিবে ১২ সমব্যথা-বিহীন বন্ধু ১৩ আমার মনের উত্তাপ, দুঃখ ১৪ থাকুক ১৫ অভিমান ১৬ আমি যোগিনী হইয়া যাইব

শাহা ফরমুজ আলীয়ে বলে,—

রাত্রি-নিশাকালে ফুটে দারুণ বলওয়ার ফুল[১] ;

ফুলের বিছানা করি', বসিয়া রইলু[২] মুই নারী-

আইস বন্ধু, দেও দরশন।

রে বন্ধু, তুমি বুইদ্ধি দেও মোরে ॥

। ২৭১ ।

বন্ধুয়া রে,

আমি তোমার দর্শন ভিখারী ॥

প্রেমশেল হেনে মোরে গেলে বন্ধু দেশান্তরে—

ছিরিপুরে[৩] আছ মহানন্দে ;

কটাক্ষের মারি' বাণ, হরিলে যুবতীর প্রাণ,

প্রেমানলে বিরহিণীর মনুরায়[৪] কান্দে রে।

হায় রে বন্ধু, আমি তোমার দর্শন ভিখারী ॥

বসন্ত সময় হইল, নানা পুষ্প বিকশিল,

ফুল শইয্যা[৫] করি' অভাগিনী ;

পলক না মারি' আঁখি[৬] পন্থ নিরখিয়া থাকি—

আসার আশায় বসি' কাটাই রজনী রে।

হায় রে বন্ধু, আমি তোমার দর্শন ভিখারী ॥

দয়ার ভাণ্ডার তুমি লোকমুখে শুনি আমি

কিঞ্চিৎ দয়া করি' বিতরণ—

অধিনীর নিকেতন কর বন্ধু পদার্পণ

দয়াভাবে দুখিনীরে দেও দরশন রে।

হায় রে বন্ধু, আমি তোমার দর্শন ভিখারী ॥

১ ফুল বিশেষ ২ বসিয়া রহিলাম ১ শ্রীপুরে ২ মন ৩ ফুলশয্যা ৪ চোখের পলক না ফেলিয়া

রজনী প্রভাত হল— প্রাণ-বন্ধু না আসিল

অভাগীর ললাটে আগুন ;

আশাতে নিরাশ হনু, প্রিয়মুখ না হেরিনু,

কোকিলার রবে জ্বালা হইল দ্বিগুণ রে।

হায় রে বন্ধু, আমি তোমার দর্শন ভিখারী ॥

শুনো ইয়াছিন-বাণী— ওগো সখি বিরহিণি,

তব বন্ধুর লীলা অগণন ;

থাকে তোর সঙ্গে সঙ্গে, বেড়াইছে কতো রঙ্গে—

মনের বন্ধে মান করিয়ে না দেয় দরশন রে

হায় রে বন্ধু, আমি তোমার দর্শন ভিখারী ॥

। ২৭২ ।

আয় রে,[১] আমি তোরে ডাকি বন্ধুরে,

আয় রে, ডাকি রইয়া রইয়া।

কি দোষ পাইয়া বন্ধু

গেলায়[২] মু[৩] ছাড়িয়া রে ;

আমি তোরে ডাকি বন্ধু রে ॥

আর আনবার কাল আন্‌ছলায়্[৪] রে বন্ধু

আশা-ভরসা দিয়া।

ওরে, অখন তুমি যাইত্‌রায়[৫] ছাড়িয়া

কি দোইষ বানাইয়া[৬] রে ॥

আর মাও নাই, বাপ নাই রে,

নাইরে সোদের[৭] ভাই।

ওরে, আমি নি[৮] অভাগীর নির্লক্ষ্যীর[৯]

আর তো লক্ষ্য নাইরে ॥

১ ওরে, হায় রে ২ গেলে ৩ যে ৪ আনিবার কালে আনিয়াছিলে ৫ এখন তুমি যাইতেছ ৬ কি দোষ দেখিয়া ৭ সহোদর ৮ অব্যয় পদ। অর্থহীন ৯ লক্ষ্য নাই যাহার

আর অমায়া[১] সাগরে বন্ধু
গেলায় রে ছাড়িয়া।
আমি অভাগী জানি' রে বন্ধু,
গেলায় রে ছাড়িয়া।
আয় রে, আপন কর্ম-দোইষে আমার
কপাল জলিলা রে॥

আর শুন শুন প্রাণের বন্ধু রে,
চাও রে ফিরিয়া।
ওরে, কানর যম আসিব[২] বন্ধু
আমার লাগিয়া রে॥

আর অতি না যৈবনের কালে
মাইয়ে[৩] বাপে মোর।
ওরে বিয়া যে দিছিলা মোরে
সুখের কারণে রে॥

আর কইয়ো কইয়ো প্রাণের বন্ধু রে,
কইয়ো ভাইগণ ওরে।
আমি অভাগীর যৈবন
কার পরার ঘরে রে॥

ওরে, শীতালং ফকিরে কইন[৪] রে
গাছের তলে বইয়া।
ওরে পারইতাম পারইতাম করি'[৫]
দিন তো যায় মোর গইয়া[৬] রে

১ মায়াহীন ২ কোথাকার যম আসিবে ৩ মায়ে ৪ কহেন ৫ পার হইব-হইব করিয়া
৬ কাটিয়া, চলিয়া

। ২৭৩ ।

তুমি রইলে কই, ওবা[১] বন্ধু,
মুই রইলাম কই ;
তোমারে পাইবার লাগি' উদাসিনী হই
ওরে বন্ধ রে ॥

আর ঠগিলায়[২] আমারে রে বন্ধু,
বাজারেতে দিয়া ।
কোন্ কোঠায় সামাইলায়[৩] বন্ধু,
না পাইলাম ভুকাইয়া[৪] ॥

আর কোন্ পন্থে[৫] গেলায়[৬] রে বন্ধু,
নিলয় না পাই ।
গুন্‌গুনানি শব্দ শুনি—
ডাকিতে উদেশ নাই[৭] ॥

আর দিলালপুরে থাকো রে বন্ধু,
নছিরায়ে[৮] খেলা ।
সোনার বরণ ভুতা অইয়া[৯]
তির্‌পুণ্যিতে মেলা ॥

আর দমের কুঞ্জি[১০] দিয়া রে ভাঙ্গ
বন্ধের কোঠার তালা ।
খুলিলে বন্ধুর পাইবায়[১১]
ফরমুজে কহিলা ॥

---

১ ওহে ২ ঠকাইলে ৩ প্রবেশ করিলে ৪ খুঁজিয়া ৫ কোন্ পথে ৬ গেলে ৭ ডাকিলে উদ্দেশ মিলে না ৮ হৃদয়ে ৯ সোনার বর্ণ তোতা হইয়া ১০ নিঃশ্বাসের চাবি ১১ পাইবে

। ২৭৪

ওহে প্রাণনাথ,
আমার নিবেদন শুনরে কালিয়া,—
কি দোষে অবুলার বানে[১] রে
না চাইলায়[২] ফিরিয়া ॥

তোমার লাগিয়া আইলাম আমি রে বন্ধু,
কুলমান ত্যজিয়া ;
তুমি আমায় প্রাণে মাইলায়[৩] বন্ধু রে,
কিসের লাগিয়া রে।
কি দোষে অবুলার বানে রে
না চাইলায় ফিরিয়া ॥

কাহারে দেখাব আমি রে বন্ধু রে,
এ বুক চিরিয়া ;
তুমি আমায় প্রাণে মার রে বন্ধু,
কি দোষ পাইয়া রে।
কি দোষে অবুলার বানে রে
না চাইলায় ফিরিয়া ॥

ভাবিতে চিন্তিতে বন্ধু রে,
বন্ধু রে, দেহা[৪] গেল শুকাইয়া ;—
সোনার অঙ্গ হইল কালা, রে বন্ধু,
পিরিতের লাগিয়া রে।
কি দোষে অবুলার বানে রে
না চাইলায় ফিরিয়া ॥

১ অবলার পানে ২ চাহিলে ৩ মারিলে ৪ দেহ

কালাচান্দে বলে, বন্ধু রে,
সবিনয় করিয়া—
"সায়রে[১] ভাসাইয়া যাইলায়, রে বন্ধু,
না চাইলায় ফিরিয়া রে।"
কি দোষে অবুলার বানে রে
না চাইলায় ফিরিয়া ॥

।২৭৫।

ও শ্যাম বন্ধুয়া রে,
ও বন্ধু, আমি তোমার দরশন ভিখারী রে,
শ্যাম রে ॥

আর বন্ধের আতে[২] তোতার ছাও[৩] —
ও আল্লা, খেওয়া ঘাটে নাই রে নাও রে ;
ও আমার খেওয়ানীরে[৪] খাইছে[৫] লঙ্কার বাঘে
বা শ্যাম বন্ধুয়া রে,
ও বন্ধু, আমি দরশন ভিখারী রে,
শ্যাম রে ॥

আর বন্ধের আতে তালের পাঙ্খা[৬] —
ও আল্লা, তাতে রাধার নামটি লেখা রে।
ও আমার কালার নামটি কে দিল লিখাইয়া।
বা শ্যাম বন্ধুয়ারে,
ও বন্ধু, আমি তোমার দরশন ভিখারী রে,
শ্যাম রে ॥

১ সাগরে ২ বন্ধুর হাতে ৩ তোতার ছানা ৪ খেওয়ার মাঝিকে ৫ খাইয়াছে ৬ পাখা

আর দুখের দুখিলা[১] যত, ও আল্লা
তারারে ফালাইলাম পক্ষ[২] রে ;
ও আল্লা, তারা রইলা[৩] আল্লার দিগে চাইয়া
বা শ্যাম বন্ধুয়া রে,
ও বন্ধু, আমি তোমার দরশন ভিখারী রে,
শ্যাম রে ॥

আর কইন[৪] তো ফকির বানু শায়—
ও আল্লা, দিনের পন্থে দিন তো যায় রে ;
ও আমি বেরথা জনম গওয়াইলাম[৫] হেথায়।
বা শ্যাম বন্ধুয়ারে,
ও বন্ধু, আমি তোমার দরশন ভিখারী রে,
শ্যাম রে ॥

। ২৭৬ ।

কালা, তোর নাম শুইনা রে
আমি হইয়াছি পাগল :
রে কালা, তোর নাম শুইনা রে

আর আছমান[৬] কালা, জমিন কালা,
কালা দুইটি আখি ;
হিদ্‌রের মাঝে আছইন কালা[৭]
নয়ানে না দেখি।
রে কালা, তোর নাম শুইনা রে ॥

১ দুঃখের সমব্যথী ২ তাহাদিগকে দূরে ফেলিয়া রাখিলাম ৩ রহিল ৪ কহেন ৫ বৃথা জন্ম কাটাইলাম ৬ আশমান ৭ হৃদয়ের মাঝে কালা আছেন

আর আকাশ কালা, পাতাল কালা
কালা নদীর জল ;
কালার নাম ভরসা করি'
আমি হইয়াছি পাগল ।
রে কালা, তোর নাম শুইনা রে ॥

আর ডাইনে গঙ্গা, বামে যমুনা
মধ্যে বালুচর ;
হায়, এক চউখে[১] নি[২] কইতে পারে
আর চউখের খবর ।
রে কালা, তোর নাম শুইনা রে ॥

আর বৃক্ষের তলে গেলাম বা আল্লা
ছায়া লইবার আশে ;
পত্র ফাড়ি'[৩] রইদ[৪] লাগে
আপন কর্ম-দোইষে[৫] ।
রে কালা, তোর নাম শুইনা রে ॥

আর গাঙের পারে গেলাম বা আমি
গাঙ পারইবার[৬] আশে ;
আমারে দেখিয়া নৌকায়
ভিন্ন ভিন্ন বাসে[৭] ।
রে কালা, তোর নাম শুইনা রে ॥

আর জঙ্গলিয়া মস্তানে[৮] বলে—
কালা বড়ো ধন ;
হুভ-লোভ[৯] ছাড়িলে
পাইবায়[১০] কালার দরশন ।
রে কালা, তোর নাম শুইনা রে ॥

---

১ চোখে ২ নাকি ৩ পাতা ভেদ করিয়া ৪ রৌদ্র ৫ দোষে ৬ পার হইবার ৭ পর বলিয়া মনে করে ৮ বনের পাগল, উদাসী ৯ লোভ-লালসা ১০ পাইবে

। ২৭৭ ।

আর জ্বালা সয় না পরানে, সুন্দরি,
কদমতলায় কে বাজাইল মুররী ॥

চল সব সখীগণ, সঙ্গে মোর পাঞ্চজন,
চল যাই রাধার মন্দিরে।
কুমন্ত্রণা কেও তো দিয়ো না—
একভাবে দেখি গি'[১] বন্ধুরে ॥

যখনে[২] যমুনায় যাই, বাঁশীর রব শুনিয়ে আই[৩] ;
ডাকে বাঁশীয়ে মোরে নাম ধরি'।
হু-হু বাঁশীর সুরে, প্রাণি মোর নিল হরিয়ে-
কোন্ বন্ধে বাজায় মুররী ॥

হাতে মোহন বাঁশী বায়[৪] , নেপূর বাজে দু তায়
ঝলকিয়া উঠে অঙ্গখানি।
মালকুতে হেরিয়া, চাইয়ো নিরখিয়া—
সেই কালে আইসে ননদী ॥

কলসী লইয়া, জলেতে লামিয়া[৫]
গা'খানি ধইতে লাগে[৬] বালা ;
সেই না কলসীর জল, করে অতি টলমল—
উদয় হইলা চিকন কালা ॥

ননদী আসিয়া, কুমন্ত্রণা দিয়া
যুগ্‌তি[৭] করিল মনাইয়ের[৮] সঙ্গে।
যুগতি করিল, নিদ্রা ভুলান দিল[৯] —
জাগিয়া না পাইলাম কালা রে ॥

১ দেখি গিয়া ২ যখনই ৩ শুনিয়া আসি ৪ বাজে ৫ নামিয়া ৬ গা'টি ধুইতে লাগে
৭ যুক্তি ৮ মনের ৯ ভুলিয়া গেল

ফকির আচনে কয়, যেই জন রসিয়া অয়[১] —
তাল্লাস করিলে পন্থ মিলে।
দমের সনে তিন মিলাইয়া,
উলটকলে পেঁচ লাগাইয়া,—
কালাচান্দের খোঁজ কিবার মিলে[২] ॥

। ২৭৮ ।

ছাড়িয়া না যাও মোরে—
প্রেমানল দিয়া রে।
বন্ধু শ্যাম-কালিয়া,
আইস প্রভু, জগত-বন্ধু রে ॥

নিষ্ঠুর জানিয়া মোরে
না যাইয়ো ছাড়িয়া।
প্রাণরক্ষা কর মোরে,—দরশন দিয়া রে ॥

প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে—
সহিতে না পারি।
শ্রবণেতে শুনি—বাজে মুকুন্দ-মুররী[৩] রে ॥

প্রেমস্বরে বাইয়ো[৪] বাঁশী
রসিক বন্ধুয়া—
অবুলার প্রাণি[৫] নেও স্বরেতে টানিয়া রে ॥

পবনেতে বাইয়ো বাঁশী—
ডাকি' নাম ধরি'।
যৌবতী[৬] সবের তুমি প্রাণি নেও হরি' রে ॥

---

১ যেইজন রসিক হয় ২ হয়তো বা কালাচাঁদের খোঁজ মিলে ৩ মুরলী ৪ বাজাইয়ো ৫ অবলার প্রাণ ৬ যুবতী

মুররী বাজাইয়ো সাধু
কোকিলার স্বরে—
প্রাণি হরি' নেও মোর,—দগধে অন্তর রে ॥

মথুরায় বাইয়ো বাঁশী—
কদম্ব হেলিয়া।
সোনাপুরে জপে নাম সুন্দর তুতিয়া[১] রে ॥

সোনাপুরে আছে সাধু—
রূপের ভাণ্ডারী।
রূপেতে হরিয়া সাধু তুতিয়া পসারি রে ॥

সোনাপুরে যাইয়ো সাধু
করিয়া ঘোষণ—
মিলিবা তুতিয়া সাধু চান্দের বরণ রে ॥

আনন্দে প্রবেশ হইয়া
শ্রীকুল্লার হাটে—
দেখিতে রসিক বন্ধু, ত্রিপুণ্যির ঘাটে রে ॥

শীতালং ফকিরে কহে—
না ভজিলাম প্রিয়া ;
মোরে নাহি চায় বন্ধু কলঙ্কী জানিয়া রে ॥

। ২৭৯ ।

ও মোরে ঠগিলায়,[২] ঠগিলায় রে, বন্ধরে,
বন্ধুরে, ঠগিলায় আমারে ;
লাড়িয়া পিতল[৩] দিয়া রে বন্ধু,
অবুলা[৪] ভাড়িলায়[৫] রে।
ও মোরে ঠগিলায়, ঠগিলায় রে, বন্ধরে ॥

১ তোতাপাখী ২ ঠকাইলে ৩ মূল্যহীন, তুচ্ছ পিতল ৪ অবলাকে ৫ ভাঁড়াইলে

আর ঠগের আশা, ঠগের বাসা,
ঠগের গৃহবাস ;
ঠগ দি' বানাইছইন আল্লায়
সয়াল সংসার[১] রে।
ও মোরে ঠগিলায়, ঠগিলায় রে, বন্ধ রে ॥

আর চান্দে যে করইনি রে গৈরব[২]
উঠইন[৩] তেরা লইয়া ;
রাধিকায় করইন গৈরব :
আমার কানুর গলার মালা রে।
ও মোরে ঠগিলায়, ঠগিলায় রে, বন্ধরে ॥

আর আলিমে[৪] করইনি রে গৈরব
কোরান-কিতাব লইয়া ;
মুই অধমে করি গৈরব :
আমার পীর-মুরশিদের বচন লইয়া রে।
ও মোরে ঠগিলায়, ঠগিলায় রে, বন্ধরে ॥

আর আম ধরে ঝোপা রে ঝোপা[৫]
তেঁতই ধরে বেঁকা[৬]—
দেশের বন্ধু বিদেশ যাইতে[৭]
আর না হইব[৮] দেখা রে।
ও মোরে ঠগিলায়, ঠগিলায় রে, বন্ধরে ॥

আর, আমের পাতা চিরল-চিরল,[৯]
তেঁতইর পাতা রেকী[১০] ;
এমত চাইয়া[১১] করিয়ো পিরিতি
মইলে[১২] যারে দেখি রে।
ও মোরে ঠগিলায়, ঠগিলায় রে, বন্ধ রে ॥

১ ছলনা দিয়া আল্লা সকল সংসার বানাইয়াছেন ২ যে গৌরব করিয়া থাকেন ৩ উঠেন
৪ বিদ্বান ব্যক্তি ৫ থোকায় থোকায় ৬ তেঁতুল ধরে বাঁকা ৭ বিদেশ গেলে ৮ না হইবে
৯ লম্বালম্বা ১০ ছোটো চিকন ১১ এমন ভাবে ১২ মরিলে

আর কইন তো ফকির জবান আলীয়ে
নদীয়ার কূলে বইয়া[১]—
পারইমু-পারইমু করি'[২]
আমার দিন তো যাইত্‌রা[৩] গইয়া রে
ও মোরে ঠগিলায়, ঠগিলায় রে, বন্ধ রে ॥

। ২৮০ ।

তোরে লইয়া নিগুড় বনে[৪]
ললিত স্বরে গান করি :
দেশে আইল[৫] নবীন কিশোরী ॥

তোর বাড়ী যাইতে বন্ধু রে
ও বন্ধু, রইদে করে ধাকৃধাকি[৬] ;
এগো, তুমি আমার প্রাণের বন্ধু,
তুমি আমার দয়ার বন্ধু,
ছিরের[৭] উপর ধর ছাত্তি।
—দেশে আইল নবীন কিশোরী

মোর বাড়ী যাইতে বন্ধু রে,
ও বন্ধু, খালায়-নালায় আইল পানি[৮] ;
আয় রে, এওতের[৯] দিমু লিলুয়া ঘোড়া[১০]
বরিষার দিমু নাওখিনি[৮]।
—দেশে আইল নবীন কিশোরী ॥

১ বসিয়া ২ পার হইব-হইব করিয়া ৩ যাইতেছে ৪ নিগূঢ় বনে, মনের গহনে, গোপন ভাবে ৫ আসিল ৬ প্রচণ্ড রৌদ্র ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলে ৭ শিরের ৮ খালে নালায় জল আসিল ৯ হেমন্তকালের (?) ১০ রঙীন ঘোড়া ৮ নাওখানি

মথুরারি হাটে গিয়া ও বন্ধু,
কিনিয়া আনলাম লাকুড়ি[১] ;
এগো, শুকনার কাঠে নাও বান্ধাইয়া[২]
জলে ভাসায় সুন্দরী।
—দেশে আইল নবীন কিশোরী ॥

শীতালং ফকির কইনি ও সই,
এখন আমি কি করি ;
এগো, এ বঙ্গ-সংসারের মাঝে
হকির নামে বাস করি।
—দেশে আইল নবীন কিশোরী ॥

। ২৮১ ।

॥ দেহতত্ত্ব ॥

কোন্ কলে বানাইলা ঘর রে
নিলয়[৩] না জানি রে।
ও আল্লা, কোন্ কলে বানাইলা ঘর রে

আর চাইর খুঁটির বানায়া[৪] ঘর রে
ষোল্ল খুঁটির খাড়া[৫] ;
এগো, পবনে উড়াইত পারে
ছুট্‌ব[৬] ঘরের তালা রে।
কোন্ মিস্ত্‌রী বানায় ঘর নিলয় না জানি রে।

১ কাঠ ২ নৌকা প্রস্তুত করিয়া ৩ উদ্দেশ, রীতি, হদিশ ৪ বানাইয়া ৫ আব, আতস, থাক ও বাদ—চারি খুঁটি। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় ও ছয়টি রিপু মিলিয়া ষোল খুঁটি ৬ ছুটিবে, ভাঙিবে

আর আড়ের[১] বানায়া ঘর রে
চামেড়ার ছানি[২] ;
ফটিকের দুই গো থুনি[৩]
চুইয়া পড়ের পানি রে ॥

আর কার বানায়া ঘর রে
কেবা ঘরের গিরি[৪] ;
কোন্ কলে বানাইলা ঘর
নিলয় না জানি রে ॥

আর ঘরে যদি থাকত ভাই রে
চৈতন্য আমার ;
তেকেনে[৫] দুর্দশা ঘটাইত[৬] আমার রে।

আর আছগর আলী পীরের নাতি
ওয়াইদ আলীর বেটা ;
এই গীত বানাইয়া দিলা
খুর্শিদ বাউলা রে ॥

। ২৮২ ।

শ্যাম-বন্ধু হ[১] ', কালা রে রতন,—
দরশন বিনে আমার
অসারের জীবন[২] ।
—শ্যাম-বন্ধু হ' ॥

১ হাড়ের ২ চামড়ার ছাউনি ৩ খুঁটি ৪ গৃহী ৫ তাহা হইলে কি ৬ ঘটিত
১ শ্যাম-বন্ধু গো ২ এ জীবন অসার

শ্যাম-বন্ধু হ',
আব-আতস-খাক-বাদে[১]
বানাইয়াছ ঘর ;
তার মাঝে আছইন[২] বন্ধু
বিনন্দ[৩] নাগর ।
—শ্যাম-বন্ধু হ' ॥

শ্যাম-বন্ধু হ',
একই ঘরে থাকি বন্ধু,
না পাইলাম ধুড়িয়া[৪] ;
তোমার দরশনের লাগি'
আমি হইয়াছি পাগল ।
—শ্যাম-বন্ধু হ' ॥

শ্যাম-বন্ধু হ',
সর্ব অঙ্গ খাওদ কাগা[৫]
না রাখিয়ো বাকী ;
কৃষ্ণ দরশনের লাগি'
রাখো দুইটি আঁখি ।
—শ্যাম-বন্ধু হ' ॥

শ্যাম-বন্ধু হ',
কইন তো ফকির ওহাব আলী
নদীয়ার কূলে বইয়া ;
পাইমু-পাইমু করি'
আমার দিন তো যাইত্‌রা গইয়া[৬]
—শ্যাম-বন্ধু হ' ॥

১ জল, আগুন, মাটি ও বায়ু ২ আছেন ৩ বিনোদ ৫ (?) ৬ বহিয়া যাইতেছে ।

। ২৮৩ ।

নিবেদন বলি তোর হুজুরে রে,
ও বন্ধু, নিবেদন বলি তোর হুজুরে ॥

বন্ধু রে, হিদ্‌রে[১] আছে ছয়জন,
জোগাইতে না পারি মন,
হামেশা বিবাদ মোর সনে ;
আমি তাদের সঙ্গ ছাড়ি—
আমারে না দেয় ছুড়ি'[২] ,
না জানি কিবা তাদের মনে।
রে বন্ধুয়া, ও বন্ধু, নিবেদন বলি তোর হুজুরে

বন্ধু রে প্রেমরোগী যেই হয়—
সে কি সুখে ঘরে রয়,
সর্বাঙ্গ শোষিয়া[৩] পড়ের[৪] ঘাম ;
হিদ্‌রে প্রেমের পীড়া যার—
ফরামুসি[৫] নাই তার,
জোগায় মনে সদায়[৬] জপের নাম।
রে বন্ধুয়া, ও বন্ধু, নিবেদন বলি তোর হুজুরে।

বন্ধু রে, জালের[৭] জঞ্জাল যতো
তাহা বা কইমু কতো—
ছাড়াইলে না ছাড়ের কুহুমতে[৮] :
কুব্জা রাণীর কুমন্ত্রণায়
দেশে র'না[৯] হইল দায়
আমি নারী না পারি আর বঞ্চিতে[১০]।
রে বন্ধুয়া, ও বন্ধু, নিবেদন বলি তোর হুজুরে

---

১ হৃদয়ে ২ ছাড়িয়া ৩ বহিয়া ৪ পড়ে ৫ বিস্মরণ ৬ সদাই ৭ প্রেমিকের (?)
৮ কোনো মতে ছাড়ে না ৯ রহা ১০ দিন কাটাইতে

বন্ধু রে, ননদীর বিষম জ্বালা,
সদায় রাখে মুখ কালা—
হামেশা গুঞ্জরে শ্বশুরানী[১] ;
শ্বশুর বসিয়া থাকে—
ভাশুর অতি ক্রুদ্ধ রাখে[২] ,
দেওরায় লইয়া করে টানাটানি।
রে বন্ধুয়া, ও বন্ধু, নিবেদন বলি তোর হুজুরে ॥

বন্ধু রে, ফকির আচনে কয়,
হেন মোর মনে লয়[৩] —
চল্লিশা নি ছয়-ষাট্টিয়ে মিলায়[৪] ;
স্বরের সঙ্গে যুক্তি করি'[৫]
তিপুর্ণ্যিতে দিশা ধরি'[৬]
কাল ভুজঙ্গী ডরে ভাগি' যায়[৭] ।
রে বন্ধুয়া, ও বন্ধু, নিবেদন বলি তোর হুজুরে ॥

। ২৮৪ ।

ও মন, যাইতায়[৮] কার বাড়ী রে ;—
সে দেশে দরদী নাই রে, রছুল-ধন[৯] বিনে ॥

আর চিনলায়[১০]না রে অবোধ মন
অন্তের দিকে চাইয়া ;
এগো পাছের দিকে চাইয়া দেখ—
তোর ঘাটে নাও বান্ধা রে।
—সে দেশে দরদী নাই রে, রছুল-ধন বিনে ॥

১ শাশুড়ী সর্বদাই গঞ্জনা দেয় ২ ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে ৩ এই আমার মনে হয় ৪ (১) ৫ স্বরবর্ণের সহিত ব্যঞ্জন বর্ণের, প্রকৃতির সহিত পুরুষ মিলিত করিয়া, আল্লার সহিত রসুলকে মিলাইয়া ৬ ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্নার মিলিত স্থান ত্রিবেণীকে ভিত্তি করিয়া ৭ মনের কু-প্রবৃত্তি দূর হইয়া যায় (?) ৮ যাইবে ৯ রসুলধন, আল্লার প্রতিমূর্তি ১০ চিনিলে

আর আষ্ট আঙ্গুলা কোদালখিনি[১]
গোল্ল আঙ্গুইলা ডাঁটি ;
সেই কোদালে কাটিয়া তুল্‌ত
মনার আপন ঘরের মাটি রে।
—সে দেশে দরদী নাই রে, রছুল-ধন বিনে ॥

কহে ফকির বাউল, মনে ভাবি' দেখ্‌
মনা তুই চাইয়ে ;
এই চক্ষু মুজিলে মনার
দুনিয়া আন্ধারা[২] রে।
—সে দেশে দরদী নাই রে, রছুল-ধন বিনে ॥

। ২৮৫ ।

সুতা না কাটিলায়[৩] রে মুরশিদ,
কিমইলর[৪] দিয়া—
জঙ্গারিয়া লোহার হলায়[৫]
নাল যায় ছিঁড়িয়া।
সুতা না কাটিলায় রে ॥

আর চরখা দিলাম, চরখী দিলাম—
আর বা' দিলাম মাল,
ভাই রে, আর বা দিলাম মাল,
হায় রে, কাটিবার লাকুড়ি[৬] দিলাম
রসে বইয়া টান।
সুতা না কাটিলায় রে ॥

---

১ কোদালখান। অষ্টম ইন্দু (মুখ ১, স্তন ২, হস্ত ২, বক্ষ ১, নাভি ১, উপস্থ ১), অষ্টদল পদ্ম, অষ্টসিদ্ধি, অষ্টপাশ ইত্যাদির কোনোটির সহিত এই আটকে সম্পর্কান্বিত করা যায় না। তবে, প্রকৃতি ও পুরুষের (বা আল্লা ও রসুলের) চারিটি করিয়া আটটি উপাদান হয় ২ অন্ধকার ৩ কাটিলে ৪ (?) ৫ জং ধরা লোহার শলাকা দিয়া ৬ লাকড়ি, কাঠ

আর চাইর খুঁটি দিয়া চরখা
করিয়াছে খাড়া
তাতে ষোল্ল বাঁকী জোড়া ;
হায়রে, হিলাইতে দুলাইতে নাল
ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া গেলা।
সুতা না কাটিলায় রে ॥

আর আকাষ্ঠা মান্দারের[১] চরখা
চামেড়ার ছানি ;
হায়রে, কোন্ রঙ্গিলায় বানায় চরখা
নিলয় না জানি।
সুতা না কাটিলায় রে ॥

। ২৮৬ ।

গউর[২] রে, তুমি ভাসাইলায়[৩] সাগরে—
মিছা দোষী কলঙ্কিনী বানাইছ আমারে
—দয়াল গউর রে ॥

গউর রে, হাটে যাও, বাজারে যাও
কিনিয়া আনবায়[৪] কি ;
আমার লাগি' কিনিয়া আনিয়ো
রউয়ের মুড়ি[৫]।
—দয়াল গউর রে ॥

আকাঠ মাদারের। ২ গৌর ৩ ভাসাইলে ৪ আনিবে ৫ রুইমাছের মুড়ো

মাও মইলা[১], বাপ মইলা,
মইলা সোদর ভাই ;
একাকিনী রইলাম আল্লা
না দেখি' উপায়।
—দয়াল গউর রে ॥

আট আঙ্গুলা কোদালখানি—
ষোল্ল আঙ্গুলা ডাঁটি ;
এরে দিয়া খুঁড়ইন[২] বন্দায়
নিজ ঘরের মাটি।
—দয়াল গউর রে ॥

ফকির আবজলে বলে,
শুনো রে কালিয়া :
নিভি'[৩] ছিল মনেরই আগুইন-
কে দিল জ্বালাইয়া।
—দয়াল গউর রে ॥

। ২৮৭ ।

সুন্দর কালিয়া রে,
আমি তোমার না পাইলাম
রঙ কি রূপ।
—সুন্দর কালিয়া রে ॥

১ মরিল ২ ইহা দ্বারা খুঁড়েন বান্দা ৩ নিভিয়া

সুন্দর কালিয়া রে,
আওরের[১] মাঝারে রে
কদম্বেরি গাছ রে—
তার উপর তিনটি ডাল আছে ;
তার যে উপরে রে
মনিরার[২] বাসা রে :
প্রেমের ফান্দ পাতিয়া থইছে[৩] তারে
—সুন্দর কালিয়া রে ॥

সুন্দর কালিয়া রে,
আধারের[৪] লাগিয়া রে
জমিনে লামিল[৫] রে—
হায়রে, প্রেমের ফাঁদ লাগল রাধার গলে।
—সুন্দর কালিয়া রে ॥

সুন্দর কালিয়া রে,
চাইরি[৬] পাতা কালা-ধলা—
বারো ডাল তার দেখতে ভালা :
পাতার আওড়ে[৭] ফুটিয়া রইছে ফুল ;
সেই ফুল ঝরিয়া যায়—
কোন্ সুজনে তারে পায়
হায়রে, নয়নে না দেখি চান্দ মুখ।
—সুন্দর কালিয়া রে ॥

---

১ হাওরের, সাগরের ২ মনপাখীর ৩ থুইয়াছে, রাখিয়াছে ৪ আহারের ৫ নামিল
৬ চার। সাদা, কালো, লাল, হলুদ ৭ আড়ালে

সুন্দর কালিয়া রে,
চামিড়ের[১] দড়ি দিয়া
হস্ত-পদ বন্ধ্ করিয়া—
আলিপেতে[২] ধিয়ান করি' চাইয়ো ;
উলট-কলট করি'[৩] , উলট মনে টান করিয়া
হায়রে, বসিয়া থাক
নয়নের উপর।
—সুন্দর কালিয়া রে ॥

সুন্দর কালিয়া রে,
চামিড়ের দড়ি দিয়া
দুই নয়ান বন্ধ করিয়া—
হায়রে, বসিয়া থাক অন্ধলার[৪] মতো।
—সুন্দর কালিয়া রে ॥

সুন্দর কালিয়া রে,
কইন[৫] তো ফকির জমাদ আলী
কলসী রহিল খালি—
ভরিতে না পাইলাম গঙ্গার জল ;
মুরশিদ যদি সদয় অয়[৬]
জল ভরিবার মনে লয়—
ও মুরশিদ, দয়া রাখিয়ো[৭] বালক জানিয়া।
—সুন্দর কালিয়া রে ॥

---

১ চামড়ার ২ আলেফ, আরবী বর্ণ-মালার প্রথম বর্ণ, ঈশ্বরের পরিবর্তে ব্যবহৃত ৩ উল্টা সাধন করিয়া ৪ অন্ধের ৫ কহেন ৬ হয় ৭ দয়া করিয়ো

। ২৮৮ ।

লাহুল[১] দরিয়ার মাঝে রে ভাই,
ও সাগরের মাঝে রে ভাই,
আমার মন মজিয়াছে :
চল, একবার দেশে যাই ॥

ভাই রে ভাই, উত্তর আল[২] দক্ষিণ আল,
বাও[৩] উল্টা, বইঠা ভাঙা নাও—
ঝলকে ঝলকে উঠে পানি ;
কইয়ো গি'[৪] মুরশিদের ঠাঁই—
এই নায়ের ভরসা নাই,
কোন্ ঘড়ি[৫] কোন্ জলে ডুবিয়া মরি।
চল, একবার দেশে যাই ॥

ইঙ্গুলা-পিঙ্গুলা ঘর,[৬] ঘুণে খাইয়া জর-জর,
মাড়ইল খাইয়া করিবা ছোচা[৭] ;
দিনে-দিনে খসিব রে[৮] মাড়ইল কাষ্ঠের জোড়া রে,
হায়রে, বাজার লুটিয়া নিব[৯] চোরে রে।
চল, একবার দেশে যাই ॥

ভাইরে ভাই, আওরেরই[১০] মাঝে রে
একগাছ কদম রে :
তার শতেক ডাল,—
তার মাঝে বগুয়ার[১১] বাসা ;

১ আরবী 'লা'-র অর্থ 'না' বা 'নাই' ; 'হু'-র অর্থ 'সে' বা 'আল্লাহ্' ; 'আল'-র অর্থ 'টি' বা 'সেই'। আল্লার যেমন অবয়ব নাই, 'লাহুল' শব্দটির অর্থও তেমনি 'সীমাহীন' ২ দিক-অর্থে ৩ বাতাস ৪ কহিয়ো গিয়া ৫ কোন্ মুহূর্তে ৬ ইড়া-পিঙ্গলা নামক নাড়ী-দ্বয় ৭ (?) ৮ খসিয়া পড়িবে রে ৯ লইবে ১০ জলময় ভূ-ভাগ, সাগরেরই ১১ বকের, মস-পাখীর

আধারের[১] লাগিয়া রে
জমিনে লামিব[২] রে—
হায় রে, তাতে ঘিরিব মায়ার জালে রে।
চল, একবার দেশে যাই ॥

মিলন শা' ফকিরে কয়,
আমার মনে এই লয়—
দূর-ই থাকি'[৩] মায়ের কান্দন শুনি ;
দুই চউখ মুজিলে রে
ঘরের বাইর করিবা রে—
হায় রে, থইয়া আইবা একাশর ঘরে[৪] রে।
চল, একবার দেশে যাই ॥

। ২৮৯ ।

মনের কবট[৫] খুল, মানী[৬] সই,
দিলের কবট খুল রে—
—সায়বানী[৭] সই, মনের কবট খুল ॥

আর ধানের ভিতরে ধুয়ারা[৮] ভাই রে,
সইরষের[৯] মাঝে তেল ;
এগুার ভিতরে বাইচ্চা মইল[১০]
প্রাণি[১১] কেম্‌নে গেল রে।
—সায়বানী সই, মনের কবট খুল

১ আহারের ২ নামিলে ৩ দূরে থাকিয়া ৪ ঘরে একাকী রাখিয়া আসিলে ৫ কপাট
৬ মানিনী ৭ সাহেবানী ৮ তুষ ৯ সরিষার ১০ ডিমের ভিতরে বাচ্চা মরিল ১১ প্রাণ

আর ধানের ভিতরে ধুয়ারা ভাই রে,
সইরষের মাঝে তেল ;
নারিকেলের ভিতরে পানি
কোন্ সন্ধানে গেল রে।
—সায়বানী সই, মনের কবট খুল

আশমান কালা, জমিন কালা,
কালা দরিয়ার পানি ;
পানির মাঝে থইছে[১] আল্লায়
কুদ্‌রতের[২] নিশানি[৩] রে।
—সায়বানী সই, মনের কবট খুল ॥

আর পইচমে তনে আইল হকির[৪]
সোনার খড়ম পায়—
"লাইলাহা ইল্লেল্লা" দাগ্
তহিদ[৫] কোথায় পায় রে।
—সায়বানী সই, মনের কবট খুল ॥

আসগর আলী পীরের নাতি,
ওয়াইদ আলী যার বেটা ;
এই গীত রুচিয়া[৬] দিলা
খুর্শিদ বাউলা[৭] রে।
—সায়বানী সই, মনের কবট খুল ॥

---

১ থুইয়াছে, রাখিয়াছে ২ মহিমার ৩ চিহ্ন ৪ পশ্চিম দিক হইতে ফকির আসিল
৫ ভগবানের 'একত্ব' ৬ রচনা করিয়া ৭ বাউল

। ২৯০ ।

র-মুরশিদা ও গুরুতত্ত্ব ॥

আমার মনেরি আনল[১]
ওরে, অন্তরে আগুনির জ্বালা রে—
বালা, কে জানে বেদন ॥

আর বনের হরিণী হইতাম যদি রে
খাইতাম রে ভরমিয়া।
ভবের তাড়নায় মরি
মনুষ্যি জনম লইয়া রে ॥

আর ডালের পঙ্খী হইতাম যদি রে
যাইতাম রে উড়িয়া।
শীতল নদীর জলে অঙ্গ জুড়াইয়া রে

আর তনু ঝুরে, মন রে ঝুরে,
আল্লা, ঝুরে দুইটি আখি।
পিঞ্জিরায় বন্দী ঝুরে
আমার জঙ্গলার পঙ্খী রে ॥

আর তনু হইল লড়খড়[২] রে,
যৌবনে দিলা ভাটি।
চালাইতে[৩] না চলে তন[৪]
আমার নছিবের[৫] লয়লাটি[৬] রে ॥

আর অধম আফজলে বলে রে,
নদীয়ার কূলে বইয়া।
সকল যাইন[৭] মুরশিদের বাড়ী—
আমি রইলাম চাইয়া রে ॥

---

১ অনল ২ জর্জরিত, জীর্ণ ৩ চালাইলে ৪ তনু ৫ নসিবের ৬ ললাটলিপি ৭ সকলে যাইতেছেন

। ২৯১ ।

আজব লীলা, রঙ্গের খেলা,
মিছা ভবের কারখানা :—
মন রে, ও তুমি রঙ্গে মজিয়ো না

রঙপুর বন্ধুয়ার বাড়ী—
দিলালপুর তার কারখানা।
গেল দিন তো লওরে পন্থ
করো কি আর ভাবনা ॥

মন রে, রসে-রঙ্গে তোদের সঙ্গে
রিপু ছয় জনা।
ভবের কুলে মায়াজালে
জঞ্জালে আর ঠেকিয়ো না ॥

মনরে, অধম হাছনে বলইন[1] —
মুরশিদ-পন্থের পাইনা ঠিকানা।
আনো ছুরী, কপাল চিরি,
বিধাতায় কি লেখিলা ॥

। ২৯২ ।

আরে হায়রে সুজন নাইয়া,
আমি কি বণিজে[2] আইলাম ভাই রে-
পরার পানুয়া নাও লইয়া[3]

১ বলেন ২ বাণিজ্যে ৩ পরের ছিদ্রবিশিষ্ট নৌকা লইয়া

সুজন নাইয়ার ধন হিসাব করিব[১] ;
তিলে-পলে হিসাব দিতে পরমাদ ঠেকিব[২] ।
রে সুজন নাইয়া,
আমি কি বণিজে আইলাম ভাই রে—
পরার পাহুয়া নাও লইয়া ॥

কি বণিজে আইলাম ভাই রে, লইয়া পরার ধন :
চিনিয়া করিয়ো খরিদ—অমূল্য রতন ।
রে সুজন নাইয়া,
আমি কি বণিজে আইলাম ভাই রে—
পরার পাহুয়া নাও লইয়া ॥

আকাষ্ঠা কাষ্ঠের নাও[৩] , লাগিয়াছে কতেক গুড়া[৪] :
সুজন কাণ্ডারীর নায়ে শূন্যে করে উড়া[৫] ।
রে সুজন নাইয়া,
আমি কি বণিজে আইলাম ভাই রে—
পরার পাহুয়া নাও লইয়া ॥

এ নায়ের ভরসা নাই, পলকে ডুবি' যাইব[৬] ;
সুজন কাণ্ডারী নায়ে উড়াল বইঠা বাইব[৭] ।
রে সুজন নাইয়া,
আমি কি বণিজে আইলাম ভাই রে—
পরার পাহুয়া নাও লইয়া ॥

উড়াল বইঠা বাও—নায়ের পীরমুরশিদ ছওয়ারী[৮] ;
অবশ্যি দীনের নাথে লইবা উদ্ধারি' ।
রে সুজন নাইয়া,
আমি কি বণিজে আইলাম ভাই রে—
পরার পাহুয়া নাও লইয়া ॥

১ হিসাব করিবে ২ প্রমাদ হইবে, ঘটিবে ৩ পলকা কাঠের নৌকা ৪ (?) ৫ শূন্যে উড়িতেছে
৬ ডুবিয়া যাইবে ৭ এমন দ্রুত বইঠা বাহিবে যে নৌকা যেন উড়িয়া চলিবে ৮ সওয়ারী

ভাঙ্গা নায়ের ভাঙ্গা বইঠা, তরাসে ঢালো পানি
দমের উপর ভর করি' নায়ে দেও গাহনি[১]।
রে সুজন নাইয়া,
আমি কি বণিজে আইলাম ভাই রে—
পরার পাছুয়া নাও লইয়া ॥

যে ধন বণিজে আনলাম,—সব নিল চোরে :
কয় ফকির ভেলা শা-য়, পরানি কাম্পে ডরে[২]
রে সুজন নাইয়া,
আমি কি বণিজে আইলাম ভাই রে—
পরার পাছুয়া নাও লইয়া ॥

। ২৯৩ ।

বন্ধু আমার, রাইত[৩] হইল রে—
ও পরানের বন্ধু, বেলা দেখি অল্প ;
শেষ, ওরে বন্ধু আমার, রাইত হইল রে ॥

আর আকাষ্ঠা মান্দারের নাও[৪] —
নাওয়ের নাই রে খুল[৫] ;
বা' মুরশিদ, নাওয়ের নাই রে খুল।
লক্ষি-হাজার[৬] গুণ তার—
একইটা[৭] মাস্তল ॥

আর আকাষ্ঠা মান্দারের নাও—
নাওয়ের নাই সে জলই[৮] ;
বা' মুরশিদ, নাওয়ের নাই সে জলই।
ওরে, মক্কায় তার দাঁড়ের কোড়া—
মদিনায় গলই ॥

---

১ নৌকা ভাসাও, বাণিজ্য করিবার জন্য ২ ডরে পরান কাঁপে ৩ রাত্রি ৪ আকাঠ মাদারের নৌকা ৫ খোল, নৌকার তলদেশ ৬ লক্ষহাজার ৭ একটিই ৮ (?)

আর আকাঠা মান্দারের নাও—
নাওয়ের নাই সে গুড়া ;
বা' মুরশিদ, নাওয়ের নাই সে গুড়া ।
ওরে, পীর-মুরশিদ ছওয়ারী[১] —
নাও শূন্যে করে উড়া ॥

আর আন্ধারিয়া ঘরের মাঝে—
চউখে নাই সে দেখি ;
বা' মুরশিদ, চউখে নাই সে দেখি ।
ওরে, উড়িবার পন্থ নাই—
চাইর দিকে চৌকি ॥

আর আলিফের[২] মাঝে ইলিম[৩] ভাই রে—
সইরের মাঝে[৪] তেল ;
ভাই রে, সইরের মাঝে তেল ।
ওরে, আণ্ডার ভিতরে বাইচ্চা মইল[৫] —
প্রাণি[৬] কেম্‌নে গেল ॥

আর কইন তো ফকির কানু শা'য়—
সন্দের পারে বইয়া ;
বা' মুরশিদ, সন্দের পারে বইয়া ।
ওরে, পারইমু পারইমু করি'—
আমার দিন তো যাইত্‌রা গইয়া ॥

। ২৯৪ ।

আমি ডাকি কূলে বইয়া[৭] রে,—
পার কর দীনের নাথ মোরে ॥

---

১ সওয়ারী ২ আরবী বর্ণমালার প্রথম বর্ণ ৩ বিদ্যা ৪ সরিষার মধ্যে ৫ বাচ্চা মরিল
৬ প্রাণ ৭ বসিয়া

আর আল্লায় দিলা ডাইল-চাউল,
মুরশিদে দিলা হাঁড়ী।
ওরে, রসাই করি[২] ' খাইয়া যাইতাম-
আমার মুরশিদ চান্দের বাড়ী রে ॥

আর মুরশিদ যাইনি[৩] নায়ে নায়ে
বালক যাইনি রড়ে[৪]।
তোমার-আমার হইব দেখা—
মুরশিদ, রোজ কিয়ামতে[৫] রে ॥

আর নদীর কূলে গেলাম বা' মুরশিদ,
পার হইবার আশে।
ওরে, নাও আছে, খেওয়ানী নাই—
আপন করম দোইষে রে ॥

আর মুরশিদের বাড়ী ফুলবাগিচা
বালকের বাড়ী খালি।
আপন কথা কও বা' মুরশিদ,
আমি ছাড়ি ঘর-বাড়ী রে ॥

আর কইন তো মুরশিদ চান্দ আলী শা'য়
বড়ো বন্দে[৬] বইয়া।
পার করো চাই[৭] দয়ার মুরশিদ,
আমার বালক সকল[৮] লইয়া রে ॥

২ রান্না করিয়া ৩ যান ৪ হাঁটিয়া ৫ শেষ বিচারের দিনে ৬ পদকর্তার বাসস্থান
৭ পার করো তো ৮ শিষ্য সকল

। ২৯৫ ।

সোনা বন্ধু, আও আও রে,
মুই অভাগী জানিয়া ;—
আরে বাড়াইয়া প্রেমের পিরিত
ও তুমি না যাইয়ো ছাড়িয়া।
রে সোনা বন্ধু, আও আও রে ॥

আর না জানি পিরিতের ভাও[১]
না জানি তার কল।
হায় রে, কেবলমাত্র মুরশিদের দোওয়া[২]
মুই বেয়াকল[৩] ॥

আর পিরিতি করিলাম আমি
হইয়া ছাবাল[৪]।
ওরে, অল্প বয়সের পিরিতখানি—
ও তুমি রাখিয়ো বহাল[৫] ॥

আর জানিবা[৬] গোকুলের লোকে
পিরিতে আছি আমি।
ওরে, লোকেতে জানিলে দেখা—
নাহি দেও তুমি ॥

আর গোপনের পিরিতখানি
হইলে প্রচার—
ওরে লোকের মাঝে কলঙ্কিনী
হইব নাম আমার ॥

১ মূল্য, স্বরূপ ২ আশীর্বাদ ৩ ব্যাকুল, জ্ঞানহীন ৪ বালক ৫ বিদ্যমান ৬ জানি

আর শশুড়ী-ননদী বয়রী[1]
ঘরেতে আমার—
ওরে, সময়ে না পাইলাম আমি
হইতে ঘরের বার ॥

আর যাইমু যাইমু করি'
জীবন গেলা গইয়া।
ওরে, কতকাল রাখিমু যৌবন আমি
লোকের বয়রী হইয়া ॥

আর মনে লয়, যুগুনী[2] হইতাম
তুইন বন্ধের কারণ ;—
ওরে, কোথায় যাইমু, কোথায় পাইমু,
সদায় হুতাশন[3] ॥

আর অধম ফরমুজে বলে
মুরশিদের পদে ধরি'—
ওরে, মুই অধম বালকে ডাকি
হইয়া ভিখারী ॥

। ২৯৬ ।

গুরু, আমি কই আইলাম রে আল্লা,
নিলয়[4] না পাই ;
হায় রে, যারে ভজতে আইলাম ভবে—
তাহান[5] উদেশ[6] নাই।
ওবা'[7] গুরু, আমি কই আইলাম রে ॥

১ বৈরী ২ যোগিনী ৩ সদাই হুতাশা ৪ উদ্দেশ ৫ তাঁহার ৬ উদ্দেশ ৭ ও হে

আর সত্যি করি' আইলাম বা' গুরু,
ভজিতাম তোমারে—
বা' আল্লা, ভজিতাম তোমারে।
হায় রে, বেরথা ভাবে দিন গাওয়াইলাম[১],
না ভজিলাম তোমারে॥

আর আমার নায়ের ছয়জন মাঝি,
ষোল্লজন কাণ্ডারী—
বা' আল্লা, ষোল্লজন কাণ্ডারী।
হায়রে, কোন্ নায়ের[২] চড়নদার আমি,
চিনিতে না পারি॥

আর অধম রইছে বলইন[৩] —
জীতে[৪] আমি মরা—
বা' আল্লা, জীতে আমি মরা।
হায় রে, আনিয়া দিলে খাইবার আছইন[৫],
সঙ্গে যারা[৬] নাই॥

১ বৃথা ভাবে দিন কাটাইলাম ২ কোন্ নৌকার, কেমন নৌকার ৩ বলেন ৪ জীবিত অবস্থাতে ৫ আছেন ৬ যাত্রী, যাইবার

। ২৯৭ ।

লৌকিক ॥

দরশন দেও বন্ধুরে, দয়া ভাবি' মনে[১] —
যুবতী-বিচ্ছেদ-জ্বালা সহিব কেমনে রে।
—দরশন দেও বন্ধু রে ॥

আর শিশুকালে কইলে[২] রে বন্ধু,
আমারে পিয়ার[৩] ;
হায়রে, যুবাকালে ভিন্ন বাসো[৪]
কি দোষ আমায় রে।
—দরশন দেও বন্ধু রে ॥

আর যৌবনের জ্বালা রে বন্ধু,
না পারি সহিতে ;
হায় রে, দয়ার আকার[৫] বুঝি
নাই তোমার মনেতে রে।
—দরশন দেও বন্ধু রে ॥

আর প্রেমের জ্বালায় রে বন্ধু,
চউখে নিন্দ নাই[৬] ;
হায় রে, দিবার নিশি[৭] প্রেমানলে
কান্দিয়া পোসাই[৮] রে।
—দরশন দেও বন্ধু রে ॥

১ মনে দয়া করিয়া ২ করিলে, কহিলে ৩ আমাকে প্রেমের বাণী শোনাইলে, আমার সহিত প্রেমাবদ্ধ হইলে ৪ ভিন্ন মনে করো ৫ দয়ার স্পর্শ, দয়ার রূপ ৬ চোখে ঘুম নাই ৭ দিবানিশি ৮ কাটাই, পোহাই

আর বসন্ত সময় রে বন্ধু,
মৌমাছিগণে—
হায় রে, ফুলরেণু আনন্দেতে
তুলিছে বাগানে রে।
—দরশন দেও বন্ধু রে॥

আর বসন্ত ঋতু রে বন্ধু,
ডাকিছে কোকিলা;
হায় রে, যুবতী সহিব কত
যৌবনের জ্বালা রে।
—দরশন দেও বন্ধু রে॥

আর ভমর বিরাজে রে বন্ধু,
আনন্দে কমলে;
হায় রে, দেখিয়া সহিব কতো
যৌবনের জ্বালা রে।
—দরশন দেও বন্ধুরে॥

আর চাতকিনীর মতো রে বন্ধু,
জল পিপাসায়—
হায় রে, দর্শনের বারি লাগি'
ডাকিছি[১] তোমায় রে।
—দরশন দেও বন্ধু রে॥

আর ইয়াছিন বলে রে বন্ধু,
পরানের পতি;
হায় রে, তার প্রেমে মজে যেই[২]
ধন্য সেই যুবতী রে।
—দরশন দেও বন্ধু রে॥

১ ডাকিতেছি ২ যে

। ২৯৮ ।

আইলায় না[১], আইলায় না বন্ধু রে,
নিন্দ[২] হইল বৈরী ;—
এগো, একেলা মন্দিরে[৩] ঝুরি আমি নারী অভাগিনী রে।
আইলায় না, আইলায় না বন্ধু রে ॥

আর এক প'র[৪] রাত্রি যাইতে বন্ধু রে,
আইলাম তোর বাসরে[৫] ;
এগো, সুস্বামী ভাড়িয়া[৬] আইলাম
বালক দিয়া কোলে রে।
আইলায় না, আইলায় না বন্ধু রে ॥

আর দুই প'র রাত্রি যায় বন্ধু রে,
ফুটে চাম্পা-নাগেশ্বর ;
এগো, কেওয়া না কেতকী ফুলে
সাজাইলাম বাসর রে—
আইলায় না, আইলায় না বন্ধু রে ॥

আর তৃতীয়া প'র নিশি যাইতে বন্ধু রে,
কোকিলায় কাড়ে রাও[৭] :
এগো, উঠ-উঠ প্রাণের বন্ধু,
কত নিদ্রা যাও রে—
আইলায় না, আইলায় না বন্ধু রে ॥

১ আসিলে না ২ নিদ্রা ৩ ঘরে ৪ প্রহর ৫ গৃহে, ঘরে ৬ ছলনা করিয়া ৭ কোকিল ডাকে

আর রাত্রি না পোসাইয়া[১] যাইতে বন্ধু রে,
পূবে উদয় ধলা[২] ;
এগো, রাধিকার অঞ্চল[৩] ছাড়ি'
কানু জলে করে খেলা রে—
আইলায় না, আইলায় না বন্ধু রে ॥

আর রাত্রি না পোসাইয়া যাইতে বন্ধু রে,
পূবে উদয় ভানু ;
এগো, রাধিকার অঞ্চল ধরি'
বিদায় মাঙ্গইন[৪] কানু রে—
আইলায় না, আইলায় না বন্ধু রে ॥

আর অধম ফাজিলে কহে বন্ধু রে,
নদীয়ার কূলে বইয়া[৫] ;
এগো, পারইমু-পারইমু করি'[৬]
আমার দিন তো যায় গইয়া[৭] রে—
আইলায় না, আইলায় না বন্ধু রে ॥

। ২৯৯ ।

নিশি হইল অবসান, ল'[৮] পরানের বন্ধ,
নিশি হইল অবসান ॥

রাত্রি পোসাইয়া[৯] যায়,
কোকিলায় পঞ্চমে গায়,
নিদ্রাতে কি বড়ো পাইছ সুখ—
ল' পরানের বন্ধ,
নিশি হইল অবসান ॥

১ পোহাইয়া ২ সূর্য অর্থে ৩ আঁচল ৪ বিদায় মাগেন ৫ নদীর কূলে বসিয়া ৬ পার হইব-হইব করিয়া ৭ কাটিয়া, চলিয়া ৮ ওলো ৯ পোহাইয়া

অভাগিনী বসিয়া রে
নিশি পোসাইলু রে,
উঠ অবে,[১] দেখি চান্দ মুখ—
ল' পরানের বন্ধ,
নিশি হইল অবসান ॥

আমার মাথা খাও
উঠ অবে, ঘরে যাও,
কাকুতি করিয়া বলি তোরে—
ল' পরানের বন্ধ,
নিশি হইল অবসান ॥

রাত্রি ফরসা হইলে
লোকে দেখিব[২] তোরে
কলঙ্কিনী করিবে মোরে—
ল' পরানের বন্ধ,
নিশি হইল অবসান ॥

কলঙ্ক রাখিতে মোর
ভালা না পড়িব তোর,[৩]
মোরে করবে জনমের খুটা[৪] —
ল' পরানের বন্ধ,
নিশি হইল অবসান ॥

তুমি হেন বন্ধু যার
কিবা দুখ-সুখ তার
দুখ তার হইয়া যাইব[৫] সুখ—
ল' পরানের বন্ধ,
নিশি হইল অবসান ॥

---

১ এবে, এখন ২ দেখিবে ৩ তোর ভালো হইবে না ৪ আমাকে জন্ম ভরিয়া খোঁটা দিবে
৫ যাইবে

ফকির ওহাবে কয়,
প্রাণি দিবার মনে লয়[১]
তিলেক না দেখি' চান্দ মুখ—
ল' পরানের বন্ধ,
নিশি হইল অবসান ॥

। ৩০০ ।

বিধবার মনেরি দুঃখ বুঝলায় না[২] গো ধর্মে,[৩]
বুঝলায় না গো ধর্মে, বুঝলায় না গো ধর্মে

আর ছয় না বচ্ছরের কালে
বাপে দানে দিল বিয়া ;
এগো,[৪] বারো না বচ্ছরের কালে
স্বামী গেল মারা ।
গো দুঃখ বুঝলায় না গো ধর্মে ॥

আর হিন্দুকুলে লইলাম জন্ম
না জানি কোন্ পাপে ;
এগো, মরিয়া যাউক পণ্ডিতের বংশ
বিধবারি শাপে ।
গো দুঃখ বুঝলায় না গো ধর্মে ॥

আর কহে কন্যা চন্দ্রমালা
মনেতে ভাবিয়া ;
এগো বিধবারি হৃদয়ের আগুইন[৫]
কে দিব[৬] নিবাইয়া ।
গো দুঃখ বুঝলায় না গো ধর্মে ॥

১ মনে হয়, প্রাণ দিই ২ বুঝিলে না, বুঝিতে পারিলে না ৩ সম্বোধন, ধর্ম ৪ ওগো
৫ আগুন ৬ কে দিবে

॥ রাগ ॥

। ৩০১ ।

আমার দিন তো যায় গইয়া[১]
শ্যাম-নাগরের লাগিয়া।
ভাবিতে-ভাবিতে আমার—
দিন তো যায় গইয়া॥

সোনা না হয়, রূপা গো রাই,
পিরিতি গলার মালা।
তোমরা সখি জলে যাইতে—
কি ধন মাঙ্গিলা[২] শ্যামকালা।

যমুনার জলে যাইতে
পন্থ বহুত দূর।
হাঁটিতে না পারে রাধা—
চরণে নেপূর॥

যমুনার জলে যাইতে
পন্থে চিকন মাটি।
আছাড় খাইয়া রাধিকায়—
ভাঙিলা কলসী॥

১ চলিয়া ২ চাহিল

কহেন বৈষ্টব দাসে—
রাই গো, শুনো সখি তোরা :
কালিয়ার সনে পিরতি করি'
জী'তে[১] আমি মরা ॥

। ৩০২ ।

আলো।[২] রাই, কি হইল মোরে দিয়া[৩]
মনে লয়—হইতাম ঘরের বা'র—
পিরিতের লাগিয়া ॥

বন্ধের সনে করিতে পিরিতি
না দেয় ননদিনী।
রহিতে না পারি ঘরে রে—
শুনিয়া বাঁশীর ধ্বনি ॥

ঘরে বইরী ননদিনী
কি হইল প্রমাদ।
কতো বা সইব দুখ রাই—
কানু-পরবাদ ॥

মুই তো অভাগীর রে নারী
কুল বিনাশিলু।
কদমতলে বন্ধের খেলা রাই—
বিচারি'[৪] না পাইলু ॥

১ জীবিত অবস্থায় ২ ওলো ৩ আমার কি হইল ৪ খুঁজিয়া

বন্ধের লাগি' জলি' তনু
হইয়া গেল কালা।
এমন নিষ্ঠুর বন্ধু—
তেব[1] দেয় জ্বালা॥

কহে ফকির ভেলা রে শাহে
বাঁশীর নিলয়[2] না পাই।
কোন্ নাম জপে বাঁশীয়ে-
উদেশ করো চাই॥

। ৩০৩।

চিত-চোরা বাঁশীর সানে[3] —
যুবতী মজিবা রঙ্গে বা' কানাই,
কানাই রে, ও তোর ভালা না পড়িব[4]॥

কি করিমু, কোথায় যাইমু
এই সে ভাবনা—
বুঝি আমা লাগি' রাখিয়াছ
সংসারের বাসনা॥

এ জাতি-যৌবন রে
দিয়া না পাইলাম তোরে।
হইলাম ঘরের বা'র—
কি করিতায় মোরে॥

---

[1] তবু [2] হদিশ [3] টানে, সুরে [4] ভালো হইবে না

মুই গেলু যমুনার জলে
ভরিতে কলসী।
তাতে বুলে[১] বন্ধুয়ার সনে—
কইলাম হাসি-রসি[২] ॥

হাসি না হয়, রসি না হয়
বিজুলিয়ার ছাটা।
ফিরিয়া চাইতে ভাঙিল কলসী—
আমি খাইলাম উষ্টা[৩] ॥
শাশুড়ী, ননদী, বা' কানাই
আর নিজ পতি—
আখিয়ে আখিয়ে ঠারি'
থাকে ভাঙিতে পিরিতি ॥

বিধির বিড়ম্বনায় বন্ধু রে
ভাসিলাম সাগরে—
বসতি ছাড়াইতে চাহে
নন্দের কুওরে[৪] ॥

কুলের ঝিয়ারী হইয়া
ফিরিয়া আইলাম ঘরে।
পূরাইতাম মনের সাধ—
ননদী যদি মরে ॥

ধইনি-ধইনি[৫] রাধা-কানু—
ধইনি বিন্দাবন।
ধইনি-ধইনি গোকুলের সখী
ধইনি গোপীগণ ॥

---

১ বুঝি, বলে ২ হাসি-রসিকতা ৩ হোঁচট ৪ কুমারে, পুত্র ৫ ধন্যধন্য

মনে লয়—পরানের বন্ধু রে
গলায় গাঁথি' রাখি।
নিরবধি চাইয়া থাকি—
লিয়া[১] দুইটি আখি॥

যমুনারি[২] তীরে-নীরে
খেলা করে কানাই।
তুমি কানাই বিনে—
রাধার সঙ্গী কেও নাই

। ৩০৪ ।

কি সোনার বন্ধু রে, কি বলিমু তোরে—
প্রেম বাড়াইয়া আজি কেনে ছাড়ো মোরে
—কি সোনার বন্ধু রে।

সহজে অভাগিনী হইলাম কলঙ্কিনী—
আপনার সর্ব হেন ছাড়িলা আপনি।
কি সোনার বন্ধুরে॥

প্রেমভাব বাড়াইয়া ভাবি রাত্রি-দিন—
জাতিকুল দিয়া মুই না পাইলু আপন।
—কি সোনার বন্ধু রে॥

কুলধর্ম এই কাজে পরিহরি লাজে—
পরানের বন্ধু পাইমু মুই যমুনার মাঝে।
—কি সোনার বন্ধু রে॥

১ লইয়া ২ যমুনারি

না দেখিলে প্রাণি[১] মোর দহে কলেবর—
আসিতে যাইতে যেন কাটে নিরন্তর।
—কি সোনার বন্ধুরে॥

মোর হেন হিয়া জ্বলে, ভিন্ বাসো কেনে[২] —
পুরুষ ভ্রমরা জাতি, না জানো আপনে।
—কি সোনার বন্ধু রে॥

অন্তরে ধরিতে গেলু, ভাবে মোরে চিত[৩]—
ভবানন্দে বলে—না হয় উচিত।
—কি সোনার বন্ধু রে॥

। ৩০৫।

হায় রে, পিরিতি বাড়াইয়া বা শ্যাম যায় রে ;
হিয়ার মাঝে আছে পিয়া,
আসন করি' বসিয়া—
রাজপন্থে করে নানান খেলা।
—বা' শ্যাম যায় রে॥

মুই যদি জানিতু পিয়া,
এমন সময় যায়[৪] ছাড়িয়া—
নিশি পোসাইতাম উরে[৫] লইয়া।
—বা' শ্যাম যায় রে॥

যদি বন্ধু আপন হইত,
দুখ-সুখ সব জানিত—
পরান বন্ধে না চায় ফিরিয়া।
—বা' শ্যাম যায় রে॥

১ প্রাণ ২ অন্তরূপ ভাবো কেন ৩ আমাকে বিপরীত ভাবে ৪ কাটাইতাম ৫ বুকে, কোলে

যদি কাষ্ঠ আনল হইত,
জলি' পুড়িয়া রইত—
দারুণ প্রেমের আনল আমার নিভে না রে।
—বা' শ্যাম যায় রে ॥

দীন ভবানন্দে কয়—
এই ছেল[1] খসিবার নয় :
এই ছেল খসিব রাধা মইলে।
—বা' শ্যাম যায় রে ॥

।৩০৬।

ও তুই কার ঘরের বউয়ারী[2] গো রাধে—
রাধে গো, তুই কার ঘরের বউয়ারী ॥

দারুণ বিধাতায় মোরে
সৃজিল গোয়ালের ঘরে—
কানাইয়ে মোরে কইল কলঙ্কিনী ॥

কাঙ্খেতে কলসী করি'
বাইর[3] হইলা সুন্দরী—
বাতাসে হালিয়া-ঢালিয়া পড়ে ॥

কেমন নাগরে
বিয়া যে করিয়াছে তোরে—
একেলা পাঠাইল গঙ্গার জলে ॥

১ শেল ২ বউ ৩ বাহির

অন্‌চল[1] -পিন্‌চল[2] ঘাট,
লামিতে[3] সঙ্কট তাত—
ধীরে লামে এ চন্দ্রবদনী ॥

একবার ফিরিয়া চাও,
জুড়াউক শ্যামের গাও—
কলসী ভরিয়া দিমু আমি ॥

সকল সখীর সঙ্গে
যমুনাতে গেলু রঙ্গে—
দেখি আইলু বিজুলিয়ার ছাটা ॥

ভরিতে গঙ্গার জল
কলসী না হয় তল—
দারুণ জোয়ারে দিল ভাটা ॥

পন্থ মোর ছুড়ো[4] রে,
ও নিলজ্জবর[5] কালা রে—
গাগুরী[6] লাগিব তোর গায় ॥

দুনু হস্ত[7] জোড় করি'
রাধিকা সুন্দরী—
মিন্নতি করিলা বন্ধের পায় ॥

বলে দীন ভবানন্দে :
শুনো গো সুন্দরী রাধে—
কেনে আইলে হিঙ্গল মন্দির[8] ঘরে ॥

১ অর্থহীন ২ পিছল ৩ নামিতে ৪ ছাড়ো ৫ নির্লজ্জ ৬ গাগরী ৭ দুই হাতে ৮ কাল্পনিক স্থান বিশেষ

নন্দের ঘরের চিকনকালা,
হিদ্‌রে[1] মোর দিল জ্বালা—
বাঁশী বাজায় কদম্বেরি তলে

। ৩০৭ ।

হায় রে বন্ধু, হরি দয়াময়,
তোমারে দেখিবার মনে লয়[2]
তোমারে দেখি' গো—
রাধার জীবন শান্ত হয় ॥

নিশাকালে আইস রে বন্ধু,
করিয়া আরতি।
তোমার বাঁশীর স্বরে—
লইয়াছে খিয়াতি[3] ॥

একে রাধা অল্পতরু[4]
আর তো অবুলা।
কতো দুখ সহিব[5] প্রাণে—
বিরহের জ্বালা ॥

বাঁশীটি বাজাও রে বন্ধু,
বাঁশীর জানো কল।
কোন্ কলে বাজাও
মন করিয়াছে পাগল

১ হৃদয়ে ২ মনে হয় ৩ খ্যাতি ৪ অল্পবয়স্ক ৫ সহিবে

বাঁশীটি বাজাইয়া রে বন্ধু,
না যাইয়ো নিন্দে।
আগ দুয়ারে ননদিনী—
তিলে-পলে জাগে॥

বাঁশীটি বাজাইয়া রে বন্ধু,
থইলা কদম্বতলে।
লিলুয়া বাতাসে[১] বাঁশী—
'রাধা রাধা' বলে॥

কদম্বডালে থাকো রে বন্ধু,
কদম্বের তুড়ো ফুল।
মুখেতে মধুর দিয়া—
লইলায়[২] জাতি-কুল॥

কদম্বডালে থাকো রে বন্ধু,
কদম্বেরি ভাঙো আগা।
আবাল-কালে[৩] কইলায় পিরিতি-
যুবত-কালে দাগা॥

মোর নিবেদন কিছু
শুনো রে অবুলা।
কে বা বাড়াইল পিরিতি—
কার ভয় মন জ্বালা॥

কেও কালা, কেও গোরা,
একই ঘরে থাকি।
কেওয়াড়[৪] খুলিয়া দেও—
চান্দমুখ দেখি॥

১ মৃদু মন্দ বাতাসে ২ লইলে ৩ শিশুকালে ৪ কপাট

দীন ভবানন্দে কহে :
  শুনো প্রাণের ধন।
    কানাই বিহনে রাধিকার—
      না রহে জীবন ॥

।৩০৮।

নিন্দ হইল পরানের বয়রী[১]।
  রে নাইওর বন্ধ,[২]
    ও আমার নিন্দ হইল পরানের বয়রী ॥

নাইওর রে, এ দমের[৩] ভরসা নাই—
  নাম জপ' সাধু ভাই,
    পলকে হইব[৪] ঘর চুরি ॥

নাইওর রে, নিমের গাছে নিমের জড়[৫]
  অঙ্গানি[৬] নিরন্তর,
    ধুঁয়া তার লাগিছে আকাশে রে।
সেই ধুঁয়ার পরকাশে
  ঘর অন্ধকার রে—
    দুইটি আখি লাগি' যাইব মেলা[৭] ॥

নাইওর রে, দুখের মন্দিরে—
  সুখে নিদ্রা না যাইয়ো রে ;
    সুখ ছাড়ি' হইবা রে বনবাসী রে।
সুখের বন্ধুয়া রে,
  নয়ানে না দেখি রে—
    জাগিয়া হইলাম উদাসিনী ॥

১ শত্রু ২ প্রিয়বন্ধু ৩ নিশ্বাসের ৪ হইবে ৫ শিকড় ৬ (?) ৭ তখন (?)

শুনো রে মুমিন[১] ভাই,
কেওরের[২] সঙ্গী কেও নাই—
দণ্ডে-পলে ঘর হইব[৩] চুরি ॥

নাইওর রে, ঘরের মাঝে
মনুরায়ে বিরাজে—
ওরে, সদায় তাতে বাঘে করিছে শয়ন রে।

ভেলা শা' ফকিরে কয়—
রাজ পন্থে মিলন হয়,
এই ছিল নছিবের বাঁটা[৪] ॥

। ৩০৯ ।

তোর পিরিতে সকল হারিলাম—
রে পরানের বন্ধু,
তোর পিরিতে সকল হারিলু[৫] ॥

মাও ছাড়লাম, বাপ ছাড়লাম,
ছাড়লাম সোদের[৬] ভাই।
অনাথের নাথ তুমি—
আর লক্ষ্য নাই ॥

আগ ডালে বইস রে বন্ধু,
কদম্ব হেলিয়া।
মুই অনাথ বালকে ডাকি রে বন্ধু,
জঙ্গলবাসী হইয়া ॥

১ বিশ্বাসী ধার্মিক ২ কাহারও ৩ হইবে ৪ ভাগ্যের লিখন ৫ হারাইলাম ৬ সহোদর

যে বেলা করিয়াছিলায় পিরিত
শান-বান্ধিল[1] ঘাটে—
ছাড়বায়না-ছাড়বায়না করি'
হস্ত দিলাম মাথে ॥

জঙ্গালে[2] সে রইস, রে বন্ধু,
জঙ্গালে সে যাইয়ো।
মুই অনাথ বালকে ডাকি—
ফিরিয়া চাইয়ো ॥

দীন ভবানন্দে কয় :
বন্ধু, শুনো রে কালিয়া—
নিভি' ছিল মনের আনল,
কে দিল জালিয়া ॥

। ৩১০ ।

রাধারে ধরিমু চোর
পাইয়া ফুলের রেণু।
ও সই, যাইবায় নি[3] রাধার বাড়ী-
যথা গিয়াছে কানু ॥

ষোলশ[4] গোপিনী লইয়া
যখন করিয়াছিলাম খেলা :
কদম্বতলে না পাইয়া—
রাধার বাড়ী গেলা ॥

---

১ শান-বাঁধানোঘাটে ২ জঙ্গলে ৩ যাইবে কি ৪ ষোড়শ

এক সখীয়ে উঠিয়া বলে
আর সখীর আইয়ো[১] ঃ
ধীরে ধীরে পা পালাইয়ো[২] —
তারা শুনব[৩] —চাইয়ো ॥

এক সখীয়ে উঠিয়া বলে
ঘরে নাই কানু ঃ
মিছা-মিছা কথা কহিয়া—
জ্বালাও রাধার তনু ॥

রাধার মন্দিরের মাঝে
উদয় হইলা ভানু ঃ
বেড়'[৪] রে গোকুলের লোক—
এই ঘরে কানু ॥

বলইন[৫] বৈষ্ণব দাসে ঃ
দুয়ার না ঘুচাও লাজে ;
বসিছে দ্বিতীয়ার চান্দ—
আন্ধইর[৬] কোঠা-মাঝে ॥

। ৩১১ ।

কি হইল পাগেলার মনা[৭] রে,
মনা না লয় ঘর-বাড়ী ।
শিশুকালে সুস্বামীর ঘরে রে-
যৈবতকালে রাঁড়ী[৮] ॥

১ ঠাঁই, নিকটে . ২ ফেলিয়ো ৩ শুনিবে ৪ বেষ্টন করো ৫ বলেন ৬ অন্ধকার ৭ মন
৮ বিধবা

অভাগিনী হইলু রাঁড়ী রে
না গেল মনের হিছ[১]।
প্রভাতে পরদেশীর ঘরে রে—
না পূরিল মনের তিষ[২] ॥

না কইলু সুস্বামীর সেবা রে
না লইলু ছায়া।
ঘরখিনি[৩] রঙ্গিলা দেখি রে—
ভাঙিয়া পড়ে চালা ॥

করমহীন দেখিয়া লোকে রে
আমারে তো দোষে।
না কইলু সুস্বামীর সেবা রে—
দংশিল কাল-সাপে ॥

পাও নাই চলে সর্পের রে
দাঁত-নাই কাটে।
ঝাড়িতে না লামে[৪] বিষ রে—
দুঃখে প্রাণি ফাটে ॥

কতো বা সহিমু দুঃখ রে
বিষের তাড়না।
অভাগীর মনের দুঃখ রে—
তোমরা কি জানো ॥

কহে ফকির ভেলা শাহে রে
হইয়া বড়ো দুঃখী।
খাকের তনু[৫] খাকে যাইবা রে-
লাগিব[৬] দুইটি আখি ॥

---

১ আকাঙ্ক্ষা ২ পিপাসা ৩ ঘরখানি ৪ নামে ৫ মাটির দেহ ৬ লাগিবে

। ৩১২ ।

বেলা হইল এক প'র,[১]
কানাই রে, সিনানে নাই তোর মন ·
আমি তো অভাগিনী নারী
চড়াইলু রান্ধন—
সুন্দর কানাই রে ॥

বেলা হইল দুই প'র,
কানাই রে উদরে লাগিল ভুখ[২] ;
দুইটি আঙ্খি ঢিলি-মিলি[৩]
শুকাইল চান্দ মুখ—
সুন্দর কানাই রে ॥

কদম ডালে থাকো কানাই
কদম্বের তুড আগা ;
শিশুকালে কইলায় পিরিত
যুবত কালে দাগা—
সুন্দর কানাই রে ॥

বেলা হইল তিন প'র,
কানাই রে, রাখালে ছাড়ে গোরু ;
আবাল কালে[৪] কইলায় পিরিত
চাইয়া অল্পতরু[৫] —
সুন্দর কানাই রে ॥

সাঞ্জা[৬] গেল, রাত্রি হইল,
কানাইরে, গিরস্তে[৭] জ্বালে বাতি ;
তোমায়-আমার নাই সে দেখা
কিসের পিরিতি—
সুন্দর কানাই রে ॥

---

১ প্রহর ২ ক্ষুধা ৩ ঢুলু-ঢুলু ৪ শিশুকালে ৫ অল্পবয়স দেখিয়া ৬ সন্ধ্যা ৭ গৃহস্থ

দীন ভবানন্দে কয় :
কানাই রে, বাঁশীর নাম মুরারী[১] :
ছাড়িয়া যাইবা নিষ্ঠুর কালা
ত্যজিয়া পিরিতি—
সুন্দর কানাই রে ॥

। ৩১৩ ।

আর নি আসিবা[২] কিষ্ণ—
কলঙ্কী রাধা মইলে গো।
ওগো দূতী,
কইয়ো পরান-বন্ধের লাগ পাইলে[৩]

কইয়ো কইয়ো ওগো দূতী,
শ্রীরাধার করুণা।
দুই নয়নে বহে গো ধারা—
গঙ্গা আর যমুনা গো ॥

রাধা মইলে না পুড়িয়ো—
না ভাসাইয়ো জলে।
রাধারে বান্ধিয়া থইয়ো
তমাল বিরিকের[৪] ডালে গো ॥

পুষ্করিণীর চারিপাশে
চাম্পা-নাগেশ্বর।
ডাল ভাঙিয়া ফুল তুড়ে—
বিদেশী নাগর গো ॥

১ মুরলী ২ আর কি আসিবেন ৩ সাক্ষাৎ হইলে ৪ বৃক্ষের

যে বেলায় করিয়াছিলায় পিরিত
তুমি আর আমি—
অখন কেনে সেই সব কথা
লোকের মুখে শুনি গো ॥

যখনে পিরিতি কইলায়[১]
চালের কোণায় ধরি'—
দরদ-জ্বালা, মাথার বিষ
কলিজা দরদে মরি গো ॥

দীন ভবানন্দে কয় :
রাধা ভাগ্যবতী।
তোমরা নি রাখিতায় পারো—
সুজনের পিরিতি গো ॥

। ৩১৪ ।

বিকটী[২] কদম্বের ডালে পত্র সারি-সারি ;
দেখিলে জীবন ধরে,
না দেখিলে মরি গো—
বিনা দরশনে ॥

বিকটী কদম্বের ডালে ফুটে নানান ফুল ;
কানুর গলায় মালা দেখি,
আমার বন্ধ বেয়াকুল গো—
বিনা দরশনে ॥

১ করিলে ২ বিটপী

গাঁথিয়া বনফুলের মালা কতো উঠে মনে ;
প্রাণের পতি নাই ঘরে,
মালা দিমু কুনে[১] গো—
বিনা দরশনে ॥

দংশিল কালিয়া নাগে, বিষে কইল কারি[২] ;
ঝাড়িতে না লামে বিষ,
আমি যাই কার বাড়ী গো—
বিনা দরশনে ॥

এক উঝায়[৩] নাড়ে-চাড়ে, আর উঝায় ঝাড়ে ;
ঝাড়িতে না লামে বিষ,
আমার ফিরিয়া উজান ধরে গো—
বিনা দরশনে ॥

ঘরখিনি[৪] বানাইয়া চান্দে বাইরে কইলা বাসা ;
জনম ভরি' রইল দুখ,
আমার না পূরিল আশা গো—
বিনা দরশনে ॥

যাইতে যমুনার জলে হস্তে লইয়া ঝারি ;
এই লাখের যৌবন লইয়া আমি
যাইতাম কার বাড়ী গো—
বিনা দরশনে ॥

দীন ভবানন্দে কইন[৫] জাতে ছিলাম হীন ;
যদি বন্ধে করে দয়া
কিয়ামতের দিন[৬] গো—
বিনা দরশনে ॥

---

১ কাহাকে ২ কাল ৩ ওঝায় ৪ ঘরখানি ৫ কহেন ৬ শেষ বিচারের দিন

॥ ধামাইল ॥

। ৩১৫ ।

অজ্ঞান মন, গুরু কি ধন চিনলায়[1] না—
পাতল[2] স্বভাব গেল না ॥

আর রূপ দেখিয়া হইয়াছে পাগল
গুণের পাগল হইলায়[3] না।
ওয়রে, কূল পাথারে সাঁতার দিয়া
সাধন সিদ্ধি কইলায় না ॥

আর একটি নদীর দুইটি ধারা[4]
বাইতে পাইলায় না।
ওয়রে, হৃদয়-পিঞ্জিরার পাখী
ঘুরিয়া-ঘুরিয়া আইল না ॥

আর ভাইবে রাধারমণ বলে,
না হইলে প্রাণ বাঁচের[5] না—
ওয়রে, কাজের কাজী না হইলে
তন্তর-মন্তর ধরের না ॥

---

১ চিনিলে ২ চপলতা ৩ হইলে ৪ 'একটি নদী' অর্থে সুষুম্না; 'দুইটিধারা' হইলে ইড়া ও পিঙ্গলা ৫ বাঁচে

। ৩১৬ ।

আরে ও পাগেলার মন রে,
আইজ[১] আনন্দে হরির গুণ গাও ॥

আয় উর্ধ্ববাহু, হেট মাথে[২] ,
যখন ছিলায় মাতৃ-গর্ভে—
এখন ভূমিতে পড়িয়া মাটি খাও ॥

আর নয়ন দুইটি রত্ন-ভরা,
তোমার চরণ দুইটি রথের ঘোড়া ;—
তোমার হস্ত দুইটি গুরুর সেবা দাও ॥

ভাইবে রাধারমণ বলে—
মনরে, তুই রইলে ভুইলে[৩] :
একবার 'হরি' বইলে ব্রজে চাইলে[৪] যাও ॥

। ৩১৭ ।

মনের মানুষ না পাইলে
মনের কথা কইয়ো না—
প্রাণ-সজনি, না না না ॥

কুসঙ্গীয়ার সঙ্গ ছাড়ো,
হায়রে, সদায় গুরুর সঙ্গ ধরো গো
ওরে, রঙ্গের গুটি চালান কইরে[৫]
বন্ধ কইরো না ॥

১ আজি ২ হেঁট মাথায় ৩ ভুলিয়া ৪ চলিয়া ৫ করিয়া

যদি তোমার ভাগ্যে থাকে—
হায়রে, মনের মানুষ পাইবে বসে গো।
ওরে, অসময়ে চলতে গেলে
কেও[১] তো চল্‌বে না॥

ভাইবে রাধারমণ বলে,
হায়রে, মনের মানুষ ধরতে গেলে গো—
ওরে, মনের মানুষ ধরতে গেলে
ধরা দিব[২] না॥

। ৩১৮ ।

চলো যাই সেখানে গো—
মনের মানুষ যেখানে॥

আটিয়া[৩] যাইতে কাম-নদীতে
পাড়ি দিল ওই বিপিনে।
কতো ধনীর ভরা খাইছে মারা[৪]
পড়িয়া নদীর ঘোর তুফানে॥

সাধু যারা পারয়[৫] তারা
তারা নদীর দার[৬] চিনে।
কতো উল্টা নদী বাইছে যারা
তারা সেরূপ সাধন জানে॥

শতদল কমলের মাঝে
রসের একটি পউম্ম[৭] আছে।
ফুলের ভমর বিনে
ফুলের মধু অন্য কে আর জানে

১ কেউ ২ দিবে ৩ হাটিয়া ৪ ভরা ডুবি হইয়াছে ৫ পার হয় ৬ ধার ৭ পদ্ম

। ৩১৯ ।

সখি, চল্ গো মোরে লইয়া—
মথুরাতে প্রাণ-বন্ধুয়ার চরণ দেখি গিয়া ॥

আর সেপারে বন্ধুয়ার বাড়ী
মধ্যেতে নদীয়া[১] ।
ওরে, কে হইব[২] পারের মাঝি—
কে যাইব বাইয়া[৩] ॥

আর গোকুলের যতোই নারী
মন্ত্রণা করিয়া—
এগো, রাধার সনে ফুল আনিতে
রহে দাঁড়াইয়া ॥

আর যে জন রসিক হও রে
পসার পাতিয়ো ।
এগো, পর মারিয়া[৪] সোনাপুরে
গেলে মু[৫] চলিয়া ॥

আর রাধিকাও জলে যাইতে
রদির[৬] বিষম জ্বালা ।
এগো, কান্দিয়া বলে বিনোদিনী রাই—
আবে[৭] ধরে ছায়া ॥

আর রাধিকাও জলে যাইতে
মেঘের আন্ধারিয়া ।
ওরে, চিতরঞ্জিনী দাসী—
বারইল[৮] মোমের বাত্তি লইয়া ॥

---

১ নদী ২ হইবে ৩ বাহিয়া যাইবে ৪ উড়িয়া ৫ যে ৬ রৌদ্রের ৭ মেঘে ৮ বাহির হইল

আর আম্বর আলী বলছে,
ধনি, কার বায়[১] রইলায় চাইয়া—
ওরে, আইত্‌রা-আইত্‌রা[২] শ্যাম-কালাচান্দ
মুররী[৩] বাজাইয়া ॥

। ৩২০ ।

নিদয়া, আমায় গেলায়[৪] ছাড়িয়া—
ওয়রে, নিষ্ঠুর কালিয়া ॥

আর নিদয়া-নিষ্ঠুর রে বন্ধু,
বাসর দিলাম সাজাইয়া।
এগো, আইল না শ্যাম-চিকন-কালা—
নিশি গেল পোসাইয়া ॥

আর সার-সুয়ায়[৫] গান করে—
তমাইল বিরুকে বইয়া[৬]।
এগো, সার্থক জীবন তার
বনের পাখী ধরিয়া ॥

আর জ্বালাইয়া মোমেরি গো বাতি
নিশি গেল পোসাইয়া—
এগো, আইল না শ্যাম-চিকন-কালা
কে রাখিল ধরিয়া ॥

আর তোষের আনল[৭] রে বন্ধু,
জ্বলে ঘইয়া-ঘইয়া[৮] :
এগো, মনে লয়—জীবন দিতাম[৮]
বুকে ছুরি মারিয়া ॥

১ কাহার দিকে ২ আসিতেছেন ৩ মুরারী, মুরলী ৪ গেলে ৫ শুকসারী, পরমতত্ত্ব
৬ তমাল বৃক্ষে বসিয়া ৭ তুষের অনল ৮ থাকিয়া থাকিয়া ৯ দিই

। ৩২১ ।

আমার মন-মাতঙ্গ সাথে
ডুব দিয়ো না কাম-নদীতে ॥

নদীর উইঠব[১] ঢেউ, ছুইটব[২] নালা
সর্বস্বধন নিব সোতে[৩]।
ডুব দিয়ো না কাম-নদীতে ॥

মাইয়া ভজন, মাইয়া সাধন—
মাইয়ার প্রেমে যে জন মজে :
মাইয়া ভজলে ছয়গুণ[৪], নইলে নয়গুণ[৫],
আটচাল্লিশ গুণ[৬] মাইয়ার কাছে ॥

নিতাই চান্দে উজন[৭] করে—
বস্তায় বান্দি' নিত্যই রাখে।
এগো, দুলভ চরণ সুয়াগ দাসে
পাইল না তার স্বভাব দোষে ॥

---

[১] উঠিবে [২] ছুটিবে [৩] স্রোতে লইবে [৪] 'ছয়'কে যখন 'গুণ' বলা হইতেছে তখন ইহা নিশ্চয়ই 'ছয়রিপু' নহে। মনে হয় 'ষটচক্র', বা স্বাধিষ্ঠান চক্রের 'ষড়দলপদ্ম', কিংবা কটু-তিক্ত-কষায়-লবণ-অম্ল-মধুর এই 'ষড়রস'-কে বুঝাইয়া থাকিবে [৫] দেহের 'নয়' দরজার কথা সম্পর্কে ২০৪-সংখ্যক গানের পাদটীকা দ্রষ্টব্য। কিন্তু, এখানে 'নয়' দরজার সংখ্যা নহে। কিংবা ইহা 'নবগ্রহ'-ও নহে। তবে, শৃঙ্গার হাস্য করুণ অদ্ভুত রৌদ্র বীর ভয়ানক-বীভৎস শান্ত—এই 'নবরস'হইতে পারে [৬] আটচল্লিশের তাৎপর্যও বোঝা যাইতেছে না। ৩৫৪ সংখ্যক গানে পাই "আটচল্লিশ জোড়া," দেহের মধ্যে আটচল্লিশটি সন্ধিস্থল রহিয়াছে [৭] ওজন

। ৩২২ ।

রসের দয়রদী[১] শ্যামরায়,
আমি কাঙালিনী তোমার পানে চাই ॥

আর রূপ দেখি ঝলমলি
প্রাণি আমার নিলায় হরি'।
ওরে, চাতকিনী হইয়ে আমি
সে রূপ ধরিতে চাই ॥

আর দূরে থাকি' দেখা ভালো
নিকণ্টে[২] মিশিয়া রইয়ো।
ওয়রে, ভিন্ বাসিয়ো না[৩] অবুলারে
চরণতলে দিয়ো ঠাই[৪] ॥

আর ভাইবে রাধারমণ বলে
প্রেম করি' কালিয়ার সনে :
ওয়রে, গোপীর মতন উদাসিনী
আমারে বানাইত[৫] চায় ॥

। ৩২৩ ।

তোরা বল গো সখি সকলে—
গৌরচান্দ পাইমু গো কই গেলে[৬] ॥

এগো, কই গেলে রে ও গৌরচান্দ,
ও তুমি অঙ্গ শীতল পূরাইলে[৭]।
—কই গেলে ॥

১ দরদী ২ নিকটে ৩ পর মনে করিয়ো না ৪ ঠাঁই ৫ বানাইতে ৬ কোথায় গেলে
৭ আমার অঙ্গ শীতল করিবার বাসনা পূরণ করিলে

এগো, কই গেলে রে ও গৌরচান্দ,
ও তুমি দেখা দিয়া লুকাইলে।
—কই গেলে ॥

এগো, বিজুলি চটকের[১] মতন গৌরচান্দ,
দেখা দিয়া লুকাইলে।
—কই গেলে ॥

এগো, তাপিত অঙ্গ শীতল অয় না[২] গৌরচান্দ,
তোমারে না দেখিলে।
—কই গেলে ॥

। ৩২৪ ।

আমার মন হইয়াছে লাচাড়ি[৩]।
পড়িয়াছি ঘোর বিপদে—
তরাও গৌর-হরি ॥

আর একা একা বনেতে বেড়াই ;
কতো সিংহ-ব্যাঘ্র দেখিয়া গৌর
মনেতে ডরাই।
ওরে, কি করিমু, কোথায় যাইমু—
তাইতে মনে মন ভাবি ॥

আর শুনছি[৪] কতো সাধুর মুখে
তোমার নামটি যে লয় গৌর
সে থাকে সুখে।
ওয়রে, আমার কেনে এ দুর্দশা—
বেহুশে[৫] কান্দিয়া মরি ॥

---

১ ছটার ২ হয় না ৩ অসহায় ৪ শুনিয়াছি ৫ বেহুঁশে

আর আমায় কইন তো তায়ে ক্ষেতি[১] নাই ;
তোমার নামটি হৃদয় মাঝে—
ওই ভিক্ষা চাই।
রাধারমণ বলে,—মৃত্যুকালে
দিয়ো চরণ-তরী ॥

। ৩২৫ ।

সখি গো, কি হেরিলাম জলে।
বিজুলি চটকের রূপ গগন মণ্ডলে গো
নবীন কালিয়ার রূপ ॥

কেও বলে মেঘ-মেঘ, কেও বলে কালা।
তোমরা কি দেখিয়াছ সই—
মেঘের গলায় মালা গো ॥

মেঘ যদি অইত সই গো যাইত রে ছাড়িয়া।
তে কেনে রইত মেঘ—
কদম্ব হেলিয়া[২] গো ॥

আতে[৩] ধড়া, মাথে চূড়া, গলে ফুলের মালা।
যার পানে চায় তারে মারে—
প্রাণে করে সারা গো ॥

১ তাহাতে ক্ষতি নাই ২ কদমগাছে হেলিয়া ৩ হাতে

। ৩২৬ ।

কি অপরূপ দেইখে আইলাম
জলের ঘাটে গিয়া।
কালায় রঙ্গে-রঙ্গে বাজায় বাঁশী—
কদম-তলে বইয়া॥

কালা না কালিন্দ্রীর[১] জল
চলো দেখি গিয়া।
এগো, কালায় নিল জাতি-কুল—
প্রাণটি না যায় রাখা॥

চন্দ্রাবলী দুচ্চারণী,[২]
জানে বড় টুনা[৩]।
এগো, টুনা করি' রাইখ্‌ছে আমার
বন্ধু কালিয়া-সোনা॥

ভাইবে রাধারমণ বলে—
শুনো গো সজনি:
বন্ধে শঠের মতো কয় গো কথা
জনমের লাগিয়া॥

। ৩২৭ ।

ও রূপ দেইখে আইলাম সখি গো,
জল আনিতে জারণবীর[৪] ঘাটে।
এগো কাঞ্চাসোনা ঝিলমিল্‌-ঝিলমিল্‌-
ও সই, চান্দ বটে কি মানুষ বটে॥

---

১ কালিন্দীর ২ দুশ্চারিণী ৩ যাদু ৪ জাহ্নবীর

আর যার লাগি' মন চাতুরী খেইলে
তার কথা উঠলে মনে ধাকাধাকি[1] করে
এগো, নিমূল্যি[2] করাতের ধারে—
আইতে-যাইতে সমান কাটে ॥

আর যখন কালায় নয়ন-বান ছাড়ে—
কতো রমণীর মন আপনি গো ভুলে।
এগো, রমণীর মন ভুলাইবারে—
বসিয়াছে যমুনার তটে ॥

আর সোনার চান্দ বাউলে বলে—
ও রূপ না দেখলে প্রাণ রয় কেমনে :
এগো, দেখছি যখন, ঠেকছি তখন—
গিরে[3] রইতে না লয় মনে ॥

। ৩২৮ ।

ললিতে, জলে গিয়াছিলাম একেলা—
ডাকছে নাগর শ্যাম-কালা ॥

আর পদের উপর পদ থইয়া
বাজায় কদম-তলা।
ওয়রে, দেখছি অনে[4] লইছে মনে-
মন হইয়াছে চঞ্চলা ॥

১ ধুকধুক ২ অমূল্য, এখানে অসাধারণ ৩ গৃহে ৪ হনে, হইতে, অবধি

আর কি মহিমা জানে সই গো—
নন্দের চিকন-কালা।
আঙ্খির ঠারে শ্যাম-নাগরে
দিত[১] চায় ফুলের মালা॥

আর ভাইবে রাধারমণ বলে
কি হইল যন্ত্রণা ঃ
বৈকণ্ঠ বলে, জলের ঘাটে
আর যাইয়ো না একেলা॥

। ৩২৯ ।

শুইনে ধ্বনি নিলায়[২] প্রাণি—
বাঁচি না গো এখানে।
চিত্ত-চোরায় বাজায় বাঁশী কোন্ বনে?

যখন বন্ধে বাজায় গো বাঁশী—
তখন আমি রান্ধতে বসি,
উপায় কি করি॥

যখন বন্ধে বাঁশীয়ে দিল টান—
বাঁশীয়ে নিল কুলমান,
বন্ধুয়ায় নিল জান॥

এগো, কাঞ্চা লাকৃড়ি[৩] চুলায় দিয়া—
ধুমার ছইলে[৪] কান্দি গো আমি।
চিত্ত-চোরায় বাজায় বাঁশী কোন্ বনে?

---

১ দিতে ২ লইলে ৩ কাঁচা কাঠ ৪ ছলে

। ৩৩০ ।

আর শুন শুন, শুন মন দিয়া—
কালায় প্রাণ নিল মুররী[১] বাজাইয়া।
গিরে[২] রইতে নারি বাঁশীর রব শুনিয়া ॥

আর কদম্বেরি তলে বসি'—
কালায় নাম ধরিয়া বাজায় বাঁশী।
গিরে[২] রইতে নারি বাঁশীর রব শুনিয়া ॥

আর ঘরে গুরুজন বয়রী[৩] —
আমি ফুকারিয়া না কান্দতে পারি।
আমি কতোই রইমু[৪] পরার অধীন হইয়া

আর ভাইবে রাধারমণ বলে,
মনে মনে ভাবো কেনে ঃ
ওরে, আসব[৫] তোমার প্রাণ-বন্ধু
নিকুঞ্জে আসিয়া ॥

। ৩৩১ ।

বাঁশি, বিনয় করি তোরে—
নাম ধরিয়া ডাকিয়ো না অবুলা রাধারে ॥

বাঁশি রে, আমিও অবুলা নারী
দুঃখ পাই অন্তরে।
তবু কেনে নিষ্ঠুর বাঁশি—
বাঁশি, যন্ত্রণা দেও মোরে ॥

১ মুরারী, মুরলী ২ গৃহে ৩ বৈরী ৪ রহিব ৫ আসিবে

বাঁশি রে, শইলে স্বপন দেখি
বন্ধু লইছি[১] কোলে।
জাগিয়া না পাইলাম তারে-
কাল নিদ্রা গেল ছুটে॥

বাঁশিরে, চুয়া-চন্দন, ফুলের মালা,
গাঁথিয়া যতনে—
প্রাণ-বন্ধু আসিবে বলি'
ও সে না আসিল:

বাঁশি রে, ভাইবে রাধারমণ বলে,
মিন্‌নতি চরণে :
জী'তে[২] না পুরিল আশা—
মইলে[৩] যেন পূরে॥

। ৩৩২ ।

আয় বা'[৪] নিলাজ কালা' রে,—
কালা, কোন্ ঘাটে ভরিতাম গঙ্গার জল।

আর যেই ঘাটে ভরিতাম জল
সেই ঘাটে ইংরাজের কল রে—
ওয়রে, কল চাপিয়া দেও গঙ্গার জল॥

আর তোমার বাঁশীর সুরে
ভাটিয়ল নদী উজান ধরে।
ওয়রে, ঘৃত-লনী না লয় আমার মন॥

১ লইয়াছি ২ জীবিত কালে ৩ মরিলে ৪ হায় রে

আর ভাইবে রাধারমণ বলে
আছইন[১] কালা কদমতলে :
ওয়রে, কুলমান লজ্জা-ডরে
থাকো নিলাজ কালারে ॥

। ৩৩৩ ।

ওরে সজনি, আমি আগে তো না জানি গো
কালার প্রেম-বিচ্ছেদের আগুইনি ।
ওরে, যে সুখে রাইখছ[২] রে প্রাণ—
জল ছাড়া হই চাতকিনী ॥

শ্যাম-পিরিতের এ দুখ ছিল :
একুল গেল, সে কূল গেল,
দুইকূল গেল ।
শ্যাম না পাইলাম, কূল হারাইলাম—
নাম রইল সই কলঙ্কিনী ॥

কালার প্রেমের সুরত ভালো নয় ;
সূর্যমঙ্গল বেসাতে উদিত হয়[৩] ।
ও দীন সোয়াগে বলে—
ডুবিয়া মইলা[৪] চণ্ডীদাস আর রজকিনী

। ৩৩৪ ।

সজনি, আমি পাই না ধৈর্য ধরিতে—
শ্যাম-পিরিতে করিয়াছে উদাসিনী ।
হয়রে, বন-পোড়া হরিণীর মতন
জ্বালায়ে জ্বলিয়া মরি ॥

১ আছেন ২ রাখিয়াছ ৩ (?) ৪ মরিলেন

সখি, তোরা কইরে গো মন্ত্রণা
শ্যাম-বিচ্ছেদে প্রাণ বাঁচে না, সহে না
সাধ কইরে মন-প্রাণ সঁপিলাম—
হইয়াছিলাম কলঙ্কিনী ॥

ভাইবে রাধারমণ গো বলে,
প্রেম কথাটি রইল গোপনে জগতে।
ওয়রে, মরণ-জীওন[১] সমান—
কৃষ্ণ প্রেমের কাঙালিনী ॥

।৩৩৫।

অপরূপ জলছে আনল[২] —
নিভাই বলো কোন্ কলে।
সই গো, আরে জীবন আমার যায় জইলে[৩] ॥

শুকনা কাঠে জলিয়াছে আনল ;
দ্বিগুণ হইয়া উঠে সই গো,
তাত[৪] না দিলাম জল।
কেও যদি দইরদী[৫] থাকো—
সন্ধান বাতাই'[৬] দেও বইলে[৭] ॥

গোপনেতে পিরিতি করা
আয়ু থাকতে প্রাণে সই গো,
ওই প্রেমে মরা।
এমন পিরিত করতাম না সই—
আগে আমি জানিলে ॥

---

১ জীবন-মরণ ২ অনল ৩ জ্বলিয়া ৪ তাহাতে ৫ দরদী ৬ বাতাইয়া ৭ বলিয়া

জয়ান্দ্র কয় এতেক বাণী—
তোমরা সব আছো সই গো,
প্রেম সন্ধ্যাসিনী[১]।
আপনা ধনকে যত্ন করি'
হাতে লও সোনা বইলে ॥

। ৩৩৬।

অবুলা[২] জানিয়া রে—
শ্যাম-চান্দের মনে দয়া নাই।
আমি ডুবি সুখের সায়র হ'[৩],
আমি কূল-কিনারা নাই পাই ॥

আর মুখেতে মধুর দিয়া, কামশর হস্তে লিয়া[৪]
মাইলায় রে খেঁচিয়া[৫]।
ওরে, মারিয়াছে খেদঙ্গ-তীর[৬] হ,'
আমি প্রাণে আর বাঁচিমু নাই ॥

আর অধীন ওয়াতিরে বলে,
ডুব' হে যবুনার[৭] জলে।
'শ্যাম-চান্দ' বইলে[৮] নিরলে বসিয়া হ',
আমি শ্যাম-চান্দ বইলে ডাকতে চাই ॥

। ৩৩৭।

নিদয়া-নিষ্ঠুর রে বন্ধু, নাই সে দয়া তোর রে—
শ্যাম, প্রেম-জ্বালা কেনে দাও বারে বার।
ওরে, ধৈর্যধরা নাই মানে অন্তরে আমার রে ॥

---

১ সন্ন্যাসিনী ২ অবলা ৩ সায়রে হে ৪ নিয়া ৫ সবেগে মারিলে ৬ প্রাণঘাতী তীর
৭ যমুনায় ৮ বলিয়া

আর পূর্বে আইসবে[১] বলেছিলে,
এখন কার ভাবে তোর মন মজাইলে।
ওয়রে, তোমারি কারণে অন্তর
জ্বলিয়া ছার-খার রে ॥

আর আগে বন্ধে আশা দিয়া
কতো রঙ-ঢঙে তার মন মজাইয়া
ও তোর রঙ-যৈবন আর কতোই দিন
করিবায় বেহার[২] রে ॥

আর ভাইবে রাধারমণ বলে—
মনের মানুষ পাই না এ সংসারে।
ওয়রে, মনের মতন রসিক পাইলে
হইতাম সঙ্গী তার রে ॥

। ৩৩৮ ।

নিদয়া হবে বলে আগে তো না জানি-
বন্ধু, শ্যাম-গুণমণি ॥

আর আমি তোমার, তুমি আমার,
ভিন্ন নাই সে জানি।
আমায় থইয়া চন্দ্রার কুঞ্জে
পোসাইলায়[৩] রজনী ॥

আর তুমি হও কল্পতরু,—
আমি হই লতা।
ওয়রে, দুই চরণে বান্ধিয়া রাখমু-
ছাড়িয়া যাইবায়[৪] কোথা ॥

---

১ আসিবে ২ বিহার করিবে ৩ কাটাইলে ৪ যাইবে

আর ভাইবে রাধারমণ বলে—
শুনো গো প্রেয়সী ঃ
এখন তোমার মনের খেদ
পূরাব আপনি ॥

। ৩৩৯ ।

বন্ধু, রমণীর মন চোর—
থাক্ থাক্ প্রাণ, দেখমু ভালো,
থাকলে ব্রেজপুর[১] ॥

আর কি-বুকেরে প্রাণ-বন্ধু—
হায় রে, প্রাণ সঁপিলায় মোরে।
ওয়রে, ধর্মাধর্মি কওরে বন্ধু,
আছে নি[২] তোর মনে ॥

আর যেইবালা[৩] পিরিতি কইলাম, রে বন্ধু,
তুমি আর আমি—
ওয়রে, আমার ছিল চান্দের দশা,
তোমার রাশি শনি ॥

আর সুরেশ বলে, কিশোরী গো,
ও তোর পদের বালাই মোরে।
ওরে, কিষ্ণকে দেখিয়া রাধার
মন হইল ভারী ॥

১ যদি ব্রজপুরে থাকি, তাহা হইলে তোমাকে দেখিব ২ কি ৩ যেই বেলা, যে সময়ে

। ৩৪০ ।

ও বিশখা[১] সই গো,
কই[২] গো আমার মন-মোহিন কালিয়া
ও আমায় শান্ত করো—
প্রাণনাথ আনিয়া ॥

আর বাসর-শয্যা ত্যজ্য করি'
আমরা বসিয়াছিলাম সব নারী।
আমায় শান্ত করো জলধারা দিয়া ॥

আর চুয়া-চন্দন, ফুলের মালা,
রাখিয়াছিলাম যত্ন কইরা[৩]।
ওয়রে, নতুন যৈবন দিতাম—
আমার সুস্বামী ডাকিয়া ॥

আর ভাইবে রাধারমণ বলে,
আমি ঠেকছি রে কালিয়ার প্রেমে :
আমায় গেল অন্‌নাথ[৪] করিয়া ॥

। ৩৪১ ।

সোনা-বন্ধু কালিয়া,
আইল না শ্যাম কি দোইষ জানিয়া[৫]।
বড়ো লইজ্জা[৬] পাইলাম—নিকুঞ্জে আসিয়া ॥

আর মনে বড়ো আশা করি—
আইল না শ্যাম—বংশীধারী।
কতো চুয়া-চন্দন কটরায়[৭] ভরিয়া ॥

---

১ বিশাখা ২ কোথায় ৩ করিয়া ৪ অনাথ ৫ দোষ দেখিয়া ৬ লজ্জা ৭ কৌটায়, বাটিতে

আর গাঁথিয়া বন-ফুলের মালা—
মালা হইল দ্বিগুণ জ্বালা।
ও মালা নেও, নেও,
দেও মালা জলেতে ভাসাইয়া

আর ভাইবে রাধারমণ বলে,
প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে :
ও তার নয়নজলে
বক্ষ যায় ভাসিয়া ॥

। ৩৪২ ।

আয়রে[১] বন্ধু, রজনী আর নাই।
চান্দমুখের নিশানি[২] লইয়া
ফিরিয়া ঘরে যাই ॥

আর আমারে নি তোমার মনে, রে বন্ধু,
আছে কিবার নাই[৩]।
ওয়রে, দাসী বলি' রাইখ মনে—
এই ভিক্ষাটি চাই।

আর মনের দুঃখ রইল মনে, রে বন্ধু,
শুনো বা' কানাই।
কতো আমোদ-আহ্লাদ রইল বাকী-
নিশি যায় পোসাই'[৪] ॥

১ হায় রে ২ চিহ্ন ৩ আছে কি নাই ৪ পোহাইয়া

আর দুর্গাচরণ দাসে বলে, রে বন্ধু,
শুনো রে কানাই :
ওরে, রসে-রঙ্গে বন্ধের সঙ্গে
আর নি লাগাল পাই ॥

। ৩৪৩ ।

প্রেম কইরে প্রাণ কান্দাইলায়[1] আমার গো—
ওয় গো বিনোদিনী ॥

আর একা ঘরে শইয়ে[2] থাকি,
ও আমি শইলে স্বপন দেখি গো ।
ওয়রে, শইলে স্বপন দেখি
তোমার চান্দ মুখ গো ॥

আর তোমার কথা মনে হইলে
আমার বুক ভাসিয়া যায় নয়নজলে গো ।
ওয়রে, বুক ভাসিয়া যায় নয়নজলে—
করি কি উপায় গো ॥

আর ভাইবে রাধারমণ বলে,
ভাবিয়ো না রাই মনে :
ওরে, আইস্‌ব[3] তোমার প্রাণ-বন্ধুয়া—
ভাবছ কি আর মনে গো ।

---

১ কাঁদাইলে ২ শুইয়া ৩ আসিবে

। ৩৪৪ ।

॥ লৌকিক ॥

কে বাজাইয়া যায়—
এমন সুখের বাঁশীয়ে রাধারে জাগায় ॥

আর রাস্তায় চলিয়ে কিষ্ণে
বাঁশীয়ে[১] দিলা টান।
ওয়রে, ঘরে থাকি' শ্রীরাধিকার
উড়াইলা পরান ॥

আর মন্দিরে সামাইয়া কিষ্ণে
চারি পানে চায় ঃ
ওয়রে, হাতের বাঁশী ভূমিত থইয়া
রাধারে জাগায় ॥

আর ঘুম-ঘুম করিয়া কিষ্ণে
মুখে দিলা পান।
ও রাধারমণ বলে,
শ্রীরাধিকায় যৈবন কইলা[২] দান ॥

। ৩৪৫ ।

ঘরে আইস্‌ল[৩] মনোচোর—
মনে রইল খেদ গো,
যামিনী হইল ভোর।
হায়রে, কালিয়া-পিরিতে আমার
গেল জাতি-কুল ॥

১ বাঁশীতে ২ করিলেন ৩ আসিল

আর আগে যদি জানতাম বন্ধু হ'—
যাইবায় এতো দূর।
ওয়রে, দুই চরণ বান্ধিয়া রাখতাম
দিয়া প্রেম-ডোর॥

আর কোকিলে পঞ্চমে গায় হ' বন্ধু—
নিশি হইল ভোর।
ওরে, 'রাই-রাই' বলিয়া আমি
হই গো বেভুল॥

আর দুর্গাচরণ দাসে বলে, হ' বন্ধু—
মন হইল বাউল।
ওয়রে, পুরুষ কঠিন জাতি
নিদয়া-নিষ্ঠুর॥

। ৩৪৬ ।

রাই, কিসের তোমার অভিমান গো—
শ্যাম আইল[১] না কুঞ্জবনে॥

আর আইস বন্ধু, বইস কাছে—
খাও রে বাটার পান।
ওরে, হাসি-মুখে কও রে কথা
জুড়াউক পরান গো॥

আর নতুন ফুলের মালা—
নতুন গাঁথুনি।
সেই মালা পইরাইত[২]
আমার রাধা-বিনোদিনী গো॥

১ আসিল ২ পরাইত, পরাইবে

আর ভাইবে রাধারমণ বলে—
শুনো রে কালিয়া :
ওরে, তুলসী-মালা পইরাই' দেও[1]
বন্ধের গলে নিয়া গো ॥

। ৩৪৭ ।

আমি জানলাম রে নিঠুর কালা
তোর পিরিতি ॥

আর প্রথম পিরিতি করি'
আইলায় নিতি-নিতি।
ওয়রে, অখন[2] বুঝি করিয়া যারায়[3]
আচম্বিত[4] ডাকাতি ॥

আর কেওরের[5] পিরিত আইসা-যাওয়া,
কেওরের পিরিত নিতি।
ওয়রে, কেওরের পিরিত সোনা-রূপা,
কেও কিনিয়া দেয় ধুতি ॥

আর ভাইবে রাধারমণ বলে,
শুনো গো যৈবতী :
ওয়রে, ব্রজপুরের মাঝে তোমরা
কয়জন আছো সতী ॥

১ পরাইয়া দাও ২ এখন ৩ যাইতেছেন ৪ অকস্মাৎ ৫ কাহারও

। ৩৪৮ ।

বন্ধু, তুইন[১] বড়ো কঠিন।
অন্তরে জাইনাছি[২] বন্ধু—আমায় বাসো ভিন্।

হারে পত্র ছাড়া তমাল-বৃক্ষ রে---
জল ছাড়া তার মীন।
ওয়রে, কিষ্ণ ছাড়া শ্রীরাধিকা
বাঁচব[৩] কতেক দিন॥

আর মধুছাড়া কমলপুষ্প, রে বন্ধু,
ভমরায় বাসে ভিন্।
ওয়রে, ছাড়াইলে ছাড়াইতায় পারো—
তোমার অধীন॥

আর তোর পিরিতের জ্বালা, রে বন্ধু,
সইমু কতেক দিন।
ওয়রে, তোমার পিরিতের জ্বালায়—
বন-পোড়া হরিণ॥

আর ভাইবে রাধারমণ বলে, রে বন্ধু,
কলঙ্কে যায় মোর দিন।
ওয়রে, কি দোইষের কারণে[৪] বন্ধে—
আমায় বাসইন[৫] ভিন্॥

১ তুই ২ জানিয়াছি ৩ বাঁচিবে ৪ দোষের জন্যে ৫ বাসেন

। ৩৪৯ ।

আর বন্ধু নি[১] আমার—
রে নিদয়া-পাষাণ বন্ধু রে ॥

তুমি যদি হও রে আমার,
সত্য কথা কও সারাসার।
ওয়রে, তোমার লাগি' কতই কইলাম—
আর রে ॥

বন্ধু, যদি যাও রে ছাড়ি'—
গলে দিমু কাটালি[২] -ছুরি।
ওয়রে, তোমার লাগি'—
ত্যজিতাম[৩] পরান রে ॥

আর চুয়া-চন্দন থইছি আমি
কটরায়-কটরায়[৪] ভরি'।
ওরে, দেখলে চন্দন উঠে কান্দন—
কার অঙ্গে ছিটাই রে ॥

আর কেওয়া পুষ্প, ফুল মালতী—
আমি বিনা-সুতায় মালা গাঁথি।
ওয়রে, দেখলে মালা উঠে জ্বালা
কার গলে পরাই রে ॥

আর ভাইবে রাধারমণ বলে,
প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে :
ও তার নয়ন-জলে বক্ষ যায়—
ভাসিয়া রে ॥

১ কি ২ কাটারি ৩ ত্যজিব ৪ কৌটায়, বাটিতে

। ৩৫০ ।

দুখ কইয়ো গো,
চান্দ-মণিরে নিরলে[১] নিয়া ॥

আর তাপিনী ল',
তাপে-তাপে জনম গেল গইয়া ;
ওরে, পাইলে কইয়ো—
চিরদিন মরিমু ঝুরিয়া ॥

আর লঙ-এলাচি-জায়ফল-জত্রী
বাটায় ভরিয়া—
ওয়রে, বন্ধু আইলে দিয়ো পান
আদর করিয়া ॥

আর চাতক রইলা মেঘের আশে
চরণ-পানে চাইয়া—
গো চান্দ-মণিরে নিরলে নিয়া ॥

আর ভাইবে রাধারমণ বলে,
শুনো রে কালিয়া :
পরা নি আপন হইব[২] —
পিরিতের লাগিয়া ॥

। ৩৫১ ।

সুখ চিন্তামণি,
চিন্তিয়া না পাই তোমারে—
কি অপরাধ--কও না শুনি

১ নিরালায় ২ পর কি আপন হইবে

আর যদি কোনো অপরাধ বন্ধ রে,
আমি তো না জানি ।
ওয়রে, ক্ষেমা করো অপরাধ—
অবুলা[১] রমণী ॥

আর এইরূপে যৈবন তোমার, রে বন্ধু,
পিরিতের নিশানি ।
ওয়রে, দিনান্তে আমারে তোমার
মনে পড়ের নি[২] ॥

আর আন্ধিয়ারা ঘরের মাঝে, রে বন্ধু,
থাকি একাকিনী ।
ওয়রে, আটকখানার ফাটক কেমন
রসের কামিনী ॥

আর প্রেম করিয়া দুখ দিতে, রে বন্ধু,
প্রাণেতে সহের নি[৩] ।
ও দীন প্রেমদাস কয়—
প্রেম-লালসে বাঁচের না[৪] পরানি

। ৩৫২ ।

রসের ভমরা, বন্ধু, নয়নের কাজল—
এগো, কপালপোড়া মতিনাশায়[৫]
মন কইল[৬] পাগল গো ॥

১ অবলা ২ পড়ে কি ৩ সহে কি ৪ বাঁচে না ৫ ভ্রষ্টমতি ৬ করিল

আর আমার বাড়ী যাও রে বন্ধু
আউঠা বেড়া[১] দিয়া—
এগো, হাত বাড়াইয়া গুয়া দিতে
দেখল কপালপোড়া গো ॥

আর আমার বাড়ী যাও রে বন্ধু
খালা-নালায় পানি।
এগো, গাঞ্ছা[২] ভিজাইয়া যাইয়ো—
তছর[৩] দিমু আমি গো ॥

আর উঁচ্চা করি' বান্ধছ খোঁপা
মাঝে দিয়া ফুল।
এগো, ঝিলমিল-ঝিলমিল কবচছড়া[৪]
তিথিবলা চুল[৫] গো ॥

---

১ বাড়ীর চারিদিকের ছেঁচা বাঁশের তৈরী বেড়া ২ গামছা ৩ তসব (?) ৪ কবচের তৈরী হার ৫ ত্রিগুচ্ছের দ্বারা দড়ির মতো পাকাইয়া বাঁধা চুল

॥ সারি ॥

। ৩৫৩ ।

রঙ্গিলা[১] বাড়াইয়ে দিছে
পাইক[২] তুলি' নায়।
সখি গো, পবন ভরিয়া নাও
বাইছালি খেলায়[৩] ॥

আগা-পিছা নয় দরজা
চাইর চৌকিদার।
আগিল গলইয়ে[৪] নৌকার
ধরিয়াছে কাণ্ডার ॥

গঙ্গা আর যমুনা নদী
রাতা-দিন চলে।
বিনা দাঁড়ে, বিনা বৈঠায়
না জানি কোন্ কলে ॥

চাইর তক্ত দিয়া নাও
করিয়াছে খাড়া।
পীর-মুরশিদ ছওয়ারী
নাও শূন্যে করে

---

১ রঙীন ২ যাহারা বাইচের নৌকা বায় ৩ বাইচ খেলে ৪ নৌকার সম্মুখ গলুইয়ে

চাইর কুতুব,[১] ষোল্ল পরী
দিয়া নৌকার সাজ।
দিবা-নিশি খেলে তারা
করিয়া বিরাজ ॥

বিচখানে[২] বানাইল কোঠা
কলা তার নাম।
সেইখানে কারিগরের
কদমী মোকাম ॥

বিন পেরাগে, বিন পাতাসে[৩]
খালি বেতের বান।
বালানে পাইলে নৌকা
করিব খান-খান ॥

পাগল আরকুমে কয়—
খাকের তনু[৪] ভাই ॥
আসিব আজরাইল[৫] বালান
আর বাকী নাই ॥

। ৩৫৪ ।

আরে আষাঢ় মাসের গোলা[৬]
ভাটা দিয়া যায়।
সখি গো, পাইকগণ সাজন করি'[৭]
তুলো খেলুয়ায়[৮] ॥

---

১ আব, আতস, খাক, বাদ দিয়া প্রস্তুত দেহ ২ মাঝখানে ৩ নৌকার তক্তা জুড়িবার লোহা ৪ মাটির দেহ ৫ যম ৬ নদীর জল ৭ সাজাইয়া ৮ যে নৌকা বাইচ খেলে

এই নৌকা বানাইল যেই কারিগরে-
তার তুল্য মিস্তরী নাই
এই ভব-সংসারে ॥

জ্বালাইয়াছে দুই বাত্তি
গলইয়ে নৌকার।
বিছকানে[১] বসিয়া মাঝিয়ে
ধরিয়াছে কাণ্ডার ॥

আট বাঁক, বারো বুরুজ
আটচাল্লিশ জোড়া।
চৌদ্দ গুছা[২] দিয়া নৌকা
করিয়াছে খাড়া ॥

পাহাড় জঙ্গল কিবা
দেহাত ময়দান।
কখনো চালায় নৌকা
কখনো লাগান ॥

পাঁচজনা পাইক যদি
হইত আমার নাও—
সকলের আগে আমি
জিতিয়া যাইতাম দাও[৩] ॥

হে[৪] হজ,[৫] জে[৬] জকাত[৭]
সু নমাজ আর ;
কাফ কলিমা,[৮] রে রোজা
নাহিক আচার ॥

---

১ মাঝখানে ২ নৌকার পাশের তক্তা ৩ বাজী, প্রতিযোগিতা ৪ আরবী বর্ণ
৫ তীর্থযাত্রী ৬ আরবী বর্ণ ৭ বৎসরে আয়ের পরিমাণ অনুসারে মুসলমান শাস্ত্রে দান করিবার কথা উল্লিখিত আছে। ইহাকেই বলে 'জকাত'। ইহা শতকরা আড়াই ভাগ
৮ মুসলমান ধর্মের ইষ্টমন্ত্র : 'লা ইলাহা ইল্লেল্লাহ'

পাগল আরকুমে কয়—
মুরশিদের ঠাঁই :
খালি নৌকা লইয়া আমি
দেশে কিলা খাই ॥

। ৩৫৫ ।

পাগেলা ফকিরের সনে
দিদার-মাদার[১] নাই।
সখি গো, মন-পবন কাষ্ঠের নাও
কাণ্ডারী কানাই ॥

নদী তো তরঙ্গ নদী
সোত[২] চলে ধারে।
অপুরা বিরিন্দাবন[৩]
নদীয়ার কিনারে ॥

আব[৪] হইতে চলে নৌকা
বাদ[৫] অইলে বন্ধ।
নায়ের মাঝে চৌদ্দ গুছা[৬]
শুনতে লাগে ধন্ধ ॥

বারো ডাল বিশ মাথা
নাওয়ের মাঝে আছে।
বত্তিশ কাঙ্গুরা[৭] নাও
গলইয়ে চেরাগ জ্বলে ॥

---

১ দেখাশোনা ২ স্রোত ৩ অপূর্ব বৃন্দাবন ৪ মেঘ, জল ৫ বায়ু ৬ নৌকার পাশের তক্তা
৭ (?)

শুনিয়া চমকিত হইলা
রাধিকা সুন্দরী।
গহীন বনে আজু[১] মোর॥
কে বাজায় মুররী[২]॥

মন-পবন কাষ্ঠের নাও
সারি-সারি গুড়া।
পীর-মুরশিদ ছওয়ারী
নাও শূন্যে করে উড়া॥

সৈয়দ শা' নূরে কয়
আল্লাকে ভাবিয়া :
মিছা গৈরব করো রে মন
খাকের[৩] তনু লইয়া॥

। ৩৫৬ ।

দূতী গো, চলো বিন্দাবন—
দূতী গো, চলো বিন্দাবন ;
মাথায় টিকা[৪] পাইবা গো দূতী-
চলো বিন্দাবন।
দূতী গো, চলো বিন্দাবন॥

নাকের বেশর পাইবা গো দূতী—
চলো বিন্দাবন।
দূতী গো, চলো বিন্দাবন॥

১ আজি ২ মুরলী ৩ মাটির ৪ টিকলি

কানের ঢুল পাইবা গো দূতী—
চলো বিন্দাবন।
দূতী গো, চলো বিন্দাবন ॥

গলার হার পাইবা গো দূতী—
চলো বিন্দাবন।
দূতী গো, চলো বিন্দাবন ॥

কোমরের ঘুঙ্গুর পাইবা গো দূতী—
চলো বিন্দাবন।
দূতী গো, চলো বিন্দাবন ॥

পায়ের মল পাইবা গো দূতী—
চলো বিন্দাবন।
গো, চলো বিন্দাবন ॥

। ৩৫৭ ।

পিরিতে চাইলায় না[১] আমায় ;
চাইলায় না আমায় রে বন্ধু,
চাইলায় না আমায়—
পিরিতে চাইলায় না আমায় ॥

যেইবালা[২] পিরিতি রে কইলাম—
তুমি আর আমি :
পিরিতে চাইলায় না আমায়।
ওরে, এখন কেনে সেই সব কথা
লোকের মুখে শুনি :
পিরিতে চাইলায় না আমায় ॥

১ চাহিলে না   ২ যেই সময়ে

ওরে যেইবালা কইলাম, রে পিরিত—
শানের বান্ধিল ঘাটে[১] :
পিরিতে চাইলায় না আমায়।
যেইবালা পিরিতি রে কইলাম
গোকুল ফুলের তলে :
পিরিতে চাইলায় না আমায় ॥

গোকুল ফুলের হার গাঁথিয়া—
পরাই বন্ধের গলে :
পিরিতে চাইলায় না আমায়।
যেইবালা পিরিতি রে কইলাম
কেওয়া ফুলের তলে :
পিরিতে চাইলায় না আমায় ॥

কেওয়া ফুলের হার গাঁথিয়া—
পরাই বন্ধের গলে :
পিরিতে চাইলায় না আমায়।
যেইবালা পিরিতি রে কইলাম
চাম্পা ফুলের তলে :
পিরিতে চাইলায় না আমায় ॥

চাম্পা ফুলের হার গাঁথিয়া—
পরাই বন্ধের গলে :
পিরিতে চাইলায় না আমায়।
যেইবালা পিরিতি রে কইলাম
বউল ফুলের[২] তলে :
পিরিতে চাইলায় না আমায় ॥

বউল ফুলে হার গাঁথিয়া—
পরাই বন্ধের গলে :
পিরিতে চাইলায় না আমায় ॥

---

১ শান-বাঁধানো ঘাটে ২ বকুল ফুলের

। ৩৫৮ ।

॥ লৌকিক ॥

বালীর[১] যৈবনের ভরে—
আধা বয়েস কাটায় বালী মাই-বাপের ঘরে ॥

চরণের নেপুর কইনায়
অঙ্গেতে লাগায়।
(কি রে হয় হয় হইয়া)
অঙ্গে যে লাগাইয়া কইনায় আয়নার দিকে চায় ॥

মাও-বাপ অইছইন[২] কানা
আমার অখনে[৩]।
(কি রে হয় হয় হইয়া)
অল্প বয়সে বিয়া নাহি দিলা ও যে মোরে ॥

আতের কাঙ্কণ পইরাই[৪] কইনায়
অঙ্গের দু মাঝে।
(কি রে হয় হয় হইয়া)
আতের কাঙ্কণ পইরাই কইনায় আয়না দিয়া চায় ॥

এই না সময়ের কালে
করি কি উপায়।
(কি রে হয় হয় হইয়া)
নাই যেন আমার পুরুষ এই দুনিয়ায় ॥

১ বালিকার ২ হইয়াছেন ৩ এখন ৪ হাতের কাঁকন পরে

এই না সময়ের কালে
কি না কাম করিল—
(কিরে হয় হয় হইয়া)
আতে যে কাঙ্কণ লইয়া নগরে গেল ॥

এই না সময়ের কালে
কি না কাম করে—
কি রে হয় হয় হইয়া)
সাড়ী যে পইরাইয়া কইনায় আয়না দিয়া চায়

ও বিয়াই, শুনিয়া লও রে,
লিলুয়া বাতাসের দুখ কইয়া যাইরে ॥

এই না সময়ের কালে
কি না কাম করে—
(কি রে হয় হয় হইয়া)
হাওয়ায় উড়াইয়া মোরে নিব যে উপরে ॥

আতের কাঙ্কণ আতে লইয়া
এমন সময়ের কালে—
(কিরে হয় হয় হইয়া)
আতের কাঙ্কণ আতে লইয়া বসিল অখনে ॥

৩৫৯

"সাঞ্জাবালা[১] ফুল পাইলায়[২] কই ।
ছাবাল-পুতের বউ,[৩]
সাঞ্জাবালা ফুল পাইলায় কই

১ সন্ধ্যাবেলা ২ পাইলে ৩ ওগো অল্পবয়সী পুত্রবধূ

"বাড়ীর পিছে সরুয়া নদী—
জল ভরিতে গেলু :
(কিরে হয় হয় হইয়া)।
ভাসিয়া আইল চাম্পা ফুল—
খোঁপায় তুলিয়া দিলু ॥"

"ছাবাল-পুতের বউ,···

"বাড়ীর পিছে সরুয়া নদী—
জল ভরিতে গেলু :
(কি রে হয় হয় হইয়া)।
ভাসিয়া আইল নাগেশ্বর ফুল—
খোঁপায় তুলিয়া দিলু ॥"

"ছাবাল-পুতের বউ,···

"বাড়ীর পিছে সরুয়া নদী
জল ভরিতে গেলু :
(কি রে হয় হয় হইয়া)।
ভাসিয়া আইল বউল ফুল—
খোঁপায় তুলিয়া দিলু ॥"

"ছাবাল-পুতের বউ,···

"বাড়ীর পিছে সরুয়া নদী—
জল ভরিতে গেলু :
(কি রে হয় হয় হইয়া)।
ভাসিয়া আইল গোকুল ফুল—
খোঁপায় তুলিয়া দিলু ॥

"ছাবাল-পুতের বউ,···

"বাড়ীর পিছে সরুয়া নদী—
জল ভরিতে গেলু :
(কি রে হয় হয় হইয়া)।
ভাসিয়া আইল কেওয়া ফুল—
খোঁপায় তুলিয়া দিলু ॥"

। ৩৬০ ।

অল্প না বয়সে ছাবাল রাঁড়ী[১] —
বাবণ[২] লাগিল করে[৩] রে।
"আরে, সিঁথেরি সিন্দুর দিমু রে"—
"বাবণ, ছাড়ো আমার মায়া রে ॥"

এ···অল্প না বয়সে ছাবাল রাঁড়ী—
বাবণ লাগিল করে রে।
"আরে, মাথারি টিকা[৪] দিমু রে"—
"বাবণ, ছাড়ো আমার মায়া রে ॥"

এ···অল্প না বয়সে ছাবাল রাঁড়ী—
বাবণ লাগিল করে রে।
"আরে, নাকেরি বেশর দিমু রে"—
"বাবণ, ছাড়ো আমার মায়া রে ॥"

এ···অল্প না বয়সে ছাবাল রাঁড়ী—
বাবণ লাগিল করে রে।
"আরে কানেরই দোল[৫] দিমুরে"—
"বাবণ, ছাড়ো আমার মায়া রে ॥"

১ বালবিধবা ২ ব্রাহ্মণ ৩ পিছনে ৪ টিকলি, গহনা বিশেষ ৫ দুল

এ···অল্প না বয়সে ছাবাল রাঁড়ী—
বাবণ লাগিল করে রে।
"আরে, গলারি হার দিমু রে"—
"বাবণ, ছাড়ো আমার মায়া রে॥"

এ···অল্প না বয়সে ছাবাল রাঁড়ী
বাবণ লাগিল করে রে।
"আরে, কোমরেরি ঘুঙ্গুর দিমু রে"—
"বাবণ, ছাড়ো আমার মায়া রে॥"

এ···অল্প না বয়সে ছাবাল রাঁড়ী—
বাবণ লাগিল করে রে।
"আরে, পায়েরি মল যে দিমু রে"—
"বাবণ, ছাড়ো আমার মায়া রে॥"

। ৩৬১ ।

ভাগিনা নি যাইতায়[১] রে
ওই লঙ্কার বণিজে[২] রে—
মামীর লাগি' আনিবায়[৩] কি ঃ
(কি রে হয় হয় হইয়া)।
"মামীর লাগি' আন্‌মু[৪] গো
নাকের বেশর গো—
মামীজীয়ে দরিশন করিবায় নি॥"

ভাগিনা নি যাইতায় রে···
"মামীর লাগি' আন্‌মু গো
পিন্দনের সাড়ী গো—
মামীজীয়ে দরিশন করিবায় নি॥"

---

১ যাইবে ২ বাণিজ্যে ৩ আনিবে ৪ আনিব

ভাগিনা নি যাইতায় রে···
"মামীর লাগি' আন্‌মু গো
হাতেরি খাড়ু গো—
মামীজীয়ে দরিশন করিবায় নি ॥"

ভাগিনা নি যাইতায় রে···
"মামীর লাগি' আন্‌মু গো
পায়েরি বেকী[1] গো—
মামীজীয়ে দরিশন করিবায় নি ॥"

ভাগিনা নি যাইতায় রে···
"মামীর লাগি' আন্‌মু গো
গলারি আছলি[2] গো—
মামীজীয়ে দরিশন করিবায় নি ॥"

১ পদাভরণ বিশেষ ২ হাঁসুলি

॥ বিবাহ-গীতি ॥

। ৩৬২ ।

বলি বলি বলি দাই গো,
মুই বলি তোমারে :
"বাবাজীর বাঙ্গেলায়[১] দাই[২] গো,
কিসের উকিল আইছে[৩] ।"
"আইছে দামান্দের[৪] উকিল—
কইনা জুড়িবারে[৫] ॥"

আনো চাই বাবাজীর কিতাব—
পড়িয়া দেখি আমি ।
আনো চাই চাচাজীর কিতাব—
পড়িয়া দেখি আমি ॥

কিতাব পড়িয়া কইনায়
কান্দইন জারেজারে[৬] ।
নছিবের লেখা দাই গো,
কে খণ্ডাইতে পারে ॥

---

১ বাড়ীতে ২ দাসী ৩ আসিয়াছে ৪ বরের ৫ পাত্রী ঠিক করিতে ৬ থাকিয়া-থাকিয়া, ঝর-ঝর ধারায়

। ৩৬৩ ।

সাজো গো, এগো ধনি,
শ্যাম মনো মন-মোহিনী,
কৃষ্ণ-প্রেম-আহ্লাদিনী ॥

মাথায়ে তো তৈল্ল পইরে[১] —
কাঙ্কাইয়ে[২] তো শোভা করে।
সাজো গো,··· ॥

সিঁথে তো সিন্দুর পইরে—
কাজলে তো শোভা ধরে।
সাজো গো,··· ॥

কর্ণে তো কুণ্ডল পইরে—
শিষ[৩] ফুলে তো শোভা ধরে।
সাজো গো,··· ॥

নাকসিকায়[৪] বেশর পইরে—
পাতায়ে তো শোভা ধরে।
সাজো গো,··· ॥

গলায়ে তো দানা পইরে—
দুই লরীয়ে[৫] শোভা ধরে।
সাজো গো,··· ॥

হস্তেতে দুই শঙ্খ পইরে—
চাইর গেছিয়ে[৬] শোভা কইরে।
সাজো গো··· ॥

---

১ তেল পরিয়া, মাখিয়া ২ কাঁকইতে, চিরুণীতে ৩ শিরীষ ৪ নাসিকায় ৫ দুই লহরাতে
৬ চার গাছি শাঁখায়

মাজায়ে তো সাড়ী পইরে—
শেমিজে কি শোভা কইরে।
সাজো গো,… ॥

পদে তো খাড়ুয়া পইরে—
ঘুঘুরেতে[১] শোভা করে।
সাজো গো,… ॥

। ৩৬৪ ।

পরী চলিলা রথে, দেবগণ লইয়া সাথে—
যাইতা[২] পরী শানের বান্ধিল[৩] ঘাটে না[৪] রে সই,
ধন্যি ধন্যি পরীর বিয়া ॥

ঘরতন বারইতে[৫] পরী—
আবে[৬] ছায়া ধরে না রে সই,
ধন্যি ধন্যি পরীর বিয়া ॥

ঘরতন বারইতে পরী—
মউরে পেখম ধরে না রে সই,
ধন্যি ধন্যি পরীর বিয়া ॥

আগে-করে দশজন দাই[৭] —
মাঝে পরী-কইনা না রে সই,
ধন্যি ধন্যি পরীর বিয়া ॥

শানের বান্ধিল ঘাটে
পরীয়ে মছরি টাঙ্গাইলা[৮] না রে সই,
ধন্যি ধন্যি পরীর বিয়া ॥

---

১ ঘুঙুরেতে ২ যাইবেন ৩ শান বাঁধানো ৪ 'না' অর্থহীন অব্যয় হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে
৫ ঘর হইতে বাহির হইতে ৬ মেঘে ৭ আগে-পিছে চলে দশজন দাসী ৮ মশারি টানাইলেন

পাতা-পানিত লামিয়া[১] পরীয়ে
  পাতা মাঞ্জন[২] কইলা না রে সই,
    ধন্যি ধন্যি পরীর বিয়া ॥

আটু-পানিত[৩] লামিয়া পরীয়ে—
  আটু মাঞ্জন কইলা না রে সই,
    ধন্যি ধন্যি পরীর বিয়া ॥

নলা-পানিত[৪] লামিয়া পরীয়ে—
  নলা মাঞ্জন কইলা না রে সই,
    ধন্যি ধন্যি পরীর বিয়া ॥

কোমর-পানিত লামিয়া পরীয়ে—
  কোমর মাঞ্জন কইলা না রে সই,
    ধন্যি ধন্যি পরীর বিয়া ॥

ছাত্তি-পানিত[৫] লামিয়া পরীয়ে—
  ছাত্তি মাঞ্জন কইলা না রে সই,
    ধন্যি ধন্যি পরীর বিয়া ॥

দশ বুড়[৬] দিয়া পরীয়ে—
  শুকনায় উঠিলা না রে সই,
    ধন্যি ধন্যি পরীর বিয়া ॥

শুকনায় উঠিয়া পরীয়ে—
  সাড়ী বদল কইলা না রে সই,
    ধন্যি ধন্যি পরীর বিয়া ॥

১ নামিয়া ২ মাজন ৩ হাঁটু-ডোবা জলে ৪ জঙ্ঘা-ডোবা জলে ৫ বুক-ডোবা জলে ৬

মন না লাগিল—
সাড়ী খসাইয়া ফালাইলা[১] না রে সই,
ধন্যি ধন্যি পরীর বিয়া ॥

তার শেষে পিন্দিলা সাড়ী—
নামে বাঙ্গইন-বিচি না রে সই,
ধন্যি ধন্যি পরীর বিয়া ॥

সাড়ী যে পিন্দিয়া কইনায়—
সাড়ীর বানে[২] চাইলা না রে ;
মন না লাগিল—
সাড়ী খসাইয়া ফালাইলা না রে সই,
ধন্যি ধন্যি পরীর বিয়া ॥

তার শেষে পিন্দিলা সাড়ী—
নামে আঙ্গনি পাটে না রে ;
মন না লাগিল··· ॥

তার শেষে পিন্দিলা সাড়ী—
নামে উটখুট না রে সই ;
সাড়ী যে পিন্দিয়া··· ॥

তার শেষে পিন্দিলা সাড়ী—
নামে গঙ্গার জল না রে ;
মন যে লাগিয়াছে—
সাড়ী পিন্দিয়া বেড়াইলা না রে সই,
ধন্যি ধন্যি পরীর বিয়া ॥

১ ফেলিলেন ২ পানে, দিকে

সাড়ী যে পিন্দিয়া কইনায়—
মাথা বেশ করিলা না রে সই,
ধন্যি ধন্যি পরীর বিয়া ॥

আবেরি কাঙ্কইতে[১] পরীয়ে—
মাথা বেশ করিলা না রে সই,
ধন্যি ধন্যি পরীর বিয়া ॥

মাথা বেশ করিয়া পরীয়ে—
খোঁপা বান্ধইন[২] না রে সই,
ধন্যি ধন্যি পরীর বিয়া ॥

প্রথমকু[৩] বান্ধিলা খোঁপা—
নামে কাইজুরা না রে ;
খোঁপা যে বান্ধিয়া পরীয়ে
খোঁপার পানে চাইলা না রে সই,
ধন্যি ধন্যি পরীর বিয়া ॥

মনে না লাগিল খোঁপা—
ফালাইলা খসাইয়া না রে ;
তার শেষে বান্ধিলা খোঁপা
নামে মইজুরা না রে সই,
ধন্যি ধন্যি পরীর বিয়া ॥

মন না লাগিল—
খোঁপা খসাইয়া ফালাইলা না রে ;
তার শেষে বান্ধিলা খোঁপা
নামে এড়ুজুড়া না রে সই,
ধন্যি ধন্যি পরীর বিয়া ॥

১ কাঁকইতে ২ বাঁধেন ৩ প্রথমতঃ

মন না লাগিল—
খোঁপা খসাইয়া ফালাইলা না রে ;
তার শেষে বান্ধিলা খোঁপা
নামে মনোহরা না রে সই,
মন যে লাগিয়াছে খোঁপা—
আটিয়া[১] বেড়াইলা না রে সই,
ধন্যি ধন্যি পরীর বিয়া ॥

উত্তরে দক্ষিণে ঘর—
মাঝে পরীর শইয্যা-ঘর[২] ;
দখিনাল[৩] দরজায় পরীয়ে
লাগাইছে কেওড়[৪] না রে সই.
ধন্যি ধন্যি পরীর বিয়া ॥

বেওনা ফুলের বেকী জোড়[৫] ,
তার উপর সোনার জোড়,
তার উপর লাগাইছে—
সোনার ঘুঙ্গুর না রে সই,
ধন্যি ধন্যি পরীর বিয়া ॥

। ৩৬৫ ।

ভরনা দুই প'রি বালা[৬] —
বেলওয়ায়[৭] খেইড়ে দিলা মন[৮] ।
আরাইয়া-তুকাইয়া কান্দইন[৯]
সোনার বাজুবন্দ—
বেলওয়া রূপার কাঙ্কণ ॥

---

১ হাঁটিয়া ২ শয়নকক্ষ ৩ দক্ষিণ দিকস্থ ৪ কপাট ৫ পদাভরণ বিশেষ ৬ ভরা দুই প্রহর বেলায় ৭ বালিকা, নারিকা, কন্যা ৮ খেলায় মন দিল ৯ হারাইয়া খুঁজিতে-খুঁজিতে কাঁদেন

ঘোড়া মারিয়া যাইন দ' রাজা[১] ,
আও ওই চাম্পার তল[২] —
বেলওয়া চাইয়া চাম্পার তল
"আমি দিমু মাথার টিকা[৩]
আও ওই চাম্পার তল ॥"

ভরনা দুই প'রি বালা···
"আমি দিমু নাকের বেশর
আও ওই চাম্পার তল ॥"

ভরনা দুই প'রি বালা···
"আমি দিমু কানের জরিনা[৪]
আও ওই চাম্পার তল ॥"

ভরনা দুই প'রি বালা···
"আমি দিমু আতের তারবাউ[৫]
আও ওই চাম্পার তল ॥"

ভরনা দুই প'রি বালা···
"আমি দিমু কোমরের সাড়ী
আও ওই চাম্পার তল ॥"

ভরনা দুই প'রি বালা···
"আমি দিমু পাওয়ের খাড়ুয়া
আও ওই চাম্পার তল ॥"

---

১ ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছেন হে রাজা ২ আইস ওই চাঁপা গাছের তলে ৩ টিকলি, গহনা বিশেষ ৪ কর্ণাভরণ বিশেষ ৫ হাতের তার-বাজু

। ৩৬৬ ।

বা'র বাড়ী[১] মাফা থইয়া[২]
সামাইলা[৩] বৈরাতী[৪] ।
তুমি ধরো ডালে ল' বালি,[৫]
আমি কুসুম তুড়ি ॥

আমার দেশ নাই দ'[৬] রাজা
কুসুম চোরাচুরি ।
আমার বাবাজী আছইন[৭]
কইলকাত্তার[৮] বেপারী ।
উকুমে[৯] আনাইয়া দিবা
ফুলের বাইশা-কুড়ি[১০]

। ৩৬৭ ।

উড় ফুল[১১] মালন্তী ফুল[১২], ফুটে নানান ডালে—
সোনার কুটা[১৩]আতে[১৪] বা' দামান্দ,[১৫]
যাইনি ফুলের তলে ॥

কতো রেণু তুড়ো[১৬] বা' দামান্দ,
এব্‌লা লামো আইয়া[১৭] ।
পট্‌কা[১৮] ভরিল রেণু বা' দামান্দ,
এব্‌লা লামো আইয়া ॥

চাম্পা ফুল, মালন্তী ফুল, ফুটে নানান ডালে—
সোনার কুটা আতে বা' দামান্দ,
যাইনি ফুলের তলে ॥

---

১ বাহির বাড়ীতে ২ পাল্কি রাখিয়া ৩ প্রবেশ করিলেন ৪ বরযাত্রিগণ ৫ ওগো বালিকা ৬ নাই গো ৭ আছেন, হন ৮ কলিকাতার ৯ হুকুমে ১০ কোনো কোনো জায়গায় কোনো কোনো জিনিসের কুড়ি-বাইশটা করিয়া গণনা করা হয় ১১ ওড় ফুল ১২ মালতী ফুল ১৩ আঁকশি ১৪ হাতে ১৫ ওগো বর ১৬ কতো ফুল ছেঁড়ো, তোলো ১৭ এখন নামিয়া আইস ১৮ গামছ

কতো রেণু তুড়ো বা দামান্দ,
এব্লা লামো আইয়া ।
রুমাল ভরিল রেণু বা' দামান্দ,
এব্লা লামো আইয়া ॥

। ৩৬৮ ।

আইজ তোমারে কে সাজাইল, নদীয়ার চান্দ ।
ও তোমার চূড়া দেইখতে[১] চমৎকার, বাবুলাল—
আইজ তোমারে কে সাজাইল, নদীয়ার চান্দ ॥

এগো, তোমার চন্দন দেইখ্তে চমৎকার, বাবুলাল—
আইজ তোমারে…॥

ও তোমার মায়ের পূরউক[২] মনের সাধ, বাবুলাল—
আইজ তোমারে…॥

তোমার দানা দেইখ্তে চমৎকার, বাবুলাল—
আইজ তোমারে…॥

ও তোমার জুড়া[৩] দেইখ্তে চমৎকার, বাবুলাল—
আইজ তোমারে…॥

তোমার কোঁচা দেইখ্তে চমৎকার, বাবুলাল—
আইজ তোমারে…॥

তোমার মোজা দেইখ্তে চমৎকার, বাবুলাল—
আইজ তোমারে…॥

১ দেখিতে ২ পুরিত হউক ৩ জোড়া,

। ৩৬৯ ।

ঢাকা তনে[১] আইলা রে[২] , ওয়রে[৩] ভাই নাইয়া রে,
কোন্ কোন্ ঘোড়াইয়ায়[৪]
কোন্ মিঞা ছওয়ার[৫] —
কি হয় রে নাইয়া ।
ফানুস লাগাও নদীর কূল
কি হয় রে নাইয়া ;
পটকা[৬] লাগাও নদীর কুল
কি হয় রে নাইয়া ॥

যেই মিঞার গায়ে রে
সোনালী আছগন[৭] রে—
সেই মিঞা শ্বশুরাল ছওয়ার
কি হয় রে নাইয়া ॥

যেই মিঞার পায়ে রে
সোনালী জুতা রে—
সেই মিঞা শ্বশুরাল ছওয়ার
কি হয় রে নাইয়া ॥

। ৩৭০ ।

ছিলটিয়া[৮] ছিপাইয়া[৯] দুলা[১০] রে,
আতে মুতির চাবক[১১] রে,
ঘোড়িয়া মারিয়া[১২] যাইননি মোর ছিপাই দুলা—
বল-পিরিতের[১৩] তলে রে ।
ঘোড়িয়া বান্ধইন[১৪] আরে মোর ছিপাই দুলায়
বল-পিরিতের ডালে রে ॥

---

১ ঢাকা শহর হইতে ২ আসিলেন রে ৩ ওরে ৪ ঘোড়ায় ৫ সওয়ার ৬ গামছা ৭ লম্বা মালা বিশেষ ৮ সিলটিয়া, শ্রীহট্টজাত ৯ সিপাই ১০ বর ১১ হাতে মোতির চাবুক ১২ ঘোড়ায় চড়িয়া ১৩ বৃক্ষ বিশেষের ১৪ বাঁধেন

খবর-উলিয়ায়[১] খবর দিল রে—
অবুঝ বেলওয়ার[২] আগে[৩] রে :
"তোমার হু বাবাজীর বাঙ্গেলায়[৪]
ঘোড়িয়ায় লুটন করে রে,
অস্তীয়ে লুটন করে[৫] রে ॥"

কান্দি' কান্দি' যাইননি মোর অবুঝ বেলওয়া—
তান[৬] মাইজীর আগে রে :
"শুনিয়াছ নি আরে মোর মাইজী,
শুনিয়াছ নি খবর রে,—
আমার হু বাবাজীর বাঙ্গেলায়
ঘোড়িয়ায় লুটন করে রে,
অস্তীয়ে লুটন করে রে।"
"যাও যাও, আরে মোর খেড়ির[৭] ঝিয়াই,
যাও জামাইর ঘরে রে ॥"

কান্দি' কান্দি' যাইন নি মোর অবোধ বেলওয়া—
তান চাচীর আগে রে :
"শুনিয়াছ নি আরে মোর চাচীজী,
শুনিয়াছ নি খবর রে,—
আমার হু চাচাজীর বাঙ্গেলায়
ঘোড়িয়ায় লুটন করে রে,
অস্তীয়ে লুটন করে রে।"
"যাও যাও, আরে মোর খেড়ির ঝিয়াই,
যাও জামাইর ঘরে রে ॥"

১ খবর ওয়ালায়, সংবাদদাতা ২ অবুঝ বালিকার ৩ কাছে, সম্মুখে ৪ গৃহে ৫ ঘোড়া ও হাতী লুণ্ঠন করে ৬ তাঁহার ৭ খেলার, এখানে অনাদরে

কান্দি' কান্দি' যাইননি মোর অবোধ বেলওয়া—
তান ভনির[১] আগে রে ঃ
"শুনিয়াছ নি আরে মোর ভইনি[২] ,
শুনিয়াছ নি খবর রে,—
আমার সু বড়ো ভাইর বাঙ্গেলায়
ঘোড়িয়ায় লুটন করে রে
অস্তীয়ে লুটন করে রে ॥"
"যাও যাও, আরে মোর খেড়ির ভইনাই
যাও জামাইর ঘরে রে ॥"

আগে-করে দশজনা দাই[৩] ,
আর মাঝে বেলওয়া কইনা রে—
ধীরে-ভরে[৪] যাইননি মোর অবোধ বেলওয়ার আগে রে।

শইজ্যা করি' পড়ইন[৫] নু মোর অবোধ বেলওয়া
ছিপাই দুলার পায়ে রে ঃ
"তুলো তুলো, আরে মোর মালীয়া[৬] ভাই,
রঙীন মাওয়ার ভিত্তর[৭] রে—
যেই বিবির লাগি' পেরেশান[৮] ছিলাম রে ॥"

। ৩৭১ ।

দীকি দিলাম সাত-পাঁচা[৯] —
রুইয়া আইলাম[১০] ফুল-বাগিচা।
যাইন[১১] মনুওর[১২] অরিণী[১৩] শিকারে,
যাইন মনুওর মৃগ শিকারে ॥

---

১ বোনেব ২ বোন ৩ দাসী ৪ ধীরে ধীরে ৫ ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া ৬ মালী ভাই, পাল্কি বেহারা ৭ পাল্কির ভিতরে ৮ আকুল ৯ সাত ফুট দৈর্ঘ্যে ও পাঁচ ফুট প্রস্থে দীঘি কাটিলাম ১০ রোপণ করিয়া আসিলাম ১১ যাইতেছেন ১২ আদরার্থে ছেলেকে সম্বোধন ১৩ হরিণী

পন্থে পাইলা সুন্দরীর পাড়া[১],
অস্তী-ঘোড়া কইলা খাড়া—
যাইন মহুওর··· ॥

ডালাইন গাছ এলাইন দিয়া[২],
সুন্দরী বইছইন[৩] জোড় আত করিয়া—
বত্তিশ ডালে[৪] শুকাইন[৫] মাথার কেশ ॥

এমন সুন্দরী কইনা
যুদি রাজায় না দেইন[৬] বিয়া—
ছাড়িয়া যাইমু বাবাজীর নগর ॥

তালুক-মিরাশ[৭] বেচিয়া রে মহুওর
দিমু বিয়া রে।
না যাও মহুওর দূর দেশান্তর—
না যাও মহুওর পর দেশান্তর ॥

। ৩৭২ ।

ঘোড়া মারিয়া যাইন দ' রাজা[৮]
রছুলগঞ্জ বাজারে রে ;—
আরে রছুলগঞ্জের মউলা-রাণীয়ে
ধরিল পটকা[৯] রে।
"আরে, ছুড় ছুড়[১০] দ' রাণি,
পটকার ঝাঝইর[১১] রে ॥"

১ পদছাপ ২ ডালিম গাছে হেলান দিয়া ৩ বসিয়াছেন ৪ (?) ৫ শুকান ৬ দেন
৭ ভূসম্পত্তি ৮ ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছেন হে রাজা ৯ গামছা ১০ ছাড়ো ছাড়ো ১১ চুপড়ি

"আরে, দোহাই তোমার আল্লার—
দিয়ার[১] দোহাই তোমার রছুল রে।
আরে, এক প'র রাত্রি রইয়া যাইবায়[২]
আমার বাসরে রে ॥"

"আরে, ঘরেতে থইয়া আইছি[৩]
চধরী বাবাইর[৪] কন্যা রে।
আরে, তাইন[৫] সে শুনিলে বালী
ত্যজিবা[৬] পরান রে ॥"

আরে, এক প'র রাত্রি যাইন দ' বালীর
রান্ধনে-বাড়নে রে।
আরে, দুই প'র রাত্রি যাইন দ' বালীর
পন্থা-মাছ সাজাইতে[৭] রে ॥

আরে, তিন প'র রাত্রি যাইন দ' বালীর
খানা-পানি খাইতে রে।
আরে, চাইর প'র রাত্রি যাইন দ' বালীর
শাশুড়ীর খেজমতে[৮] রে ॥

আরে, পাঁচ প'র রাত্রি যাইন দ' বালীর
চউপর পাশ্‌শা খেইড়ে[৯] রে।
আরে, এক্কমাঝে চাইয়া দেখইন[১০]
চৌদিগ হইল পসর[১১] রে ॥

আরে, ঘোড়া মারিয়া যাইন দ' রাজা
আপনার বাসরে রে।
আরে, চউখে করে ঢিলি-মিলি[১২]
মুখে পানের লাল্লি[১৩] রে ॥

---

১ দিতেছি ২ রহিয়া যাইবে ৩ রাখিয়া আসিয়াছি ৪ চৌধুরী বাবার ৫ তিনি ৬ ত্যাগ করিবেন ৭ পান্তাভাত ও মাছ সাজাইতে ৮ সেবায় ৯ সমস্ত রাত্রি পাশা খেলিয়া ১০ ইহার মধ্যে চাহিয়া দেখেন ১১ ফরসা ১২ চোখ ঢুলঢুলু করিতেছে ১৩ পানের রস

"আরে কার বাসরে তুমি
গওয়াইলায় রঞ্জনী[১] রে ॥"

"আরে, তোমার বাবাজীর বাড়ী
ঘাটুয়া[২] নাচাইলা রে।
আরে, তোমার বাবাজীর বাড়ী
নাটুয়া[২] নাচাইলা রে।
আরে, এরু তামেশায়[৩] বালি
গওয়াইলাম রঞ্জনী রে ॥"

"আরে, আউকা-আউকা[৪] দয়ার বাবাজী
কান্দিয়া আরজ করমু[৫] রে।
আরে আউকা-আউকা দয়ার চাচাজী
কান্দিয়া আরজ করমু রে।
আরে, এমন তামেশার কাল
না নেওয়াইলা মোরে রে ॥"

'আরে, দোহাই তোমার আল্লার
দিয়ার দোহাই তোমার রছুল রে।
আরে আমার বাসরে বালি
ঘাটুয়া নাচাইমু রে।
আরে, আমার বাসরে বালি
নাটুয়া নাচাইমু রে ॥"

১ রজনী কাটাইলে ২ ঘাটু-র নাচ ও নাটুয়া-র নাচ পূর্ব বঙ্গের এক বিশেষত্ব
৩ এইরূপ তামাশায় ৪ আসুন আসুন ৫ আরজি করিব

। ৩৭৩ ।

বড়ো পা'ড় তনে[১] চাম রুখ[২] আনাইয়া
সাত ভাইয়ে বাঙ্গেলা বানাইলা।
লোধপুর তনে দুধ-পাতি আনাইয়া
সাত ভাইয়ে বাঙ্গেলা ছাওয়াইলা ॥

লালপুর তনে লালমাটি আনাইয়া
সাত ভাইয়ে বাঙ্গেলা লেপাইলা।
সিলট তনে[৩] দৌড়ির চকি আনাইয়া
সাত ভাইয়ে বাঙ্গেলায় থওয়াইলা

রঙপুর তনে রঙীন পাটি আনাইয়া
সাত ভাইয়ে বাঙ্গেলায় বিছাইলা।
ভাটি তনে ভনি-জামই[৪] আনাইয়া
সাত ভাইয়ে ভনিরে[৫] সঁপিলা ॥

। ৩৭৪ ।

একমিলে[৭] এক আসনে, সই,
এক আসনে দুইজনে—
স্নান করাবো রাধা-কানাই এক সনে

উত্তম কুরুসি-চকি,[৮] বিচিত্র মণ্ডল আঁকি'—
এগো, তার উপর বসাও নিয়া
রাধা-কানাই একমিলে ॥

১ বড়ো পাহাড় হইতে ২ চাম কাঠ ৩ শ্রীহট্ট হইতে ৪ ভগ্নিপতি ৬ ভগ্নীকে ৭ এক সঙ্গে ৮ জলচৌকি বিশেষ

আর সোনার বাটায় ধান্য-দূর্বা,
ইরার[১] বাটায় লইয়া যে—দুইজনে।
এগো, আরগণ আর গীতা আইলা[২]
এগো, পঞ্চ আয়[৩] লইয়া যে—দুইজনে॥

কালা না কালিন্দীর জল—
আনিলা ভরিয়া যে—দুইজনে।
এগো, থইলা[৪] নিয়া সব সখী
রাধা-কানাইর সাইক্ষেতে[৫] —দুইজনে॥

লক্ষীয়ে আসিয়া আরগণ করইন
সরাইয়ে মঙ্গল[৬] —দুইজনে।
এগো, সার আসিয়া গাও মাঞ্জইন[৭]
গঙ্গার ঢালইন জল যে—দুইজনে॥

ঢাল-ঢাল করিয়া জল ঢালইন—
শিরের উপরে—দুইজনে।
এগো, ঢালিলা গঙ্গার জল
জুড়াইল জীবন যে—দুইজনে॥

তিতা বস্ত্র[৮] তেয়াগিয়া
শুক্লবস্ত্র পইরাছে[৯] —দুইজনে।
এগো, কোলে তুলিয়া নেও গিয়া রাম-সীতা—
সাজন-মন্দির ঘরেতে—একাসনে॥

১ হীরার ২ আর যাহারা গীত গাহিতে আসিয়াছেন ৩ পাঁচজন এয়ো ৪ রাখিলেন
৫ সাক্ষাতে ৬ (?) ৭ গা মাজেন ৮ ভেজা কাপড় ৯ শুকনা কাপড় পরিয়াছে

। ৩৭৫ ।

রাইয়ায় কোন্ ঠমকে আটে[১]
শ্যাম-চান্দের করে-করে[২] —
—মউরে পেখম ধরে ॥

উত্তম শালির গুঁড়িয়ে[৩] মণ্ডলি আঁকিলা ;
ও চারিগুলি[৪] বাঁশের চিক[৫]
চারিস্থানে থইয়া[৬] ॥

চারিগুলি মঙ্গল ঘট চারি স্থানে থইয়া—
চারিগুলি অম্র-পত্র
ঘটের মুখে দিলা ॥

দুধে কুলপইত[৭] -কলায় একত্র করিয়া—
বাক্যি-মন্ত্র কইয়া পুরইতে[৮]
সূর্য অর্ঘ্য দিলা ॥

এক পাক, দুইয়ো পাক, তিনো পাক দিয়া
চারি পাকের কালে পুরইতে
ঝারির জল উড়াইলা ॥

এক-এক করিয়া দেখ—সাত পাক দিলা
চারিগুলি বাঁশের ছিকল
উড়াইয়া ফালাইলা[৯] ॥

---

১ হাঁটে ২ সঙ্গে সঙ্গে, পিছনে-পিছনে ৩ শালি ধান্যজাত চাউলের গুঁড়া দিয়া ৪ চারিটি
৫ বাঁশের কাঠি ৬ থুইয়া ৭ (?) ৮ পুরোহিতে ৯ ফেলিলেন

। ৩৭৬।

'লীলমণি,[১] লীলমণি' ডাকইন[২] নন্দরাণী রে
—লীলমণি ॥

তলে পাড়ইন[৩] চিকন পাটি—
উপরে চান্দিয়া রে।
—লীলমণি ॥

সোনার বাটায় ধান্য-দূর্বা
ইরার[৪] বাটায় লইয়া রে—
— লীলমণি ॥

আরগণ আর গীতা আইলা
দেবে রায় রাণী রে[৫]।
—লীলমণি ॥

আরগণ আর গিয়া রাণী
কি বর দিলায় তানে[৬] গো।
—লীলমণি ॥

লক্ষীয়ায়[৭] না ছাড়উক বাছায়
বিনন্দ-বাসরে।
—লীলমণি ॥

বাঁচিয়া থাকো রে বাছা
পরমাই অউক বিস্তর[৮] রে।
—লীলমণি ॥

১ নীলমণি ২ ডাকেন ৩ পাতেন ৪ হীরার ৫ (?) ৬ তাঁহাকে ৭ লক্ষ্মীতে ৮ বিস্তর পরমায়ু হউক

। ৩৭৭ ।

পাশা খেইলব[১] বংশিধারী ;
আইজ তোমারে পরাজয় দিব[২]
রাই কিশোরী ॥

পাশা যে খালাইতায়[৩] শ্যাম রে,
আগে থও দাও[৪] :
আরিলে আরণ দিবায়[৫]
গলার মণিহার ॥

পাশা যে খালাইতায় রাই গো,
আগে থও পণ :
এগো, হারিলে আরণ দিবায়
এই নব যৌবন ॥

দশ-দশ করিয়া পাশা
ঢালইন[৬] শ্যাম-রায় ।
বিশ-বিশ করিয়া পাশা
দেখ, তুলইন[৭] রাধিকায় ॥

আর জিতিল সে রাধিকা
আরইন শ্যাম-রায় ।
সখিগণে মিলিয়া তারা
মঙ্গল জোগার[৮] গায় ॥

১ খেলিবে ২ পরাজিত করিবে ৩ খেলিবে ৪ বাজী বাখো ৫ হাবিলে 'হারণ' দিবে
৬ ঢালেন ৭ তুলেন ৮ জয়কার, উলুধ্বনি

। ৩৭৮ ।

রুইলু,[১] রুইলু রে পান,
পা'ড়ে[২] আর পর্বতে পান—
সেই না পানে না লয় সমান ॥

পাড়ো, পাড়ো রে পান,
সোনার কুটায়ে[৩] পান—
সেই না পানে না লয় সমান ॥

থুবাও[৪] , থুবাও রে পান,
সোনার খারায়ে[৫] পান—
সেই না পানে না লয় সমান ॥

ধলাও[৬] , ধলাও রে পান,
সোনার খারায়ে পান—
সেই না পানে না লয় সমান ॥

চিরো, চিরো রে পান,
হিরার কাটাইলে[৭] পান—
সেই না পানে না লয় সমান ॥

সাঞ্জাও,[৮] সাঞ্জাও পান,
সোনার বাটায়ে পান—
সেই না পানে না লয় সমান ।

১ রোপণ করিলাম ২ পাহাড়ে ৩ আঁকশিতে ৪ কুড়াও ৫ বাঁশের তৈয়ারী পাত্র বিশেষে ৬ ধোও ৭ হীরার কাটারী দিয়া সেই পান কাটো ৮ সাজাও

খিলাও,[১] খিলাও রে পান,
পীর-মুরশিদের আগে পান—
সেই না পানে না লয় সমান ॥

। ৩৭৯ ।

সাজাও গো বাসর-শয্যা
যাথী ফুলেতে—
নগর বিচারি'[২] পুষ্প আনো ত্বরিতে ॥

আর যাথী-যূথী, লংমালতী,
পারিজাতেতে—
বিনা সুতে গাঁইথ্‌ছে[৩] মালা রঙন গোকুলে।

আর পারিজাত, গন্ধরাজ,
গোকুল ফুলেতে—
রঙ্গ দিদি, আয় গো ত্বরা মালা গাঁথিতে ॥

আর অশোক ফুল দিয়া রাধে
কুঞ্জ সাজাইছে—
রাসবিহারী কুঞ্জ সাজায় মন সাধেতে ॥

১ খাওয়াও ২ খুঁজিয়া ৩ গাঁথিয়াছে

। ৩৮০ ।

মছরির ভিত্তরে[১] উন্নুর-ঝুন্নুর বাজে ;
রব-রঙ্গিলা দামান্দে অতো ঠমকা[২] জানে ;
বালীর টিকা[৩] ছাপাইয়া
কান্দাই'-আসাই'[৪] মারে ॥

বালীর কান্দনে বাবাজীর কটোয়াল জাগে ;
না কান্দিয়ো উমরা-জাদী[৫] গো—
না বান্ধিয়ো গলা ।
এক টিকার বদলে গো
আরে পাঞ্চটিকা দিমু ॥

১ মশারির ভিতরে ২ ভেঙ্কি, খুনসুটি করিতে ৩ টিকলি, অলঙ্কার বিশেষ ৪ কাঁদাইয়া-হাসাইয়া ৫ বড়োলোকের মেয়ে

পরিশিষ্ট

॥ ইরফান আলীর অতিরিক্ত গান ॥

। ১ ।

। বাউল ।

ভবের পেরমে কলঙ্কিনী সার
যে পড়ে পিরিতের ফান্দে
আশা নাই তার বাঁচিবার। ধুয়া ॥

আগে আগে সোয়াগে-সোয়াগে
গলায় দিনু পিরিতের হার
তোরা দেখ আসি' লাগছে ফাঁসি
শক্তি নাই মোর ছাড়িবার ॥

ইমান আমান যায়
জাতিকুলে যৌবন যায় আর
যার লাগি' কলঙ্কী হইলু
সে বুঝি নয় আমার ॥

কুসঙ্গীয়ার সঙ্গ লইয়া
ভবের হাট মোর গেল গইয়া গো
কারে দোষ দিমু
আমার মনা হইলা দুরাচার ॥

অধীন ইরফানে বুলে
ভবের জালে হইছি গিরিফতার
আখেরে ভরসা রাখি
নবীজীর চরণ-ধুলার ॥

। ২ ।

। রাগ ।

রে সোনার ময়না,
তোমার পিঞ্জিরা ছাড়িয়া কোথায় যাও
ছাড়িলে ঘরের মায়া
তুমি ফিরিয়া না চাও। ধুয়া ॥

আসিব পেয়াদা
তোরে নিব রে বান্ধিয়া
তিরি-পুত্র-ভাই-বন্ধু তোমার
উঠিবা কান্দিয়া ॥

পলকের মাঝে সব হইয়া যাবে ধন্দ
বিবি তোমার বেওয়া[১] হইবা
এতিম[২] ফরজন্দ[৩] ॥

রাখিতে পারিব কোনে
ছান্দিয়া-বান্ধিয়া
ছাড়িবায় ভবের মায়া তুমি
কান্দিয়া-কান্দিয়া ॥

তুমি জান্ আমি তন্
ছাড়িয়া কেনে যাও
ফিরাও তোমার চান্দ-মুখ
একবার নয়ন খুলি' চাও ॥

মানুষের জীবন যেমন
পৌষ মাসের খুয়া[৪]
পড়িয়া রইবা খাকের তনু
উড়িয়া যাইবা সুয়া ॥

১ বিধবা ২ পিতৃহীন অনাথ ৩ সন্তান ৪ কুয়াসা

কান্দিলু জনম ভরি'
পরের কান্দন
আপনার কান্দন না কান্দিলু
থাকিতে জীবন ॥

নাকিছ[১] ইরফানে বুলে
দিন যায় মোর গইয়া
গয়াইলু দুর্লভ জনম
চোরের ছলা বইয়া ॥

। ৩ ।

। রাগ ।

সময় চিন' না,
লাখের ভরা যাইব গো মারা
গেলে জীবন আর পাবে না। ধূয়া

লাখের দোকানো গো
তোমার পরদীপ দিলায় না
আন্ধার[২] হাতে মাণিক দিলে
যতন করে না ॥

জানিলে বাজারের রীতি
ব্যাপার হয় দুনা
না জানিলে তামা বলি'
বিকি' দেয় সোনা ॥

কাক কালা, ময়না গো কালা
আমি মূল জানি না
বন্দী কইলু কাকের বাচ্চা
আমি ছাড়ি' দিলু ময়না ॥

---

১ অধম ২ অন্ধের

পিঞ্জিরাতে থাকিতে গো পঙ্খী
পোষ মানাইলাম না।
ছুটিব সুন্দর পঙ্খী
ধরা দিব না॥

সঙ্গিগণে যায় চড়িয়া
দেখিয়া দেখ না
তোমার চোখ থাকিতে কি সন্ধানে
হইলায় কানা॥

অধীন ইরফানে কহে
না কইলাম ভজনা
আমার নবীজীর শফাতে
আল্লায় পূরাও বাসনা॥*

॥ ভবানন্দের অতিরিক্ত গান ॥

। ১ ।

ও পরান কালার ভাবে
সদায় আকুল রাধার হিয়া। ধুয়া॥

এ নব যৌবন দিয়া বন্ধুরে সম্মুখে থইয়া,
দেখি রূপ নয়ান ভরিয়া;
হেন সাধ করে মনে প্রাণ-বন্ধুর চরণে
ভজি গিয়া জাতি-কুল দিয়া॥

যে বলউক, বলউক লোকে যার মনে যেই দেখে
ননদিনী বলউক অসতী;
গুরু গরবিত জনে বলউক যে দেখে শুনে
ছাড়ে ছাড়উক নিজ পতি॥

* ইরফান আলীর এই তিনটি গান শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (মাঘ, ১৩৪৩, পৃ ১২৮-১৩১) হইতে উদ্ধৃত। মুহাম্মদ আব্দুল বারী-কর্তৃক সংগৃহীত। স্তবক ও বানান আমাদের।

শ্রবণে কুণ্ডল দিয়া যুগুনীর ভেশ লইয়া
যথা-তথা যাইমু মনোদুঃখে ;
কানুর বিরহে মোর তনু হইল ঝর-ঝর
কি বলিব গোকুলের লোকে ?
মুই যদি ঐ মত জানু যমুনা-পুলিনে কানু
তবে কেনে আনতে যাইতু জল ;
বিহানে শুনিয়া বাধা গেলু কলঙ্কিনী রাধা
পাইলু তার প্রতিফল ॥

শুন হেরি প্রাণ-সই তোমাতে মরম কই,
মোর রূপ কালার অধীন ;
অবিরত মনে ভাবি রাতুল চরণ সেবি'
রচিলেক ভবানন্দ দীন ॥

। ২ ।

দীনের নাথ আর সহে না পরানে
দিবা-নিশি দারুণ দেহা
বা' নাথ কাটে বজ্রঘুণে । ধুয়া ॥

যে বেলা করিলায় পিরিত
তুমি আর আমি
অখন কেনে সেই কথা নাথ
লোকের মুখে শুনি ॥

তোমার পিরিতি হায় রে নাথ
শুদা মিছা মায়া
অখনে জানিলাম নাথ
কিঞ্চিৎ নাই তোর দয়া ॥

তোমার পিরিতি নাথ
কুমারের পুইনী
হৃদয়ে লাগাইয়া গেলায়
জ্বলন্ত অগুনি ॥

মুই যদি জানিতাম হায় রে
যাইবায় রে ছাড়িয়া
নিশি পোসাইতাম হায় রে
উদরে লইয়া ॥

আশা-ভরসা করি' নাথ
সঙ্গে আইলাম তোর
কৃপায় বানাইয়া দিলায়
বিনন্দ বাসর ॥

দীন ভবানন্দে বলে
নাথ শুন রে কালিয়া
পর কি আপনা হয়
পিরিতের লাগিয়া ॥

। ৩ ।

গৌর তোরে ঘরের বাইর কে কইল রে
আমার মনের বাঞ্ছা না পূরিল রে। ধুয়া ॥

আর উঁচ্চা না দালানে বসি' কি কর ভাই পরবাসী রে,
আমার পরবাসীর অসার জীবন রে।
উজান মুখে ছাড়ি' নাও ভাটিয়াল পানি বাইয়া যাও রে,
ও আমার আল্লার নামে জানাইয়ো ছালাম রে।

ছিরিপুর দিশা করি' নৌকাখানি দিলাম ছাড়ি' রে,
আমার নৌকা যাইত শ্রীপুরের ঘাটে রে।
যমুনার তরঙ্গ বড় পাতালখানি রাখিয়ো দৃঢ় রে,
নৌকা অকুল দরিয়ায় লইবা পার করি'।
দীন ভবানন্দে কয় আমার নৌকার খোঁজ কেবা লয় রে,
আমার নৌকার খোঁজ লইবা নিরঞ্জনে রে ॥*

। রাগ—রঙীন ।

("রাগ হরিবংশ" হইতে

আমি যারে চাই রে নাথ
সে এতো নিষ্ঠুর। ধুয়া ॥

ধরিতে না পাই রে বন্ধু
তোমার দিদার
দেখা দিয়া পরানি রাখো
দুঃখিনী রাধার ॥

নব রঙ জল তনে করে ঝলমল
না দেখি পরানে মরি
হইয়াছি পাগল ॥

ধিয়ানে না পাই রে বন্ধু
তোমার দিদার
যুগুনীর মতো আমি
হইমু ঘরের বার ॥

* ভবানন্দের এই তিনটি গান শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (বৈশাখ, ১৩৪৪, পৃ ২৪-২৬) হইতে উদ্ধৃত। স্তবক ও বানান আমাদের।

ডাকিতে না শুন বন্ধু
না দেও উত্তর
তোমারে দেখিবার শোকে
তনু ঝরঝর ॥

[ছাড়িয়া দেও রে কানু
খাও মোর মাথা
নিশাকালে যাইয়ো তুমি
পূরাইমু সরবতা ॥] (অতিরিক্ত পদ)

আজি হনে তুমি পরানের বন্ধু
না ভাসিয়ো ভিন্
রাধার সংবাদ কহে
ভবানন্দ দীন ॥*

॥ রাধারমণের অতিরিক্ত গান ॥

শ্যামের বাঁশী রে,
ঘরের বাহির করলে আমারে।
যে যন্ত্রণা বনে যাওয়া,
গৃহে থাকা না লয় মনে ॥

যথায়-তথায় যাও রে বাঁশী
সঙ্গে নিয়ে আমারে ;—
পায়ে ধরি' বিনয় করি
লাঞ্ছনা দিয়ো না মোরে ॥

* 'রাগ হরিবংশে'র ১০-সংখ্যক গান। শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্মা-কর্তৃক শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (কার্তিক, ১৩৪৪, পৃ ৯৪-৯৫) পুনরুদ্ধৃত। স্তবক ও বানান আমাদের।

ভেবে রাধারমণ বলে, শুন' গো ললিতে-
পাইতাম যদি শ্যামের বাঁশী
ভাসাইতাম যমুনার জলে ॥

যে দুঃখ দিয়াছ বাঁশী আমার অন্তরে—
এমন বান্ধব নাই যে গো
দেখাব কারে ;
মনে রইল দেখাব মইলে ॥*

॥ সৈয়দ শাহ নূরের অতিরিক্ত গান ॥

। ১ ।

('নূর নছিয়ত' হইতে)

। রাগ—ভাটিয়ল ।

বন্ধু প্রেমের পিয়াসী রে—ধুয়া ॥

বন্ধু তোর সনে পিরিত করি'
ঘরে না মুই রইতে পারি ॥

বন্ধু রে দিবানিশি ঝুরিয়া মরি
তুই বন্ধুর লাগিয়া
রাইতে-দিনে চাইয়া থাকি
পন্থ নিরখিয়া ॥

বন্ধু রে সহিতে না পারি দুখ
সদায় জলে হিয়া
স্বপনে দেখিনু বন্ধু
না পাইনু জাগিয়া ॥

---

* শ্রীসাবদা চরণ রায়-সঙ্কলিত। প্রবাসী পত্রিকা (ফাল্গুন, ১৩৩৫, পৃ ৬৫৪) হইতে উদ্ধৃত। স্তবক ও বানান আমাদেব।

বন্ধু রে সৈয়দ শাহানুরে কয়
উদাসিনী হইয়া
কি দোষে পরানের বন্ধু
না চাও ফিরিয়া ॥

। ২ ।

। রাগ—বিরহিণী ।

প্রাণনাথ কেবলি আশকি[১]
করিছে রোদন
কোথা গেলায় পরানের হরি
উদয় গগন ॥

আমা ছাড়া প্রাণের নাথ
রহিয়াছ কোথায়
জ্বলন্ত আগুনি আমি
অভাগিনীর গায় ॥

যে বলে বন্ধুর কথা
তার দিকে ধাই
মস্তকেতে হস্ত মরি
ভূমিতে লুটাই ॥

কলিজা দগধে আমার
সহন না যায়
নিশি-দিশি ঝুরিয়া মরি
কি হইব উপায় ॥

১ প্রেমিক

অনলেতে ঝম্প দিলে
যদি প্রাণ যায়
বন্ধের শোকে পরানি দিমু
যে করে খোদায় ॥

যার ঘরে গিয়াছে
বাঞ্ছা খলপতি
সৈয়দ শাহানূরে কয়
সে করে পিরিতি ॥

। ৩ ।

। রাগ—ভাটিয়ল ।

সুবোলী বোল চাই শুনি রে সুজন পঙ্খী
সুবোলী শুন চাই শুনি। ধুয়া ॥

আর সুবোলী বোল রে পঙ্খী
কাজল-বরণ আঙ্খি
কোথায় থাকি' বোল পঙ্খী
নয়ানে না দেখি ॥

আম গাছে থাকে রে পঙ্খী
কদম ডালে বাসা
পঙ্খীরে দেখিতাম বলি'
মনে রাখি আশা ॥

দেখিমু দেখিমু করি
কপালে নাই লেখা
মিনতি করি রে পঙ্খী
একবার দেও দেখা ॥

দেখিতাম দেখিতাম বলি
দিবানিশি ঝুরি
সাথে থাকি না দেও দেখা
আমি উদাসী ভিখারী ॥

সৈয়দ শাহানূরে কয়
পঙ্খী দেখা দেও আমারে
তোর লাগি' উদাসী হইয়া
ফিরে ঘরে ঘরে ॥

। রাগ—এশ্‌কি ।

হায় রে রঙ্গিলা নায়ের মাঝি
কোন দিন খুলিবায় নাও
অভাগীয়ে না জানি । ধুয়া ॥

মাঝি রে, উজানে থাকে রে কন্যা
আউলাইয়া মাথার কেশ
পানি চাইতে না দেয় কন্যায় রে
ও মাঝি এ কোন্ পামর দেশ ।

ও মাঝি বাড়ীর পিছে পুষ্করণী
শানের বান্ধিল ঘাটখানি
হাতীয়ে-ঘোড়ায় না খায় জল
কলসী না হয় তল
সেই পুষ্করণীর জল খাইলে
নাগর হয় পাগল ॥

। ৫ ।

। রাগ—মইউর (ময়ূর) ।

চল রে চল রে নিলজ্জার কালা
কলসী রহিল কাঁখে
তুমার আমার পরিহাস
ননদীয়ে দেখে । ধুয়া ॥

বিহানে উঠিতে মোর পড়িছিল বাধা
তেকেনে জলেরে আইনু
কলঙ্কিনী রাধা ॥

কেবা না আইসে ঘাটে
ভরিয়া নিতে জল
একাকী পাইয়া মোরে
তুমি কর বল ॥

শাশুড়ী-ননদী
একে বলে পরিবাদ
বিন্দাবন ছাড়িয়া যাইমু
রহিতে নাহি সাদ ॥

মায়ে-বাপে বলে মোরে
রাধা-কলঙ্কিনী
যুগুনী হইয়া যাইমু
মনের ওগুনি ॥

শশুড়ী-ননদী-জাল
—দেওরা হইলা বৈরী
দেখা না পাই রে বন্ধু
নিরবধি ঝুরি ॥

ছৈয়দ শাহানূরে কইন
একি পরমাদ
শশুড়ী-ননদী-জালে
কই সম্বাদ ॥*

* শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (মাঘ, ১৩৪৪, পৃ ১২৩-১৩৬) হইতে উদ্ধৃত। আব্দুল জব্বার-কর্তৃক সঙ্কলিত। স্তবক ও বানান আমাদের।

পরিশিষ্ট—খ ঃ শ্রীহট্টের অন্যান্য লোক-সঙ্গীত

॥ শ্রীহট্টের মাঘব্রত ॥

"মাঘব্রত কুমারীদের পালনীয় একটি ব্রতরূপে শ্রীহট্ট সমাজে প্রচলিত আছে। ···মাঘমাসে এই ব্রতের কার্য করা হয় বলিয়া ইহা মাঘব্রত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পৌষের সংক্রান্তি (উত্তরায়ণ সংক্রান্তি) হইতে আরম্ভ করিয়া মাঘের শেষ সংক্রান্তি পর্যন্ত ইহার কার্য করিতে হয়। কুমারীগণ অতি প্রত্যুষে স্নান (সাধারণতঃ পুকুরের ঠাণ্ডা জলে) করিয়া আসিয়া এই ব্রতের কার্য করিয়া থাকে। ইহা কোন শাস্ত্র-বিহিত নহে। ইহাতে কোনও ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। ইহার পুরোহিতের কার্য করিয়া থাকেন ঘরের সর্বাপেক্ষা বয়স্কা গৃহিণী। অনেক স্থলেই কুমারী কন্যার মাতা স্বয়ং। ইহার মন্ত্র হিন্দু সমাজে পূজা-পার্বণে প্রচলিত সংস্কৃত মন্ত্র নহে। ইহা বাঙলা এবং তাহাও পূর্ব হইতে প্রচলিত একপ্রকার স্থানীয় বাঙলা। ইহার মন্ত্র হইতে দেখা যায় ইহা মূলতঃ শুধু নিজের সুখ-স্বচ্ছন্দে মূল্যবান পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি ধারণ করিয়া উৎকৃষ্ট আহারে উদর পূর্তি করতঃ জীবন অতিবাহিত করার একটি কামনাত্মক কার্য। পুকুরের মত একটি ক্ষুদ্রাকৃতি গর্ত করিয়া তাহার পূর্বপারে এক ছোট বেদীর উপর ক্ষুদ্রাকারের দুইটি মৃত্তিকা গোলক বা মৃৎপিণ্ড (মাটির বলের ন্যায় তৈয়ারী গোলাকার ডিম্ব) রাখা হয়; ইহাদিগকে দেউল বলা হয়।

"অনেকগুলি দূর্বাঘাসের দ্বারা প্রস্তুত একটি গুচ্ছদ্বারা ঐ পুকুরে দেওয়া জল একটি মন্ত্রপাঠ পূর্বক আলোড়ন করিয়া ঐ দূর্বাগুচ্ছ পূর্বোক্ত মৃত্তিকা গোলকদ্বয়ের উপরে রক্ষিত হয়। তারপর ফুলদ্বারা অন্যান্য প্রস্তুত মণ্ডলের (এক-একটি ফুল এক-একটি মণ্ডলের উপর মন্ত্রপাঠপূর্বক এক-একটি কথা বলিয়া দিয়া) পূজা করিয়া সর্বশেষে মণ্ডলের শেষ সীমায় অঙ্কিত প্রবেশ-দ্বারে বা প্রবেশ-পথে স্বর্গদ্বার পূজা হইল বলিয়া অবশিষ্ট ফুল দিয়া পূজা করিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করতঃ ব্রতের কার্য শেষ করা হয়।···

"মণ্ডলের মোটামুটি বিবরণ এই :—ব্রত পূর্বমুখী হইয়া করিতে হয়। পূর্বোক্ত পুকুরের পশ্চিমদিকে চাউলের ও অন্যান্য বস্তুর যথা ইট ও তুষ (ধানের

খোসা পোড়ান) ইত্যাদির গুঁড়িদ্বারা বসিবার জন্য মাটিতে একটি আসনের মত চিত্র অঙ্কিত করা হয়। ইহাতে বসিয়া ব্রতের কার্য করিতে হয়। পুকুরের পূর্বপারে পূর্বোক্ত বেদীর পূর্বদিকে (অনেক স্থলে রেখাঙ্কিত ক্ষেত্র মধ্যেই) চন্দ্র, সূর্য, একখানা থালা ও একটি ভৃঙ্গার বিভিন্ন রঙের গুঁড়ি দ্বারা অঙ্কিত করা হয়।

"ব্রতকারিণীর ও পুকুরের দক্ষিণপার্শ্বে চতুর্দিকে অঙ্কিত রেখার মধ্যে ত্রিকোণাকার পৃথিবী, চারিটি মনুষ্যমূর্তি ও সর্বনিম্নে নিম্নরেখার মধ্যস্থলে যেখানে অঙ্কিত আয়ত ক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশদ্বার দেওয়া হয় তাহার উভয় দিকে দুইটি মনুষ্যমূর্তি গুঁড়িদ্বারা অঙ্কিত করা হয়। উক্ত অঙ্কিত ক্ষেত্রের ভিতরে বিভিন্ন অলঙ্কার, সাড়ী ইত্যাদি গুঁড়িদ্বারা অঙ্কিত করা হইয়া থাকে।

"এই সমস্ত পূজার মন্ত্র নিম্নলিখিত রূপ।

১। "পির্থিম্ গেলা ভাসিয়া মুই বর্ত করু (করো ?) সিঙ্গাসনে বস্ইয়া।" এই বলিয়া বসিবার অঙ্কিত আসনে ফুল একটি দিতে হয়।

২। অঙ্কিত চন্দ্র, সূর্য, থালা ও ভৃঙ্গারে এইরূপ ফুল দিতে হয়, নিম্নলিখিত কথা বলিয়া—"চান্দ পূজু (পূজো ?) চান্দনে, সূর্য পূজু বন্ধনে, থাল, ভাত, ভিঙ্গার, পানি জন্মে জন্মে আয় (আয়ো, এয়ো) রাণী।"

৩। তারপর ত্রিকোণাকার ক্ষেত্রে ফুল দিয়া বলিতে হয়—"পির্থিম্ পূজি তিন কোণ, রাজ্য পূজি সম্‌কোণ, এরে পূজইতে পাইহু বর বিষ্ণুপুরী মোর ঘর।"

৪। তারপর চতুর্দিকে রেখাঙ্কিত স্থানের মধ্যবর্তী মনুষ্য (পুরুষ) মূর্তি-গুলিকে এক-একটি ফুল দিয়া বলিতে হয়, "মাঘ মণ্ডল, সোনার কণ্ডল, বাপ রাজা, ভাই পর্জা।" তারপর কতকটা বেগুন গাছ ও বেগুনের মত গুঁড়িদ্বারা প্রস্তুত মণ্ডলে ফুল দিয়া বলিতে হয় "আইঙ্গন বাইঙ্গন গুড়িত্ কাটা, জন্মে জন্মে ভাইব বাটা।" তারপর একটি আয়ত ক্ষেত্রের ভিতরে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বর্গ বা আয়ত ক্ষেত্রের মত দীর্ঘ ও প্রস্থ লম্ব রেখাসমূহদ্বারা অঙ্কিত একটি মণ্ডলে ফুল দিয়া বলিতে হয়, 'আটপূজি আটেশ্বর, স্বামী রাজা পাটেশ্বর।' তারপর একত্রীকৃত তিনটি কুণ্ডলীতে পূজা করিতে হয় এই বলিয়া—'তিন কুণ্ডলী পূজু

মুই, তিন রাজ পূজু মুই। আগে পূজু বাপের রাজ দুধে-ভাতে খাইয়া, তারপর স্বামীর রাজ মইচ্ছে-মাংসে খাইয়া, তারপর পুত্রের রাজ ঘিরৃতে-ভাতে খাইয়া।" তারপর বিভিন্ন অলঙ্কার ও সাড়ী পূজা করিতে হয়। মন্ত্র এইরূপ, "মুই দিলু গুঁড়ির সাড়ী, মোর লাগি' থাউক পাটের সাড়ী" ইত্যাদি। তারপর রেখাঙ্কিত ক্ষেত্রের নিম্নস্থ মনুষ্যমূর্তির মধ্যবর্তী স্থলে সমস্ত ফুল দিয়া "দেউ দুয়ার, দেউ দুয়ার, পূজি' উঠি স্বর্গ-দুয়ার"—বলিয়া পূজা করিয়া প্রণাম করিতে হয়।

"...দূর্বাদ্বারা পূর্বোক্ত জল আলোড়নের মন্ত্র বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। তাহা এই :—

আভাঙ্গিলা[১] পানি ফুটি[২] ভাঙ্গু[৩] রে,
মাই-বাপুর[৪] রাজকিনি[৫] পূজু[৬] রে।
মাই-বাপে দিয়া পাঠাইলা চাম্পা ফুলের ডালি,
তারে দিয়া দিয়া মুখকিনি পাখালি[৭]।
ছলে না ছলে লক্ষীর জলে[৮]
লল[৯] সুরুযাই লল পানি[১০]।
লেখিয়া-জুখিয়া[১১] (সাতকুরা[১২] পানি)
সাতকুরা পানি মোর সাত ঢালে[১৩] যায়
এককুরা[১৪] পানি মোর বাইছালি খালায়[১৫]।
বাইছালি খালাইতে রে ফুটি আইলু কাঁটা[১৬]
ঘাইট্‌খিলা কররে সুরুযাই বেটা[১৭]।
একহাত ঘাইটখিলা আর হাত তৈল,[১৮]
(হেনকালে সুরুযাই নাইবারে গেল)

---

১ অনালোড়িত ২ জলটুকু ৩ আলোড়ন করি ৪ মা-বাপের ৫ রাজ্যটি ৬ পূজা করি ৭ তাহাদ্বারা মুখ প্রক্ষালন করি ৮ কোনও ছল বা কৌশল করিয়া লক্ষ্মীরূপ জলে চল যাই ৯ লও। নিশ্চয়ার্থে বা জোর দিবার জন্য দ্বিত্ব ১০ হে সূর্য, জল লও ১১ ঠিক পরিমাণ করিয়া। কমি-বেশী না হয় ১২ একটি পরিমাণ মাত্র ১৩ দিকে ১৪ সামান্যার্থে ব্যবহৃত—কতটুকু ১৫ ভুঁইচালি খেলায় অর্থাৎ আন্দোলিত হয়। কতটুকু জল আন্দোলিত হইতেছে ১৬ আন্দোলিত জলের মধ্যে জল আন্দোলন করিয়া খেলা করিবার সময় কাঁটা ফুটিয়া, কাঁটা বিদ্ধ হইয়া আসিয়াছি ১৭ হে সূর্য নামক লোক, তুমি গ্রন্থিস্থিত ঘিলা দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া কণ্টকাবিদ্ধ স্থান সুস্থ বা স্বাভাবিক কর ১৮ একহাতে গাঁইট বা গ্রন্থিস্থিত ঘিলা ও অন্য হাতে তৈল নিয়া 'গিয়াছিল' উহ্য আছে। ঘিলাকে বিশেষ মূল্যবান মনে করিয়াই সম্ভবতঃ বস্ত্রখণ্ডে গ্রন্থি দিয়া রাখা হইত

নাইয়া-ধুইয়া রৌদ্দ দিলা পিঠ,[১]
তাত্ত পড়িয়া গেলা বরমার দিরিষ[২] ।
বর্মা সাত ভাই পানি রে যাইতে[৩] ,
কুরুয়ার[৪] ডাক শুনি কুর[৫] উঠি আইতে ।
থাক্ থাক্ কুরুয়া ভাঙ্গড়িমু তোর বাসা,[৬]
কাইল[৭] কেনে আইলে না সপ্তমীর দশা[৮] ।
সপ্তমী-অষ্টমী নাম্লে পড়ে খুয়া,[৯]
(মাঘাইর বর্তী[১০]ভইন পাঞ্জরর সুয়া[১১]) ।
মাঘমাস ধরিয়া মাঘাইর[১২] সেবা[১৩] ।
দেউল[১৪] পূজি দেউলেশ্বর, মোর বাপ-ভাই লক্ষেশ্বর[১৫] ।

"পূজার শেষ অংশে "দেউদুয়ার-দেউদুয়ার পূজি উঠি স্বর্গ-দুয়ার" বলিয়া সব ফুল দিয়া যে প্রণাম করা হয় তাহাতে স্বর্গ বাসের কামনা করা হয় বলিয়া মনে হয়। দেউ দুয়ার—দেবতার দ্বার ; স্বর্গদুয়ার—স্বর্গদ্বার। দেবতা স্বর্গে থাকেন বলিয়া কল্পিত হইয়া থাকেন। সুতরাং দেবতার স্বর্গে যাইবার যে

---

১ স্নান করিয়া ও ধৌত করিয়া পিঠ রৌদ্রে দেওয়া হইল। সম্ভবতঃ শীতানুভব জন্য ২ তাহাতে ব্রহ্মার দৃষ্টি পড়িয়া গেল ৩ ব্রহ্মার সাত ভাই-ই যখন জলে যাইতেছিলেন ৪ পক্ষী বিশেষ। মৎস্যখাদক বলিয়া খ্যাত ৫ কূলে। কুরুয়ার ডাক শুনিয়া ভয়ে ভীত হইয়া কূলে উঠিয়া যখন আসিতেছিলেন (তখন) ব্রহ্মার দৃষ্টি পড়িয়াছিল ৬ যেহেতু কুরুয়ার ডাক শুনিয়া ব্রহ্মার সাত ভাই জলে যাওয়ার সময় ভীত হইয়াছিলেন সেজন্যে কুরুয়াকে ধমক দিয়া শাসনের ভাবে বলা হইতেছে; রে কুরুয়া তুই অপেক্ষা কর, তোর বাসা আমি ভাঙ্গিয়া দিব ৭ গতকল্য ৮ আজ সপ্তমীর দশা অর্থাৎ সপ্তমীর তিথি উপস্থিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ মাঘ সপ্তমীর কথা বলা হইতেছে ৯ সপ্তমী-অষ্টমী প্রভৃতি দিনে বরাবর সমস্ত দিন ব্যাপী শিশির (কুয়াসা) পাত হইয়া থাকে। সুতরাং কাল না আসিয়া আজ (সপ্তমীর দিনে) তোমার আসা ঠিক হয় নাই। কাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইতেছে তাহা উহ্য আছে। অথবা, কোনো-কোনো স্থানে পঠিত "মাঘাইর বর্তী ভইন পাঞ্জরর সুয়া"-কে লক্ষ্য করিয়াও বলা হইতে পারে ১০ ব্রতী ১১ অতিস্নেহের বা ভালোবাসার পাত্রী ১২ সম্ভবতঃ মাঘ-মাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ১৩ সমস্ত মাঘ মাস (ধরিয়া) ব্যাপিয়া মাঘ মাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সেবা-পূজা হইতেছে, তুমি কাল অর্থাৎ পূর্বে কেন আস নাই। আজ সপ্তমীতে কেন আসিয়াছ। এখন সপ্তমী-অষ্টমী হইতে সর্বদা আকাশ কুয়াসাতে আচ্ছন্ন হইয়া আসিবে, দিন ভালো থাকিবে না, কাজেই হইাতে আনন্দোৎসবে ব্যাঘাত ঘটিবে ১৪ এখানে মৃৎ পিণ্ডকে বা মৃৎ পিণ্ডদ্বয়কে 'দেউল' বলা হইতেছে ১৫ হে দেউলেশ্বর, তোমাকে পূজা করিতেছি, আমার পিতা ও ভ্রাতাগণ লক্ষেশ্বর অর্থাৎ লক্ষপতি অর্থাৎ খুব ধনী হন

দ্বার তাহাই স্বর্গে যাইবার দ্বার। তাহাকে আমি পূজা করি অর্থাৎ ওই পথে যেন আমি যাইতে পারি।…

"দেউল নামধেয় গোলাকার মৃৎপিণ্ডগুলি ও দূর্বাগুচ্ছ প্রতিদিন যত্নে রক্ষিত হইয়া থাকে। এবং সাতদিনের দেউল ও দূর্বাগুচ্ছ একত্রিত হইয়া (কোনও সময়ে কারণবশতঃ সাত দিনের পরেও হয়) পাড়া-প্রতিবেশিনী মহিলাগণের সম্মিলনে আনন্দধ্বনি জ্ঞাপক গীতিকা সহযোগে পুকুরের জলে নিক্ষিপ্ত হয়। ইহা "দেউল ভাসান" নামে উক্ত হইয়া থাকে। ওই দিন অঙ্কিত মণ্ডলোপরি উপবিষ্ট সম্পন্ন গৃহস্বামিগণের কুমারীগণ কর্তৃক দেশীয় প্রস্তুত বাঁশ-বেতের ছাতা ঘূর্ণিত হইয়া থাকে। ছাতার উপর গৃহে প্রস্তুত নাড়ু, বাতাসা ইত্যাদি দেওয়া হয় এবং তাহা ছাতার ঘূর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে পতিত হয় ও বালক-বালিকারা তাহা মহানন্দে ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহাকে দেশীয় কথায় "ছাতি ফিরান" বলা হয়।

"ছাতি ফিরানের দিন অপরাহ্নে এক রেখাঙ্কিত ক্ষেত্রের মধ্যে একটি বিস্তৃত মণ্ডল অঙ্কিত হয়। প্রতিদিন পূজিত প্রত্যেক মনুষ্যমূর্তি, সাড়ী ও অলঙ্কারাদির সাত-সাতটি করিয়া ইহার মধ্যে অঙ্কিত হইয়া পূজিত হইয়া থাকে। এই অঙ্কিত মণ্ডল সমষ্টিগতভাবে "উদ" (অকারান্ত উচ্চারণ) নামে অভিহিত হয়। উদ্‌ শব্দের অর্থ প্রকাশ। দেশীয় উচ্চারণে অকারান্ত উচ্চারণ হইয়া "উদ" হইয়াছে। প্রতিদিন যে সমস্ত মণ্ডল দেওয়া হয় তাহার একত্রে সমাবেশ বা প্রকাশ এই অর্থে 'উদ' শব্দ হইয়া থাকিতে পারে। অথবা 'উদ' শব্দে জল। জলে যেমন প্রতিবিম্ব প্রকাশিত হয়, সেইরূপ এখানে প্রতিদিন পূজিত মণ্ডলের প্রতিবিম্ব বা ছবি দেওয়া হয় বলিয়া "উদ" নামাকরণ হইয়া থাকিতে পারে। উদ পূজার মন্ত্রাত্মক বাক্যগুলি নিম্নলিখিতরূপ ঃ-

গাইয়ে গুবরি উঠানে মণ্ডলী,[১]
উঠ উঠ ললিতা[২] সুয়াগ চলিতা[৩]।

---

১ গাইয়ের গোবরদ্বারা উঠানে মণ্ডল দিতে হইবে ২ ললিতা নামক কোনও স্ত্রীলোককে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে, হে ললিতা, (ভোর হইয়াছে) উঠ উঠ। নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান কর ৩ সোহাগ নামক কোনও একটি স্ত্রীলোকের কথা বলা হইতেছে, যে সোহাগ চলিতা—সোহাগ চলিবে অর্থাৎ সোহাগ এখনই ঘুম হইতে উঠিয়া কাজে বৃত হইবে, বৃত হইতেছে।…উক্ত দুই পঙক্তির পর যাহা বলা হইতেছে তাহা উহার সঙ্গে সম্মিলিত অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই

সুয়াগ চলন্তি[১] উদ পূজন্তি[২] ।
উদ পূজিতে অস্ত না যায়,[৩]
শিয়ালে ডাকতে ভাত না খায়[৪]
কাকে ডাকতে ঘুম না যায়[৫] ।*

॥ নিমাইর বারমাসী ॥

"নিমাই সন্ন্যাসী বাঙ্গালীর আদরের ধন, শ্রীহট্ট বাসীর হৃদয় রতন।···

"শ্রীহট্টের গ্রাম্য কবি এই অমৃত ধারা হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিতে পারেন না। তাই তিনি গ্রাম্য ভাষায়, গ্রাম্য ভাবে নিমাই সন্ন্যাসের করুণ গাথা পুত্রশোকাতুরা জননীর হৃদয়-বেদনার উৎসরূপে তাঁহার দেশবাসীকে দিয়া গিয়াছেন—

অরে ও নিমাইচান্দ মণি !
নিমাইচান্দরে না দেখিলে বিদরে পরানি ॥

"মাঘ মাসে কেশব ভারতী কি জানি কি মন্ত্র দিয়া "গৌর কৈলা[৬] উদাসী" আর বিষ্ণুপ্রিয়াকে ঘরে ফেলিয়া নিমাই সাজিলেন সন্ন্যাসী।

হায়রে পুত্র নিমাইচান্দরে মায়ের গৌরহরি।
অভাগিনী তোমার শোকে ত্যজিব পরানি ॥

"···ফাল্গুনমাসে নিমাই কাঞ্চন নগরে গেলেন "সোনার বসন ঘরে থৈয়া[৭]" ডোর-কৌপীন পরিলেন, "মস্তক মুণ্ডাইয়া" দণ্ড হাতে সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিলেন।

১ সোহাগ নামক স্ত্রীলোকটি চলিতেছে অর্থাৎ কাজ করিতেছে ২ সে উদ পূজা করিতেছে ৩ সূর্য অস্তের পূর্বেই উদ পূজা সমাধা করিতে হইবে ৪ শিয়ালে ডাকিবার পূর্বে অর্থাৎ সন্ধ্যার পূর্বে ভাত খাওয়া শেষ করিতে হইবে। ইহার বিশেষ কোনও অর্থ বা উদ্দেশ্য বুঝা যাইতেছে না ৫ অতিপ্রত্যুষে ঘুম হইতে উঠিতে হইবে ৬ করিলেন ৭ রাখিয়া, ফেলিয়া

* শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (শ্রাবণ, ১৩৪৪, পৃঃ ৪৫-৬৯) হইতে উদ্ধৃত। শ্রী কৃষ্ণবিহারী রায়চৌধুরী-সঙ্কলিত। স্তবক ও বানান আমাদের

"দুঃখিনী জননীর চিন্তা—

চৈত্রিক মাসেতে নিমাই রৌদ্রের বিষম জ্বালা।
দারুণ রৌদ্রের তাপে শরীর কৈল কালা॥
দারুণ রৌদ্রের তাপে শরীর উনায়[১]।
রাত্রি যে দুঃখিনী বাছার কেমনে পোষায়[২]॥

"মায়ের আশা ছিল বাছা এসব যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া হয়তো বৈশাখ মাসে ফিরিয়া আসিবে; কিন্তু বৈশাখ মাস চলিয়া গেল, জ্যৈষ্ঠ আসিয়া পড়িল।···আষাঢ় মাসে "ঘন বরিষণ"—

কার বাড়ীতে গিয়া বাছা খুঁজিবায় আসন।
পরার মায়ে পরার বইনে[৩] তুলিয়া দিব গালি।
নিমাইর বেদন কে জানিব পরার জননী॥

"...বরঞ্চ একটু কষ্টই হউক, তথাপি অন্যের বাড়ীতে গিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করা উচিত নয়—

নিমের তলে থাকিয়ো বাছা নিমের গোটা[৪] খাইয়ো

"যাহা হউক, শ্রাবণ মাসে এতো গরম থাকিবে না, বাছার—ততো কষ্ট হইবে না,—কিন্তু মার প্রাণ—

জি'তে থাইকতে[৫] না ছাড়িব নিমাই চান্দের মায়া

"ভাদ্রমাস—"বরিষার শেষ" কিন্তু নিমাইচাঁদ কোথায়—

কোন্ দেশে গেলায় নিমাই উদ্দেশ না জানি।
ঘরে বসি' ঝুরি' মরি মা অভাগিনী॥

"আশ্বিন মাসও গেল, নিমাইর কোনও খবর নাই, কার্তিক মাসে "নিওরি[৬] পড়ে ধারে," দুঃখিনী মায়ের প্রাণে—"নিমাই চান্দের কতকথা উঠে জলিয়া-জলিয়া।"

"অগ্রহায়ণ মাসে দুঃখের কাহিনী অফুরন্ত। এই অগ্রহায়ণ মাসেই নিমাই

---

১ গলিয়া যায়, রৌদ্রতাপে ঘর্মাক্ত হয়, নম্র হয়, ক্লিষ্ট হয় ২ পোহায় ৩ ভইন, ভগ্নী
৪ ফল ৫ জীবিত থাকিতে ৬ কুয়াসা

বাল্যকালে নদীয়ার বালকদের সঙ্গে কত খেলা করিতেন,—মায়ের মনে এই সব কথা উদিত হইতেছে—

হস্তে লাল বাঁশী রে নিমাই গলে বনমালা।
নদীয়ার বালক সঙ্গে কে করিব খেলা॥

"পৌষ মাস আসিয়া পড়িল—

পৌষ মাসেতে নিমাই দেখিলাম স্বপন।
স্বপন দেখিয়া বাছা না কৈল্লাম ভোজন॥

"—এমনই ভাবে মাসের পর মাস গিয়া বৎসর ফিরিয়া আসে—দুঃখিনী মাতার চক্ষের জলের বিরাম নাই—

গলে বনমালা নিমাই হস্তে লাল বাঁশী।
এমনি মত গাই আমরা নিমাইর বারমাসী॥"*

॥ শান্তির বারমাসী ॥

"শ্রীহট্টের কথ্য ভাষায় যে সকল গীতিকাব্য গ্রামে-গ্রামে সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে বারমাসী এক অমূল্য সম্পদ। গ্রাম্য কবি আড়ম্বরহীন ভাষায় গ্রাম্য নায়ক-নায়িকার প্রেম কাহিনী হইতে আরম্ভ করিয়া নানারূপ ধর্মমূলক শিক্ষাপ্রদ কাহিনীগুলি বারমাসীর আকারে গীতরূপে রচনা করিয়াছিলেন। এই গীতিকাগুলি মেয়ে মহলেই বিশেষ আদর পাইয়াছে,—যুবক মহলেও তাহাদের স্থান কম নয়। শারদীয় ৺দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে নবমীর রাত্রে ও দশমীর দিনে শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলায় নৌকা টানার যে স্ত্রী-আচার প্রচলিত আছে, তাহাতে ধামালি নৃত্য সহকারে এই বারমাসীগুলি এখনও গীত হয়। তা ছাড়া কোনও উৎসব উপলক্ষ্যে বার-মাসীর যথেষ্ট আদর আছে।...

"প্রোষিতভর্তৃকা সতীনারী পরমা সুন্দরী শান্তি স্বামীর বিরহে কাতরা;

* শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (শ্রাবণ, ১৩৪৫, পৃঃ ২০-২২) হইতে উদ্ধৃত। শ্রী রাজমোহন নাথ, বি. ই-সঙ্কলিত। স্তবক ও বানান আমাদের

কিন্তু অন্য এক বিদেশী বণিক যুবক তাহার রূপমুগ্ধ, নানাভাবে তাহার মন আকৃষ্ট করিতে ব্যস্ত।—

আরে ও শান্তিকন্যা[১] রূপের মনোহর।
তোর রূপে পাগল কৈল সাউদ-সদাগর॥

"বুদ্ধিমতী চতুরা নারী কিছুতেই আত্মবিসর্জন করিবে না—প্রেমান্ধ যুবকও কিছুতেই আশাত্যাগ করিবে না। মাসের পর মাস যায়—প্রত্যেক মাসেই প্রেমিক নূতন ছন্দে নূতন আবেদন উপস্থিত করে, নূতনভাবে মন ভুলাইবার ফন্দি করে, আর বুদ্ধিমতী সতী প্রতি মাসেই নূতন উপায়ে সেই সমস্ত জাল এড়াইয়া চলে;—নিরাশও করে না—ধরাও দেয় না। এইভাবে বারমাস প্রেমের খেলা চলে আর গ্রাম্য কবি নীরবে বসিয়া সেই কাহিনীর বিবরণ গান করে।

"হেমন্তের আগমনে প্রকৃতি রম্যমূর্তি ধারণ করিতেছে, গ্রামের ক্ষেতে ধানের শীষগুলি পুষ্ট হইতেছে।…গ্রাম্য কবির নিকট প্রেম স্ফুরণের এই উপযুক্ত সময়।

কার্তিক মাসেতে শান্তি ধানে বান্ধে খির।
তোর রূপ-যৌবন দেখি' প্রাণি না লয় স্থির॥

"শান্তি সান্ত্বনা দিল…আগামী কল্য যমুনার ঘাটে দেখা হইবে।—যুবক উৎসাহিত হইল। সময় মত "শান্তি এক হস্তে চোয়া-চন্দন আর এক হস্তে তেল" লইয়া যমুনার ঘাটে স্নানে গেল—সাউদের কুমারও সেখানে উপস্থিত। আনন্দের আতিশয্যে প্রেমিক একটু রসিকতা করিয়া বলিল—

জল ভর' শান্তিকন্যা, স্নান কর' তুমি।
যে ঘাটে ভরিবায় জল, চৌকিদার আমি॥

"শান্তি স্বপ্ন ভাঙিয়া দিল—

রাজায় দিছইন সাগর দীঘি, শানের[২] বান্ধিল ঘাট।
শান্তিকন্যা জল ভরিতে কিসের চৌকিদার॥

---

১ অসমীয়া ভাষায় 'শান্তি' শব্দের অর্থ 'সতী'। ..রজস্বলা কুমারীকেও শান্তি বলা হয়; প্রথম রজোদর্শনকে 'শান্তি হওয়া' বলে। আলোচ্য গীতে সর্বত্র 'শান্তিকন্যা' বলিয়া উল্লেখ আছে, এখানে শান্তি অর্থে সতীও হইতে পারে—নামও হইতে পারে ২ প্রস্তরের

"প্রেমিক নিরাশ হইল···কিন্তু আশা ছাড়িল না—

এই মাস ভাঁড়িলায় শান্তি, না পূরিল আশ
তোর রূপ-যৌবন দেখি সামনে আগণ মাস[১] ॥

"এবার প্রেমিক ভাবিল, শুধু কথায় মন ভিজিবে না। প্রেমিকাকে কিছু উপহার দেওয়া চাই।—তাই অগ্রহায়ণ মাসে যখন গ্রামের ক্ষেতে "কিষাণে কাটে ধান" তখন নবীন প্রেমিক অতি যত্নসহকারে "তোমা লাগি' আইন্‌ছি শান্তি আবের কাঁকইখান।"

"শান্তি উত্তর দিল, সাধু যেন নিজের বোনকে ঐ চিরুণীখানা দিয়া দেয়। ব্যথিত হৃদয়ে প্রেমিক পৌষ মাসে বঁধুর জন্য কিছু আহার্য-সামগ্রী উপঢৌকন আনিতে মনস্থ করিল।···তাই পৌষ মাসেতে যখন "বন্দে[২] পড়ে খুয়া[৩]" তখন অতি যত্ন-সহকারে চুপে চুপে "তোমার লাগি' আইন্‌ছি শান্তি সোনার বাটায় গুয়া"—যুবক এবার বাস্তব কাজে হাত দিয়াছে···শান্তি তাই একটু কঠোর উত্তর দিল—

আনছ, আনছ ওরে সাধু, খাইতু নারে ছঁইতু।
তোর মা-বৈন কাছে পাইলে ডাকিয়া বিলাইতু ॥

"···এ যেন অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং হইয়া পড়িল। যুবকও একটু কড়া কথা শুনাইয়া দিল।—

লঘুজাতি শান্তিকন্যা লঘু বুলি বোল।
তোমার আমার পন্থের পরিচয় মা-বৈন কেনে তোল ॥

"—শান্তি নিরুত্তর ;—সাউদের কুমারও ক্ষুব্ধ।···

এও মাস ভাঁড়িলায় শান্তি না পুরাইলায় আশ।
তোর রূপ-যৌবন দেখি সামনে মাঘ মাস ॥

"মাঘ-মাসে দারুণ শীত,—প্রোষিতভর্তৃকা "হিঙ্গুল মন্দির ঘরে"—"জোড়-পালঙ্ক সাজাইয়া" স্বামীর কথা ভাবিতে-ভাবিতে "জুড়িল ক্রন্দন" প্রেমিক বলিল—শান্তি! আমি "লঙ্কার হনুমান" হইয়া তোমার "হিঙ্গুল মন্দির ঘরে" প্রবেশ করিব। শান্তি উত্তর করিল—

১ অগ্রহায়ণ মাস ২ মাঠে, ক্ষেতে ৩ কুয়াসা

ঘরেতে জ্বালাইয়া আমি রাখমু মোমের বাতি।
দুয়ারে বান্ধিয়া থইমু নাগমস্ত[১] হাতী ॥

"...প্রেমিকের কি শক্তি নাই?—

থাবড়াইয়া[২] নিবাইমু তোর ঘরের মোমের বাতি।
আছাড়ি' মারিমু তোর নাগমস্ত হাতী ॥

"শান্তি টলিল না—প্রেমিকও আশা ছাড়িল না। নৈরাশ্যের মধ্যে আশার প্রদীপ জ্বালিয়া ফাল্গুন মাসের দিকে চাহিয়া থাকিল, এবং ফাল্গুনেও বিফল মনোরথ হইয়া—

চৈত্র মাসেতে শান্তি বসন্তে কাড়ে রাও[৩]।
অঙ্গের বসন খুল' শান্তি জুড়াউক সর্ব গাও[৪] ॥

"বলিয়া আবার প্রেম নিবেদন করিল। শান্তি এবার খুব সবল উত্তর দিল—গায়ে যদি জ্বালা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা হইলে তাহা স্নিগ্ধ করিবার যথেষ্ট উপায়ও ত' রহিয়াছে—"ছাত্তিপানি[৫] নাম' সাধু জুড়াউক সর্ব গাও।" সদাগর ব্যথিত হইল—এরূপ উত্তর সে প্রত্যাশা করে নাই। বৈশাখ মাসের বান-তুফানে কলাবন ভাঙিয়া গেল—কিন্তু শান্তির হৃদয় গলিল না।—ক্রমশঃ অসহ্য হইয়া পড়িল—জ্যৈষ্ঠ মাসে সাহসে বুক বাঁধিয়া সদাগর বলিয়া ফেলিল—

জ্যৈষ্ঠ মাসেতে শান্তি গাছে পাকে আম।
তোমার অঙ্গে মারমু শান্তি কামের পঞ্চ বাণ ॥

"সতী নারীর ভয়ের কি কারণ আছে?—সগর্বে শান্তি উত্তর করিল—

'মার-মার' আরে সাধু ভাসাইয়া দেও জলে।
ভাসিয়া-ভাসিয়া যাইমু আমি স্বামীর তল্লাসে ॥

"...তথাপি প্রেমিক শান্তিকে আষাঢ়ের "গাঙ্গে নয়া পানি"-তে তাহার নৌকায় "উজান-ভাটি খেলাইতে" আহ্বান করিল।...কিন্তু শান্তি উত্তর করিল—তাহারও নৌকা আছে এবং ঐ নৌকাতে যখন তাহার স্বামী কাণ্ডারী হইবেন তখনই সে নৌকা ভ্রমণে বাহির হইবে।

---

১ বোধহয় মদমত্ত ২ থাবা দিয়া ৩ কোকিলে কুহুধ্বনি করে ৪ সর্বশরীর ৫ বুকজলে

"শ্রাবণ মাসে প্রেমিক ভয় দেখাইল—

শ্রাবণ মাসেতে শান্তি গাঙ্গে দিলাম ভাটি।
তোমার স্বামীর কাটা খাইছইন কাঞ্চনপুরের মাটি ॥

"সতী নারী উত্তর করিল—যদি বাস্তবিকই তাহার স্বামী নিহত হইতেন, তাহা হইলে সে পূর্বেই বুঝিতে পারিত ;—তাহার হাতের "রাম-লক্ষ্মণ দুই-মুট শঙ্খ" ভাঙিয়া চূর্ণ হইয়া যাইত, আর "দিনে দিনে হইত মলিন সিঁথের সিন্দুর" ; এইসব লক্ষণ যখন দেখা যায় নাই—তখন সে কি করিয়া তাহার স্বামীর মৃত্যু-সংবাদে আস্থা স্থাপন করিবে ?

"ভাদ্রমাসে বিরহবিধুরার প্রাণের ধন ঘাটে আসিয়া উপস্থিত—এক বৎসর পরে আবার স্বামী-স্ত্রীর মধুর মিলন হইল।

"ব্যর্থমনোরথ প্রেমিক সদাগর—আশ্বিনে শান্তির নিকট বিদায় নিতে আসিল—"বিদায় দেও শান্তিকন্যা, যাই আপন দেশে।"—নির্বিকার ভাবে শান্তি উত্তর করিল—

তুমিত' পুরুষজাতি, আমি জাতে নারী।
আমারওকি শক্তি আছে বিদায় দিতে পারি ॥

"—তোমার সঙ্গে কোন সম্বন্ধই নাই—আবার বিদায়ের কথা কি ? সুচতুরা শান্তি শেষ পর্যন্ত কোনও ত্রুটির মধ্যে পড়িল না।

"কাহিনী এই পর্যন্ত। গীতের শেষে রচয়িতার ভণিতা আছে, কিন্তু তাহা হইতে তাঁহার বিশেষ কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না।

বার মাসে তের পদ লহ রে গনিয়া।
এ গীত রচিল কোন শ্রীধর বানিয়া ॥
শ্রীধর বানিয়া না হয়, ধরম তার বাপ।
যেবা গায়, যেবা শুনে, খণ্ডে মহাপাপ ॥
ঢোল বাজে, ঘণ্টা বাজে, আর বাজে কাঁসী।
লোকে জিজ্ঞাসিলে কইয়ো শান্তির বারমাসী ॥*

* শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (শ্রাবণ, ১৩৪৪, পৃ ৩৯-৪৪) হইতে উদ্ধৃত। শ্রী রাজমোহন নাথ, বি. ই-সঙ্কলিত। স্তবক ও বানান আমাদের

॥ ভট্টকবি ॥

"ভট্টকবিগণের সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। আমাদের গ্রামে ইঁহারা বনিয়াদী অধিবাসী ; একটা প্রবাদ আছে "ভাট বামুন বানিয়া আর যত হুমা-নিয়া" (হুমানিয়া নবাগতদের খোঁটা)। কেশব মিশ্রের সঙ্গেই না কি ইঁহারা আসেন।

"...কবিতার ভণিতায় ইঁহারা অনেকেই "দ্বিজ" এই বিশেষণ-সমন্বিত।...

"ঢাকা অঞ্চলে ইঁহাদিগকে "ভাট-বামুন" বলে এবং কোনও ব্রাহ্মণকে আমি ভট্টের পদধূলি গ্রহণ করিতেও দেখিয়াছি।...তবে এখন দেখিতেছি যে ভট্টগণ আর ভট্ট উপাধি লেখেন না—"রায়" "রায় বর্মন্" এইরূপ ক্ষত্রিয়োচিত উপাধিই লেখেন এবং একপ্রকার সর্বসম্মতিক্রমেই "ক্ষত্রিয়" বলিয়া খ্যাপন করিয়া থাকেন।...

"শব্দকল্পদ্রুমে" ভট্ট সম্বন্ধে এইরূপ লেখা আছে : ভট্টঃ (পুং) জাতিবিশেষঃ। ভাট ইতি ভাষা। তস্যোৎপত্তির্যথা—বৈশ্যায়াং শূদ্রবীর্যেন পুমানেকো বভূব হ। স ভট্টো বাবদূকশ্চ সর্বেষাং স্তুতিপাঠকঃ ইতি ব্রহ্ম বৈবর্তে ব্রহ্মখণ্ডে ১০ম অধ্যায়ঃ ॥ অপিচ ক্ষত্রিয়াদ্বিপ্রকন্যায়াং ভট্টোজাতোহনু-বাচকঃ। ইতি যুধিষ্টির পরশুরাম সংবাদে জাতিসঙ্করলক্ষণম ॥

"খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস আমরা অনেকটা কবিকঙ্কণের চণ্ডীগ্রন্থ হইতে জানিতে পারি। তাহাতে কালকেতুর গুজরাট রাজ্যে নানা জাতীয় লোকের উপনিবেশের কথায় ভট্টজাতিকে ক্ষত্রিয় মধ্যে পরিগণনা করা হইয়াছে। রাজপুতদের বর্ণনার পরেই আছে—

আসি পুর গুজরাট, নিবাস করয়ে ভাট,
অবিরত পঢ়য়ে পিঙ্গল।
বীরদের খাসা জোড়া, চড়িতে উত্তম ঘোড়া,
নিত্য চিন্তে বীরের মঙ্গল ॥ ...

"অপিতু কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে "ইতর জাতির আগমন" বর্ণনায় বাগদি-পাটুনি চণ্ডাল ইত্যাদির মধ্যে—

আসি পুর গুজরাটে, বৈসে যতেক ভাটে,
ভিক্ষা মাগি বুলে ঘরে ঘরে ॥

"ইহারা ব্রহ্মবৈবর্তোক্ত "বৈশ্যায়াং শূদ্রবীর্যেন" জাত ভট্ট হইতেও বা পারে। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলেও ভট্টের উল্লেখ আছে। 'সুন্দর' 'বিদ্যার' ঘরে ধরা পড়িলে দণ্ড প্রদানার্থ বীর সিংহের সভায় আনীত হইলে পরিচয় জিজ্ঞাসায় কোনও সদুত্তর দেন নাই—পরন্তু মালিনীর মুখে কাঞ্চীপুরের গুণসিন্ধু রাজার পুত্র ইনি, এই পরিচয় পাইয়া কাঞ্চীপুরে যে ভট্ট গিয়াছিলেন সেই গঙ্গাভট্টকে ডাকাইলেন। ভাটের সঙ্গে রাজার কথোপকথন হিন্দী ভাষায় হইল—বোঝা গেল ভট্টরা বাঙ্গালায় ঘরবাড়ী বাঁধিয়া উপনিবিষ্ট হইলেও মূলতঃ হিন্দী ভাষাভাষী বিহার বা তদ্বহিঃস্থ প্রদেশ নিবাসী।...

"বানিয়াচঙ্গ ভট্টগণের প্রধান বসতিস্থান হইলেও অন্যত্র তাঁহাদের বসতি আছে—তরপ, চৌয়ালিশ, আগনা, দুলালী, বামৈ এই সব পরগণায় অনেক ভট্ট আছেন।...

"ভট্ট কবিদের দ্বারা নানা প্রকারে লোকশিক্ষার প্রচার হয়। তাঁহাদের কবিতা দ্বারা রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণাদির কাহিনী সাধারণ্যে সুপ্রচারিত হয়, যেমন পাঠক-কথকদের দ্বারা হইয়া থাকে। ইঁহাদের কবিতার বিষয় কেবল প্রাচীন উপাখ্যানেই নিবদ্ধ নহে। কোনওরূপ অভিনব ঘটনায় সমাজে আন্দোলন-আলোচনার তরঙ্গ উঠিলে তাহাও ভট্ট কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে,—যথা মোহন্ত মাধবগিরির কাহিনী 'নবীন এলোকেশী' বিষয়ক কবিতায় বর্ণিত হইয়াছিল। দৈব উৎপাতে স্থান বিশেষ বিধ্বস্ত হইলে ভট্ট কবিতায় সেই কাহিনীও স্থান লাভ করিয়াছে, যথা 'রাজনগরের কবিতায়' কীর্তিনাশা নদীদ্বারা ওই স্থানের ধ্বংসের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। বিশেষতঃ কোনও দানশীল ধর্মপরায়ণ ভূস্বামী কোনও ধর্মানুষ্ঠান করিলে ভট্টগণ তাঁহার যশোগীতি প্রস্তুত করিয়া সমাজের সর্বত্র সদনুষ্ঠানের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। ইহাতে অপর ধনীরাও সৎকার্যে প্ররোচিত হইতেন। দেশে যখন খবরের কাগজ ছিল না, ভট্টগণ ওইরূপে নানা ঘটনার সাধারণ্যে প্রচারের কাজ করিয়াছেন।

"এ ছাড়া নানারূপ রস-রচনায়ও তাঁহারা সমাজে কাব্যানন্দ বিতরণ করিয়াছেন।...

"কবিকঙ্কণ বা ভারতচন্দ্রের কাব্যে উল্লিখিত ভট্টগণ সংস্কৃত কাব্যাদি

পাঠ করিতেন। কিন্তু আধুনাতন ভট্টগণ সামান্য বাঙ্গালা লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন—যাহাতে মাত্র রামায়ণ-মহাভারতাদি পড়া যায়।…

"বানিয়াচঙ্গ ভট্ট কবিগণের প্রধান স্থান। তন্মধ্যে মকরন্দ রায় সর্বোৎকৃষ্ট কবি ছিলেন।…

"জানিতে পারিয়াছি যে বানিয়াচঙ্গের ভট্টগণ কবিতা ছাপাইত না এই নিমিত্ত, যে ছাপান কবিতা পড়িলে কেহ আর ভট্টদের মুখে আবৃত্তি শুনিতে চাহিবে না—তাই তাঁহাদের একটা আয়ের পথ বন্ধ হইয়া যাইবে।…" *

॥ ভট্টকাব্যে সিলেটের মুসলমান ॥

"আমাদের সিলেট জেলার বিভিন্ন স্থানে ভট্ট উপাধিধারী এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বাস করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই একপ্রকার শ্রুতিমধুর ও সুরযুক্ত কবিতা রচনা করিতে পারেন। এই শ্রেণীর কবিতাকে ভাটের কবিতা বলে, যেহেতু ভট্ট কবিরা (ভাটগণ) সাধারণ্যে ভাট ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। ভাটগণকে গড়ুয়া ব্রাহ্মণও বলা হয়। এতদ্দেশের গ্রাম্য ভাষা ও ভাবে গড়ুয়া বলিতে—এক শ্রেণীর অধৈর্য ভিক্ষুক বুঝাইয়া থাকে। …শুনা গিয়াছে যে, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়ে অনাদৃত ভাবে দুর্ভিক্ষ পীড়িত হইয়া পশ্চিমাঞ্চল হইতে বহু সংখ্যক ভিখারী ব্রাহ্মণ এতদ্দেশে আসিয়াছিলেন। খুব সম্ভব ভাট বা গড়ুয়ারা তাঁহাদেরই বংশধর।

"ভট্ট কবিতা রচনায় ভাট কবিগণ এতই অভ্যস্ত যে, তাঁহারা যে কোন স্থানে বসিয়া—যে কোন বিষয় অবলম্বন করিয়া সহসা কবিতা রচনা করিতে পারেন। ভাটের কবিতা একই নির্দিষ্ট সুরে গীত হইয়া থাকে। ইহা অতি শ্রুতি-মধুর। সাধারণ সমাজে এই শ্রেণীর কবিতাকে শুধু 'কবি' বলা হয়। ভাটেরা গ্রামে-গ্রামে বেড়াইয়া এই শ্রেণীর কবিতা গাহিয়া অর্থোপার্জন করিয়া থাকেন।

"শ্রীহট্টের মুসলমানদের মধ্যে অনেক ব্যক্তিই ভাট কবিতা রচনায় কৃতিত্ব দেখাইয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানেও এই শ্রেণীর অনেক কবি পল্লিগ্রামগুলিতে রহিয়াছেন!"**

---

* শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (বৈশাখ, ১৩৪৪, পৃঃ ১৪-২০) হইতে উদ্ধৃত। শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্মা-কর্তৃক সঙ্কলিত। বানান আমাদের

** শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (কার্তিক, ১৩৪৬, পৃঃ ১০০-১০১) হইতে উদ্ধৃত। মোহাম্মদ আশরাফ্ হোসেন-সঙ্কলিত। বানান আমাদের

। ভট্ট কবিতার তুইটি নিদর্শন ।

॥ রাজনগর ধ্বংসের কবিতা ॥

নমো লক্ষ্মী নারায়ণ চক্র[১] সুদর্শন শ্রীপতি শ্রীজনার্দন।
গোলোক বিহারী গোলোকেশ্বর হরি বৈকুণ্ঠে যে নারায়ণ ॥
ভক্তাধীন হরি ভক্তবাঞ্ছাকারী ভক্তে করেন উদ্ধার।
অসংখ্য মহিমা বেদে নাহি সীমা জীবে বুঝা সাধ্যভার ॥
ভবে বাসতরে এক স্থানোপরে সৃজন করিলা হরি।
সোনার রাজনগর সৃজিলা শ্রীধর সুখ বাঞ্ছা মনে করি ॥
বিপ্র বৈদ্য কায়স্থ বিষয়ী সমস্ত বাস্তু আছে বহুতর।
(যেমনি) যমুনা মধ্যেতে ব্রজেতে (তেমনি) খাল-বিল-নদী নগর
যেমনি ধ্রুবলোক করিয়া কৌতুক সৃজেছিলা ভগবান।
তেমনি রম্যধাম রাজনগর গ্রাম দ্বিতীয় করিলা নির্মাণ ॥
যে স্থলে ভূপতি নাহি যদুপতি দেখে চিন্তাযুক্ত মন।
(বুঝি) এই মনে করে সমুদ্রের পারে দ্রুত করিলা গমন ॥
ঘোর যুদ্ধ করি আপনি শ্রীহরি জরাসন্ধ করি বধ।
(বুঝি) পুনঃ জন্ম তারে দিলা রাজনগরে দিয়ে তার রাজত্বপদ[২] ॥
মজুমদার কৃষ্ণ জীবন বিশিষ্ট সুতপস্যা ভবার্ণব।
তস্য ঘরে জাত হইলেন সুবিখ্যাত মহারাজ রাজবল্লভ ॥
হইলেন মহারাজ রাজনগর মাঝ বৈদ্যবংশে অবতার।
রাঢ় গৌড় কলিঙ্গ তৈলঙ্গ অঙ্গ বঙ্গ চমৎকার কীর্তি যার ॥
জন্মে ভূমণ্ডলে নিজ বাহুবলে কীর্তি কৈল বহুতর।
(বিল) দাহনিয়া[৩] ভরি অট্টালিকা পুরী নির্মাইলা নরেশ্বর ॥
সব দালান পাকা চকমিলান বাঁকা তুল্য অমরানগর।
শত রত্নাবধি[৪] পঞ্চরত্ন আদি একুশ রত্ন মনোহর ॥

১ 'লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র' মহারাজ রাজবল্লভের পিতা কৃষ্ণজীবন মজুমদারকে জনৈক সন্ন্যাসী দিয়া যান—তিনি 'রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ' আখ্যাত হইয়া রাজনগরের উপাস্য দেবদেবী মধ্যে শ্রেষ্ঠরূপে পূজিত হইতেন ২ কথিত আছে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র হস্তচালনা বিদ্যা প্রয়োগে জানিয়াছিলেন—"পূর্বে রাজা জরাসন্ধ ইদানীং রাজবল্লভ।" ৩ রাজনগরের পূর্ব নাম। রাজবল্লভের সময় হইতেই রাজনগর নাম প্রসিদ্ধ হয় ৪ 'সত্তর' রত্নকেই লোকে ভুল করিয়া 'শতরত্ন' বলিত। ফলতঃ ইহা সপ্তদশ চূড়াবিশিষ্ট মন্দির ছিল

দোল মঞ্চ শোভা আহা মরি কিবা সুমেরুর চূড়া প্রায়।
দীঘি-সরোবর শোভিত সুন্দর স্থানে স্থানে দেখা যায়॥
কত স্থানে স্থান দেবালয় নির্মাণ শিবালয়ে স্থাপিত শিব।
কোটি শিব কুড়াশী[১] তুল্য প্রায় কাশী দৃষ্টি কর কলির জীব॥
রাজা[২] লক্ষ্মীনারায়ণ দেবাদি ব্রাহ্মণ সেবা করে নিরন্তর।
যাহার কৃপাবলে রাজত্বপদ পাইলে এসে ধরণী উপর॥
সিংহ দরজায় নক্‌সা চমৎকার দেখিলে হয় যে শঙ্কা।
(যেমনি) সমুদ্র মাঝারে রাজা লঙ্কেশ্বরে সৃজিল কনক লঙ্কা॥
যেমনি রামায়ণে শুনেছি শ্রবণে প্রত্যক্ষ তায় দেখাইলে।
তেমনি মত সব রাজা রাজবল্লভ বিল দাহনিয়া দীপ্তি কৈলে।
রাবণ ঢশায় রাবণ ঠশায়[৩] রাবণ প্রতাপ সব।
রাবণ জিনিয়ে দিগ্বিজয়ী হইয়ে মহারাজা রাজবল্লভ॥
সুবে বাঙ্গালায়, সুবে উড়িষ্যায়, সুবে বর্ধমান বিহার।
নেপাল মথুরা কর্ণাট ত্রিপুরা এমনি কীর্তি নাহি আর॥
জানি কোন শাপে জরাসন্ধ ভূপে জন্মে রাজনগর মাঝ।
যাহার কৃপাতে বাঙলা মুলুকেতে প্রকাশ পাইল ইংরাজ॥
নবাবী আমল কৈরে বেদখল ইংরাজে রাজত্ব দিলে।
ধন্য মহারাজ ডঙ্কা ভর মাঝ রেইখে পরলোক হৈলে॥
হইলা নির্জীব কীর্তি তাঁর সজীব বর্তমান ভূমণ্ডলে।
সে কীর্তির বাদী কীর্তিনাশা নদী অকস্মাৎ তরঙ্গ হইলে॥
শুনি পঁচিশসালে ভাঙ্গিল দুই কূলে কীর্তিনাশা হয়ে খল[৪]।
আড়া-ফুলবেড়িয়া[৫] গোকুলগঞ্জ ভাঙ্গিয়া মুলকতগঞ্জ কৈল তল॥

১ কুড়াশী গ্রামে কোটি শিব লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ২ লক্ষ্মী নারায়ণের বিশেষণ। (সর্বপ্রথম পাদটীকা দ্রষ্টব্য) ৩ 'ঢশা-ঠশা'—'চালচলন' 'ধরণ-ধারণ' অর্থে দেশজ শব্দ-যুগ্ম ৪ এই পঙ্‌ক্তিটি 'রাজবল্লভ চরিত' গ্রন্থে মুদ্রিত কবিতা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে ৫ আড়া, ফুলবেড়িয়া ইত্যাদি গ্রামের নাম। এইগুলি বিশেষতঃ চাঁদ কেদারের কীর্তি ১২২৫ সালে ভাঙ্গিয়া নদী 'কীর্তিনাশা' নাম ধারণ করিয়াছিল—৫১ বৎসর পরে রাজনগর ভাঙ্গিয়া নামটি সার্থক করিয়াছে

(চান্দ) কেদার রায়ের কীর্তি চমৎকার ভেঙ্গে নিল কোটিশ্বর।
গোবিন্দ মঙ্গল (সোনার) সোনার দেউল থাকুটিয়াদি বহুতর ॥
পূর্বে এইমত ভেঙ্গে নিয়ে কত স্থির ছিল কিয়ৎকাল।
পুনঃ ছিয়াত্তর সালে ভাঙনি আরম্ভিলে হয়ে তরঙ্গ উত্তাল ॥

আর ছন্দ[১]

(দেখ) দেখ ভাইরে রাজনগরের হৈল কি দুর্দশা।
করলে মহারাজার কীর্তি নিবৃত্তি কীর্তিনাশা ॥
(যেমনি) নল রাজা মহাতেজা পাপাশ্রিত হৈল।
(দুষ্ট) কলি যাইয়ে প্রবেশিয়ে রাজ্যভ্রষ্ট কৈল ॥
হইল তদাকার ধরা পর কলুষ প্রবল।
(নইলে) নগরে সাগর করে কি নদী হইয়ে খল ॥
(যাকে) ভবার্ণবে এমনি ভাবে বিধি হয়রে বাম।
(তাকে) এরূপে কি দেখ দেখি করয়ে নির্ণাম ॥
যেমন চন্দ্রধর প্রতিপর মনসা বিবাদী।
(আনিয়ে) কালীদহে দেখ তাহে উনশত নদী ॥
(কৈরে) মহার্ণব ডিঙ্গা সব ডুবাইলেন মনসা।
(তেমনি) মহারাজার কীর্তিবাদী হৈল কীর্তিনাশা ॥
(হায়রে) দারুণ বিধি বুঝি নদীরূপে কাল হইয়া।
(কৈল) অসময় কি খণ্ড প্রলয় রাজনগর ভাঙ্গিয়া ॥
নাহি ভারতবর্ষে বাঙলাদেশে এমনি কীর্তি আর।
(সেই) সোনার নগর কীর্তিসাগর কৈল কি ছারখার ॥
ইহা দেইখে, লোকে মনের দুঃখে বলে হায়রে হায়।
নদীর কি তরঙ্গে রাজ্যে ভেঙ্গে কীর্তি লইয়ে যায়[২] ॥
অমনি কলরব অসম্ভব হইল নগরে।
(কেহ) কোলের ছেলে বিত্ত ফেইলে সরিয়া যাইতে নারে ॥
(ক্ষুদ্র) তালুকদাররা বিত্তহারা হইয়া হত জ্ঞান।

---

১ যেখানে ভট্টকবি রাগিণী বা ছন্দের পরিবর্তন করিয়াছেন সেই স্থানেই 'আর' (=অপর) ছন্দ লেখা হইয়াছে   ২ মুদ্রিত কবিতায় এই পঙ্‌ক্তিটির অন্তরূপ দেখা যায়—"কর্মে কিবল অর্জিত বিত্ত নদী লইয়া যায়"

(বলে) জীবনের আর সাধ কি ভবে কিসে রবে মান ॥
(কেহ) বলে ভাইরে কি হ'লরে এই ছিল কি লেখা।
(বুঝি) এ রাজ্যে আর আর কারো সনে কার না হইবে দেখা ॥
(নদীর) বেগ অতি রাজ্য প্রতি কি হইল আক্রোশ।
যাচ্ছে মহারঙ্গ রাজ্য ভেঙ্গে মধ্য দিয়ে ঢোষ ॥
(লোকে) কি করিবে কোথায় যাবে হইল আশঙ্কিত।
(হায়রে) কিবা দশা কীর্তিনাশা কৈল আচম্বিত।
(এমনি) চমৎকার কীর্তি আর হবে না ভুবনে।
(এমন) সোনার নগর কীর্তিসাগর পাব গিয়া কোন স্থানে ॥
(দেইখে) দেশ-বিদেশী লোকে আসি বলে হায় হায়।
(বলে) কি তরঙ্গে রাজ্য ভেঙ্গে কীর্তি লয়ে যায় ॥
(কত) দালান পাকা অলেখা[১] ভাঙ্গিল তরুবর।
(প্রথম) কুম্ভের বাড়ী ধরিলেক সুখ সাগর ॥
(নিলে) সুখের সাগর সুখসাগরে মহাসাগর ধরে।
(নদীর) কি প্রতাপ অসম্ভব প্রাণটি কাঁপে ডরে ॥
সাধের মতি সাগর মুহূর্তেক পর ভাঙ্গিলরে ভাই।
কোথায় গেল রাউত পাড়া আকশার[২] চিহ্ন নাই ॥
(নিল) রাণী সাগর কৃষ্ণ সাগর গুরুধাম আর।
(হায়রে) খালে-বিলে এক সমান যে কৈল জলাকার ॥
হায়রে পুরান দীঘি কাল বৈশাখী[৩] হৈত যার পার।
নিল সেই মেলা জুয়া খেলা লাল বাজারের বাহার ॥
যাচ্ছে ক্রমাগত ভেঙে যত রাজবংশের কীর্তি।
রায় মৃত্যুঞ্জয়ের[৪] কীর্তি, পরে করিল নিবৃত্তি ॥

---

১ মুদ্রিত কবিতায় 'অলেখা' স্থানে আছে "ঢকমিলান বাকা" ২ মুদ্রিত কবিতায় এই দুইটি পাড়ার নাম আছে। (আমাদের সংগৃহীত কবিতায় এই স্থলটি অস্পষ্ট লিখিত ছিল) ৩ পুরাতন দীঘির পশ্চিম পারে চৈত্র সংক্রান্তি হইতে দুই মাস ব্যাপী মেলা হইত—ইহার নাম "কাল বৈশাখী" ছিল। মেলাটি ঢাকার বিখ্যাত "কার্তিক বারুণী"র ন্যায় ছিল; খরিদ-বিক্রী, আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদি ইহাতে খুবই হইত ৪ রায় মৃত্যুঞ্জয় মহারাজ রাজবল্লভের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন—তিনিও উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কীর্তিমান হইয়াছিলেন

হায়রে শত রতন হইল পতন চমৎকার নগরে।
হৈল কাশীতে যে ভূমিকম্প পঞ্চ ক্রোশী পরে ॥
ভট্ট জয়চন্দ্রে পদ বন্দে করিয়া বর্ণন।
পরে পুরান হাউলির কথা বলি শুনেন সর্বজন ॥

আর ছন্দ

(হায়রে) কীর্তিনাশায় কীর্তি সব নিল ;
(বুঝি) এতদিনে মহারাজের নামটি লোপ হইল।
(সোনার) রাজনগর কি জলাকার কৈল ॥
(ভেইঙ্গে) রায় মৃত্যুঞ্জয়ের হাউলি, বাউলি দিয়ে অকস্মাৎ;
(হায়রে) পুরান হাউলি, যাইয়ে ধরল একি বজ্রাঘাত।
(হায়রে) বাবু সবকে করিয়া অনাথ ॥
(সাধের) নব রতন পড়ল যখন নদীর মাঝারে ;
(যেমন) নিরাকারে বট পত্র প্রায় ভাসে নীরে[১]।
(এরূপ) দেখি নাই আর জগৎ সংসারে ॥
(বলেন) বাবু সবে বিষাদভাবে বিধির হইল কোপ ;
একি কালে মহারাজার নামটি কৈল লোপ।
(হায়রে) কীর্তিনাশা হৈয়ে কাল স্বরূপ ॥
(অমনি) সোনার মঞ্চ দোল মঞ্চ হইল পতন ;
(রাজ) লক্ষ্মী নারায়ণ থাকতে হৈল এ লঘু লাঞ্ছন।
(বুঝি) দেব ধর্ম নাই কলিতে এখন ॥
(যদি) থাকত সত্য মাহাত্ম্য ব্রাহ্মণ দেবতার ;
তবে কি আর ছিন্ন ভিন্ন হয় গো এ সংসার।
(জানলেম) কলিতে হবে সব একাকার ॥
(হায়রে) কীর্তিনাশা কি নৈরাশা কৈল একেবারে ;
একটি চিহ্ন না রাখিলে নাম লইতে আর।
হায়রে জহ্নুমুনি নাইরে এ সংসার[২] ॥

---

১ নবরত্নের গঠন এরূপ সুদৃঢ় ছিল যে সমস্ত রাজনগর নদী প্রবাহে বিলুপ্ত হইলেও ইহা নদীগর্ভে বহুদিন দণ্ডায়মান অবস্থায় দৃষ্ট হইয়াছিল ২ জহ্নুমুনি গঙ্গা পান করিয়াছেন, তিনি থাকিলে হয়ত কীর্তিনাশার বারিরাশি পান করিয়া রাজনগর রক্ষা করিতেন

(দেইখে) স্থলে কান্দে স্থলচর জলে কান্দে মীন ;
আকাশেতে চন্দ্র-সূর্য হইল মলিন।
হায়রে একুশ রত্ন পড়িল যে দিন ॥
যত পাখী সব উড়িয়ে দেখি ঘুরিয়ে বেড়ায় ;
(তাদের) আশার বাসা কীর্তিনাশা ভেঙ্গে নিয়ে যায়।
(ওরা) বসিবার স্থান নাহি পায় ॥
লোক কেহ যায় রে হাসারকান্দি কেহ যায় খিলগায় ;
কেহ কেহ পাতনা দিয়ে[১] বইসে দিন কাটায়।
বলে নদী নি[২] রে একবার ফিরে চায় ॥
(ভট্ট) জয়চন্দ্রের এই নিবেদন শুনেন সমুদয় ;
কাছাড় জেলায় ভূমিকম্পে এইরূপ ঘটায়।
তাহাতে হইয়াছে এক আশ্চর্য প্রলয়[৩] ॥
জানবেন বিধিকৃত কর্ম যত খণ্ডন না যায় ;
যা হবার তা হয়ে গেল আমার কি উপায়।
(এরূপ) মাস্থ আমি আর পাব কোথায় ॥*

॥ নিরানব্বই সনের[৪] গিরাইর[৫] কবিতা ॥

আল্লা বল ভাই যত মছলমান।
লইবায় আল্লার নাম দেখিয়া কোরান ॥
তারপরে নবির বাত রাখিবায় আমল।
মউতের[৬] বাদে ভাই তরিবায় সকল ॥

---

১ নদীর ভাঙনির সন্নিকটে ঝোপরী বানাইয়া ২ নাকি ৩ এই প্রলয়ঙ্কর ভূকম্পন ১৮৬৯ ইং সনে শীত ঋতুতে ঘটে

* শ্রীযুক্ত রসিকলাল গুপ্ত (ভোলা রাধানাথ) লিখিত মহারাজ রাজবল্লভের জীবনচরিত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত (বিসং ১৩১৯, পৃঃ ১৯)। এই কবিতায় যে প্রলয়-চিত্র অঙ্কিত হইযাছে তাহা শ্রীহট্ট নিবাসী জয়চন্দ্র ভট্ট-কর্তৃক। ইনি তখন রাজকবিরূপে রাজনগরে ছিলেন। "তিনি স্বচক্ষে সেই দৃশ্য অবলোকন করিয়া আবেগপূর্ণ হৃদয়ে যে বিষাদ-সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি পূর্ববঙ্গের ভট্টকবিগণ স্বর-সংযোগে আবৃত্তি করিয়া থাকেন।" শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (বৈশাখ, ১৩৪৫, পৃঃ ১-৮) হইতে উদ্ধৃত

৪ বঙালা ১২৯৯ সাল ৫ দুর্মূল্যের ৬ মৃত্যুর

দেখ ভাই মুসলমান করিয়া খিয়াল।
আখেরি জবানায়[১] বড় ঘটিল জঞ্জাল॥
কতদিন হইল আজি জান সবলোকে।
বার সেরি নিদান ভাই হইয়াছিল মুলুকে॥
দিলের[২] দৈশতে[৩] লোক হইয়াছিল আকুল।
দানা বিনে কত লোকের গেছে জাতি-কুল॥
তারপরে খোদা-তায়লার হুকুম হইল।
আট পারি ধান টাকায় বিকিতে লাগিল॥
আট পারি, সাত পারি, ছয় পারি বিকে।
পাঁচ পারি বিকি এবে চারি পারি লাগে॥
ফরামিশ[৪] করিয়া দেখ দিলের ভিতর।
এই যে জবানার হালে দিলে লাগে ডর॥
এমন গিরাই দিন ভাই টাকায় চাউলের পারি।
চাষা লোকে আশা করে আর পাইতে পারি॥
চারি আনা গুড়ের সের সাত আনা সুপারি।
আট আনা খরচের সের দশ পয়সা খাসারি॥
কেমনে বাঁচিব লোকে উপায় নাই পায়।
সোনা, রূপা, জা'গা, জমিন বেচিয়া লোকে খায়॥
সোনা, রূপা, জা'গা, জমিন শতেক টাকার হইলে।
বন্ধক দিয়া কোনরূপে পঁচিশ টাকা মিলে॥
আর যারা যারা পয়সা-আলা পূর্ব ছিলেটের মাঝে।
টাকায় লয় চারি পয়সা সুদ গরীব কেমনে বাঁচে॥
শ্রীহট্ট আর পদ্মার পারি ধান কাটিবার আশে।
প'রে-প'রে হইছিল নৌকা ভাটি রাজ্যের মাঝে॥
আগে বরু ধানেরে কর্‌তা অপমান।
এই বারের বরু ধানে রাখল লোকের জান॥

১ ভবিষ্যৎকালে ২ মনের ৩ ভয়ে ৪ পরামর্শ

কিছু-কিছু পয়সা-কড়ি ছিল যারার হাতে।
আর কিছু মুনাফা কইলা ধানের বেপারেতে[১] ॥
যার হাতে পয়সা আছে দিলে তার ডর।
সিঁদ দিয়া চুরাইয়া[২] লইয়া যায় ঘর ॥
গুর[৩] -গাট্টা আছে যার টাকার নাই কমি।
জোরে ছিনাইয়া নেইন গরীবের জমি ॥
মিছা সাক্ষী দেইন আর কাছারীতে গিয়া।
গুয়া চুরি, কলা চুরি, রাত হানা দিয়া ॥
কেহ কার কর্জ নিলে দিত নাহি কয়।
হাতের পয়সা দিয়া দেখ মাইর[৪] করা হয় ॥
এ ছাই আওয়াল[৫] ভাই হৈয়াছে দেশেতে।
দিলেতে দৈশত লাগে বাঁচিমু কিমতে ॥
এই সব বাতে জান ইমামি হয় খলল[৬]।
নির্বল হইয়া গেল নেকির আমল ॥
বদির আমলে লোক ফিরে হামেহাল।
কিছমত[৭] কমিয়া গেল জীব যত কাল ॥
খোদারে না দিয়ো দোষ, না দিল খোদায়।
আপনার আকলে[৮] আপনে হারিলায় ॥
মিছা সাক্ষী, জুট বাত, ছাড় এই সব।
জোয়াব না পারিবায় দিতে পড়িলে তলব।
দুরুদ পড়িয়া ভেজ নবির উপরে।
তাঁহার ইজ্জতে খোদায় উদ্ধারে সবারে ॥
কি আর বলিমু ভাই দুছরা কালাম।
ছোট-বড় সবার আগে অধমের ছালাম ॥
৯৯ সালে ভাই এই সব হাল।
সাক্ষাতে কি আছে আর ভাবি সে খিয়াল ॥

---

১ ব্যবসাতে ২ চুরি করিয়া ৩ দল ৪ মারামারি ৫ বিবরণ ৬ দুর্বল ৭ ভাগ্য ৮ বুদ্ধিতে

নালায়েক[1] সায়েরি[2] আমি জুনাবে সবার
অধমের খাতা চাহি মাফ করিবার ॥
ধরাধরপুর ঘর আমার খিত্তা পরগণায়।
বাপের নাম মাং আছিম সবে জানিবায় ॥
আরকুম উল্লা নাম আমার সবারে জানাই।
ছোট-বড় সবার কাছে দোয়া কিছু চাই ॥
অধিক লেখিলে ভাই নাহি হয় খুবি[3]।
তামাম হইয়া গেল নিদানের কবি ॥ *

॥ লাছাড়ী গান ॥

"শ্রীহট্ট কাছাড়ে একপ্রকার গান "লাছাড়ী" নামে অভিহিত হয়। লাছাড়ী গান আপাতদৃষ্টিতে উপাখ্যান বলিয়া বোধ হইলেও সাধারণভাবে উহা ভিত্তিহীন উপাখ্যান মাত্রই নহে,—অনেকগুলিই সত্যঘটনামূলক। যেমন, "কটুমিয়ার গান"। উহার বিষয়বস্তু খুব বেশী দিনের পুরাতন নহে। কটুমিয়া শ্রীহট্ট জেলার মৌলভীবাজার মহকুমার অন্তর্গত ইটার অভিজাত বংশের ছেলে। তিনি লংলা পরগণায় বিবাহ করিয়াছিলেন।

"ইটায় থাকইন কটুমিয়া লংলায় কইলা বিয়া,
বড় সাধ আছিল মিয়ার লংলা দেখ্‌তা গিয়া।"

"এই যে তিনি লংলা দেখিতে অর্থাৎ শ্বশুর বাড়ীতে গেলেন, আর জীবন্ত ফিরিলেন না। দুশ্চরিত্রা নববিবাহিতা স্ত্রীর হাতে তাঁহার অপমৃত্যু ঘটে। এই করুণ কাহিনী অবলম্বনে এক সুদীর্ঘ গান এতদঞ্চলে সুপ্রচলিত আছে।

"পুলক কৈবর্তের ছেলে। খালে, বিলে, নদীতে নিত্যই 'জাল' দিয়া মাছ ধরিতে যায়। কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ে লীলাই (লীলা—লীলাবতী) ঘটনাচক্রে পুলকের প্রেমে পড়িয়া গেল।

"লীলা—আর দিন জাল বাও জালুয়ারে খালে আর বিলে,
আজি কেনে বাও জাল শামের বান্ধিল ঘাটে।

১ অযোগ্য ২ রচক ৩ সুন্দর

* আরকুম উল্লা-রচিত। শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা (মাঘ, ১৩৩৬, পৃ ১৭ হইতে উদ্ধৃত। মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন-কর্তৃক সঙ্কলিত। ধামান আমাদের

"ধনীকন্যা লীলা বাঁধান ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছিল :

"লীলা—ধন্যি তোর মাও বাপ ধন্যি তোর হিয়া,
এত বড় অইছ জালুয়া না করিছ বিয়া।
"পুলক—ধন্যি না হয় মাও বাপ ধন্যি না হয় হিয়া,
তোমার মতন কন্যা পাইলে করিতাম বিয়া।

"প্রথমে অবশ্য ব্যাপারটা হাসি-তামাশার ভিতর দিয়াই আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু পরিশেষে গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। ভ্রাতৃজায়ারা এই নিয়া লীলাকে শ্লেষ-বিদ্রূপ করিয়া উত্যক্ত করিয়া তুলিল। অবশেষে লীলা কতকটা জেদের বশবর্তিনী হইয়াই 'জালুয়া'র সন্ধানে গৃহত্যাগ করিল। "পুলক জালুয়ার গান" যে সত্য ঘটনামূলক তাহাতে সন্দেহ নাই।

'বিনন্দ রাজার গান'ও সত্য ঘটনা মূলক। 'কুঁড়া' (জলচর পক্ষী বিশেষ) শিকারে বিনন্দ রাজার খুব শখ ছিল। একদিন রাত্রে মা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ছেলেকে শিকারে যাইতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু বিনন্দ মা-র নিষেধ শুনিলেন না। শিকারী কুঁড়া নিয়া চুপি চুপি বাহির হইয়া গেলেন। মা-র স্বপ্নই সত্যে পরিণত হইল—বিনন্দ বিষধর সর্পের দংশনে প্রাণ হারাইলেন। কথিত আছে—করিমগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত মুড়িয়া হাওরে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং অনুমিত হয় মুড়িয়া হাওরেরই অদূরবর্তী কোন স্থানে বিনন্দ রাজার বাড়ী ছিল।

"রাজা নূতন দীঘি কাটাইবেন, লোকজন সব প্রস্তুত। সতীনের ষড়যন্ত্রে খনকদের সর্দার কমলারাণীর নামেই "প্রথম কোপ" বসাইল। দীঘি সমাপ্ত হইল ; কিন্তু জল ত' আর উঠে না। স্বপ্নে রাজা দেখিলেন, কমলারাণীকে উৎসর্গ না করিলে জল উঠিবে না। রাজা ত' স্তম্ভিত ! তিনি দীঘি বুঁজাইয়া ফেলিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু কমলারাণী কিছুতেই তাহা হইতে দিলেন না। তিনি আত্মবিসর্জনে প্রস্তুত হইলেন। ছয়মাসের ছেলেকে কোলে নিয়া কমলারাণী পুকুরে নামিতে লাগিলেন। যেই নামা অমনি হু-হু করিয়া জল উঠিতে আরম্ভ করিল। রাণী যতই নামেন জল তত বাড়ে। পা, হাঁটু, কোমর—ক্রমে বুক পর্যন্ত জল আসিল। ছেলেকে শেষবারের মতন স্তন্য পান করাইয়া ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়া আরও নামিলেন—এবার গলা পর্যন্ত ডুবিয়া

গিয়াছে। আর ত' রাখা যায় না, বুকজোড়া ধনকে শেষ চুম্বন দিয়া স্বামীর হাতে তুলিয়া দিলেন। তারপরেই সব শেষ! প্রসিদ্ধ বানিয়াচোঙ্গ গ্রামে সেই সাগর-দীঘি এখনো বর্তমান আছে। এবং বর্তমান আছে "কমলরাণীর গান"।

"এইরূপ সত্য ঘটনামূলক গান আরও আছে। "আদম খাঁর গীতে" দেখা যায়, আদম খাঁর মা বলিতেছেন—

"তোর পিতা মছলন্দ আলী, ভাওয়ালে বান্ধিছিল বাড়ী,
লুঠিয়া আনছিল ওলির নিয়ামত কন্যা রে—

"কাজেই দেওয়ান আদম খাঁর পিতা প্রসিদ্ধ ভাওয়ালের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতা মছলন্দ আলী "ভাটি শ্রীপুর" হইতে "ওলির নিয়ামত" কন্যাকে (আদম খাঁর মা) ধরিয়া আনিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। আদম খাঁও পিতার যোগ্য পুত্র। তিনি পিতৃ-পন্থা অনুসরণপূর্বক খেদাব রাজার কন্যাকে অর্থাৎ মামাতো বোনকে ধরিয়া আনিয়া বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইলেন। গানে এই অভিযান কাহিনীই বর্ণিত হইয়াছে।

"হীরাচান্দ সওদাগরের গানে আছে—হীরাচান্দ 'ভেল্‌ওয়া' কন্যাকে বিবাহ করিয়াই মাতৃ আদেশে বাণিজ্যযাত্রা করিতে বাধ্য হইলেন। ভেল্‌ওয়া প্রথমেই শাশুড়ী-ননদীর বিষ-নজরে পড়িয়াছিল। হীরাচান্দকে বাণিজ্যে পাঠাইয়া মা ও মেয়ে ভেল্‌ওয়াকে নির্যাতন আরম্ভ করিল।

"এদিকে হীরাচান্দ 'বাণেশ্বর মুলুকে' গিয়া তথাকার অধিকারিণী বাণেশ্বরী কন্যাকে দ্যূতক্রীড়ায় পরাস্ত করিয়া বিবাহ করেন। বাণেশ্বরী কন্যার পণ ছিল, যে তাঁহাকে দ্যূতক্রীড়ায় পরাস্ত করিতে পারিবে সেই তাঁহাকে বিবাহ করিবে এবং হারিলে কয়েদখানায় আবদ্ধ থাকিতে হইবে। বিবাহের পর এরূপ বহু কয়েদীকে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তিপ্রাপ্ত একজন কয়েদী—ইনিও একজন সওদাগর—ডিঙ্গা ভাটি দিয়া বাড়ী ফিরিতেছেন। একদিন নদীর ঘাটে অপরূপ রূপ-লাবণ্যবতী একটি মেয়েকে স্নান করিতে দেখিয়া সেই সওদাগর—নাম "মযুয়া রাজা"—মাঝি-মাল্লার নিষেধ সত্ত্বেও তাহাকে চুরি করিয়া ডিঙ্গায় তুলিয়া লইয়া যায়। এই মেয়ে আর কেহ নহে, হীরাচান্দের আদরের স্ত্রী ভেল্‌ওয়া—শাশুড়ীর যন্ত্রণায় নদী হইতে জল নিতে আসিয়াছিল।

যথা সময়ে হীরাচান্দ বাণেশ্বরীসহ ফিরিয়া শুনিলেন, ভেল্ওয়া আর বাঁচিয়া নাই। কিন্তু তাহার বিশ্বাস হইল না। অবশেষে সবই শুনিলেন। তারপর আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে ভেল্ওয়ার অন্বেষণে বাহির হইলেন।

"গরু রাখ রাখাল ভাইরে হাতে লাল ছড়ি।
কোন্ পন্থে যাইতাম আমি মঘুয়া রাজার বাড়ী॥"

"তারপর—

"হাতে লইলা লাউয়া[১] লাঠি
কান্ধে ফাড়া[২] ছাতি,
ধীরে ধীরে যাইন ফকির মঘুয়া রাজার বাড়ী।"

"অবশেষে সন্ন্যাসী মঘুয়া রাজার বাড়ী পৌঁছিলেন। পশ্চাতে লোক-লশকর সব বন্দোবস্ত ছিল।

"এদিকে মঘুয়া রাজা সব আয়োজন শেষ করিয়া বিবাহের জন্য প্রস্তুত। এমন সময় হরিষে বিষাদ ঘটিল। হীরাচান্দের লোক "মাউগ-চোরা মঘুয়া রাজা"-কে লাঞ্ছনার একশেষ করিয়া ভেলওয়াকে উদ্ধার করে।

"গানের বিষয়বস্তু হইতে বুঝা যায়, হীরাচান্দ পূর্ববঙ্গের ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবাসী ছিলেন। বাণেশ্বর মুলুক আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কোনও স্থান ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। মঘুয়া রাজার বাড়ী চট্টগ্রাম অঞ্চলে ছিল বলিয়া কথিত হয়।

"'মনাই হাড়িয়া,' 'আমীর আজফর' প্রভৃতি গানও সত্যঘটনা-মূলক বলিয়া যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। মনাই হাড়িয়া মালী। সুন্দর বাঁশী বাজাইতে পারে। দ্বাপর যুগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিল। প্রভুকন্যা বাঁশীর সুরে মজিল,—মনাই হাড়িয়ার সঙ্গে গৃহত্যাগ করিল। মনাই তাহাকে লইয়া হরিচিকরের রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিল। উভয় পক্ষে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটিয়াছিল। মনাইর বংশধরগণ এখনো বর্তমান আছেন।

"'ধনাই সাধু', 'নরসিং রাজা', 'ফুলভী কন্যা,' 'হিমালিয়া রাণী,' 'মাছিম খাঁ দেওয়ান,' 'ধুজিয়া পালোয়ান' প্রভৃতি গান সত্য ঘটনামূলক বলিয়া অনু-

১ বাদ্যযন্ত্র বিশেষ ২ ছেঁড়া

মিত হয়। কিন্তু 'কাঞ্চনমালা,' 'মধুমালা' প্রভৃতি গান নিছক উপাখ্যান মাত্র। শেষোক্ত গানগুলি আদ্যোপান্ত সুর সংযোগে গীত হয় না। গল্পের মধ্যে বিশেষ বিশেষ স্থলে—নায়ক-নায়িকার কথোপকথন, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি—সুর করিয়া গীত হয়। ইহাতে উপাখ্যানটি শ্রোতৃবর্গের নিকট অধিকতর সরস ও হৃদয়গ্রাহী হয়।

"লাছাড়ী গান আরম্ভের পূর্বে বন্দনার রীতি সুপ্রচলিত। সকল গানের বন্দনাই প্রায় এক প্রকার। নিম্নে বন্দনাটুকু উদ্ধৃত হইল—

"পূবেতে বন্দনা কইলাম পূবে উদয় ভানু,
যেই দিকে উদয় ভানু সয়াল[১] হয় ফশর[২]।
উত্তরে বন্দনা কইলাম উত্তম সিংহাসন,
উনকোটি দেবগণে পাতিয়াছইন আসন।
পশ্চিমে বন্দনা কইলাম মক্কা আর মদিনা,
হিন্দু ছাড়া মুছলমানে যে বায়[৩] দেইন ছজিদা;
দক্ষিণে বন্দনা কইলাম কালিধর সাগর,
পদ্মার বিবাদে চান্দের চৌদ্দ ডিঙ্গা তল।

"লাছাড়ী গানের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের এক অদ্ভুত খিঁচুড়ীরূপ দেখা যায়। হীরাচান্দ ফকিরের (সন্ন্যাসীর নয়) বেশে হাতে সারঙ্গী লইয়া লইয়া স্ত্রীর অন্বেষণে বাহির হইয়াছেন। গায়ক নির্বিকারে গাহিয়া চলিয়াছে—

"আল্লা আল্লা বলিয়া সারিন্দায়[৪] মাইল টান,
পরথমে সারিন্দায় বলে আল্লাজীর নাম।" ইত্যাদি

"হীরাচান্দ নিশ্চয়ই হিন্দু। তিনি কৃষ্ণ-বিষ্ণু না বলিয়া আল্লা-আল্লা বলিতে গেলেন, এ সম্বন্ধে কোনই প্রশ্ন উঠে না। তবে হীরাচান্দ নাম যদি মুসলমানের হইয়া থাকে, তাহা হইলে অবশ্য কথা নাই। খাঁটি হিন্দু গান—যেমন "বিনন্দ রাজা" প্রভৃতিতেও এরকম পাঁচমেশালি দেখা যায়। মোটকথা, এই সমস্ত গানের রচয়িতা মুসলমান, গায়কগণও পুরুষানুক্রমে মুসলমান। তাই যে সকল গানের নায়ক-নায়িকা হিন্দু তাহাদেরও মুসলমানী চেহারা দাঁড়াইয়া গিয়াছে। আবার দীর্ঘদিন হিন্দু প্রতিবেশীদের সহিত মেলামেশার

১ সমস্ত সংসার · ২ ফরসা ৩ যে দিকে ৪ সারেঙ্গীতে

ফলে স্বাভাবিক ভাবেই হিন্দু ভাবধারাও গানের সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

"লাছাড়ী গান হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারি যে, এককালে এ দেশের লোক বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইত। দুঃখ-দৈন্যে আজকালকার মত এত প্রপীড়িত ছিল না। সওদাগরেরা লোক-লশকর লইয়া ডিঙ্গা সাজাইয়া দূরদেশে বাণিজ্য করিতে যাইত। শৌর্যে-বীর্যে বাঙ্গালী পশ্চাৎপদ ছিল না।

"লাছাড়ী গায়কের সংখ্যা এমনিই মুষ্টিমেয়। ইঁহাদের সংখ্যা দিন দিনই হ্রাস পাইতেছে। আশঙ্কা হয়, অদূর ভবিষ্যতে এই শ্রেণীর গান পল্লীগ্রাম হইতে লোপ পাইবে। কারণ, এই সকল সুদীর্ঘ গান শিক্ষা করিবার মত ধৈর্য, সময় ও মনোবৃত্তি যেন পল্লীবাসীদের আর নাই। পূর্বের মত আসরও আর তত বসে না।...কোন কোন গান এত দীর্ঘ যে সারারাত ব্যাপিয়া গান চলিত।...ইদানীং সে রকম দেখা যায় না। পল্লীবাসীদের আনন্দ করিবার শক্তি কমিয়া গিয়াছে—আর সে মনও তাহাদের নাই।"*

---

* মাসিক মোহাম্মদী (অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭, পৃ ১৩৪-১৩৫) হইতে উদ্ধৃত। মুহম্মদ আব্দুল বারী কর্তৃক সঙ্কলিত। বানান আমাদের

	নাম :		ঠিকানা :
১	আছমত উল্লা	...	বাউসী, শ্রীহট্ট সদর
২	আছির আলী	...	রাতাবাড়ী, করিমগঞ্জ
৩	আজিজুর রহমান	...	মাতারগাঁও, সুনামগঞ্জ
৪	আবরজান বিবি	...	নন্দীরফল, করিমগঞ্জ
৫	আব্দাল শা’	...	আতানগর, করিমগঞ্জ
৬	আব্দুর রইছ	...	রাতাবাড়ী, করিমগঞ্জ
৭	আব্দুর রইছ চৌধুরী	...	বাগরসাঙ্গন, করিমগঞ্জ
৮	আব্দুল বারি	...	করিমগঞ্জ
৯	আব্দুল মছব্বির চৌধুরী	...	বাগরসাঙ্গন, করিমগঞ্জ
১০	ইদ্রিজ আলী	...	কেশরকাপন, করিমগঞ্জ
১১	ওয়াছির শেখ	...	বাহাদুরপুর, করিমগঞ্জ
১২	কালা শেখ	...	নন্দীরফল, করিমগঞ্জ
১৩	কুটি মিঞা	...	জল্লারপার, শ্রীহট্ট সদর
১৪	কুতুবউদ্দিন আহমদছিদ্দেকী	...	আব্দুল্লাপুর, করিমগঞ্জ
১৫	গুণবালা মালাকর	...	নন্দীরফল, করিমগঞ্জ
১৬	ছিদ্দেক আলী	...	তুরুকখলা, শ্রীহট্টসদর
১৭	জাহির আলী	...	নন্দীরফল, করিমগঞ্জ
১৮	তই শেখ	...	নন্দীরফল, করিমগঞ্জ
১৯	দশরথ নমঃশূদ্র	...	বিপক, করিমগঞ্জ
২০	ফুল শা’	...	লোহারমল, করিমগঞ্জ
২১	মতছিম আলী চৌধুরী	...	হিজিম, করিমগঞ্জ
২২	মতাহির আলী ছিদ্দেকী	...	আব্দুল্লাপুর, করিমগঞ্জ
২৩	মেচু মিঞা	...	বারহাল, করিমগঞ্জ
২৪	রওয়াইদ আলী	...	নন্দীরফল, করিমগঞ্জ
২৫	লেচইবিবি	...	বাহাদুরপুর, করিমগঞ্জ

২৬	শেখ নজই	...	নন্দীরফল, করিমগঞ্জ
২৭	শেখ নেনা	...	রণকেলী, শ্রীহট্ট সদর
২৮	শেখ মগই	...	কার্দিমল্লিক, করিমগঞ্জ
২৯	শেখ মুন্সী	...	নন্দীরফল, করিমগঞ্জ
৩০	শেখ রষিদ (শ্যাম মামু)	...	নন্দীরফল, করিমগঞ্জ
৩১	শেখ সরই	...	গাঙ্গপার, করিমগঞ্জ
৩২	সইদ আলী	...	নন্দীরফল, করিমগঞ্জ
৩৩	সরাফত উল্লা	...	মমরুজপুর, মৌলবীবাজার
৩৪	সুরেন্দ্র নমঃশূদ্র	...	বিপক, করিমগঞ্জ

ইঁহাদের নিকট হইতে আমরা বর্তমান গ্রন্থে সঙ্কলিত গানগুলি সংগ্রহ করিয়াছি। সকৃতজ্ঞ চিত্তে ইঁহাদের প্রতি আমরা ঋণ স্বীকার করিতেছি।

॥ শ্রীহেমাঙ্গ বিশ্বাস-কর্তৃক লিখিত ॥

॥ এক

"শ্রীহট্টের লোক-সঙ্গীতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য কি? বাঙলা দেশের অন্যান্য স্থানের লোক-সঙ্গীতের সঙ্গে এর কোনো সুরগত পার্থক্য আছে কি না,—সে সম্পর্কে ব্যাকরণ-সম্মত আলোচনা করুন"—প্রশ্নটি এই পুস্তক প্রণেতা অধ্যাপক ডাঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক মহাশয়ের। শ্রীহট্টবাসী না হয়েও শ্রীহট্টের ইতিহাস ও লৌকিক ঐতিহ্যের গবেষণায় যে নিষ্ঠা ও অনুরাগ তিনি দেখিয়েছেন, তা সত্যি প্রশংসনীয়। শ্রীহট্টের গীত রচনার ধারার বিশদ আলোচনা তিনি করেছেন। আমার ওপর ভার পড়েছে—তার সাঙ্গীতিকী নিয়ে আলোচনা করবার; যদিও জানি, ভাবকে বাদ দিয়ে ভঙ্গীর আলোচনায় একপেশে হবার ভয় থাকে।

শ্রীহট্টের সুর ব'লে কি কোনো সুর আছে? বাঙলাদেশকে যদি তিনটি অঞ্চলে ভাগ করি সুরের দিক থেকে,—তাহলে বলতে পারি, পূর্ববঙ্গ ভাটিয়ালী-প্রধান, উত্তরবঙ্গ ভাওয়াইয়া-প্রধান এবং মধ্য ও পশ্চিমবঙ্গ বাউল-প্রধান। কিন্তু ভাটিয়ালী-প্রধান পূর্ববঙ্গকে আবার সূক্ষ্ম সুর-বিচারে মোটা-মুটি জেলাগত অনু-বিভাগে ভাগ করতে পারি। আমরা যারা পূর্ববঙ্গের সুরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত, সেই অঞ্চলের গান শুনলেই অমুকটা ময়মনসিংহের, অমুকটা ত্রিপুরার, অমুকটা শ্রীহট্টের—ইত্যাদি বলতে অভ্যস্ত। কী পদ্ধতিতে এই ভাগটা ক'রে থাকি? কোনো বৈজ্ঞানিক রাগবিশ্লেষণে মোটেই নয়,—কেবলমাত্র "তৈরী কান" দিয়ে। কোনো বিশেষ ঢঙ, বিশেষ ছন্দ ও বিশেষ গায়কীতে এমনি একটা আঞ্চলিকতা মিশে থাকে এবং তা শুনতে-শুনতে এমনি অভ্যস্ত হয়ে যাই যে, এই সুর-বিচারে কোনো দিন বুদ্ধিগত বিশ্লেষণের চেষ্টা করি নি। কাজেই, এই স্বভাব-স্বীকৃতিগুলোকে ব্যাকরণ-সম্মত আলোচনায় দাঁড় করানো সত্যি অতি দুরূহ ব্যাপার। তা ছাড়া, গান গেয়ে দেখানো যেমন সহজ, লিখে—এমন কি,

স্বরলিপি ক'রেও তা প্রমাণ করা তেমন সহজ নয়। স্বরলিপিতে পল্লিসঙ্গীতের ঢঙ্ ও শ্রুতির মাধুর্য কোনোদিনই ধরা পড়ে না।

সকলেই জানেন, সাতটি পূর্ণস্বর এবং পাঁচটি অর্ধস্বরের যোগ-বিয়োগের টানা-পোড়েনে সমগ্র বিশ্বসঙ্গীতের ধ্বনিতরঙ্গের চিত্র-বিচিত্র নক্সা ধরা পড়েছে। মানব-সভ্যতার বহু শতাব্দীর বিবর্তনের পর মানুষের কণ্ঠ এই বারোটি স্বরকে আয়ত্তে আনতে পেরেছে। আজো অধিকাংশ লোকসঙ্গীত ঔড়ব-জাতীয়,—অর্থাৎ পঞ্চস্বরী, পঞ্চস্বরিক। বাঙলার লোকসঙ্গীতের বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্যের একটি বড়ো কারণ এই যে কড়ি-মধ্যম ছাড়া সমস্ত স্বরেরই প্রয়োগ এতে পাওয়া যায়। ভাটিয়ালী ঠাটেও কড়ি-মধ্যম ছাড়া সব ক'টি শুদ্ধ ও কোমল স্বরের ব্যবহার আমরা পাই। ভাটিয়ালীর সার্বজনীন রূপটি হ'ল,

সা রা মা মা -া পা পা ধা ণধা -পা

আ মি ব ন্ধু র্ প্রে মা গু নে ০

ণধা পমা পা মা -গা -রা সা -ণ্া -ধ্া

পো ড়া স ই ০ ০ গো ০ ০

ধা সা সা -া রা গা রা -া গা রা সা

আ মি ম র্ লে পো ড়া স্ নি তো রা

ভাটিয়ালীর অবরোহণে পা মা গা রা সা ণ্া ধ্া। মুদারার পঞ্চম থেকে উদারার কোমল নিখাদে নেমে ধৈবতে যে বিরাম,—ভাটিয়ালীর 'পকড়' বা প্রাণ সেখানেই। সমস্ত পূর্ববঙ্গের প্রাণ-ভোমরার এটাই হ'ল ফটিক মীনার। এই ভাটিয়ালীরই deflectional changes আরোহণ-অবরোহণের বহু রকম ফেরেরই এক একটি বিশেষ ভঙ্গী আঞ্চলিকতার সৃষ্টি করেছে। তার ওপর, গায়কীর আঞ্চলিকতা তো আছেই,—যদিও জেলায়-জেলায় ভৌগোলিক সীমান্তের মতো সুরের ধারার সীমান্ত-রেখা টেনে দেওয়া সম্ভব নয়। ভাষার উচ্চারণে এবং intonation-এ আঞ্চলিকতা তো আছেই। যেমন, ওপরের গানটি গাইবার সময় শ্রীহট্টের গ্রাম্য গায়ক গাইবেন,

আমি বন্দের প্রেমাগুনে পুরা,—
সইগ,' আমি মইলে পুরাস নি তরা॥

শ্রীহট্টের ভাটিয়ালীর একটি সাঙ্গীতিক বিশেষত্ব আছে। ভাটিয়ালীতে

রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-প্রসঙ্গ এসেছে অনেক পরে। তার আদিম রূপটি ছিল—বাস্তবজীবনের কথা ও ব্যথা, নদী ও নৌকা। প্রকৃতি ও প্রেম। পরে এলো দার্শনিকতা : নদী হ'ল জীবন-নদী, নৌকা হ'ল দেহ-তরী। তেমনি সুরের ক্ষেত্রেও ক্রমবিবর্তন আছে। শ্রীহট্টের একটি অতি-প্রচলিত ভাটিয়ালী গান,

কালো মেঘে সাজ কইর‍্যাছে,
পরান তো মানে না ;
সাবধানে চালাইও তরী—
নাও যেন ডুবে না।
বা' নাইয়া, নদীর কূল পাইলাম না ॥

সা	সা	রা	জ্ঞা	-মা	-জ্ঞা	-রা	-সা	|
কা	লো	মে	ঘে	০	০	০	০	|

সা	-রা	গা	-মা	গা	রা	-সা	-া	|
সা	জ্	ক	ই	য়া	ছে	০	০	|

সা	গা	-া	গা	মা	পা	মা	-গা	|
প	রা	ন্	তো	মা	নে	না	০	|

গা	মা	ধা	ণা	-র্সা	-ণা	-ধা	-পা	|
সাব্	ধা	নে	চা	০	০	০	০	|

পা	-ণা	ধা	ণা	-ধা	-পা	গা	মা	ধা	-পা
লাই	ও	ত	রী	০	০	নাও	যে	ন	০

পা	মা	গা	সা	সা	-া	-গা	|
ডু	বে	না	বা	না	ই	য়া	|

পা	মা	-া	মা	-গা	গা	-রা	সা	-া
ন	দী	র্	কু	ল্	পা	ই	লা	ম্

গা	-রা	-সা	|
না	০	০	|

এখানে মেঘ-এর 'ঘ'-এর ওপর আন্দোলায়িত কোমল গান্ধার এবং চালাইও-র 'চা'-তে দীর্ঘায়িত কোমল নিষাদের আবেশে এমনি এক উদার

মাধুর্য সৃষ্টি করে—যা একেবারে শ্রীহট্টের নিজস্ব ব'লে দাবী করতে পারি। ভাটিয়ালীর মুক্তগতি তাল সহ্য করতে পারে না ; এ গানটিও তালহীন। সে দিক থেকেও এখানে ভাটিয়ালীর পরিপূর্ণ রূপটি ধরা পড়েছে।

তালে ফেলে গাইলেও রাধারমণের—

রাই-বিচ্ছেদে প্রাণ বাঁচে না,—
মইলো, গো রাই কাঁচা সোনা…

এখানে 'মইলো' শব্দটি

ধা	-পা	-মা	-গা	-পা	ধা	-পা	-মা	-গা	রা	সা	-ন্া
ম	০	০	০	ই	লো	০	০	০	গো	রা	ই

ন্া	সা	সা	গা	-সা	-রা	-সা
কাঁ	চা	সো	না	০	০	০

ধৈবত থেকে নেমে আবার ধৈবতে উঠে, ঝটকা মেরে নীচে নেমে আসার ঢঙটি শ্রীহট্টের একটি বৈশিষ্ট্য।

শ্রীহট্টের হবিগঞ্জ মহকুমায় এবং ত্রিপুরার সীমান্ত অঞ্চলে ভাটিয়ালীর সুরের একটি বিশেষ ঢঙ পাওয়া যায়,—যাতে আছে উত্তরাঙ্গে টপ্পার কম্পনে এক অদ্ভুত প্রাণবন্ত প্রকাশ-ভঙ্গী। যেমন,

বড়ো দুঃখের দুঃখী আমি ও গুরু,
ভবে কেউ নাই আপনার—
শ্রীচরণে এই নালিশ আমার ॥

পা	পা	পা	পা	ধা	-র্সা	-র্জ্ঞা	-র্রা	-র্সা	-া
আ	মি	ব	ড়ো	দুঃ	খে	০	০	০	০
-ণা	-া	-ধা	-া	-পা	-া	পা	পা	ধা	ণা
০	০	০	০	০	র্	দুঃ	খী	আ	মি
ণা	-ধা	-পা	-মা	-ধা	-পা	-মা	পা	ধা	-া
ও	০	০	০	০	০	০	গু	রু	০

পা	ণা	-মা	মা	-ধা	পা	-মা	সা	রা
ভ	বে	০	কে	উ	না	ই	আ	প

সা	-ণ্া	-ধ্া ।
না	০	র্

॥ দুই ॥

শ্রীহট্টের লৌকিক ঐতিহ্যে ধর্মের দিক থেকে দু'টি প্রধান ভাবধারা প্রবহমান। একটি বৈষ্ণব, অপরটি সুফী। অধ্যাপক নির্মলেন্দু ভৌমিক এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করেছেন। সুরের ছন্দ ও ভঙ্গীতে বৈষ্ণব ধারাটি হ'ল মূলতঃ বিলম্বিত মীড়-আশ্রয়ী এবং তা লীলায়িত; অনুগামী বাদ্যযন্ত্র—একতারযুক্ত 'লাউয়া' বা 'লাউ'। সুফী ধারাটির সুর প্রধানতঃ গতিপ্রধান, কাটা-কাটা ঝটকা দেওয়া, ত্রিমাত্রিক ছন্দ; অনুগামী যন্ত্র—দোতারা ও খমক। বৈষ্ণব-ধারার লীলায়িত চলনের মধ্যে সুফী-ধারাটি নিয়ে এল এক গতির আবেগ। এই দু'টি ধারাকে অনেকে হিন্দু-ধারা ও মুসলমান-ধারা ব'লে আখ্যা দেন। কিন্তু, আমার মনে হয় তা ভুল। কারণ, এই দু'টি ধারারই প্রগতিশীল সামাজিক মুখ্য ভূমিকা ছিল—হিন্দু-মুসলমানের এক মিলিত ভাব-ধারা, এক মিলিত সংস্কৃতি গ'ড়ে তোলার। হিন্দুর গুরু, মুসলমানের মুরশিদ; হিন্দুর রাধাকৃষ্ণ, মুসলমানের আশিক-মাশুক মিশে গেছে।

ভাবাদর্শে যেমন, ঠিক তেমনি সুরের ক্ষেত্রে হিন্দু সুর ও মুসলমান সুর ব'লে ভাগ করাটা হবে অনৈতিহাসিক ও অবৈজ্ঞানিক। পশ্চিমবঙ্গের বাউলের ছন্দের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের সুফীগানের খুব মিল। বাউলগান নৃত্য-সম্বলিত; বাদ্যযন্ত্র—ডুগি ও খমক। কাজেই, বাউলের গানেও আছে কাটা-কাটা ত্রিমাত্রিক ছন্দ। সে বাউল গান শ্রীহট্টে কিংবা ত্রিপুরা-ময়মনসিংহে যখন ভাটিয়ালী সুরের প্রভাবে দেহতত্ত্ব-'বাউলা' গানে রূপান্তরিত হ'ল, তখন দেখি—ভাব এক হয়েও ভাটিয়ালীর ঢিমে টানা-টানা লয়ে তার প্রকাশ-ভঙ্গী গেছে সম্পূর্ণ পালটে। ঢাকার বিখ্যাত নরসিন্দী বাউলেরা ব্যবহার করেন 'সারিন্দা'। এই ছড়-টানা তারের যন্ত্রের টানে-টানে পশ্চিমবঙ্গের বাউল-সম্প্রদায়ের নাচের ছন্দ একেবারেই হারিয়ে গেল।

শ্রীহট্টের সুফীদের 'মারিফতী' গানে প্রায় পশ্চিমবঙ্গের বাউলের ছন্দ। শ্রীহট্ট মারিফতীদের পীঠস্থান। শ্রীহট্ট শ্রীগৌরাঙ্গের দেশ। কিন্তু, শ্রীহট্টের বিশেষত্বকে বোঝাতে গিয়ে আমরা প্রায়ই বলি 'শাহজালালের মাটি'। 'তিন শো' ষাট আউলিয়ার দেশ' ব'লে শ্রীহট্টের খ্যাতি। শ্রীহট্ট জেলায় বৈষ্ণবের আখড়ার চেয়ে পীরের 'মোকাম' বা 'দরগা' অনেক বেশী। পূর্ববঙ্গে বহু ফকির-কবির জন্ম হয়েছে। তাঁদের ওপর শাহজালালের প্রভাব অসামান্য।

আজো শাহ্‌জালালের জন্ম-বার্ষিকীতে—'উরসে শাহ্‌জালাল' দিবসে পূর্ব-বঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে শ্রীহট্টের শাহ্‌জালালের দরগায় অসংখ্য পীর-আউলিয়ার সমাগম হয়ে থাকে,—পশ্চিমবঙ্গে ঠিক যেমন জয়দেবের জন্মস্থান কেন্দুলীতে প্রতিবৎসর বাউল-সম্প্রদায়ের সমাবেশ হয়। পীর শাহ্‌জালালের ঐতিহ্য বহন ক'রে এযুগে শ্রীহট্টে আকবর আলী, আরকুম শাহ্, ইরপান, উম্মর পাগল, মজাইদ চান্দ, শেখ বানু (ভানু), হাছন রজা প্রভৃতি শ্রীহট্টের লোক-সঙ্গীতে এক অবিস্মরণীয় ঐশ্বর্যশালী গীতি-ধারায় সৃষ্টি করেছেন। শেখ বানু (ভানু)-র "নিশীথে যাইয়ো ফুলবনে রে ভমরা" কথান্তরিত হয়ে অন্য নামে রেকর্ড করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ যখন শ্রীহট্টে গিয়েছিলেন, তখন মরমী কবি হাছন রজার রচনায় মুগ্ধ হয়ে "হাছন উদাস"-এর পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ক'রে অতি যত্নে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসেন। তিনি তাঁর হিবার্ট বক্তৃতায় (Religion of Man) পূর্ববঙ্গের কোনো গ্রাম্য কবির দার্শনিকতার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে হাছন রজার "আমার আঙ্খি হৈতে পয়দা হৈল আশমান-জমিন্" : এই গানটির উল্লেখ করেন।

আমরা এই গানগুলোকে এক কথায় 'মুরশিদী' এবং কোনো-কোনো সময় 'মারিফতী' গান ব'লে থাকি। পূর্ববঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে শ্রীহট্টের এই 'মুরশিদী' গানের সুরের একটি বিশেষ ঢঙ আছে। উত্তরবঙ্গের 'চটকার'-র সঙ্গে সুর ও ছন্দে এর খুব সাদৃশ্য রয়েছে। হাছন রজার একটি বিখ্যাত গানকে নমুনা হিসেবে নেওয়া যাক: "লোকে বলে, বলে রে, ঘর-বাড়ী ভালা না আমার,"—

(দ্রুতলয়ে গেয়)

		|	+		
া	সা	ন্া	সা	রা	-া
০	লো	কে	ব	লে	০
		|	+		
-া	-া	-া	পা	পা	-া
০	০	০	ব	লে	০
		|	+		
মা	-গা	-া	রা	-া	রা
রে	০	০	ঘ	র্	বা

		।	+		
মা	মা	-গা	রা	-গা	-া
ড়ী	ভা	০	লা	০	০
		।	+		
রা	সা	-া	সা	-া	-া
মা	আ	০	মা	০	র্

এই সঙ্গে ‘চটকা’-র একটি উদাহরণ নেওয়া যাক : “ওকি মাই গে মাই, মোর মতন আর সতী নারী নাই,”—

		।	+		
া	পা	পা	মা	-পা	-া
০	ও	কি	মা	ই	০
		।	+		
মা	-জ্ঞা	-া	রা	-া	-া
গে	০	০	মা	ই	০
		।	+		
-া	-া	-া	রা	-া	মা
০	০	০	মো	র্	ম
		।	+		
মা	মা	-গা	রা	গা	-া
তন্	আ	র্	স	তী	০
		।	+		
রা	সা	-া	সা	-া	-া
না	রী	০	না	ই	-।

মুরশিদী গনের সমে-সমে ঝুঁকি দিয়ে গাইবার ঢঙটি ঠিক চটকা’র ঢঙের সঙ্গে মিলে যায়। আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। সেটি হ’ল, একই স্বরে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে দ্রুতগতিতে গানের প্রথম সারির কিছু কথা এমনিভাবে

ব'লে যাওয়া,—যা হঠাৎ গানের তাল ও সুরের বাইরে সংলাপের মত মনে হয়। যেমন,

চাইর চীজে পিঞ্জিরা বানাই'
মোরে কইলায় বন্ধ ;
বন্ধু, নির্ধনীয়ার ধন,
কেমনে পাইমু রে কালা,
তোর দরিশন ॥

আরকুম শাহের এই বিখ্যাত গানটি গাইবার সময় "চাইর চীজে পিঞ্জিরা বানাই"—এই কথাগুলো একই সঙ্গে একস্বরে আবৃত্তি ক'রে 'মোরে'-র ওপর ঝুঁকি দিয়ে গান আরম্ভ করতে হয়।

লৌকিক ঐতিহ্যের সমষ্টি-রচনা থেকে যখন ব্যষ্টি-রচনার যুগ এল, তখন ব্যক্তি-বিশেষকে অবলম্বন ক'রে অনেক সময় গায়কীর ষ্টাইলও প্রচলিত হতে লাগল। যেমন, এ যুগে ময়মনসিংহে জালালুদ্দীন ও দীন শরতের একটি বিশেষ ষ্টাইল চালু আছে ; তেমনি, শ্রীহট্টেও রাধারমণ, হাছন রজা প্রভৃতির নামে বিশেষ গায়কী আখ্যা পেয়ে আসছে।

॥ তিন ॥

শ্রীহট্টের লোক-সংস্কৃতিতে মেয়েরা এক গৌরবময় অধ্যায় রচনা করেছেন। ভারতের প্রতি প্রদেশের প্রতিটি জাতির লোক-নৃত্য ও সঙ্গীতে একান্তভাবে মেয়েদের একটি বিশেষ অবদান লক্ষণীয়। পাঞ্জাবের গিদ্দা, গুজরাটের গর্বা থেকে সুরু ক'রে আসামের আইনাম, বিয়ানাম প্রভৃতি মেয়েলী ব্রত, বিবাহগীতি, ঘুম পাড়ানিয়া গান ইত্যাদি বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে ও প্রয়োজনে ভারতীয় লৌকিক ঐতিহ্যে মেয়েরা যে উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন, তার সঠিক মূল্যায়ন আজো হয় নি। মেয়েলীগান বা মেয়েলী আচার ব'লে তাকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ রেখে এর যে বিরাট সামাজিক মূল্য—তার যথার্থ স্বীকৃতি আমরা দিই নি। আমাদের দেশের মেয়েরা তাঁদের আচার-বিচার, পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতির মধ্যে আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যকে যেমন ধ'রে রেখেছেন, তেমনি লোকসঙ্গীতেও দেখি—আমাদের মেয়েরা প্রাচীন ঐতিহ্য বহন ক'রে চলেছেন। গোষ্ঠি-রচনার স্বতঃস্ফূর্ততা, সহজ কথা ও

সুরের আবেদন, ঐহিক জীবনের প্রতি আকর্ষণ ও সমাজমুখিনতার যে বৈশিষ্ট্যে মেয়েলী ধারাটি উজ্জ্বল,—লোকসঙ্গীতের অন্যান্য ধারায় তা বিরল।

বাঙলার প্রতি জেলায় মেয়েরা সেখানকার আঞ্চলিক ছড়া, ব্রত ইত্যাদিতে একটি জেলাগত স্বকীয়তার সৃষ্টি করেছেন। এ বিষয়ে শ্রীহট্টের স্থান বিশেষ উল্লেখ্য। লৌকিক নৃত্যে বাঙলাদেশ অত্যন্ত দীন। যাও বা ছিল, তাও লুপ্তপ্রায় বা বিকৃত। কিন্তু শ্রীহট্টের মেয়েরা এক প্রাণবন্ত নৃত্য-ধারাকে প্রবাহিত রেখেছেন তাঁদের 'ধামাইল' নৃত্যে।

সেই ধামাইল নৃত্যের সঙ্গে ওতঃপ্রোতরূপে জড়িত আছে ধামাইল গান। শ্রীহট্ট জেলার এ একান্তই নিজস্ব জিনিস। বাঙলার লোকসঙ্গীতে বৈরাগ্য ও বিচ্ছেদের অন্তর্লীন ভাবটি প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু, ধামাইল গান ভাবের দিক থেকে মূলতঃ রাধা-কৃষ্ণ প্রেমকে অবলম্বন ক'রে রচিত হলেও, সুরে ও ছন্দে তা বিরহ-বিচ্ছেদ বা বৈরাগ্যকে অতিক্রম ক'রে পার্থিব উল্লাসে ভর-পুর। জন্ম, বিবাহ বা কোনো উৎসব প্রভৃতির আনন্দলগ্নে ধামাইল নাচ ও গানে গ্রামের মেয়েরা সমবেত হন। নাচের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁদের সমবেত করতালি গভীর রাত্রির নীরবতাকে ছন্দিত ক'রে তোলে বিভিন্ন লয়ে। আর একটি বড়োজিনিস—সমকালীন ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, স্বদেশী আন্দোলন ইত্যাদি অবলম্বন ক'রেও মেয়েরা impromptu গান মুখে-মুখে রচনা ক'রে ফেলেন।

ধামাইল গান নৃত্যাবলম্বী। কাজেই, গানের Scansion বা ছন্দ-বিভাগে স্বরাগ্রে ঝোঁক-প্রাধান্যই তার বৈশিষ্ট্য। যেমন,

(আমি) কী হেরিলাম | জলের ঘাটে | গিয়া না | সয়ী গো |

হেরি মুখ | চান্দে | পড়িয়াছি | ফান্দে |

প্রাণপাখী | কান্দে রইয়া | রইয়া না | সয়ী গো | ...

ধামাইলের বহু রূপ আছে। কিন্তু, সুরের দিক থেকে তা মূলতঃ ভাটিয়ালীর ঠাটের ভেতরেই। তবে, ভাটিয়ালীর টান বা মীড়ের আন্দোলন না থাকাতে প্রকাশভঙ্গী গেছে সম্পূর্ণ পালটে।

শ্রীহট্টের মেয়েদের আর একটি উল্লেখযোগ্য দান হল—বিয়ের গান। বাঙলার প্রায় প্রত্যেক জেলাতেই বিবাহ উপলক্ষে গান আছে। কিন্তু,

শ্রীহট্টে কন্যা-দেখা, মঙ্গলাচরণ, পানখিলি, জলভরা, অধিবাস, সোহাগমাগা, দধিমঙ্গল, বিবাহ, কন্যাযাত্রা—প্রত্যেক পর্বে-পর্বে এমন গানের লহরী বাঙলাদেশের অন্য কোথাও আছে ব'লে জানি না।

পার্শ্ববর্তী প্রদেশ আসামের 'বিয়ানাম'-এ শুধু এমনিতরো ঐশ্বর্যশালী বৈচিত্র্যের সন্ধান পাই। শ্রীহট্ট জেলায় বিয়েতে ধামাইল অপরিহার্য হলেও শুধু বিবাহ-অনুষ্ঠান অনুসারে যে বিশেষ গানের ধারা তাতে সুরের দিক থেকে কোনো-কোনো গানে এক সম্পূর্ণ নতুন ধারার সন্ধান পাওয়া যায় : সেটি হল, অসমীয়া 'বিয়ানাম'-এর সুস্পষ্ট ছাপ।

ঐতিহাসিক বিচারে শ্রীহট্টের তদানীন্তন (লাউড়, গৌড় ও জয়ন্তীয়া রাজ্যের) একটি বড়ো অংশ আসামের প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের কোচরাজাদের অধীনে ছিল। তা ছাড়া, আধুনিক যুগেও বৃটিশ শাসনাধীনে থাকা কালে শ্রীহট্ট ভাষা ও সংস্কৃতিতে বাঙালী হয়েও চিরদিন আসামের ভৌগোলিক অংশ হয়ে ছিল। রবীন্দ্রনাথের সেই আক্ষেপ,

মমতা বিহীন কালস্রোতে
বাঙলার রাষ্ট্রসীমা হ'তে
নির্বাসিতা তুমি
সুন্দরী শ্রীভূমি॥

শ্রীহট্টের কথ্য ভাষা এবং গানের সুরেও তাই অসমীয়া প্রভাবে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু, লক্ষণীয় যে, শ্রীহট্টের মেয়েলী গানেই শুধু এই অসমীয়া প্রভাব পরিস্ফুট। একটি 'কন্যা-বিদায়'-এর গানকে দৃষ্টান্ত হিসেবে নেওয়া যাক,

আম-ঘট সারি-সারি,
শুভ-যাত্রা করইন গৌরী ;
যাইবাইন গৌরী কৈলাসে—
মা, দেশে যাইতে॥

সা জ্ঞা -রা -সা সা -রা সা -ণ্‌া সা গা -ম -পা
আ ম ট ০ সা রি
মা গা -া গা মা -পা দা -া পা -মা
সা রি শু ০ যা ০ ত্রা

মা পা -া মা গা গা মা পা

ক র ইন্ গৌ রী যাই বা ইন্

দা পা মা জ্ঞা -া র্রা -া সা -ন্া

গৌ রী কৈ লা ০ সে ০ মা ০

সা গা -মা পা -মা গা

দে শে ০ যা ই তে

এবার একটি অসমীয়া বিয়ের গান নেওয়া যাক,

অরণ্যর মাজতে কি পহু কান্দিলে—

কি চরাই জুড়িলে রাও হে ॥

পা পা মা জ্ঞা জ্ঞা -মা পা মা

অ র ণ্য র মা ০ জ তে

মা মা -গা মা মা -জ্ঞা সা সা

কি প ০ হু কা ন্ দি লে

পা পা দা পা পা মা জ্ঞা -মা -পা মা

কি চ রাই জু ড়ি লে রা ০ ও হে

দুটি গানই কন্যা-বিদায়ের। দুটি সুরেই এক সেন্টিমেন্ট এবং সুরের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য ও লয়ের বেদনাময় গতি। এই ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য শ্রীহট্টের লোক-সঙ্গীতের সুর-বিচারে এক নতুন দিগ্‌বলয়ের সন্ধান দেয়।

॥ চার ॥

শ্রীহট্টের লোক-সঙ্গীতে রাগের প্রভাব আর একটি আলোচ্য বিষয়। "লোক-সঙ্গীতে রাগের প্রভাব"—এ কথাটিকে ঘুরিয়ে "রাগ-সঙ্গীতে লোক-সঙ্গীতের প্রভাব" বললেই ঠিক হয়। সঙ্গীত যেদিন একটি আদিম মানব-গোষ্ঠীকে আশ্রয় ক'রে প্রথম বিকশিত হয়েছিল—সেদিন সঙ্গীতের ছিল একটি সামগ্রিক গোষ্ঠীগত রূপ। তাকে "লোক-সঙ্গীত" বা "রাগ-সঙ্গীত" প্রভৃতি নামে ভাগ করার প্রশ্নই উঠত না। একটি সুর একটি গোষ্ঠীর বা উপজাতির সুর হিসেবেই পরিচিত ছিল। গোষ্ঠী-সমাজ থেকে আজকের Nation-hood-এর যে বিবর্তন,—লোক-সঙ্গীত ও রাগ-সঙ্গীতের বিবর্তনের ইতিহাসও তার সঙ্গে জড়িত। গোষ্ঠী, খণ্ড-জাতি, উপজাতির রাজনৈতিক ও

গ্রন্থিবন্ধনে যেমন জাতীয় রাষ্ট্র গ'ড়ে উঠেছে,—রাগ-সঙ্গীতেও তেমনি বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির সুরকে অবলম্বন ক'রে একটা সর্ব-ভারতীয় আকার ধারণ করেছে। আজো বহু ভারতীয় রাগ-রাগিণীর নামকরণে এর সাক্ষ্য মেলে। 'আভীরী', 'সাবেরী', 'মালবী', 'কানাড়ী', 'পাহাড়ী', 'মাঢ়' প্রভৃতি জাতির নামের সঙ্গে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর নামকরণ এই সত্যকেই পরিস্ফুট করে। আমাদের দেশের বিভিন্ন সঙ্গীত প্রবক্তারাও এ কথা স্বীকার করেছেন।

অন্যদিকে লোক-সঙ্গীতের ধারাটিও সমান্তরাল ভাবে প্রবহমান,—যদিও সে ধারাটি নিজ-নিজ আঞ্চলিক ও ভৌগোলিক সীমারেখায় প্রবাহিত। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে—একটি কেন্দ্রানুগ, আর অন্যটি কেন্দ্রাতিগ। কিন্তু, ঐতিহাসিক বিচারে দুটিই পরস্পরের পরিপূরক। রাগ-সঙ্গীত যেমন কেন্দ্রমুখী, লোক-সঙ্গীত তেমনি বিকেন্দ্রিক স্বকীয়তায় ও আঞ্চলিকতায় উজ্জ্বল হয়ে থাকলেই বেঁচে থাকবে। এর মধ্যে যাঁরা বিরোধিতা দেখেন, তাঁরা আধুনিকতার নামে জাতি-বিকাশের বৈজ্ঞানিক ধারাটিকেই অস্বীকার করেন। পূর্বেই বলেছি, এই দু'টি ধারাকে আপাত বিরোধী ব'লে মনে হলেও পরস্পরের পরিপূরক। তার মানে অবশ্য এ নয় যে, লোক-সঙ্গীতের ধারাটি একটি নিছক One Way Road। রাগ-সঙ্গীত যেমন বিভিন্ন আঞ্চলিক সুরকে অবলম্বন ক'রে গ'ড়ে উঠেছে, ঠিক তেমনি আবার রাগ-সঙ্গীতও লৌকিক ধারাটির ওপর তার প্রভাব বিস্তার ক'রে চলেছে। এই আদান-প্রদানের মধ্যে বাধার কোনো কঠিন প্রাচীর নেই। কাজেই, আমরা যখন কোনো-কোনো লোক-সঙ্গীতে রাগের প্রভাব পাই, তখন বলা মুস্কিল—সেটা সেই অঞ্চল থেকেই উদ্ভূত, অথবা ওপর থেকে আসা রাগ-সঙ্গীতের প্রভাব। বাঙলার কোনো-কোনো লোক-সঙ্গীতে রাগ-সঙ্গীতের প্রভাব সুস্পষ্ট। ঝিঁঝিট, দেশ, ভৈরবী, ভীমপলশ্রী, ভূপালী, বিভাস প্রভৃতি রাগের স্পর্শ বাঙলার লোক-সঙ্গীতকে মাধুর্য-মণ্ডিত ক'রেছে।

অবশ্য, গ্রাম্য-জীবনে বিশুদ্ধ রাগাশ্রয়ী একটি ধারা এবং লৌকিক ধারা পাশাপাশি অবস্থান ক'রে চ'লেছে। যাত্রাগানের বিবেকের সুর যেমন বিশুদ্ধ রাগাশ্রয়ী, তেমনি পূর্ববঙ্গে দ্বিজদাস, মনমোহন প্রভৃতি লোক-কবির গান-গুলোও বিশুদ্ধ রাগাশ্রয়ী। এগুলো গ্রাম্য-সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হলেও লোক-

সঙ্গীতের পর্যায়ে পড়ে না। লোক-সঙ্গীতে যেখানে রাগের ছাপ পড়েছে, সেখানে রাগের স্পর্শ থাকা সত্ত্বেও লোক-সঙ্গীতের মৌলিক চরিত্রটি বদলায় নি। এই সীমা রেখাটি অতি সাবধানে টেনে সুরের মূল্যায়নে আমাদের এগুতে হবে।

শ্রীহট্টের লোক-সঙ্গীতেও দেশ, ভূপালী প্রভৃতি রাগের ছায়া বহু গানে পাওয়া যায়। কোনো-কোনো গানে তা খুবই স্পষ্ট; আবার কোনো গানে তা শুধু ছায়া ফেলে মৌলিক ভাটিয়ালীর স্রোতে বিলীন হয়ে যায়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ থাকলেও আমি মাত্র দু'একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে এ নিবন্ধ শেষ করব।

শ্রীহট্টে, বিশেষতঃ হবিগঞ্জ মহকুমায় একটি সুর প্রচলিত আছে,—যাতে মধ্যম ও নিখাদ বর্জিত ভূপালীর সুস্পষ্ট ছাপ পাওয়া যায়,

দেহ-তরী ছাইড়া দিলাম
ও গুরু, তোমার নামে— ॥

সা	সা	সা	রা	গা	পা	ধা	র্সা	র্সা	-া
দে	হ	ত	রী	ছাই	ড়া	দি	লাম্	ও	০

-র্রা	-র্সা	-ধা	-পা	-ধা	-পা	-গা	-রা
০	০	০	০	০	০	০	০

গা	মা	-গা	-রা	-সা	ধ্া	সা	রা	গা
গু	রু	০	০	০	তো	মা	রো	না

গা	-রা	-সা
মে	০	০

আর একটি গানের প্রথম কলিতে শুদ্ধ 'দেশ' রাগের সব ক'টি পর্দারই ব্যবহার পাই,

আছে শ্যাম-অঙ্গে রাই-অঙ্গ হেলাইয়া গো,
শ্যাম-অঙ্গে রাই-অঙ্গ হেলাইয়া ॥

সা সা ঋা -া মা মা মা -পা ধা র্সা
আ ছে শ্যা ম্ অং গে রা ই অং গ

গা ধা -পা ধা পা -মা -গা -ঋা
হে লা ই য়া গো ০ ০ ০

ঋা -া ঋা মা মা -গা ঋা গা -া
শ্যা ম্ অং গে রা ই অং গ ০

ঋা সা সা -া
হে লা ই য়া

শ্রীহট্টের "হোরীগান" ব'লে প্রচলিত বসন্ত-উৎসবের উল্লসিত লোক-সঙ্গীতের সুরের মধ্যে অবরোহণে 'ললিত'-এর রেশ এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে,

আজ হোরী খেলব
রে শ্যাম, তোমার সনে ;
একেলা পাইয়াছি—
হেথা নিধুবনে ॥

I সা -া সা । সা -া । সা -া I সা জ্ঞা -ঋা । সা -ঋা । সা -ন্‌া I
আ ০ জ হো ০ রী ০ খেল্ ব ০ রে ০ শ্যা ম্

I সা -া -া । গা গা । গা -মা I পা -া -া । -া -দা । -পা -মা I
তো ০ ০ মা র স ০ নে ০ ০ ০ ০ ০ ০

I মা মা -া । পা -া । দা -পা I মা জ্ঞা -া । ঋা -া । সা -া I
এ কে ০ লা ০ পা ই য়া ছি ০ হে ০ থা ০

I ন্‌া -া -া । সা -া । ঋা -সা I ন্‌া -া -দ্‌া । প্‌া -া । -া -া I
নি ০ ০ ধু ০ ০ ০ ব ০ ০ নে ০ ০ ০

গান সুরু হয়—বিলম্বিত তেওরায়; ক্রমশঃ লয় বাড়তে-বাড়তে দাদরা ও কাহারবা তাল-ফেরে—দ্রুত কাহারবায় সমাপ্তি টানা হয়। একদিকে সুরের ধ্রুপদী বিন্যাসে এবং লয়ের তাল-ফেরের চলনে,—আবার অন্যদিকে সাধারণ লোকের সমবেত কণ্ঠের সহজ অভিব্যক্তিতে এই গানগুলো এমন এক সামগ্রিক লৌকিক রূপ ধারণ করেছে যে,—লোক-সঙ্গীতে রাগের সাবলীল মিশ্রণের এ রকম দৃষ্টান্ত অতি বিরল। কয়েক বৎসর আগে, কলকাতার শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে আমরা যখন এ গানটি উপস্থিত করি, অনেকে —এমন কি, কিছু সমজদার সঙ্গীতজ্ঞও এটিকে লোক-সঙ্গীত ব'লে মেনে নিতে চান নি।

আমি পূর্বেই বলেছি, আমাদের পল্লি-সংস্কৃতিতে একটি অনাবিল রাগ-সঙ্গীতের ধারাও বিদ্যমান; কিন্তু, এই হোরীগানের ধারাটি তার সব কাছাকাছি থাকলেও এই ধারাটী ওপর থেকে নয়,—জন-সাধারণের ভেতর থেকে উৎসারিত।

এ বিষয়ে সবচেয়ে নির্ভুল নিশানা হল গায়কী। কয়েকবৎসর পূর্বে পূজ্যপাদ আলাউদ্দীন খাঁ সাহেবের সঙ্গে ঘরোয়া আলাপের সুযোগ পেয়েছিলাম। পূর্ববঙ্গের ত্রিপুরাজেলার মাটির সুরের কোলে জন্ম নিয়ে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মীনারচূড়ায় যিনি আরোহণ করেছেন, এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য সেদিন আমার কাছে লোকসঙ্গীতের একটি নতুন দিক খুলে দিল। কথাচ্ছলে তিনি বলছিলেন তাঁরই ছোটবেলাকার মাঠে-ময়দানে গাওয়া একটি গানের কথা—যে গানটি ছোটবেলায় আমরাও গেয়েছি: "বিরলে কইয়ো গিয়া বন্ধুয়ার লাগ পাইলে।"

এই গানটি একই সুরে দুই গায়কীতে গেয়ে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সহজ অভিব্যক্তিতে বললেন, "এক গায়কীতে এটি লোকসঙ্গীত, আবার অন্য গায়কীতে একেই উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের শ্রেণীতে ফেলা যায়।"

॥ পাঁচ ॥

এই ছোট্ট নিবন্ধটি শেষ করার আগে দুটি কথা বলতে চাই। লোক-সঙ্গীত নিয়ে আলোচনার পরিধি যদিও তুলনামূলকভাবে অনেক বেড়েছে, তবুও সামাজিক, ঐতিহাসিক, কাব্যিক দিক নিয়ে আলোচনার মধ্যেই

তা সীমাবদ্ধ। লোকসঙ্গীতের সাঙ্গীতিকী নিয়ে কোনো আলোচনা প্রায় চোখেই পড়ে না। যাঁরা ভারতীয় রাগ-রাগিণী নিয়ে সার্থক গবেষণা করেছেন,—তাঁদের দরদী দৃষ্টি থেকে লোকসঙ্গীত প্রায় বঞ্চিত। অবশ্য জনজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় না থাকলে এবং একই অঞ্চলের লোক-সঙ্গীতের বিচিত্র বিন্যাস সম্বন্ধে গভীর অভিজ্ঞতা না থাকলে, দূরে ব'সে কয়েকটি সংগৃহীত সুরের বিশ্লেষণে তাঁদের আলোচনা একপেশে হবার ভয় থাকে। যাঁরা রাগসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীতের দুটি ধারার সঙ্গে সমানভাবে ঘনিষ্ঠ সেরকম গুণী ডুবুরীর সম্মুখে আমাদের লোকসঙ্গীতের বিরাট সমুদ্র আজ অবারিত ও অনাবিষ্কৃত। ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে আমি এই আলোচনার উপযুক্ত মনে করি না। তাছাড়া বিশেষ একটি জেলাতে সীমাবদ্ধ থাকায় আমার কাজ আরও কঠিন হয়ে পড়ে। তবু এই ক্ষুদ্র আলোচনা যদি উপযুক্ততরদের উৎসাহিত করে, তবে তা সার্থক।

দ্বিতীয়তঃ এই আলোচনায় সাহস পেতাম না যদি না অধ্যাপক নির্মলেন্দু ভৌমিক মহাশয় আমার ফেলে আসা জেলার সংস্কৃতি সম্পর্কে আমার চেয়েও উৎসাহী হয়ে না উঠতেন। তাঁর এই অনুপ্রেরণার প্রধান উৎস পরলোকগত গুরুসদয় দত্তের সংগৃহীত গানগুলি। বৃটিশ সিভিল সার্ভিসের লোক হওয়া সত্ত্বেও তিনি গ্রাম্য মানুষের সঙ্গে মিশে যেতে পেরেছিলেন। তাঁর সংগৃহীত লোকশিল্পের নিদর্শনগুলো ঘরোয়া মিউজিয়ামের ঐশ্বর্য আহরণের সৌখীন আর্ট-সাধনা ছিল না। সাধারণ অবজ্ঞাত মানুষের সুপ্ত প্রতিভার স্বীকৃতি দিয়ে গ্রাম বাঙলার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জাগানো ছিল তাঁর কর্মসাধনা। বাঙলাদেশে সঙ্গীত বা হস্তশিল্প জীবিত থাকলেও নৃত্য প্রায় অবলুপ্ত হতে বসেছিল। দত্ত মহাশয় ছিলেন বাঙলার লোকনৃত্যের পুনরুদ্ধারে পথিকৃৎ। সিভিলিয়ান হিসেবে তাঁর এই কার্যে গূঢ় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আরোপ ক'রে সেই সময়ের উগ্র জাতীয়তাবাদীরা তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসাপ্রচার করেছিলেন। কিন্তু, কালের বিচারে গুরুসদয় দত্তের পক্ষে রায় মিলেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই গ্রন্থখানা তারই একটি প্রধান সাক্ষ্য।

অ

আ

ক

খ

গ

ত

দ

ন

প

ব

ভ

ম

য

র

ল

শ

স

হ

পরিশিষ্ট—চ : শব্দ-সূচী

[শব্দ ও শব্দ-সমষ্টির পার্শ্বস্থিত সংখ্যাগুলি সংশ্লিষ্ট গানগুলিকে বুঝাইবে]

ই, ঈ

উ, ঊ

ঝ

ট

ঠ

ড

ঢ

ত

প

ভ

ম

য

র

শ